উৎসর্গ

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

স্নেহের ভগিনী !

তোমাকে খুসী করবার জন্যে আমার এই বাল্যকথা স্মৃতির মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি—তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত। তা ছাড়া, আমার বোম্বাই কাহিনীর সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত; তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে, তাতে যে সকল লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে তোমার সুপরিচিত কেননা কত সময় তুমি আমার বোম্বাই প্রবাস-সঙ্গিনী হয়ে কত আদর যত্নে প্রবাস যন্ত্রণা যে কি তা আমাকে জান্‌তেই দাওনি;—এই সকল কারণে এই কথামালা যেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায়? তাই ভাই এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে অর্পণ করছি, তুমি আমার স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।

রাঁচী
৫ই আগষ্ট
১৯১৫

তোমার
মেজদাদা

ভূমিকা

'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস' সমস্তটাই ভারতী পত্রিকায় প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে বাহির হইয়াছে, এইক্ষণে এই দুই খণ্ড একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে আমার বাল্যজীবন কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয় খণ্ডে আমার সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রবাসের শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত এবং সেই সঙ্গে বোম্বাই মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশের ইতিহাস, পারসী জাতি, জৈন স্বামী নারায়ণ প্রভৃতি গুজরাতের ধর্ম্ম সম্প্রদায়, আর্য্য সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের বিবরণ অল্পবিস্তর দেওয়া হইয়াছে। এই সকল লেখার ভাষা সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা বলিবার আছে। বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এ উভয়েরই সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কথিত ভাষার ব্যবহার নানা কারণে দুষ্য বিবেচনা করেন, আবার 'বীরবল' প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন যাঁহারা ঐ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন মত এই দুই প্রকার ভাষার উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমার মনে হয় বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভাষারও তারতম্য আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, ভাষাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। পাঠকবর্গ এই তর্কের মীমাংসা করিবেন। আমি গ্রন্থখানি তাঁহাদের বিচারাসনে আনিয়া এখনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রাঁচী
৬ই আগষ্ট, ১৯১৫

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছেলেবেলায় আমরা বাবামহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁসতাম না। তিনি কখনও কখনও আমাদের ডেকে ইংরেজি বাঙলায় পরীক্ষা করতেন আর কখনও বা তাঁর মজলিসে গিয়ে আমরা চুপটি করে বসে থাকতুম। আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার বেলায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়াবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রত্যহ আমাদের পারিবারিক উপাসনা হ'ত, তাতে আমরা সকলে যোগ দিতুম। আমি মুখে মুখে প্রার্থনা আবৃত্তি করতুম। একটি স্তোত্রমালার পুস্তকে কতকগুলি ভাল ভাল স্তবস্তোত্র সন্নিবিষ্ট ছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু আরও অন্য কারকারও বিরচিত। তার প্রায় সকলগুলিই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ফরাসী ব্রহ্মবাদী Fenelon হ'তে অনুবাদিত যে প্রার্থনাটি মহর্ষির আত্মজীবনীতে দেওয়া হয়েছে সেটিও তার মধ্যে ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের একটি প্রার্থনা ছিল তা এখনো আমার কিছু কিছু স্মরণ আছে। তাঁর ভাষার বিশেষত্ব তা হ'তে স্পষ্ট ফুটে বেরুচ্ছে। আরম্ভ এই—

"হে ধ্রুবসত্য সনাতন! কালসহকারে কত বিষয়ের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার অপরিবর্ত্তনীয় অপার কারুণ্য-স্বরূপের কদাচ পরিবর্ত্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নগর সকল পুরাতন হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষ অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য ও যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে কিন্তু তোমার সেই কারুণ্য-স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন নাই, ইত্যাদি।"

তখন ১১ই মাঘের উৎসব খুব ধুমধামে সম্পন্ন হ'ত। বিস্তর লোকজনের সমাগম আর রাত্রে এক বৃহৎ বৈঠকী ভোজ। তাতে আমরাও যোগ দিতুম। সেই একদিন যেদিনে ছোট বড়র কোন প্রভেদ থাকত না। ঐ উপলক্ষে একবার একদল মিলে পলতার বাগানে গিয়ে বড়ই আমোদ আহ্লাদ করা গিয়েছিল; সেদিনের ব্যাপার আমার বেশ মনে পড়ে। ভোজের কর্ম্মকর্তা ছিলেন জগমোহন গাঙ্গুলী। লোকটি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ—তাঁর ভুঁড়িটিও অতুলনীয়। এমন সৌখীন আমুদে অথচ কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। খাওয়া, পরা, ওঠা, বসা, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁর কারিগিরি প্রকাশ পেত। রান্না বান্না ঘর কন্না—পোষাক সাজ সজ্জা, কারুকার্য্য, ছুতরের কামারের কাজ—সকল কর্ম্মেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা ছেলের দল তাঁর বড় নেওটা ছিলুম—তাঁর ঘরে গিয়ে খেলা করতুম,—তাঁর কাছে গল্প শুনতুম;

তাঁর খুঁটিনাটি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে কোনওটা আবদার করে আদায় করতুম ;—তাঁর মুখের পান কি মিষ্টি লাগত! তিনি আমাকে উর্দ্দুর প্রথম কেতাব "চাহার দরবেস" শেখাতেন—"সুভান আল্লা ক্যা সানে হ্যায় কি জিসনে এক মট্টি থাকসে ক্যা ক্যা সুরতে আওর মিট্টিকি মুরতে পয়দা কিয়া।"

তাঁর ভুঁড়িটি আমাদের আদরের সামগ্রী ছিল আর তিনি সকালে যে নাকডাকানী গম্ভীর আওয়াজে দিগ্বিদিক ধ্বনিত করতেন আমরা ভোরে উঠে তাই শুনতে যেতুম। তিনি একপ্রকার আমাদের বাড়ীর দ্বারপাল ছিলেন। একবার একদল পুলিস ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে বলপূর্ব্বক আমাদের একটা গাড়ী টেনে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিল—তিনি একলা সেই গাড়ী ধরে রেখে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। আমাদের জগমোহন সেকালের রামমূর্ত্তি।

সেই গাঙ্গুলীমশায় পলতার বাগানে আমাদের বনভোজনের আহার সামগ্রী প্রস্তুত করলেন—সে মাছের ঝোল ভাত আর ভুলব না! আমাদের বাহনগুলি সারি সারি চলেছে—৮।১০টা বোট—আমরা রাত্রিশেষে পলতার বাগানে দলবলে গিয়ে উপনীত হলুম। বোটে আমাদের বিদূষক ছিলেন নবীনবাবু; তাঁর হাস্যপরিহাসে সন্ধ্যাটা খুব আমোদে কেটে গেল। তাঁর বিদ্রূপের বাণ বিশেষরূপে যাঁর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছিল সে লোকটি বে—বাবু। আমি তাকে হাবু বলব। বাবু শব্দে নবীনবাবু এক ছড়া বেঁধেছিলেন তা হাবুবাবুতে বেশ খেটে যায়—

বাবাবো বহবঃ সন্তি বাবুয়ানা পরায়ণাঃ হাবুবাবু সমো বাবু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

তিনি একজন কফ্প্রধান লোক—ঠাণ্ডার ভয়ে গলায় সালের গলাবন্ধ ও গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে ঝিমচ্ছেন। বোটের ভিতর একপাশে একটা ছোট কাচের আলমারী ছিল। নবীনবাবু যখন হাবুর প্রতি লক্ষ্য করে গম্ভীর ভাবে প্রস্তাব করলেন যে ঐ কাপড়ের পার্সেলখানা তুলোয় জড়িয়ে এই গ্লাসকেসে পুরে রাখলে ভাল হয়, তখন আমাদের হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল। পলতায় নেমে আমরা দলে দলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লুম। প্রধান দুইদল—একদল চড়ুইভাতী রান্নার চারিদিকে, অন্য দলের কেন্দ্র হচ্ছেন—চাটুয্যেমশায়। ভবিষ্যতে তিনি আমাদের একজন পরম আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়ত ৪০ পেরিয়ে থাকবে কিন্তু বালকের মত তাঁর ভাবভঙ্গী উৎসাহ কলরব, নৃত্যগীত লীলাখেলায় আমাদের সকলকে মাতিয়ে তুললেন। তাঁর তখনকার গান মনে পড়ছে—

ব্যাটাছেলের (মুখে)* কড়ি সর্ব্বলোকে কয়,
সাহসের কার্য্যে ব্যাটাছেলের পরিচয়!

* কথাটির সামান্য একটি অক্ষর বদল করিলাম।

কলম্বস নাবিক ছিল, সাহসে আমেরিকা গেল,
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।
ব্যাটাছেলে হবে যদি, সাহস কর আজ অবধি,
বিধবা বিবাহে কর আনন্দ উদয়।

উপরে আমি পারিবারিক উপাসনার কথা উল্লেখ করেছি। কোন কোন দিন উপাসনান্তে বাবামশায় আমাদের উপদেশ দিতেন। আমাদের যা কিছু দোষ দেখতেন কোন কোন দিন উপদেশে তার উল্লেখ করে শুধরে দেবার চেষ্টা কর্‌তেন। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরিজি রকম চাল চলনের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলুম তখন তিনি একদিন দালানে উপাসনার সময় ইংরাজি রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ—অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন—সে উপদেশটি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে। বিলেতে থাকতে আমি তাঁকে একবার নাচ-মজলিসে বিবিসাহেবের একসঙ্গে নৃত্য বর্ণনা করে পত্র লিখেছিলুম—তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যেন আমি সেই রাক্ষসী মায়ায় মত্ত হয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে আমার আসল কাজ ভুলে না যাই।

বাবামহাশয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে Conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতিশীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি যে-রকম সমাজসংস্কার করেছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করেছেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা Conservative হয়ে পড়েছিলেন; বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটী পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন; কিন্তু আমার তখন নবীন বয়স—আমি ছিলুম ঘোর Radical.

এই সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পর যতই মতভেদ থাক্ না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। অনেক দূর ইচ্ছামত চলতে দিতেন।

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?" আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হ'ত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয় মুসলমান রীতির অনুকরণ। অনুকরণ এবং মুসলমান অত্যাচার হ'তে আত্মরক্ষা এই দুই কারণ হ'তে তার উৎপত্তি হ'তে পারে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু-আচার অন্যতম। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হ'ত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দেবার জন্ত কত ফন্দী করতুম এখন মনে হ'লে হাসি পায়। John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম। বিলেত গিয়ে আমি দেখতুম স্ত্রী পুরুষ কেমন স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলা মেশা করছে!—গার্হস্থ্য জীবনে তাদের মেয়েদের কি মোহন সুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেছেন। আমি একবার একটি সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবার মধ্যে অতিথিরূপে কতিপয় দিবস যাপন করেছিলুম। গৃহে অনেকগুলি কন্যা কুমারী ছিলেন—সমস্ত গৃহকার্য্যে তাঁহাদেরই আধিপত্য। বিদায় নেবার সময় তাঁহাদের খাতায় স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ আমার হস্তাক্ষর রেখে যেতে অনুরোধ করাতে আমি লিখেছিলুম—

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

তাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রীরা পর্দ্দার অন্ধকারে কি খর্ব্বীকৃত বদ্ধ জীবন যাপন করেন,—উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ,—তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানবল-ক্রিয়া কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বিষয়ে পূর্ব্বপশ্চিমের পরস্পর বিপরীত ভাব আমাদের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হ'ল—পর্দ্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জেগে উঠল। কিন্তু তখন ভাল করে দেখতে পেলুম আমার সামনে যে পর্ব্বত সমান বিঘ্নবাধা রয়েছে তা অতিক্রম করা কি কঠিন! যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অথচ আমার তা না করলেই নয়। তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে এসেছি—বোম্বাই আমার কর্ম্মস্থান নিয়োজিত হয়েছে—বোম্বাই যেতেই হবে, আর আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তখন আবার কলকাতা ও বোম্বায়ের মধ্যে রেলপথ প্রস্তুত হয়নি—জাহাজে করে যেতে হবে। বাবামহাশয় তাতে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। এখন কথা হচ্ছে ঘাটে উঠা যায় কি করে? গাড়ী করে ত যাওয়া চাই? আমি প্রস্তাব করলুম বাড়ী থেকেই গাড়ীতে উঠা যাক্। কিন্তু বাবামহাশয় তাতে সম্মত হলেন না—বল্লেন মেয়েদের পাল্কী করে যাবার নিয়ম আছে তাই রক্ষা হোক্। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধু কর্ম্মচারীদের চ'খের সামনে দিয়ে বাহির দেউড়ি ডিঙ্গিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এ তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হল না। এই ত গেল পর্দ্দা ভাঙ্গার প্রথম অবস্থা। আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজমহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্য-

স্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। এখন এসব কথা গল্পের মতই মনে হয়। এইরূপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ ও পরিষ্কৃত হয়ে এল। ক্রমে আমাদের বাড়ীর লোকেরা (মেয়ে পুরুষ) আমার ওখানে গিয়ে মধ্যে মধ্যে প্রবাস-যাপন করতে লাগলেন। ওদেশে বোম্বাই মাদ্রাজে কোথাও বাঙ্গালা দেশের মত মেয়েদের অবরোধ প্রথা নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন ক'রে তাঁদের মনোভাব অনেক পরিমাণে বদলে গেল। পর্দ্দার উচ্ছেদ সাধন আমার যে চিরকালের সাধ তা ক্রমে মেটবার মত হয়ে এল। আমি বোম্বাই থেকে ছুটির সময় মাঝে মাঝে বাড়ী আসতুম—তখন দেখি পর্দ্দার তেমন কড়াক্কড় বাঁধুনি নেই, অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। তারপর এখন!

সেকাল আর একাল—কি তফাৎ! কলকাতা সহরের ভদ্র মহিলারা রাস্তা ঘাটে গাড়ীতে মোটরে ইচ্ছামত বেড়িয়ে ব্যাড়াচ্ছেন এ দৃশ্য কারও নূতন ঠেকে না। যা কিছুকাল পূর্ব্বে কল্পনারও অতীত ছিল এক্ষণে তা সহজ স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। সত্যি সত্যিই অন্তঃপুরবাসিনীগণ এখন মেমের মত গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। এতদিনে আমার মনস্কামনা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে।

আমি আমার বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে-কালের কথা পেড়েছি সে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল। তখন আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার স্মৃতি তারও ঊর্দ্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়; এবার যতটা পারি সুদূর অতীতের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করব।

দ্বারিকানাথ ঠাকুর

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে মনে পড়ে কি না? তার উত্তরে বলতে পারি একেবারে মনে পড়ে না তা নয়, স্পষ্ট মনে পড়ে তাও নয়। একদিন তিনি আমাদের তিন ভাইকে ঘরে ডেকে নিয়ে কিছু দিয়েছিলেন, দুচারটি হাসির কথা বলেছিলেন, সে ঘরটি মনে আছে আর তাঁর চেহারাও মনে পড়ে, তবে ঝাপসা ঝাপসা। তাঁর যে চেহারা আমার মনে অঙ্কিত আছে তা সে-সময়কার চাক্ষুষ জ্ঞান থেকে কিম্বা তাঁর যে সকল চিত্র আমরা সচরাচর দেখিতে পাই তার প্রতিচ্ছবি তা ঠিক বলা যায় না—খুব সম্ভব শেষটাই হবে।

কর্ত্তাদাদা যখন আমাদের ছেড়ে বিলাত যাত্রা করেন তখন আমরা নিতান্ত শিশু, সে সব ঘটনা কিছুই মনে নাই। এদেশে যখন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আসে তখন

আমরা বোটের মধ্যে গঙ্গার উপরে ভাসছিলুম—ভয়ানক ঝড় তুফান উঠেছে আর বড়দাদা হেমেন্দ্র ও আমি মার কাছে ভয়ে জড়সড়,—সেই তুফানের মধ্যে আমাদের একজন ভৃত্য কর্ত্তাদাদার মৃত্যু সংবাদ এনে বাবামশায়ের হাতে দিলে। এই ঘোর দুর্য্যোগে আমরা পলতার বাগানে নেমে, সেথান থেকে গাড়ীতে উঠে কোন প্রকারে বাড়ী পৌঁছলুম—পৌঁছেই দুধ দুধ করে অস্থির। এইটুকু আমার মনে আছে। পিতার আত্মজীবনীতে ঘটনাটির বর্ণনা এইরূপ :—

"আমাদের স্বরূপ খানসামা আমার হাতে পিতার মৃত্যু সংবাদ আনিয়া দিয়া বলিল, কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমাদের বোট ও পিনিস কালনা ছাড়াইয়া কতকদূর গিয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতার অভিমুখে ফিরিলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টি ও বাতাসের কোলাহল। পলতায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। পলতায় পৌঁছিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। এখানে আসিয়া বোট কাৎ হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত জল দাঁড়াইয়াছে, সকলি বৃষ্টির জল। যদি পলতায় গাড়ী না থাকিত তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত ; একথা আর কাহাকেও বলিতে পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতর গাড়ীর চাকা অর্দ্ধেক মগ্ন। অতিকষ্টে বাড়ী পৌঁছিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতর স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতলায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।" পৃঃ ৬০—৬১

দ্বারিকানাথ ঠাকুর দুবার ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বারে লণ্ডন নগরে ১৭৭৮ শকে (August 1846) তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও অপর একজন আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডন সহরের প্রান্তবর্ত্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি হয়। আমি প্রথম যখন সেই সমাধি মন্দির দেখি তখন তার নিতান্ত ভগ্নাবস্থা, পরে তার জীর্ণসংস্কার হয়েছে। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় দুই মহাত্মা যাঁরা ঐ সুদূর পশ্চিমে দেহত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন যাতে বিলুপ্ত না হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, একথা বলা বাহুল্য।

দ্বারিকানাথ ঠাকুর বিলাত যাবার সময় তাঁর অগাধ জমিদারী বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে যান তা তাঁর মনের মতন হয়নি। যে সকল কর্ম্মচারীর

উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাঁদের কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কর্ত্তা নিজে তত্ত্বাবধান না করলে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়' এ এক প্রকার ধরা কথা। আমার পিতা যদি তেমন মনোযোগ করে বিষয় কর্ম্ম দেখতেন তাহলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য দিকে, নিতান্ত দায়ে পড়ে যতটুকু করতে হত' তাই করতেন। কর্ত্তাদাদা তাঁকে লণ্ডন থেকে এই বিষয়ে এক পত্র লিখেছিলেন তার এই উদ্ধৃতাংশ থেকে দাদামশায়ের মনোভাব কতকটা জানা যায় :—

"আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।"*

আমি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের Sussex জেলার অন্তর্গত সমুদ্রের উপকূল Worthing নামক বন্দরে গিয়া কিছুদিন বাস করি। উহা আমার নিকট এক প্রকার তীর্থস্থানের ন্যায় মনে হয়েছিল, কেননা ঐখানে আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একমাস কাল যাপন করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন, এ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসক মার্টিনের পরামর্শে রোগ শান্তির জন্যে এই বন্দরে গিয়ে অবস্থিতি করেন। তিনি যে হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন আমি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করি ; সাহেবটির নিকট হতে দাদামশায়ের অনেক খবর শুনতে পাই। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারী, একজন Interpreter, সঙ্গীত-ওস্তাদ জর্ম্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্ব্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যকমত কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। আমার ছোট

From Dwarkauath Tagore to Debendranath Tagore
London 19th May 1846.

* It is only a source of wonder to me that all my estates are not ruined. Your time, I am sure, being more taken up in writing for the newspapers and in fighting with the missionaries than in watching over and protecting these important matters which you leave in the hands of your favourite Amlas—instead of attending to them yourself, most vigilantly.—If I was strong enough to bear the heat and climate of India, I should immediately have left London personally to superintend &c.

কাকা নগেন্দ্রনাথ আর দূর সম্পর্কীয় পিতৃব্য নবীনবাবু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোট কাকার গায়ে এক বহুমূল্য সবুজ রংএর শাল ছিল আর তাঁর জ্বলজ্বলে কাল' চোখের প্রশংসা সর্ব্বত্র শোনা যেত। তাঁর কথা আর বেশী কিছু জানতে পারলুম না। আমার পিতামহের শরীর শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। রোগের জ্বালায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন—তারপর আহার; তাঁর ভৃত্য হুলির তয়েরি কারি-ভাত আর একটু কমলানেবুর জেলী, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্যে মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন—Duchess of Inverness রোজ পত্রদ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি (Tortoise shell) কাঁচকড়া মসলার ডিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হ'ত না, জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফজল ভালবাসতেন। দিনরাত তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত প্রিয়ভৃত্য হুলি তাঁর শোবার ঘরের বাহিরে শুয়ে থাকত। অনেক সময় তাঁর বিছানার পাশে মাদুরের উপর বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হ'তে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্টে তিনি পরলোক গমন করেন। *

---

* গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত। Worthing—25th August, 1867

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু

1st August, 1846.

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে কথোপকথন

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় প্রোফেসার ম্যাক্সমূলার আমার সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষান্তে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও আমার স্বর্গীয় পিতামহ ও পিতৃদেব সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলেন।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রেমাকর্ষণ সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে হয়, সে বিষয়ে তিনি বলেন যে, অতি শৈশবকাল হইতে লোকমুখে ভারতবর্ষের নানা প্রকার বিবরণ শুনে তিনি সেটাকে একটা স্বপ্ন-রাজ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রূপকথায় যেমন থাকে যে, যোদ্ধা একদিন হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন যে, কোন অজানা দেশে এক পরমাসুন্দরী কন্যা বন্দিনীভাবে বাস করছে, তাই দেখে যোদ্ধার মন এমন বিচলিত হ'ল যে, কত খোঁজ করে যুদ্ধ করে যতদিন না তার উদ্ধার সাধন করতে পারতেন, ততদিন যেমন নিশ্চিন্ত থাকতেন না; তেমনি ভারতবর্ষকেও তিনি তাঁর স্বপ্ন-রাজ্যের সুন্দরী বলে কল্পনা করতেন। তারপর যখন তাঁর দশ বৎসর বয়স তখন তাঁর ইস্কুলের কপিবুকের মলাটে হঠাৎ একদিন কাশীর স্নানের ঘাটের চিত্র দেখে স্বপ্নাবিষ্টের মত সেই দিকে চেয়ে বসে রইলেন। চিত্রটী যদিও বিশেষ পরিস্ফুট ছিল না, তবুও সে ছবিখানি তাঁর বেশ মনে ছিল। তিনি বল্লেন, "কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক তখন আমার কতটুকু জ্ঞান ছিল? কেবল এই শুনেছিলাম যে ভারতবাসীরা কৃষ্ণকায়, তারা বিধবাদের জ্বলন্ত চিতায় অর্পণ করে, আর স্বর্গলাভ করবার জন্য জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে নিজেদের নিক্ষেপ করে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে। আমার কপিবুকের চিত্রে কিন্তু দেখলাম যে তারা বেশ লম্বা এবং সুশ্রী। আর গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দিরাদি অঙ্কিত ছিল তাদের সৌষ্ঠব ও উচ্চ চূড়াগুলিতে এমন একটি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছিল যে, আমার স্বদেশের গির্জ্জা ও প্রাসাদগুলি তাদের নিকট হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের কল্পনায় মগ্ন হয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমার শিক্ষক-মশায় এসে কানটি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বল্লেন যে, এতক্ষণ কুঁড়েমি করে বসে থাকার দরুণ আমাকে আরও অনেকগুলি পাতা কাপি করতে হবে। এই তো গেল ভারতের সঙ্গে আমার প্রথম সকরুণ পরিচয়!

"তারপর বহু বৎসর কেটে গেল। ১৮৪১ সালে আমি যখন লিপ্‌সিগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন আমার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবার লক্ষণ দেখা গেল। একদিন শুনলাম যে সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য নূতন শ্রেণী খোলা রয়েছে এবং প্রোফেসার ব্রকৃহস্ ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে লেকচার দেবেন। আমি রীতিমত

সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করে দিলাম এবং নলোপাখ্যান, শকুন্তলা ও ঋগ্বেদের কতক অংশ পড়তে শিখবার পর বার্লিন ও তৎপরে প্যারিসে সংস্কৃত-চর্চ্চা করতে যাই।

"সেই সময় ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা আমার বড়ই প্রবল হয়েছিল। ইয়োরোপীয় ছাত্রদের যেমন রোম অথবা এথেন্স দেখবার একটা তীব্র স্পৃহা থাকে, আমারও তেমনি একবার ভারতবর্ষ দর্শন করে কাশীর পবিত্র গঙ্গায় স্নান করবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তখন তাহা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল, কারণ একে ত তখন ভারতবর্ষ ছিল ছয় মাসের পথ, তার উপর অধিক ব্যয়সাধ্য। ভারতের মুখ দর্শন করা জীবনে আমার ভাগ্যে ঘটিল না। যৌবনকালে অর্থাভাবে যাওয়া ঘটে নাই, এবং পরে যদিও আমার ভারতীয় বন্ধুদের দ্বারা বার বার নিমন্ত্রিত হয়েছি, কিন্তু একে বৃদ্ধকাল, তায় নানা কর্ত্তব্য-কর্ম্মে জড়িত হ'য়ে পড়ে এই সব ছাড়িয়ে যাওয়া দুর্ঘটন হ'ল। তা ছাড়া শুধু ভারতবর্ষ একবার বেড়িয়ে এলেই তো আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ত না। (অন্ততঃ দুই তিন বৎসর সেখানে বাস করতে না পারলে, ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিখতে না পারলে এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে না পারলে আমার পক্ষে ভারতভ্রমণ বৃথা হ'ত। আমার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তো শুধু উপর থেকে নয়, তাহা বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে। কেবল যদি কলিকাতা বা বোম্বাই ঘুরে আসা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, তাহলে তো বিলাতের অক্সফোর্ড বা বণ্ড ষ্ট্রীট একবার বেড়িয়ে এলেই হয়!

"কিন্তু যদিও আমি কোন দিন ভারতে পদার্পণ করিনি তথাপি আমার সৌভাগ্যবশতঃ য়ুরোপে ভারতের কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও সুযোগ্য সন্তানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। অনেকে আমাকে বলেন যে, এই সকল মহৎ-চরিত্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ায়, ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা জন্মেছে; কারণ সর্ব্ববিষয়ের উৎকৃষ্টতা দেখলাম কিন্তু নিকৃষ্টতা কিছু জানতে পারলাম না। আমার মনে হয়—তাতে ক্ষতি কি? ভারতবাসীর চরিত্রের চরমোৎকর্ষ যে কতদূর হইতে পারে তাহা তো দেখলাম। অবশ্য আমি এমন আশা করি না যে, একটা সমগ্র জাতি কেবল রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, মালাবারী বা রমাবাইয়ের ছাঁচে ঢালা হবে, কিন্তু তা বলে, যে দেশের মধ্যে থেকে এই সব মহচ্চরিত্র লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশের জাতীয় চরিত্র উপেক্ষা করবার নয়।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীরা এমন অবাধে ভ্রমণ করত না। কালাপানি পার হওয়ার বিভীষিকা তখন খুব প্রবল ছিল; সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট

হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থূল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন দেখলাম যে নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফেসারের কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'তে বড় বেশী বিলম্ব হ'ল না। প্রোফেসার বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'ল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হ'লেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি তখন তিনি ইনষ্টিট্যুট্-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসার তাঁকে নিজের ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফরাসী তর্জ্জমার বইখানি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপর দিকে ফরাসী তর্জ্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর সুগঠিত শ্যামল অঙ্গুলীগুলি ফরাসী তর্জ্জমার পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আহা! এইগুলি যদি আমি পড়তে পারতাম!' তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল।

যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হ'ল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হ'ত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লাম একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়, পারসিক গজল, এবং আমিও তাতে বিশেষ কোন মাধুর্য্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলিতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল যে, গানে না আছে সুর, না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বল্লেন, 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি

বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হয়নি; আমি ক্রমাগত চর্চ্চা করতে লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইয়োরোপ যাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ যাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়তো তারো অধিক জান্‌তে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি।

এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি ভারি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন; তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি অন্য বিষয়ের অবতারণা করে বল্লাম যে, 'আমি শুনেছি যে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি অঙ্কশাস্ত্র হইতে। আমি একবার সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা সংস্কৃত খস্‌ড়া দেখেছিলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রোফেসার উইল্‌সন্‌ একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক এবং তিনি বহুবৎসর ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন, সেইজন্য তাঁকে আমি ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা শিখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। তিনি বল্লেন যে, তিনি গান শিখবার জন্য একবার একজন কালোয়াতের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে কালোয়াত বলেন যে, ছয়মাস পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন করে তাঁর কাছে এসে গান শিখলে পর তিনি বলতে পারবেন যে এই ছাত্র সঙ্গীত-বিদ্যা শিখবার উপযুক্ত কি না এবং তারপর একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা করলে তবে পারদর্শী হ'তে পারবেন। এই কথা শুনে প্রোফেসার উইল্‌সন্‌ সেইখানেই ক্ষান্ত দিলেন। সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে দেখে আমার বড়ই লোভ হ'ত শিখবার জন্য, কিন্তু প্রোফেসার উইল্‌সনের মুখে ঐ কথা শুনে পর্য্যন্ত আমাকেও ইচ্ছা দমন করতে হ'ল। তোমাদের ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে আর একজন সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছেন—তিনি হচ্ছেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কেন জানি না, তিনি ব্রাহ্মণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হেসে বল্লেন, 'আমি তো চিরকাল বহুতর ব্রাহ্মণকে পোষণ করে আসছি, সেই

আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু তিনি যে কেবল দেশীয় ব্রাহ্মণদেরই হীন চক্ষে দেখতেন তা নয়—তিনি যাদের নামকরণ করেছিলেন 'কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ',—তাদেরও সমান নীচ চক্ষে দেখতেন। যদিও তিনি ইংরাজদের সকল বিষয়েই প্রশংসা করিতেন, কিন্তু পাদ্রিকুলের কোন নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন। তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও পারমার্থিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাঁর একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি যত্ন সহকারে পাদ্রিদের নিন্দাজনক নানা কথা লিখে রাখতেন। সে এক অদ্ভুত সংগ্রহ—অনেক সময় আমি ভাবি যে সে খাতাখানির কি দশা হ'ল। তোমার ঋষিপ্রতিম পিতা কখনই সে খাতা লয়ে রহস্য করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখনই খৃষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, দ্বারকানাথ তখনই সেই খাতাখানি প্রমাণস্বরূপ বের করতেন। অবশ্য আমি বলতাম যে, কোন দেশেরই ধর্ম্মযাজকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে ধর্ম্মের বিচার করা চলে না।

দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্ত্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়—দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হ'ল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন!

ইংলণ্ডে বাসকালীন দ্বারকানাথ একটি মহা পুণ্যকর্ম্ম করেন। ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের ভস্ম ব্রিষ্টলের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল; দ্বারকানাথ সেই স্থানের উপর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। হায়! তখন তিনি কল্পনাও করেন নি যে, অল্পকালের মধ্যে তাঁকেও এইরূপ বিদেশে প্রাণত্যাগ করতে হবে।

বেদ

আমার বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হয় যে, যে দেশে বেদের এত মাহাত্ম্য এবং যা প্রধান ধর্ম্মপুস্তক বলে গণ্য, সে দেশে কি না আজ পর্য্যন্ত বেদ ছাপানো হয়নি এবং

সকলের তাতে অধিকারও নেই, কেবল অল্প সংখ্যক পণ্ডিতের নিকট বেদের কতকগুলি খস্‌ড়া আছে মাত্র এবং তাই থেকে কেহ কেহ কণ্ঠস্থ করেছেন। সুতরাং পরলোকগত জে. মিয়োর যখন বেদের একটা সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন, তখন কোন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করলেন না।

আমি যখন বেদের সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য প্যারিস, বার্লিন ও লণ্ডনের পুস্তকালয়ে বেদের যত খস্‌ড়া আছে, নীরবে সব সংগ্রহ করে, তা থেকে নকল করে ধারাবাহিকরূপে গোছ করিতেছিলাম, তখন দ্বারকানাথ খুব আগ্রহ সহকারে আমার কার্য্যাবলী দর্শন করতেন। ঠিক সেই সময়েই তোমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ চারজন ব্রাহ্মণকুমারকে চতুর্ব্বেদ শিক্ষা করবার জন্য কাশীতে পণ্ডিতদের কাছে পাঠান। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে, বুঝি দ্বারকানাথ আমার বেদ প্রকাশ সম্বন্ধে পুত্রকে কিছু লিখে থাকবেন, এবং তাই থেকে কাশীতে ছাত্র পাঠাবার কল্পনা তার মাথায় আসে, কিন্তু পরে তাঁর কাছে থেকে যে চিঠি পাই, তাতে জানলাম যে আমার ভ্রম হয়েছিল; দেবেন্দ্রনাথের বহুদিন থেকেই এরূপ মানস ছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, কোন ছাত্রই পরে কোন বিশেষত্ব দেখাতে পারে নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি কখনও তোমার পিতাকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে আমি অনেকগুলি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাঁর দেশের ধর্ম্মোন্নতির জন্য তিনি যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান করেছেন তাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদিও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মবিচ্ছেদ ঘটেছিল, তবু তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

বিদায়কালীন পূর্ব্বকথা স্মরণ করে তিনি বল্লেন, "Oh! I have smoked many a Hookah with your grandfather in Paris!"

কর্ত্তাদাদামশায়ের স্মৃতি যতই অস্পষ্ট হোক্ না কেন, মেজকাকা ও ছোটকাকাকে (গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ) আমার বেশ মনে পড়ে। তাঁদের মুখশ্রী জীবন্তভাবে দেখছি, তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছি, এখনো মনে করতে পারি। বাবামশায় অনেক সময় বাড়ী থাকতেন না। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখতে পাই, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় কোন না কোনখানে ভ্রমণে বেরোতেন। যখন গঙ্গায় বেড়াতে যেতেন তখন কোন কোনবার আমাদের সঙ্গে নিতেন, নইলে বাড়ীতে রেখে যেতেন।

মার কাছে আমরা বেশীক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজ কাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রাম-স্থান। বলতে গেলে মেজ কাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন; তাঁর কাছে আমরা গল্প শুনতুম, তাঁর সঙ্গে তাস খেলতুম, তাঁর কাছ থেকে বেছে বেছে নিয়ে বই পড়তুম—হাতেমতাই, লয়লা-মজনু, নবনারী, আরব্য উপন্যাস, লাম্বস্ টেল, পল ভার্জ্জিনিয়ার অনুবাদ, এই রকম কতকগুলি বই আমাদের পুঁজি ছিল। আমাদের অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে সেকালে উচ্চ শিক্ষার প্রচার ছিল না, তবুও কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বাঙ্গালা বেশ জানতেন, তাঁরাই আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কিন্তু অন্য সময় যাই হোক ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাকতুম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিনব্যাপী একরকম জ্বর হ'ত তা ম্যালেরিয়া বলতে পারি না, কেননা তখন ম্যালেরিয়া ছিল না। জ্বর হ'লেই ডাক্তার দ্বারি গুপ্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে জানে তাঁকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত। তাঁর ব্যবস্থা ছিল—প্রথম দিন তেল (Castor Oil) ও তেলের চেয়েও বিস্বাদ জলের সাগু; দ্বিতীয় দিন এলাচদানার মত সামান্য কিছু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত—সেই জ্বরের এই ক্রম ছিল। তখনকার কালে ব্যামোর সময় হাওয়া বদলের জন্যে বরাহনগর প্রভৃতি কাছাকাছি গঙ্গার ধারের জায়গা ও হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি দূরের কোন কোন স্থান স্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হ'ত। এইক্ষণে সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি বলে পরিত্যজ্য। তেমনি আবার কলিকাতা এখন জলের কলে, নালানর্দ্দমার সংস্কারে ও আর আর ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নাই; এমন কি, কলকাতাই এক্ষণে পল্লীবাসীদের বায়ু-পরিবর্ত্তনের ও স্বাস্থ্য-অর্জ্জনের প্রধান স্থান বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষায় কলিকাতা ইউরোপেরও প্রধান প্রধান নগরীর সমকক্ষ দেখা যায়। অনেক ইংরাজে বলেন দুই একমাস ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যের হিসাবে কলিকাতার সমতুল্য স্থান ভারতবর্ষে মেলা দুষ্কর।

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটকাকা)

ছোটকাকার কাছে আমরা অনেক সময় যেতুম। তিনি গৌরবর্ণ তেজীয়ান্ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন কিন্তু কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হ'ত, আমরা তাঁকে ভয় করে চলতুম। তাঁর বৈঠকখানায় নানা রকম লোভনীয় জিনিস ছড়ান থাকত। একবার

মনে আছে ছোট ছোট ছ্যাঁদা-ভরা মকমলের কাপড় মোড়া একরকম সর্পাকৃতি কাগজ চাপা তাঁর লেখবার টেবিলে ছিল, তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। কাপড় ঢাকার ছিদ্র দিয়ে সীসার গুলিগুলা ঝরে পড়ছে, তাই এক মুঠা কুড়িয়ে নিয়েছিলুম। একটু পরে আমায় তলব পড়ল, চোরামাল শুদ্ধ ধরা পড়ি আর কি! তখন কি করি, সীসার গুচ্ছ মুখে পুরে রেখে ছোটকাকার কাছে হাজির। তার কিয়দংশ গলাধঃকরণ হয়েছিল কি না মনে নাই, আর গেলবার দরুণ পরে কোন অসুখ ভোগ করতে হয়েছিল কি না বলতে পারি না।

ছোটকাকা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের যে সকল চিঠিপত্র লিখতেন তা দেখে বোধ হয় তিনি সে দেশে বেশ আমোদে ছিলেন, আর তাঁর প্রবাসকালে ইংলণ্ড স্কটলণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করে ব্যাড়াতেন। তাঁর রূপ লাবণ্যের দরুণ তিনি সাহেব বিবিদের, বিশেষতঃ বিবিদের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রবাস থেকে স্বদেশে সহজে ফিরতে চাইতেন না। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবু তাঁকে দেশে ফেরবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পত্র লেখেন, তাতে তাঁকে এইরূপে লোভ দেখাচ্ছেন—

"আগামী মাসে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের আদর্শে উচ্চ শিক্ষা বিধান উদ্দেশে কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহাতে তুমি প্রবেশ করিয়া তোমার ইচ্ছামত বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বিদ্যার্থীগণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে উপাধি ও সম্মানের বিবিধ চিহ্ন সকল লাভ করিতে পারিবে। অতএব বাড়ী ফিরিলে তোমার শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিবার যে আপত্তি তার গুরুত্ব অনুভব করিবে না।" (21st September 1846.)

ছোটকাকা সেই সময় তাঁর এক বন্ধুকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বাড়ী ফিরতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে এইরূপ লিখেছেন—

"তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমার এখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা নাই, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না। তুমি জান, আমি সাধারণতঃ ইংরাজ জাতিকে ভালবাসি না, তাদের চাল-চলন দুচক্ষে দেখিতে পারি না, তাহাদের সকল বিষয়ে বণিকবৃত্তি আমি মনের সহিত ঘৃণা করি, তথাপি একটা কি আছে যাহা এই সকল বিরুদ্ধভাবকে খণ্ডন করিয়া দিতেছে; ইংলণ্ড ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে কোন মতেই আমার মন উঠিতেছে না।"

অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরতে হ'ল: যেদিন ফিরে এলেন আমার বেশ মনে পড়ে, ছেলেদের সে মহোৎসবের দিন, কেননা তিনি আসবার সময় তাদের জন্যে

নানা রকম খ্যালনা নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ল, আমি একটা কলের ময়ুর পেয়েছিলুম।

ছোটকাকার কাছে অনেকানেক লোক যাওয়া আসা করত—রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র—পুরাকালের সব খ্যাতনামা পুরুষ—এ সবার মধ্যে তাঁর দুজন মুসলমান বন্ধু ছিল, বজলুল করীম ও বজলুল রহীম। তাঁদের নিয়ে অনেক আমোদ প্রমোদ হ'ত, কখনও বা ইংরাজি মোগলাই মিশ্রিত খানা দেওয়া হ'ত। তার ভাগ আমরাও কিছু কিছু পেতুম। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, তখনকার কালে হিন্দু মুসলমানে যেমন হৃদ্যতা ও মেলামেশা ছিল এখন তা দুর্লভ-দর্শন।

বিলাত থেকে ফিরে আসবার পরে ছোটকাকা দেখলেন আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানি হাউস তখনো বেশ চলছে। ভিতরে ভিতরে তার যে অসার টলমল অবস্থা তা বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষে সেই হাউস ফেল হওয়াতে তিনি অশেষ ঋণভারে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যয়শীল ছিলেন। এই বিষয় পিতার জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"এত দিনে, এই দশ বৎসরে আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আমার আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়, এমন কি, ১০০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর একজনের আনুকুল্য করিতেন—তিনি এমনি পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয়ব্যবহার লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল।" (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

তিনি উল্লিখিত নানা কারণে বিলাত থেকে ফিরে এসে অবধি একটা উচ্চ পদের সরকারী চাকরীর সন্ধানে ফিরছিলেন। যে সকল বড় বড় সাহেব তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লেখেন; অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি ৬ই মার্চ্চ ১৮৫৪ সালে কষ্টম্‌স কলেক্টরের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সে পদ তাঁকে অধিক দিন ভোগ করতে হয় নাই। ১৮৫৬ সালে জুন মাসে তিনি ইস্তফা পত্র দিয়ে তাঁর কলেক্টর Young সাহেবকে লিখেছেন—

"আজ আমার অবকাশের দিন সমাপ্ত হইল। দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি,

গত তিন মাস ধরিয়া আমার বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট মিটাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহাতে যদিও অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হইতে পারি নাই। আরো তিন সপ্তাহকাল সময় না পাইলে এই সমস্ত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া আমার কর্ম্মে ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। আপনি আমার পুনঃ পুনঃ ছুটির আবেদন গ্রাহ্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন; পুনরায় ছুটির দরখাস্তে (একদিনের জন্যও) আপনাদিগকে বিরক্ত করা আমি নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করি, অতএব একান্ত বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার এই চাকরীর ইস্তফা-পত্র প্রেরণ করিতেছি। যখন প্রথমে আমি গবর্ণমেণ্টের এই চাকরী স্বীকার করি, তখন তাহার বেতনের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল না কিন্তু এই-ক্ষণে আমার যেরূপ বৈষয়িক অবস্থা এখন তাহাতে আমার ঔদাসীন্য করা ঠিক হয় না। আমার এই যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিজের দোষে নয় কিন্তু আমার স্বর্গগত ভ্রাতার ঋণভার আমার উপরে পড়িবার দরুণ আমি একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় সেই বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন।"

Young সাহেব এই পত্রের উত্তরে লেখেন—"তুমি লিখিতেছ যে তিন সপ্তাহ সময় পাইলে তুমি তোমার পাওনাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া এই দায় হইতে মুক্ত হইতে পার। তা যদি হয় তাহা হইলে আমার পরামর্শ এই যে একেবারে ইস্তফা না দিয়া তুমি আর এক মাসের অবকাশ প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত কর; উত্তর পাইলে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবে। আপাতত আমি তোমার এই ইস্তফা-পত্র গবর্ণমেণ্টে না পাঠাইয়া আগামী কল্য পর্য্যন্ত তোমাকে মনঃস্থির করিবার সময় দিতেছি।"

কলেক্টর সাহেবের পরামর্শ অনুসারে ছোটকাকা কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কয়েক মাস পরেই দেখা যায় তাঁর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও স্বাস্থ্যলাভ-মানসে তিনি বোম্বাই নাসিক ইন্দোর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হন।

কলিকাতা হ'তে বিদায় নিয়ে তিনি বিদেশ থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের যে সকল পত্র লিখেছিলেন তা হ'তে তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তটাই পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে এই:—

বোম্বাই, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

তিনি সমুদ্র-পথে দিয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই পৌছিয়া Elephanta ও সালসেটের গুহামন্দির ও অন্যান্য হিন্দুকীর্ত্তি দর্শন করিয়া ভলঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পিম্পলগামে উপনীত হন।

পিম্পলগাম, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৯৬

"মারওয়াড় প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতেছি—এই দেশ রাজপুতবীর ও বীরাঙ্গনাগণের রঙ্গভূমি। কিন্তু হায়! সে সব কীর্ত্তি কোথায়? যাইতে যাইতে মনে হইতেছে, "'Tis Greece but living Greece no more"—গ্রীস বটে কিন্তু সে জীবন্ত ভাব তাহাতে নাই।

পরে তথা হইতে নাসিকে উত্তীর্ণ হইলাম, যাহা শিবাজীর অযোগ্য প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের বাসস্থান। সঙ্গে কোন ভৃত্য নাই, বন্ধু নাই, মনে অশান্তি, শরীর অপটু এই অবস্থায় ডাঙ্গা পথ দিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারিব এরূপ আশা করি নাই।"

মালেগাম, ২১এ ডিসেম্বর

"চান্দোর দেখিলাম। অত্যুচ্চ পর্ব্বত পরিবৃত মনোজ্ঞ দুর্গম স্থান। যে সকল প্রদেশ মরাঠী ও পিণ্ডারী যুদ্ধে ব্রিটিস সৈন্যের গোলাগুলি বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা অন্যতর, ইহার গাত্রে সেই ক্ষতচিহ্ন সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান। রাজবাটী (রঙ্গমহল) দর্শন করিলাম। ইহার ভিতর প্রথম হোলকারের গদী রক্ষিত আছে, একটি সামান্য কঠোর গদী, সেই অশ্বারোহী বীরসেনার যোগ্য আসন বটে। চান্দোর ত্যাগ করিয়া দিনের আলো থাকিতে থাকিতে তলঘাটের শোভা সন্দর্শন করিলাম। চারিদিকে পাহাড় শ্রেণী—কি চমৎকার দৃশ্য! এই পর্ব্বতমালার উপর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার নির্ম্মাণ কৌশল কি আর বর্ণনা করিব—যে কারিগরের ইহা মনঃকল্পনা তাহার প্রতিভা স্মরণ করিয়া দিতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির উপরে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে। ঘাট হইতে নামিয়া দেখি উপত্যকা ভূমির দৃশ্যও অতি মনোহর—শ্যামল শস্যক্ষেত্রে যেন মখমল বিছাইয়া দিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ কুঞ্জবন আবার বিহঙ্গদলের মধুর গানে প্রতিধ্বনিত—এ সকলি যারপর নাই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু ভাই সে যাহাই হৌক, বাড়ীর দিকে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে—মনে হইতেছে আমার সেই কোণের ঘরটি পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে সেরা।"

ইন্দোর, ২৮এ ডিসেম্বর

ইন্দোর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তলঘাটের শোভা সৌন্দর্য্য পুনর্ব্বার উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন, "আমি Alps পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার উপর দিয়া যে পথ কাটিয়া গিয়াছে তাহা প্রশংসাযোগ্য, তবুও এই গিরিপথের নিকট তাহাকে হার মানিতে হয়। এই সকল পথ দিয়া ভ্রমণ করা অতিশয় শ্রান্তিজনক। আমি বাল্য হইতে ভ্রমণে অভ্যস্ত না হইলে এতটা কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম না।"

তাঁর আর এক বন্ধুকে লিখিতেছেন—"আমি ইন্দোর সহর দেখিলাম। বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নাই। রাস্তা ঘাট পাথরে বাঁধানো, ভাল স্প্রিঙের গাড়ীর পক্ষে একেবারে অচল। ঘিঞ্জী সহর, বাজার যেমন আমাদের বড় বাজার, সরু সরু গলী, ময়লা ধূলিময়, ঠিক আমাদেরই পুণ্য নগরীর অনুরূপ। রাজপ্রাসাদে গিয়া সমস্ত দেখিলাম; ছোট ছোট ঘর, সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি, ঠিক যেন একটি কয়েদখানা। দেখিবার মধ্যে সুবিখ্যাত অহল্যাবাইয়ের সমাধি মন্দির, প্রস্তর নির্ম্মিত, নানা মূর্ত্তি খোদিত, ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিক সুন্দর ও প্রশংসনীয়। আমার ভ্রমণকালে আমার দেশীয় লোকেরা আমাকে যে আদর যত্ন করিয়াছে তাহা কখনও ভুলিব না।" (To Jadub Kissen Sing.)

আগ্রা, ৫ই জানুয়ারি ১৮৫৭

"ইন্দোর হইতে যখন তোমাকে পত্র লিখি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আগ্রায় আসিয়া আমি এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িব। আসল কথা হচ্ছে, এ সকল স্থানে ব্যাড়াইবার আরাম নাই, রাস্তা ঘাট দুর্গম, গাড়ীর ঝাঁকানি, আবহাওয়াও পীড়াদায়ক। এই শরীর লইয়া কোন রকমে যে আগ্রায় পৌঁছিয়াছি, হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই, এই আশ্চর্য্য! সাত দিন সর্দ্দি কাশীতে শয্যাগত ছিলাম—গলার আওয়াজ বন্ধ, অস্ত্র করিতে হইল। এখন একটু ভাল হইয়াছি, কল্যই কলিকাতার অভিমুখে রওয়ানা হইব। আগ্রায় আসিয়া তাজ দেখিয়াছি—আমার যে এতটা পথের কষ্ট—এত অর্থব্যয় এই তাজ দর্শনে তাহা সার্থক বোধ হইতেছে।"

১৮৫৪ সালে ছোটকাকার বিবাহ হয়। যখন তিনি 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' যশোহরের একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেন তখন আমার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর—ঘটনাটি আমার বেশ মনে পড়ে। বিবাহের পর তাঁহার বৈলাতিক বন্ধুরা তাঁহাকে পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন। Duke of Inverness লিখিতেছেন—"আমি ইংলণ্ডে তোমাকে অতি বালক দেখিয়াছিলাম—ইহার মধ্যে তোমাকে বিবাহিত বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না। তুমি যে আমাদের দৃষ্টান্তে এক পত্নী লইয়াই সংসার করিবার মানস করিয়াছ, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়, কেননা বহু বিবাহে গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে, নিদান আমার তাই বিশ্বাস।"

বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন ও কি কারণে পদত্যাগ করলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কর্ম্মে ইস্তফা দিয়েই দেশভ্রমণে বাহির হন— কিন্তু সেই ভ্রমণে তাঁর শরীর শোধরান দূরে থাক্ তিনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত রোগগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। এই যে তাঁকে রোগে ধরল তার হস্ত হ'তে তিনি আর মুক্ত হতে পারলেন না। এই জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন শরীরে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর উপর দিয়ে কত ডাক্তারী হাকিমী চিকিৎসা পরীক্ষিত হ'ল কিন্তু কিছুতেই কিছু

হ'ল না। একজন হাকিম মুক্তাচূর্ণ ঘটিত এক বহুমূল্য ঔষধ প্রস্তুত করে আনে ও তিনি সেই ঔষধ সেবন করেন কিন্তু তাহার মূল্যের অনুরূপ গুণের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। তাঁর সেই পীড়িত অবস্থায় আমি তাঁর সঙ্গে এঁড়েদহ বাগানে কিছু দিন বাস করেছিলুম, ক্রমে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি হ'তে লাগল। তাঁর শরীর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে এল, অবশেষে আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হ'লেন।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজকাকা)

মেজকাকা মহাশয় সুরসিক অমায়িক সৌখীন পুরুষ ছিলেন। যেন বিলাসিতা মূর্ত্তিমান। তাঁর সখের বাগানটি ফলে ফুলে সুশোভিত—আঙ্গুর বাতাবী নেবু পীচ প্রভৃতি বাছা বাছা ফল, আর চম্পা চামেলী মালতী, বেল জুঁই রজনীগন্ধা গোলাপ বকুল কত রকম সুগন্ধ ফুলের গাছ। একটি ছোটজাতের জুঁই ফুলের ব্যাড়া ছিল, রোজ বিকেলবেলা সেই সব জুঁই ফুল আমরা রাশি রাশি কুড়িয়ে আনতুম। যেমন কলাবিদ্যার প্রতি তেমনি বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক Experiments নিয়ে আমোদ করতেন ও আমাদের ডেকে আমোদ দিতেন। রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার প্রদর্শনের মধ্যে যা মনে আছে তা হচ্ছে Galvanic Batteryর প্রয়োগ, তাড়িতপ্রবাহযোগে আমার যে সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হ'ত সে সহজে ভোলবার নয়। সে সব বৈজ্ঞানিক ভেল্কীবাজীতে আমাদের খুবই আমোদ হ'ত। যেমন বিজ্ঞানে তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও মেজকাকার গতিবিধি ছিল। তিনি যে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি শিখেছিলুম—সে এই :—

ললিত

দুখে গেল সুখনিশি প্রাণনাথ কৈ এল
সুখের শয়ন আজ্ নয়নজলে ভেসে গেল।
আকাশেরি শোভা তারা, আকাশে মিশাল তারা,
রমণীর দুখতারা সুখতারা প্রকাশিল।

মেজকাকা "বাবুবিলাস" নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল সেই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু

বলতে পারি না। আমরা ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা। 'কামিনীকুমার' বলে তার একখানি পদ্যোপাখ্যানেরও সেকালে বেশ আদর ছিল।

মেজকাকার সব দিকেই চৌকোষ বুদ্ধি ছিল। বিষয়কর্ম্মে তার যে দক্ষতা মহর্ষির আত্মজীবনী থেকে তাঁর কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে দীননাথ ঘোষালের নাম উল্লেখ করেছি। তিনি আমাদের ভারী প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁকে হাতের কাছে পেলে তাঁর কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প আদায় না করে কিছুতেই ছাড়তুম না। তিনিও কথক ঠাকুরের মত গল্পের ঘটায় আমাদের মনোরঞ্জন করতেন। রামায়ণ ও মহাভারত ছেলেবেলায় এইরূপ মুখেমুখে শুনেই আমাদের এক রকম শেখা হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা)

ছেলেবেলায় বড়দাদা আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মেশবার অধিকারী ছিলেন না। বড়দাদা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাঁর ছবি-আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায় —কিন্তু হায়! এই দুই বিদ্যার কোনটিই তাঁর জীবনে স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী হ'ল না। তাঁর বাল্যকালের কবিত্বোচ্ছ্বাসে দুইটি কাব্যরত্ন প্রসূত হয়—মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও স্বপ্নপ্রয়াণ, তা ভিন্ন গুম্ফাক্রমণ কাব্য * ও অন্যান্য ছোটখাট কবিতা অনেক আছে যা সেই সময়কার ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি জানি কি কারণে, বাগ্দেবী চপলা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁর নিকট হ'তে সহসা অন্তর্ধান হলেন, বড়দাদা কাব্যামৃতপান হ'তে বিরত হয়ে তত্ত্ববিদ্যানুশীলনের দুরূহ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন হ'লেন, চিত্রকলার চর্চ্চাও ঐখানে থেমে গেল। তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সৌখীন কলা তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে বসল —বাক্সরচনা প্রণালী, আর রেখাক্ষর বর্ণমালা। এতে এত সময় নষ্ট করা হ'ল কেন? জিজ্ঞাসা করলে বড়দাদা হেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লিখতে বসলে লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই, কাগজ, কাগজ রাখবার

* পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী ভারি ভারি, গোঁপের সেবা করি সুখে বিচরে॥

৺ রাজনারায়ণ বসুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কাব্যরচিত হয়।

বাক্স, পকেট বই—এই সকল সামগ্রী আগে থাকতে সংগ্রহ করতে হয়—তাই লেখাপড়ায় দিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে বড়দাদা লেখবার জিনিস তয়েরির কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন কাগজের কারুকার্য্য, অন্যদিকে লিখনপ্রণালী সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করে রেখাক্ষর বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। সাহিত্য ব্যবসায়ীর যাতে সময় সংক্ষেপ হয় তাই উদ্দেশ্য। এই দুই সখের বিদ্যায় তাঁর বিস্তর সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হ'ল। এই দুই বিদ্যা যদিও সামান্য তবু বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়সহকারে তাদের আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন। তার জন্যে চিন্তা শিক্ষা ও সাধনা যা কিছু প্রয়োজন কিছুই বাকী রাখেন নাই। বাক্সতত্ত্বের জন্য সমুদায় গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে। সেই নব গণিতশাস্ত্র বারংবার সংস্কারের পর এইক্ষণে কোন এক আমেরিকান পণ্ডিতের হস্তে সমর্পিত হয়েছে, পরীক্ষার ফল কি হয় দেখবার জন্য বড়দাদা পথ চেয়ে আছেন। এই ত গেল বাক্স-প্রকরণ। রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম রেখাপাতের কৌশল ছড়াছড়ি, না দেখলে তার মর্য্যাদা বোঝা যায় না। সম্প্রতি এই রেখাক্ষর পদ্ধতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে—এ বিষয় কেহ জানতে ইচ্ছা করলে অনায়াসে কৌতূহল চারিতার্থ করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর কোন ছাত্র রেখাক্ষর লেখায় এ পর্য্যন্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারলে না। এখনকার সময়ে কোন সুনিপুণ রেখাক্ষর-লেখক পেলে আমরা অনেকে ভাগ্য মনে করি।

আমি বাল্যকালে রেখাক্ষর লিখনপদ্ধতি অভ্যাস করি নাই, কেবল নিজের সঙ্কেত লিপিতে টুকে নিয়ে অনেকানেক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হ'তে পিতৃদেব যে সকল উপদেশ দিতেন সেগুলি বলবার সময় আমি অমনি নোট করে নিতুম, পরে অবসর মতে বিস্তার পূর্ব্বক লিখে দিলে তিনি সংশোধন করে ছাপাতে দিতেন, পর সপ্তাহে সেই ছাপা কাগজগুলি উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হ'ত—সেইগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন ; নূতন নূতন বক্তৃতা, নূতন ব্রাহ্মসঙ্গীত—ব্রাহ্মসমাজে যেন নবজীবন সঞ্চার করেছে। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে ও আমার পিতা বাঙ্গলায় উপদেশ দিতেন। পিতৃদেবের প্রদত্ত উপদেশগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই লিপিবদ্ধ ও পরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমি ইংলণ্ড যাবার পর পিতৃদেবের বক্তৃতা তুলে নেবার কাজে হেমেন্দ্রনাথ আমার স্থান অধিকার করেন।

বড়দাদা আর আমি দুজনে মিলে কোন কোন সময় গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকগুলি আমাদের যুক্তরচনা, কতক বা আমাদের নিজস্ব রচনা।

তা ছাড়া বড়দাদা অনেকগুলি ভাল ভাল হেঁয়ালি রচনা করেছিলেন। তার অনেক ভুলে গিয়েছি ; দু একটি যা মনে আছে তা এই :—

১। বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরদ্বয়ে সবে যায় বাঁধা
শেষ দু অক্ষরে আর সবে যায় বেঁধা ;
সবটাতে দুই পারে—বেঁধা আর বাঁধা ;
মূর্খে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাঁধা—(রসিক)

২। বল দেখি দুটি ফল,—
তার ভিতরে পাওয়া যায়
ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সকল।—(বেল-কুল)

৩। ইংরাজিতে যাহা বলে প্রথম অক্ষর,
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথা জানায় আপত্তি,
সবতাতে ঘাড়নাড়ে, বিষম বিপত্তি।
দু অক্ষরে ফল এ কি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই।—(নোনা)

বড়দাদা আমাদের বাড়ীর কবি ছিলেন। আমাদের অনেক ঘরাও কথা তাঁর কবিতার মধ্যে স্থান পেত। তিনি তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে আমাদের ভাইদের এইরূপ বর্ণনা করেছেন :--

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা নীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

পণ্ডিত মহাশয়।

যখন উপর হতে প্রচণ্ড পণ্ডিত
ডাকিতে লাগিল হ'য়ে বিষম কুপিত,
হাসিখুসি ঘুরে গেল তখন সবার
দল সাথে ম্লান মুখে চলেন সদ্দার।

পণ্ডিত মুহূর্ত্ত পরে আইল সেখানে।
চসমা বাহির ক'রে পরে সাবধানে॥
খসিবার ভয়ে তাহা পরিল কসিয়া,
তার পরে যুত করে লইল বসিয়া।
শিষ্যদের আরম্ভিল পরে শিক্ষা দিতে ;
ভূত পালাইয়া যায় কথার ভঙ্গিতে !
"এস দেখি তোমাদের দেখি একবার।
তোমাদের সঙ্গে হ'ল পেরে ওঠা ভার।
আজ কাল তোমাদের অনিয়ম ভারি,
বাবুকে না বলে আর থাকিতে না পারি॥"
"ভারি নাকি অনিয়ম" ছাত্র এক কয়।
পণ্ডিত হাসিয়া বলে "অনিয়ম নয় ?
লজ্জা করে না তোমার বলিতে ও কথা ?
পড়া শুনা ত্যাগ করি ছিলে সব কোথা ?
দেখ দেখি চেয়ে কত হইয়াছে ব্যালা ?
ছি ছি ছি বিদ্যার প্রতি এত অবহেলা।
যাও প'ড়ে কাজ নাই, কর গিয়ে খ্যালা।"
এই ব'লে ঘাড় ধ'রে দিল এক ঠ্যালা॥
কৈলাস মুখুয্যে ছিল ব'সে এক কোণে,
মুচকি মুচকি হাসি সব কথা শোনে।
একজন চুপে কহে "হাসিছ যে বড় ?"
কৈলাস ইঙ্গিতে কহে "কর্ত্তা খাপা বড়।"

তেতালায় দুপুর রাত্রি।

গভীর নিশীথ মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুধাপানে বজে চরাচর॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছপালা ঝোপে ঝোপে লুকায় আঁধার।
কে কোথায় পড়ি আছে কোন চিহ্ন নাই ;
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই॥

কীটপতঙ্গের মাঝে খদ্যোত কেবল,
পঞ্চভূত মাঝে বায়ু শিশির শীতল,
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছয়ে জীবের লক্ষণ ॥

বরাহনগর উদ্যানে।

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
।। দিয়া হৃদয় মাঝে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে ॥
দ্বিজরাজ হেন বেলা, বাহির হ'ল একেলা
হর্ম্ম্য হ'তে সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
সনমুখ দিয়া সিন্ধু পানে ॥
শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দ্দশা হায় হায়
কেবা তার দুরবস্থা দেখে।
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে ॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,
ঝোপ ঝাপে অন্ধকার, নভস্থল পরিষ্কার
লতাপাতা হিমবিন্দুময় ॥
পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা,
পশ্চিম দিগন্তে নভস্তীর।
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর ॥
শাখা পত্র দুলাইয়া, জলপুঞ্জ ফুলাইয়া,
বুলাইয়া মাঠ ময়দান,
মৃদুমন্দ বায়ু বহে, মনে মনে দ্বিজ কহে,
আহা কি সুন্দর এই স্থান ॥

শান্তি নিকেতন।

শান্তি নিকেতন, শান্ত সুশোভন,
সুভদ্র হরিত ক্ষেত্র শ্যামকান্ত নিভৃত কানন।
বিমল শোভায়, সরোবর ভায়,
নভসীর বনশ্রীর স্বচ্ছ দরপণ॥

আমি যে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করতুম বড়দাদা তার কাছে পড়তেন না,—তাঁর সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, 'বহুবিবাহ' নাটক রচয়িতা। তাঁর শিক্ষাগুণে বড়দাদা সংস্কৃতকাব্যে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত পদ্যে একটি কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তাঁর সেই সময়কার রচনা। তার কয়েকটি শ্লোক আমার যা মনে আছে তা এই :—

কলিকাতা।

ইংরাজ রাজরাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতং
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্ত্তি তৎ
পয়ঃ পূরপ্রবাহিণ্যা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেখলিনীব সা
রথ্যা রম্যাঃ সুগম্যাশ্চ যত্র ভান্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাত্রগলদ্বারি-নিবারিতরজশ্চয়া
শতঘ্নীশতযুক্তেন দুর্গেণ দুগ্রর্হারিভিঃ
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাজাল সৈন্যশস্ত্রাস্ত্রশোভিনা।
ত্রিলোক বিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে
সুবিস্তীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে।
পূর্ণকায়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যায়,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনীসম ভায়।
সুরম্য সুগম্য যথা শত পথ ব্যাপি রয়,
চর্ম্মপাত্র গলদ্বারি ধূলিরাশি নিবারয়।
শত শত তোপযুক্ত দুগ্রর্হ দুর্গ রক্ষিত,
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাসম সৈন্যাস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত॥

বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েক নমুনা দিচ্ছি :—

প্রভাত বর্ণনা।

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে,
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।
মত্ত মধুপায়িদল আইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।

টঙ্কাদেবী।

ইচ্ছা সম্যক্ জগ দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড়, উড় একি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধী কিছুই কিছু না থালি ভস্মে ঘি ঢালা।

মন্দাক্রান্তা

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা।

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌ট্রা ধুতি পিরহনে মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব শিশু অনাথা তুচ্ছ করি,
বিরাজে গ্যারাজে বসি মলিন কুর্ত্তা বুট পরি,
সিগারে সিগারে মুহুর মুহু ধুমলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি।২
বিহারে শীতে রে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষম প্রমাদে দুখিজন কষ্টে জীবন ধরি;
ফিমেলে ফিমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে
কি তাতে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।

ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে.
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতন্থ দেখে বড় চটে.
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
দুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।৪
শিখরিণী

(রেখাক্ষর বর্ণমালা হইতে)

বসন্ত

মধু ঋতু এল ধরণী মাঝে।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে ।।
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর ।।
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায় ।।
মধু মালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুন্ গুনায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহরে পিক ।।
ফুলের কে পায় কূল কিনারা
অগণন যেন গগন তারা ।।
তরো তরো ফুল রঙ বেরঙ
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ
কেহ বা দোলে কেহ বা ঝোলে
কেহ বা গন্ধে মাতায়ে তোলে ।।
কদম ছড়ায় কনক রেণু
রাখাল যথায় বাজায় বেণু ।।
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চল আর না আজি ।।

কৃষ্ণের বিরহে।

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে
শুষ্কমুখ রাধিকার দুঃখে বুক ফাটে ॥
আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার,
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর ॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি,
উপুড় হইয়া ভিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি ॥
কালিন্দীর কূলে ব'সে কাঁদে গোপনারী,
তরঙ্গিণী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী ॥
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে,
সিন্ধি কাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥

মুখ-হস্তের অভিন্নতা।

মুখে হাতে ভেদ নাই সাক্ষী তার তিন।
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ আর মাতঙ্গ প্রবীণ ॥
ভুজঙ্গের মুখখানি (বরজিয়া দাঁত)
কি সুন্দর মনোহর সুকোমল হাত ॥
সাপুড়ের তুম্মি যবে বাজে ঘুরি ঘুরি।
কেমন ঘুরায় হাত গোখুরা গোখুরী ॥
হাতের কায়দা দেখি সবে বলে "বা জী!"
শেখ্যাণ্ড করিতে কিন্তু কেহ নহে রাজী ॥
বিহঙ্গের চঞ্চুহাত কম নহে বড়।
ছলা-কলা না জানুক কাজে খুব দড় ॥
কেউটে গোখুরা আদি মহা মহা ফণী,
সারসের চঞ্চুহাতে ধোঁড়া যায় বনি।
হস্তীর হস্তটি এ যে মুখেরই লেজুড়,
জানে না অবোধ লোকে তাই বলে শুঁড় ॥
খগে নাগে সাক্ষী মানি লেখে তাই শাস্ত্রে—
ভেদ নাই মুখে হাতে, দশনে নখাস্ত্রে ॥

ময়ূয়া।

জাতিতে যদিও বনের টিয়ে
রতন মানিক ময়ূয়াটি এ ॥
ছার কোয়েলিয়া ছার পাপিয়া।
ময়ূয়াটি মোর লাখ রূপিয়া ॥
কেবা জানে কুহু কে জানে পিউ।
গাহে রসভরে চাহে যা জিউ ॥
কাণে যাহা শুনে দু একবার,
মন থেকে তা নড়ে না আর ॥

পেন্সিল-প্রকরণ।

লেখনী গুজিয়া কাণে পেন্‌সিল্ ধর।
এখন লেখ, যা বলি—লেখ "হর হর" ॥
পেন্‌সিল্ করিতে হয় অত কি ছুঁচালো?
অতিসূক্ষ্মে কোন কাজ উতরে না ভাল ॥
সহজ মধ্যম স্বরে বাঁধিবে সেতার।
সপ্তমে বাঁধিলে হবে সামলানো ভার।
বেশী খাদ ভাল না, ভাল না বেশী জিল।
না সরু না মোটা করি কাটিবে পেন্‌সিল্ ॥
রেখাক্ষর হবে তবে আজ্ঞার অধীন।
চাপ দিলে মোটা হবে—ঢিল দিলে ক্ষীণ ॥
পেন্‌সিল্ খণ্ড তোমার মাসেক দুমাস—
অলপ্লত করিয়া চলিবে যেন হাঁস ॥
কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধা,
অবাধে চলিবে যেন রজকের গাধা ॥
ঐ জন্তুটির মত মাস চারি খাটি
নূতন পেন্‌সিল্ দণ্ড লবে যবে কাটি'
তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ ॥

সাধন পদ্ধতি।

কেমনে পাকাবে হাত শুন সাবধানে ;
শিষ্য জুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কাণে ॥
শিষ্যটিরে কাছে ডাকি সম্ভাষিয়া মিষ্ট
সারস্বত যোগাসনে হ'য়ে উপবিষ্ট—
লেখনী করিয়া হাতে সাজিবে লেখক,
শিষ্যটি হইবে আর উত্তর সাধক ॥
আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচার পত্র।
তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছু ছত্র ॥
ছিটা ফোঁটা দিবে না রেখাই যাবে টানি।
সঙ্গ গুণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাণী ॥
রেখায় পোকামাকড় কৃমি বিটকাল,
উচ্চিংড়ি ফড়িং পিঁপড়া পালে পাল,
ক্ষান্ত হোক রোসো আগে করি কিলিবিলি ;
ধীরে সুস্থে কোরো শেষে ফুটকুনি বিলি।
এক মেটে করিয়া করিবে কাজ ফতে।
দো মেটে করিবে শেষে অবকাশ মতে ॥

সিদ্ধিলাভ।

প্রথমে প্রথম খণ্ডে পাকাইবে হাত।
দ্বিতীয় খণ্ডের তরে উলটিবে পাত ॥
মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার।
হস্তকে করিবে তার তুরুক সোয়ার ॥
হইবে লেখনী ঘোড়-দোউড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া ॥

বড়দাদা গদ্যেও প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সমস্ত একস্থানে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তাঁর গদ্য-লেখা সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—দার্শনিক ও সামাজিক। তাঁর সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বিদ্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে অনেককালের কথা, গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কয়েকমাস ধ'রে 'গীতাপাঠ' নামক যে প্রবন্ধগুলি

'প্রবাসী' মাসিকপত্রিকায় আমরা ঔৎসুক্যসহকারে পাঠ করেছি—গীতাশাস্ত্রের এই যে অপূর্ব্ব মৌলিক ব্যাখ্যা—এটি সম্পূর্ণ অবয়বে যখন বেরবে, তখন ইহা গীতাধ্যায়ীদের পরম আদরের সামগ্রী হবে সন্দেহ নাই। 'তত্ত্ব-বিদ্যা' হ'তে আরম্ভ করে এই 'গীতাপাঠ' যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য করা যায়—এই দুইয়ের মাঝখানে বড়দাদার লিখিত বিবিধ দার্শনিক প্রবন্ধ আছে, যেমন "সারসত্যের আলোচনা", "বিদ্যা এবং জ্ঞান", "হারামণির অন্বেষণ", "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ", "বিবৃত্তিবাদ" (evolution), "বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত" ইত্যাদি—এদের কতক ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কতক বা সাময়িক পত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। উহাদের মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ—হয়ত, কোন একটা বিষয়ের অবতারণা করে তার আদ্যোপান্ত লিখে শেষ করা হয়নি, কোনটা অর্দ্ধাঙ্গ, কোনটা বিকলাঙ্গ, ভগ্নাবস্থায় অমনি পড়ে আছে—এ সকল ভাল করে দেখে শুনে গড়েপিঠে নেওয়া আবশ্যক। দার্শনিক ছাড়া সামাজিক প্রবন্ধও অনেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, যেমন সোনার কাটি রূপোর কাটি, আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা, একটি প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। বড়দাদার এই লেখাগুলি উদ্ধার হয় আমার অনেকদিনকার সাধ—কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই রইল—তা পূর্ণ হবার কোন পন্থা দেখছিনে। আসল কথা হচ্ছে—এ ভার নেয় কে? দুটি লোক আমার মনে হচ্ছে—তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধীমান্ সুধীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ, এঁরাই এই ভারগ্রহণের অধিকারী এবং উপযুক্ত-পাত্র। উভয়েই সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যজগতে স্বনামখ্যাত,—উভয়েরই সময় আছে, সামর্থ্য আছে, এই কার্য্যে যা যা চাই সকলি আছে—এঁরা বড়দাদার লেখা-গুলির সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ। এ অনুরোধ কি ইহারা রক্ষা করবেন না? সাহিত্য ভাণ্ডারের এই বহুমূল্য রত্নগুলি প্রলয়সাগরে ডুবিতে দেওয়া কি লজ্জার কথা নহে?

পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার যে একটি মাধুর্য্য, প্রসাদগুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথায় দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তাঁর লেখাসকল যে পর্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা, যার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককেও ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক—তাদের না শুনিয়ে তৃপ্ত হ'তেন না। যদিও তারা শোনবামাত্র ভাবগ্রহণ করতে পারত কি না বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে

একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটি পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ করেছিল), আমরা সকলে তাকে 'কাল' দাই' বলে ডাকতুম—বড়দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে একটি কবিতা শোনাচ্ছিলেন; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্টি লাগল সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।

বড়াদার কাছ থেকে কার্য্যগতিকে অনেক দিন পৃথক্ হয়ে পড়েছি কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অট্টহাস শিশুর ন্যায় সেই সরল অন্তঃকরণ, ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণো সে দিনের সে সব কথা কি কখন ভোলা যায়? 'তে হি নো দিবসাগতাঃ,—সত্য কিন্তু মনোরাজ্যে সে সব দিন চিরদিনই জ্বলন্ত রয়েছে। আমাদের সেকালের দুএকটি ঘটনা মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটি ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে; চসমা খুঁজে পাচ্ছেন না তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্চে অথচ সেই চসমা হয়ত নিজের পকেটে—পকেটে বলাটাও ঠিক হ'ল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এদিকে এক হাতে যেমন তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হাতে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালি গালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।—বড়দাদার ভোলা স্বভাবের দরুণ যে কত লোকে বিপদে পড়ত তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ান দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে—এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেলে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।—একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে—অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পীঠ চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন। বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যেমন সাধু তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত

থেকে খাচ্ছে—'চড়াই পাখী চাউল থাকী আয়না ঠোকরাণী' এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের ত কথাই নেই ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই কিন্তু কাককে প্রশ্রয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড় কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন সে কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হুলস্থুল বেধে গেল! সে কোথায় খোঁজ্ খোঁজ্। খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান হ'ল, তারা গ্যাখে সে কাক কোন্ একটা দূরের গাছে বসে আছে—তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।

বড়দাদার যা নিত্য নিয়মিত প্রাতঃস্নান ঠাণ্ডা জলে—তা চিরকালই সমান চলছে—শীতে গ্রীষ্মে রোগে অরোগে তার আর বিরাম নাই। তাঁর জ্বর কি কোন অসুখ হ'লে সেই স্নান বন্ধ করবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা অনুনয় বিনয় করা যায় কিন্তু ভোরে উঠেই সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। ঠাণ্ডার বদলে গরম জল কোন কালেই তাঁর মনোনীত হয় না। বড়দাদাকে ব্যামোর সময় ঔষধ পথ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাঁর লেখায় মগ্ন হয়ে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার নিয়ম ভুলে যান---এই বয়সে তাঁর শরীরে আর এ অত্যাচার সহ্য হয় না। এখন শরীর সেবায় বিশেষরূপে মনোযোগ দেবার সময় এসে পড়েছে। তিনি নিজেই তা বুঝতে পেরেছেন;—এক একবার বলেও থাকেন—আর না! কিন্তু কাজে এ কথার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা)

ও-বাড়ীর মেজদাদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তখন এ-বাড়ী ও-বাড়ীর কোন প্রভেদ ছিল না, আমরা তাঁকে আমাদের সহোদর ভাইয়ের মতই দেখতুম। তিনি ছিলেন মেজদাদা, আমি সেজদাদা বা সেজবাবু, আর বড়দাদা, এই তিন জনে সর্ব্বদাই আমরা একত্রে থাকতুম, একসঙ্গে খেলা করতুম—আমরা এই trinity তিনে এক একে তিন। মেজদাদা আমাকে বড় ভালবাসতেন, আমিও তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলুম। আমরা দুটিতে তেতলার ছাতে বসে গান করতুম, গল্প করতুম, কোজাগর পূর্ণিমায় হেসে খেলে বাগানে বেড়িয়ে রাত কাটাতুম। মেজদাদা গান বাজনা বড় ভালবাসতেন—তিনি নিজেও অনেক সঙ্গত রচনা করেছেন—ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ইত্যাদি। "দীননাথ প্রেমসুধা দেহ হৃদে ঢালিয়ে" এ তাঁর গান।

তিনি সব দিকে চৌকোষ ছিলেন—সামাজিকতা, লোকলৌকিকতা, বড়দাদার যে দিকটা অভাব ছিল, তিনি সেই সকল গুণে পূর্ণমাত্রায় ভূষিত ছিলেন।

আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চল্‌তো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা—

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতেরি যশোগান।

এদিকে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় যেমন তাঁর পারদর্শিতা ছিল, সে সময়কার সাহিত্যিকদের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর প্রণীত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ এইটি উদ্ধার করে সাহিত্য সমাজে প্রচার করেছেন দেখে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে। তাঁর লিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল—আমি এক সময়ে তাঁর হাতের লেখা পুঁথি দেখেছি, আর তিনি আমাকে পত্রেও লিখেছিলেন যে ভারত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা লিখতে আরম্ভ করেছেন—মোগল সাম্রাজ্য মনে হচ্ছে;—আক্ষেপের বিষয় যে এ সব লেখা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না—'কোন খানে লেশ, নাহি অবশেষ, সেদিনের কোন চিহ্ন'।

নাট্য অভিনয় বিষয়েও মেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে-আসবার দুই বৎসর পরে ছুটী নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের বাড়ীতে 'নবনাটক' অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি। রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্নের নামে অঙ্কিত—

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য।

নবনাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, বহুবিবাহপ্রথায় পারিবারিক দুঃখজ্বালা অশান্তি প্রকটন সূত্রে লোকশিক্ষা দেওয়া ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা

আত্মীয় স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পাত্রপাত্রী সেজেছিলেন। মেয়ের পার্ট অবিশ্যি পুরুষের নিতে হয়েছিল। আমার পিতা এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে কালীগ্রাম হ'তে মেজদাদাকে লিখছেন ; (৪ মাঘ ১৭৮৮ শক 16th January 1867)

"তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।"

আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাট্যের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন—নাট্য অভিনয়ে সেই তাঁর প্রথম উদ্যম ; পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন—তাঁকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হ'ত না। হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

এই নবনাটক আর মানময়ী নামক একটি গীতিনাট্য সর্ব্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব প্রভৃতি আরো অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'রাজা ও রাণী' এই দুই নাট্য আমাদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে গড়ে তোলা গিয়েছিল।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর সকলে আমরা একান্নপরিবারভুক্ত ছিলুম। ক্রমে আমরা পৃথক হয়ে পড়লুম। মেজদাদা ও আমাদের মধ্যে যখন বিভাগ হ'ল আমার মনে ভারি বেদনা লেগেছিল। আমরা তেতলার বাড়ীতে ছিলাম—দোতালায় এসে পড়লুম। এই দোতালার বাড়ীই আমাদের আদিম বসত্বাটী; তেতালার বাড়ী নির্ম্মাণ পরে হয়। বাড়ীর বাগান ভাগ হয়ে গেল, পুকুরটা বুঝি সাধারণ রইল। একদিন দেখি হাইকোর্টের একজন জজ এসে আমাদের বাড়ী তন্নতন্ন তদারক করে দেখে গেলেন, কি প্রণালীতে বিভাগ হবে তাই ঠিক করবার জন্যে। এই ছাড়াছাড়ি আমি অনেককাল ভুলতে পারিনি। ইংলণ্ড থেকে অনেক সময় দুঃখ করে মেজদাদাকে এই ধরণে পত্র লিখতুম। বাল্যকাল হ'তে আমরা একত্রে ছিলাম—তুমি ছিলে মেজদাদা আর এখনো পর্য্যন্ত আমার ছোটরা আমাকে সেজদাদা বলে ডাকে। আমাদের এক সঙ্গে ওঠাবসা, খ্যালাধুলা, আমোদ প্রমোদ, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাদের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ মতান্তর উপস্থিত হবে। কত কু-লোকের মন্ত্রণায় এক এক সময় এইরূপ সুখের সংসার ছারখার হয়ে যায়। যাহারা পরিবারের ভিতরে

এইরূপ অশান্তির বীজ ছড়াইবার চেষ্টা করে তাহাদের মত দুর্ম্মতি আর কে আছে? এক একবার দময়ন্তীর মত অভিশাপ দিবার ইচ্ছা হয়, যখন নলরাজা তাঁহাকে অরণ্যে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন—

অপাপচেতসং পাপো য এবং কৃতবান্ নলং
তস্মাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য জীবত্বসুখজীবিকাং

"অপাপচিত্ত নলকে যে পাপাত্মা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল, সে তদধিক দুঃখতর জীবিকা পাইয়া জীবনধারণ করুক।"

বিলেত থেকে ফিরে এসে বোম্বাই যাবার পর মেজদাদার সঙ্গে বড় আমার দেখা শুনো হ'ত না কিন্তু আমাদের পত্র-ব্যবহার বন্ধ হয় নাই। ইংলণ্ড বোম্বাই আমি যেখানেই থাকি তাঁকে চিঠি লিখতুম আর তাঁর কাছথেকেও স্নেহপূর্ণ পত্র পেতুম। ছুটিতে কলকাতায় এলে অবিশ্যি আমাদের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হ'ত। একবার আমি বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড় বৎসরের ব্যামোর ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলুম। সেই বাতে অনেক দিন শয্যাগত ছিলুম, তখন মেজদাদা সর্ব্বদাই আমাকে দেখতে আসতেন, আদর যত্ন করতেন, গল্পস্বল্পে আমার মনোরঞ্জন করতেন। আমার একটি আরামের চৌকি ছিল তার চারিদিকে বন্ধুবান্ধবেরা ঘিরে বসতেন, ঠিক যেন একটি দরবার বসেছে। আমার মনে হ'ত ব্যামোর ভিতরেও যদি এত আরাম পাওয়া যায়, তাহলে ব্যামোয় পড়তে আপত্তি কি?

O Pain! where is thy sting?

মেজদাদার অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। যে তাঁকে ভাল করে জানত সেই তাঁর গুণে মুগ্ধ হ'ত, তাঁর কেমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল। অনেকে তাঁর উপর অনেক আশা ভরসা স্থাপিত করেছিলেন। ছোটকাকার তাঁর উপর কিরূপ স্নেহ মমতা ছিল তা আমরা তাঁর পত্রে দেখতে পাই। মেজদাদার বিদ্যাশিক্ষায় পাছে কিছুমাত্র অযত্ন হয় এই তাঁর ভাবনা। তিনি একপত্রে বলেছেন—"মানুষের মন রত্নখনি বিশেষ। সেই রত্নটিকে নিয়ে মেজে ঘসে উজ্জ্বল করলে তবে তা মূল্যবান্ হয়—মনের উপর শিক্ষার কার্য্যও ঐরূপ।" ভবিষ্যতে গণেন্দ্রনাথ আমাদের গৃহস্বামী হয়ে পরিবারের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকবেন এই আশায় তিনি আশ্বস্ত ছিলেন; কিন্তু হায়! তাঁর সে আশা পূর্ণ হ'ল না। যাঁরা ভাল লোক দেবতারা শীঘ্রই তাঁদের আপনাদের কাছে ডেকে নিয়ে যান, তাই তাঁর পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে তিনিও অকস্মাৎ আমাদের সকলকে ছেড়ে পুণ্যলোকে চলে গেলেন।

Requiescat in pace!

তাঁর আত্মার শান্তি হোক!

নবগোপাল মিত্র

উপরে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্ম্মী হ'লেন; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল, তিনি সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তিনি ভারি চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus. তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম। 'Indian Mirror' পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হ'তে হস্তান্তর হ'ল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' বলে একটা ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মবিবাহ' আইন যখন বিধিবদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন যাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য সিমলার পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাবু তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন। আদি সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ফলে দাঁড়াল এই যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাইরে না গেলে আর রেজিষ্ট্রী বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁরা এই আইনের শরণাপন্ন হ'তে চান তাঁরা আপনাদের অহিন্দু বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে বাধ্য। এই আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে এখন আমরাই আর্ত্তনাদ ছাড়ছি—এই অহিন্দু Declaration উঠিয়ে দিয়ে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের হাজার চেষ্টাতেও কোন ফল হচ্ছে না।

বোম্বাই থেকে আমি একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে বোম্বাই প্রদেশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, তীর্থস্থান,—ইত্যাদি বিষয়ে একটা সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলুম—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় আমি কথায় কথায় বলেছিলুম বাঙালীদের যেমন প্রধান আহার ভাত ওদেশে সেরূপ নয়, ভাতের ব্যবহার আছে বটে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ রুটিই প্রচলিত, কোথাও বাজরী (বজরা), কোথাও জোয়ারী বা গমের হাত-গড়া রুটি। ভাতই আমাদের যেমন প্রধান খাদ্য ওদেশে তেমনি রুটি। এই ভাতখোর ও রুটিখোর, দুইজাতির মধ্যে বলিষ্ঠ কোন্ জাতি? এই প্রশ্ন উঠল। আমি বলেছিলুম ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় বাঙালী দুর্ব্বল। আবহাওয়ার গুণাগুণ এই পার্থক্যের এক কারণ হ'তে পারে, আহারের তারতম্যও আর আর কারণের মধ্যে ধরা অসঙ্গত হয় না। যব ও গমের মত ভাত পুষ্টিকর খাদ্য নয়;

সুতরাং ভাতখোর বাঙালী যে দুর্ব্বল তাতে আর বিচিত্র কি? এই কথা শুনে নবগোপাল বাবু মহা চটে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে আপনার অমত প্রকাশ করে বল্লেন, "তা কথনই হ'তে পারে না। তোমরা যাই বল, আমরা একবার ভাত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাব।" এ তর্কের আর কোন উত্তর নেই। "সভা হল নিস্তব্ধ।"

তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাশনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল; দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না. শীঘ্রই নিবে গেল। এই স্বদেশী ভাবের যে পুনরুদ্দীপন হয়েছে এভাব যদি দেশময় বিস্তার লাভ করে শাশ্বতকাল স্থায়ী হয়, তাহলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।

পূর্ব্বে বলেছি যে, পূর্ব্বে আমরা দুই কাকার সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ছিলাম। তখন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য শাখার মধ্যেও যথেষ্ট সদ্ভাব ও ঘনিষ্টতা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর ছেলেরা আমাদের বাড়ীর দালানে গুরুমশায়ের কাছে ক খ শিখতে আসত। গুরুমশায়ের কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় হাতে খড়ি। সেই উগ্রচণ্ডা গুরুমশায় বেত্রহস্তে শেখাতে বসেছেন, কখনো বা সে বেত তাঁর কোন ছাত্রপৃষ্ঠে চালিত হচ্ছে--সে চিত্র মন থেকে কখনো যাবে না। আমরা গুরুমশায়কে কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মনে করতুম—ঠিক যেন Goldsmith-এর সেই গ্রাম্য গুরুমশায়—

And still they gazed and still the wonder grew
That one small head could carry all he knew.

অবাক হইয়া দেখে, না জানি কি ক'রে
অত বিদ্যা ওই ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে।

আমরা গুরুমশায়ের কাছে ক খ, বানান, নামতা, কড়াঙ্কে, ষটকে—এই সব শিখতুম, তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা অভ্যাস করতুম। যত ওঁচা ফ্যালা, জিনিস মোড়বার মত ব্রাউন কাগজ আনা হ'ত,—শ্রীরামপুরে সাদা কাগজ যেদিন আসত খুব ভাগ্যি মনে করতুম। এই কাগজের উপর বাঙ্গলা কলম দিয়ে আঁচড়কাটা—সেই আমাদের পত্রলেখা। যতদূর মনে আছে পত্রের দুই পাঠ ছিল—'সেবক শ্রী' আর 'আজ্ঞাকারী শ্রী'—দিনের পর দিন বদলে বদলে এই দুই পাঠ লেখা হচ্চে। এখন দেখতে পাই বাঙ্গলা চিঠিতে পাঠ লেখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন, স্নেহের সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ, ছোট বড় আত্মীয় স্বজন বন্ধু, অপরিচিত দূরের লোক, formal informal—বাঙ্গলায় কাকে কি পাঠ, ও কোন্ সময় কি পাঠ লিখতে হয় সে এক বিষম সমস্যা। গুরুমশায় এই বিষয় আমাদের মনোযোগ দিয়ে শেখালে

ভবিষ্যতে অনেক কাজ দেখত। তবে ওরূপ মূর্খ পণ্ডিতের কাছে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়, আমরা ঐ গুরুর কাছে লেখাপড়ায় বেশী দূর না এগিয়ে থাকি—নিদেন গোড়া পত্তন সেই।

উপনয়ন

নয় বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হয়, ঘটনাটি বেশ মনে পড়ে। কর্ণভেদ-শিরোমুণ্ডন এগুলি যদিও ভাল লাগেনি কিন্তু নাপিতের উপর বিদ্রোহাচরণ করেছিলুম বলে মনে হয় না। হবিষ্যান্ন ভোজনে বেশ তৃপ্তি লাভ করতুম, ভালই হোক্ মন্দই হোক্ রোজকার ডালভাতের চেয়ে রুচিকর। ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে করে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে উপবীতধারী ব্রহ্মচারী সাজা, তিন দিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা—পাছে শূদ্রের মুখ দেখে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, এই চিরন্তন হিন্দুপ্রথা অনুসারে আমার পইতা হ'ল। কারাবাস হ'তে মুক্তির পর গ্যাড়া মাথায় বাড়ীময় ঘুরে বেড়ানো আর সকলের কাছ থেকে ব্রহ্মচারী বলে অভিবাদন পাওয়া—মনে মনে কত গর্ব্ব হচ্ছে—যেন আমি কি একটা ধনুর্ধর হয়েছি, অথচ ব্রহ্মচর্য্য কাকে বলে মানবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা করে আমাদের পুরুতঠাকুর কোন উপদেশ দেন নাই। কেহ আমাদের বলে নাই, 'আচার্য্যধীনো বেদমধীস্ব'—আচার্য্যাধীন হইয়া বেদাধ্যয়ন কর,—অথবা 'অধীহি, ভোঃ সাবিত্রীং মে'—আমার নিকট গায়ত্রী শিক্ষা কর। 'মা দিবা স্বাপ্সীঃ'—দিবানিদ্রা যেয়ো না বলে আমাদের কেহ সাবধান করে দেয়নি, আর আমরা ও আরামের জিনিসটা অনেকদিন পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলুম। তিন দিন ঘরে বন্ধ থাকা যে দ্বাদশ বৎসর গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করা—তা আমরা বুঝি নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য (বৈদিককালে যেমন আর্য্য আর দস্যুর মধ্যে) সেই ভেদবুদ্ধি ফুটিয়া তোলা যদি ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য হয়, সেটা সিদ্ধ হয়েছিল বলতে হবে। কতকগুলি সন্ধ্যার মন্ত্র আবৃত্তি করতে শিখেছিলুম তার মানে না বুঝে।—এখন দেখছি যে শব্দগুলি আওড়াতুম তার অর্থ– বারিবন্দনা।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া,—কুয়ার জল আমাদের মঙ্গল করুক, সমুদ্রের জল মঙ্গল করুক ইত্যাদি। কূপোদককে কথা শোনানো সহজ, সে জল পরিষ্কার রাখা আমাদেরই হাতে; কিন্তু সমুদ্র সকল সময়ে রাস মানেন না,

টাইটানিক জাহাজ-ডুবিই তার জলন্ত প্রমাণ! এই সন্ধ্যা দুবার আবৃত্তি করবার নিয়ম; কিন্তু ঐ নিয়ম বেশীদিন পালন করেছিলুম বলে বোধ হয় না। পরে আমরা মহর্ষির উপদেশে জানলুম যে, উপবীত গ্রহণের মুখ্য তাৎপর্য্য—গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা।—তা হ'তেই আমাদের নূতন জন্ম—তখন থেকে আমরা দ্বিজ। ব্রহ্মসাধনের অঙ্গরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপর পিতৃদেবের কতটা আস্থা ছিল তা তাঁর আত্মচরিতে দেখতে পাই। তিনি বলেছেন—

"পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। যদিও আমি বুঝিলাম যে, ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রী দেবীকেই ধরিয়া রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল।" ৪৫—৪৬ পৃঃ।

আমাদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা সাধারণত যে ভাবে প্রচলিত আছে তাহা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়া সংক্ষেপে সারিয়া ফেলা—ঐ ক্রিয়ার সারভাগ পরিত্যাগ করে যেন শুধু খোলসটা রাখা হয়েছে। পিতৃদেব যে ভাবে উপনয়নকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে প্রাচীন প্রথার কাছাকাছি যতটা রাখা যেতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপনয়ন-ভাগ দেখিলেই, তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়।

এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রী মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা রক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশে এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হবে। সেই উপদেশের সারমর্ম্ম এই:—

"গায়ত্রী মন্ত্র তোমাদের ইহকালের অবলম্বন, পরকালের সম্বল। সেই মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁর জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ বহির্জগতে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে। তিনি এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়া আমাদের কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই—তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'।" গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ এই।

পূজা

আমাদের বাড়ী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী—এই দুই পূজা হ'ত। দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হ'ত। আমাদের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধরে নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকতো না। সেই তিন দিন আমরা যেন কল্পনাপ্রসূত এক নূতন রাজ্যে বাস করতুম—নূতন দেশ, নূতন ঋতু, আলো বাতাস সব নূতন। প্রথম যখন প্রতিমার কাঠাম নির্ম্মাণ আরম্ভ হ'ত তখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় নির্ম্মাণ-কার্য্য আমরা কৌতূহলের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করতুম। আমাদের চোখের সামনে যেন ছোটখাট একটি সৃষ্টি কার্য্য চলেছে। প্রথমে খড়ের কাঠাম তার উপর মাটি, খড়ির প্রলেপ তার উপর রং, ক্রমে চিত্র বিচিত্র খুঁটি নাটি আর আর সমস্ত কার্য্য, সবশেষে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চালের পরে দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক দেবসভা উদ্ঘাটিত হ'ত। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কৃষ্ণলীলা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৈলাসে হর-পার্ব্বতী, নন্দী ভৃঙ্গি, হনুমান ও গন্ধমাদন, বীণাহস্তে নারদ মুনি, গরুড়বাহন বিষ্ণু, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা, নৃসিংহ অবতার, কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-মিলিত ইন্দ্রসভা, গীতায় একাদশ সর্গে যেমন বিশ্বলোকের বর্ণনা আছে, আমাদের এই চর্ম্ম চক্ষে সেই বিশ্বলোক আবিষ্কৃত হ'ত। রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুরদের দেহমণ্ডন, বসন ভূষণ সাজসজ্জা প্রস্তুত হ'ত, আমাদের দেখতে বড়ই কৌতূহল হ'ত। লক্ষ্মী সরস্বতীর চমৎকার বেশভূষা। লম্বোদর গজানন, গণেশ ঠাকুরের মূষিক তাঁর স্থূল দেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকত; কিন্তু কার্ত্তিকের প্যাখাম-ধরা ময়ূরের যে বাহার তা আর কহতব্য নয়। কার্ত্তিক ঠাকুরের অপূর্ব্ব সাজসজ্জা, তাঁর গুম্ফজোড়া, আকৃতি, বেশভূষা, ফিনফিনে শান্তিপুরে ধুতি—দেখে মনে হ'ত যেন একজন বাঙ্গালী বাবু ময়ূরের উপর এসে অধিষ্ঠান করেছেন। মহিষাসুর বেচারার অবস্থা বড় শোচনীয়, সিংহের কামড়ে তার দক্ষিণ হস্ত অসাড়, এদিকে আবার সিংহবাহিনী দশভূজার বর্শাবিদ্ধ হওয়ায় তার আর নড়ন চড়ন নেই, এ সত্ত্বেও তার মুখে Milton-এর সয়তান সদৃশ কেমন একটা অদম্য বীরত্ব ফুটে বেরচ্ছে।

পূজার সময় যাত্রা হ'ত। কত রকম যাত্রার দল এসে মহল্লা দিত, তাদের মধ্যে যা সেরা তাই বেছে নেওয়া হ'ত। যাত্রায় বহুলোকসমাগম হ'ত, উঠানটা লোকে লোকারণ্য। আমরা আদ্যোপান্ত সমস্তটা দেখতে পেতুম না, কেবল প্রথম ও শেষ ভাগে এসে বসতুম। প্রহ্লাদ চরিত্রে যে ছেলেটি প্রহ্লাদ সাজত তার বড় মিষ্টি গলা, তার গানে সকলে মোহিত হয়ে যেত। প্রহ্লাদ কত প্রকার উৎপীড়ন সহ্য

করছে, আমরা তার দুঃখে অশ্রুপাত করতুম। এত উৎপীড়নেও তার ভক্তির স্খলন নেই। সে আপনাকে শোধরাবার কত চেষ্টা করছে কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তার চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাবে?

কালী কালী বলে ডাকি সদা এই বাসনা
অভ্যাসে দোষেতে তবু কৃষ্ণ বলে রসনা।

কিন্তু যাত্রার গানের চেয়ে আমাদের সং দেখতে বেশী আমোদ হ'ত। রামায়ণের পালাতে সঙের আসল ঘটা—এদিকে রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের দল, ওদিকে আবার রামের বানর সৈন্য,—সবই সঙীন ব্যাপার। আমরা সারারাত কিছু সভায় থাকতুম না, রাত্রিশেষে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে আনা হ'ত। কোন ভাল অদ্ভুত রকম সং আসছে তাই দেখবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে আসতুম। দেখতে দেখতে তিন দিন চলে গেল - বিজয়া এল, প্রতিমা ভাসান দিতে নিয়ে যাবে—কি আপশোষ! দুর্গা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় নিয়ে চল্লেন, মনে হ'ত সত্যিই দেবীর চক্ষে জল এসেছে। বিজয়ার দিন প্রত্যুষে আমাদের গৃহগায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিদায়ের গান করতে আসতেন। যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত বিষ্ণুর তেমনি Classical—সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুর একটি আগমনী গান আমার এখনো মনে আছে—

আজ পরমানন্দা। আনন্দ। মম গৃহে আলো।
যাও যাও সহচরী
আন ডেকে পুরনারী
বরদারে বরণ করি বিলম্বে কি ফল।
এস উমা করি কোলে,
মাকে মা কি ভুলে ছিলে,
এত দিন পরে এলে বুঝি মনে ছিল।
মা হয়ে মমতা মার,
জাননা গো উমা আমার
পাষাণ স্বভাব তোমার কিছু থাকা ভাল॥

তখনকার পূজার আমোদ প্রমোদ যাত্রা উৎসবের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব, আধ্যাত্মিকতা কি ছিল এক একবার ভাবি। দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতে যেতুম, তাতে ধুপধুনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম। এত বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস। আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কি ভাগ্যি পশুবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা—পশুর বদলে কুমড়া বলি হয় এই

শুনতুম। আধ্যাত্মিক ভাবের আর যা কিছু দেখা যেত সে বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জন উপলক্ষে। বিজয়ার রাত্রে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোট-বড় সকলের মধ্যে সদ্ভাবে কোলাকুলি, এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী মনে হ'ত,—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই বাক্য যেন ঠিক ফলেছে।

এই পৌত্তলিক উপাসনার মধ্য হ'তে আস্তে আস্তে অলক্ষিত ভাবে আমাদের পরিবারে অমূর্ত্তের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অল্প বয়স থেকেই মূর্ত্তিপূজার উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল—যাকে ইংরাজীতে বলে 'Iconoclast' আমি তাই ছিলুম—তার কারণ পৈতৃক সংস্কারই বল—আর যাই বল। এক সময়ে আমাদের বাড়ী সরস্বতী পুজা হ'ত। মনে আছে একবার সরস্বতীর প্রতিমা অর্চ্চনায় গিয়েছি—শেষে ফিরে আসবার সময় আমার হাতে যে দক্ষিণার টাকা ছিল তাই দেবীর উপরে সজোরে নিক্ষেপ করে দে ছুট! তাতে দেবীর মুকুট ভেঙ্গে পড়ল। এই অপরাধে তখন কোন শাস্তি পেয়েছিলুম কি না মনে নাই, কিন্তু হাতে হাতে সাজা না পেয়ে থাকি তার ফলভোগ এখন বুঝতে পারছি। বাঁশীতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্মৃতিভ্রংশ হ'তে আরম্ভ হয়েছে। আমি যে আমার সর্ব্বিসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারিনি সেও ঐ কারণে। সরস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে পারতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হ'ল না!

ব্যায়াম

ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব ছিল না। ভোরে উঠে যোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ বরাহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্লা পদব্রজে বেড়িয়ে আসতুম। সেই আমাদের Morning Walk—তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া, Cricket, সাঁতার দেওয়া এ সব ছিল। আমাদের বাড়ীতে একটা পুকুর ছিল, তাতে আমরা অনেক সময় সাঁতার দিতে যেতুম। বাজী রেখে সাঁতার দেওয়া আমাদের এক রকম খেলা ছিল। আমরা তিন ভায়ে মিলে যেতুম—কলার গাছ আমাদের ভেলা। সেই ভেলায় চড়ে মাঝখান পর্য্যন্ত গিয়ে দেখা যেত কে কাকে সিংহাসন-চ্যুত করতে পারে। সেই কলার বাহন কেড়ে নেওয়া চাই—আরোহী সাধ্যমত চেষ্টা করছে আততায়ীকে হটিয়ে দিতে—চোখে জল ছিটিয়ে হোক আর যে কোন উপায়েই হোক তার আক্রমণ হ'তে আপনাকে রক্ষা করতে হবে।—বলপূর্ব্বক সেই কলাবাহন যে দখল করতে পারবে তারই জিৎ। এই রকমে সাঁতারে আমরা খুব পরিপক্ক হয়ে উঠেছিলুম। বাবামশায়ের সঙ্গে যখন

গঙ্গার ব্যাড়াতে যেতুম তখন সাঁতার দিয়ে স্নানে আমার বিশেষ আমোদ হ'ত। আমি সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতুম, বাবামশাই তাতে কোন আপত্তি করতেন না, বোধ করি যদিও এক একবার তাঁর মনটা অস্থির হয়ে উঠত।

বড়দাদা সাঁতারে সর্ব্বাপেক্ষা মজবুৎ ছিলেন। তাঁর রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও তিনি যে কত রকম কারদানী করতেন তার ঠিক নেই। যখন গঙ্গার ধারের বাগানে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে সাঁতার দিয়ে গঙ্গাই পার হ'তেন; আর সকলে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ত।

হীরাসিং বলে এক পালওয়ানের কাছে আমরা কুস্তী শিখতুম, তাতে আমার খুব উৎসাহ ছিল। ডনের পর ডন, বড় বড় মুগুর ভাঁজা—আর কত রকম কুস্তীর দাঁও, মার পেঁচ শিক্ষা। আমি কুস্তীতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলুম। কেউ আমার সঙ্গে সহজে পেরে উঠত না। হীরাসিংহের চ্যালাদের মধ্যে অনেকে আমার সমবয়স্ক ছিল, তাদের সঙ্গে কুস্তী হ'ত—তাদের মধ্যে যারা বড় তাদেরও আমার কাছে হার মানতে হত, সহজে কেউ আমাকে ধরাশায়ী করতে পারত না। অথচ আমার বল যে বেশী তা নয়—এই কুস্তীতে শুধু বলীর জয় তা নয়, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারলেই জিৎ। একদিন কুস্তী করতে করতে বেকায়দায় পড়ে আমার হাত মুচকে গিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে সেটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা গেল। আমার ওস্তাদের টোটকা ওষুধে সেরে যাবে এই ভেবে ছোলা ভিজিয়ে হাত বেঁধে রাখলুম; কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। শেষে ডাক্তার সাহেবের রীতিমত চিকিৎসায় তবে আরাম হ'ল। তখন থেকে সেবারকরে মত আমার কুস্তী বন্ধ। এই সব বিষয়ে আমি অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকতুম না, সবাই বলত "যা করবে সব তাতেই বাড়াবাড়ি—এ তোমার কেমন স্বভাব!" তার ফল ভোগও করতে হ'ত—হাত পা ভাঙ্গা, মাথা ভাঙ্গা কত বিপত্তি যে আমার উপর দিয়ে গিয়েছে তার অন্ত নেই। অথচ এখনো পর্য্যন্ত ত বেঁচে আছি। এত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে শিশুজীবন যে কি করে রক্ষা পায়, বিধাতার এ এক আশ্চর্য্য বিধান। সে যাহা হোক্, একথা বলা যেতে পারে 'কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়'—এটা বড় ঠিক কথা। অতিরিক্ত শরীরিক পরিশ্রমে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তিই হয়। তার সাক্ষী আমাদের ওস্তাদ হীরাসিং। তার কুস্তীর বিরাম নেই, যখনই দেখি কোন না কোন কঠোর ব্যায়ামে নিযুক্ত; কিন্তু তার শরীর বেশী দিন টিঁকল না, শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। শুনেছি এই সব পালোয়ানেরা দীর্ঘজীবী হয় না। শরীর রক্ষা করতে হ'লে আহার বিহার ব্যায়াম এ সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া আবশ্যক। গীতানির্দ্দিষ্ট মধ্যপথই প্রশস্ত—

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

নিয়মিত আহার বিহার, নিয়মিত কর্ম্ম চেষ্টা, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—ইহাতেই দুঃখহারী যোগ সাধন হয়।

শিক্ষা

আমি ইতিপূর্ব্বে পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছে আমার প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছি, তার পরের ধাপ হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন। পিতৃদেব যে চারজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্যে কাশীতে পাঠান—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তার মধ্যে একজন। ইনিই আমার সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। যদিও আমার শিক্ষক, কিন্তু এঁর উপাধির উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের যদি সার্টিফিকেট দিতে হয় তাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হবে। এঁর শিক্ষাগুণে সংস্কৃতশাস্ত্রে আমার যে বিশেষ বুৎপত্তি জন্মেছিল তা বলতে পারি না। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 'সহর্ণের্ঘঃ' 'চপোদিতা কানিতার্ণঃ' প্রভৃতি সূত্র ও তস্য বৃত্তিগুলি কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করতেই সব সময় যেত। তিনি বলতেন—

'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

অর্থাৎ আবৃত্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের সার, বোঝো আর না বোঝো তাতে কিছু যায় আসে না। কাব্যের মধ্যে রঘুবংশের কয়েক সর্গ বই আর বেশীদূর এগোয় নি। আমি যতদিন বিদ্যালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলুম, ততদিন যদি আর একজন ভাল পণ্ডিতের কাছে,—ওকথা থাক্ আর গুরুনিন্দা করব না। তাঁর নিকট শিক্ষায় আমার একটা লাভ হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে। সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ এক প্রকার আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলে আর কিছু না হোক তাঁর ঐটুকু পাণ্ডিত্য—ঐ উচ্চারণ শুদ্ধিটুকু উপার্জ্জিত হয়েছিল, আর তাঁর ছাত্রও অল্পবিস্তর তার ফলভাগী হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যে কি বিকৃত তা সকলেরই জানা আছে, সে উচ্চারণ ত আমার কাণে ভারি অশ্রাব্য ঠ্যাকে। আমাদের মধ্যে বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতদেরও উচ্চারণ শুনলে মাথা হেঁট করতে হয়। আমাদের যেমন একপ্রকার 'বাবু' ইংরিজি আছে যা নিয়ে ইংরাজেরা বিদ্রূপ করে, তেমনি 'বাবু' সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে না জানি তৈলঙ্গী বা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতেরা কি মনে করেন! সংস্কৃত কালেজের একজন ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষের সহিত আমার এই বিষয়ে কথা হয়। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলুম যে, কালেজের বিদ্যার্থীদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শেখাবার একটা সুব্যবস্থার প্রয়োজন। তিনি

আমার একথা হুট করে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, এদেশে যে উচ্চারণ চলিত তাই ঠিক—মেড়ুয়াবাদীদের কাছে আমরা আবার উচ্চারণ কি শিখব? আর কোন্ প্রদেশকেই বা উচ্চারণের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?'

কিন্তু এ তর্কের মীমাংসা গায়ের জোরে হয় না। সংস্কৃতের কোন্ বর্ণের কি উচ্চারণ তা পরীক্ষা কর্‌বার অনেক উপায় আছে, আর সে পরীক্ষায় বাঙ্গলা-সংস্কৃত উচ্চারণের ভ্যাজাল ধরা পড়বেই। "ভাষা বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ ঠিক ততগুলি বর্ণ সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ।' কিন্তু এদেশে আমরা কি সংস্কৃত বর্ণের যথা-নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করি? তা ত নয়। আমরা বর্গীয় জ, অন্তস্থ্য য, দুই ব, মূর্দ্ধণ্য ণ, দন্ত্য ন, তালব্য মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য স এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে কোন প্রভেদ মানি না। যুক্তাক্ষরে প্রতি বর্ণের পৃথক উচ্চারণ না করে বাঙলা ধরনে এক বিকৃত উচ্চারণ করে থাকি; যথা—

কৃষ্ণ (ষ্ ণ) = কিষ্ট। আত্মা = আত্তাঁ।

স্নান = স্তান। ক্ষীর (ক্ষীর) = ক্ষীর ইত্যাদি।

অন্ত্যস্থ 'য' পৃথক উচ্চারণ বাঙ্গলায় আদৌ নাই, যুক্তাক্ষরেও নহে। সংযুক্তবর্ণে 'য'কারের উচ্চারণ হয় না—যে অক্ষরে সংযুক্ত থাকে তার দ্বিরুক্তির মত উচ্চারণ হয়, যেমন—

সত্য = সত্ত। বাদ্য = বাদ্দ ইত্যাদি।

বাঙ্গালার অনেক স্থলে 'অ'কারের উচ্চারণ প্রাকৃত হ্রস্ব 'ও'কারের মত, যথা—অরি অসি ইত্যাদি। সংস্কৃত উচ্চারণের বেলাতেও আমরা এই নিয়ম অনুসরণ করি। বাঙ্গলা উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণে আরোপিত হয় বলে এখানে সংস্কৃতের উচ্চারণ এরূপ দূষিত হয়েছে। তাই বলছি সংস্কৃতের মত ঠিক উচ্চারণ করতে হ'লে আমাদের রীতিমত সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষার প্রয়োজন। একথা সত্য যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধতা কোন কোন অংশে নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের কাছে আর সকলকেই হার মানতে হয়। এদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যেরূপ বিকৃতি ধারণ করেছে এমন আর দেখি নাই। বারাণসী বল, দাক্ষিণাত্য বল, এ সকল স্থানের যে কোন পণ্ডিত হোন্ তাঁদের উচ্চারণ যে আমাদের তুলনায় বিশুদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুএকটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে; যেমন মহারাষ্ট্রে দেখেছি 'দ' এ 'নএ 'জ্ঞ'র উচ্চারণ হয়; কিন্তু সেগুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ওসকল স্থানের সংস্কৃতজ্ঞদের গুরুস্থানীয় বলে মেনে নিতে পারি। সে যা হোক্, আমায় মনে হয় বঙ্গদেশে সংস্কৃতের উচ্চারণ-সংস্কার

নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সংস্কৃতানুরাগী বিদ্বন্মণ্ডলী এবিষয়ে মনোযোগ করুন, এই আমার সবিনয় নিবেদন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট-সংস্কৃত সাহিত্যে আমার যা কিছু জ্ঞানলাভ হয়, সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সেই বিদ্যাটুকু আমার বিলক্ষণ কাজে এসেছিল। আমার সময়ে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় ৫০০ মার্ক পূর্ণমাত্রা নির্দ্ধারিত ছিল। এই ৫০০ মার্কের মধ্যে আমি সংস্কৃতে ৩৫০-এরও উপর পেয়েছিলুম। আমার পরীক্ষক ছিলেন ভট্ট মোক্ষমূলর। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। বোধ করি আমার লেখা পরীক্ষা করবার সময় আমার কাগজটার উপরে একটু সদয়ভাবে চোখ বুলিয়েছিলেন, নইলে অত উচ্চ সংখ্যা পাবার আমার আশা ছিল না। আমি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় লাটিন গ্রীকের পরিবর্ত্তে আমাদের দুই Classic—সংস্কৃত ও আরবিক নিয়েছিলুম। ওখানকার ছাত্রদের নিজের ভাষায় অথবা ওদের চিরাভ্যস্ত লাটিন গ্রীক ভাষায় যদি আমাকে পরীক্ষা দিতে হ'ত আর আমাদের ক্লাসিকদ্বয় তালবেতালরূপে যদি আমার সহায় না থাকত তাহলে ঐ পরীক্ষায় আমার জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকত না।

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী

Oriental Seminary-র হেড মাষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী আমাদের ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন।—ধীর শান্তপ্রকৃতি, সুবিদ্বান—তাঁর কি এক মোহিনী শক্তি ছিল আমরা সহজেই তাঁকে মেনে চলতুম, আমাদের উপর তাঁর কোন জোর জবরদস্তী করতে হ'ত না। আমাদের কাছে তাঁর ডাক-নাম ছিল কেবলমাত্র "*Sir*—'Sir' এসেছেন শুনলেই আমরা গিয়ে হাজির। বিদ্যালয়ে আমাদের যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল তা ছাড়াও তিনি আমাদের অনেক বই পড়তে দিতেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Gibbon's Decline and Fall—'রোম রাজ্যের অবনতি ও পতন' যার পত্রে পত্রে ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্লব, রোম সম্রাটের অমানুষিক কাণ্ডকারখানা—গিবনের মৃদঙ্গগম্ভীর ভাষায় পড়ে স্তম্ভিত হ'তে হ'ত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজি প্রবন্ধাদি লেখা, বক্তৃতাদি অভ্যাস করা, এ সকলের প্রতিও তিনি মনোযোগ দিতেন। যাতে আমাদের ইংরাজি ভাল বলবার ক্ষমতা জন্মে সেই উদ্দেশে তিনি আমাদের জন্য এক বক্তৃতা-সমিতি স্থাপন করেছিলেন; প্রতি সপ্তাহে তার অধিবেশন হ'ত এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা—নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহা মহা বীরদের বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বন করে আমরা বড় বড় তর্কবাগীশ একত্র হয়ে বাগ্মিতা ফলাবার চেষ্টা করতুম। সর্ব্বশেষে সভাপতি

মহাশয় আমাদের তর্কবিতর্কের সুন্দর মীমাংসা করে দিতেন। এই সভার কার্য্য অনেক দিন বেশ নিয়মপূর্ব্বক চলেছিল। মাষ্টারমশায়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা ছিল, তিনিও পিতার ন্যায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁরি শিক্ষাগুণে আমি ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন এক সভায় "প্রাচীন ভারতের রণনীতি" বিষয়ক একটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করি—কেশবচন্দ্র সেন সেই অধিবেশনে একজন প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন।

সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন তার নাম ছিল 'হিন্দু কলেজ।' প্রথম দুই বৎসর একাদিক্রমে দুইটি প্রাইজ পাই—দ্বিতীয়খানি সচিত্র Robinson Crusoe—বালকের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। দুবৎসর পরে বনমালী বাবুর ক্লাসে উঠি। তিনি একজন অতি কঠোর প্রকৃতির মাষ্টার ছিলেন। ছেলেদের উপর বড়ই উৎপীড়ন করতেন, সব চেয়ে যে সুশীল বালক সেও তাঁর প্রচণ্ড চপেটাঘাত এড়াতে পারত না। বন্ধুবর তারকনাথ পালিত তাঁর চপেটাঘাতে একবার ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে যমের ন্যায় ভয় করে চলতুম—যমদূতের মত তাঁর সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি মনে করলে এখনো ভয় হয়।

তারকনাথ পালিত

বনমালী বাবুর ক্লাসে আমার পড়াশুনা কেমন হ'ত মনে নাই কিন্তু একটি জিনিসের জন্যে সে বৎসরটি আমার চিরস্মরণীয় থাকবে—সে কি না বন্ধুলাভ। আমার সহাধ্যায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি যে একটি বন্ধুরত্ন পেয়েছিলুম তিনি আমার চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে রইলেন। ছেলেবেলায় তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে ভাল ভাল পায়রা—লক্ মুক্ষী লোটন গলাফোলা এনে দিয়ে কত রকমে আমাকে সুখী করবার চেষ্টা করতেন, স্কুলে ও বাড়ীতে সর্ব্বদাই আমরা মাণিক জোড়ের মত এক সঙ্গে থাকতুম। আমার ছেলেবেলাতে একবার এমন বাত হয়েছিল যে চলতে কষ্ট হ'ত—তখন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলতুম। বড় হয়ে যখন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম তখনো আমরা বন্ধুত্বসূত্রে বাঁধা। আমি বিলাত যাই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, বয়স তখন ১৯; বিলাতে থাকতে আমাদের পত্র ব্যবহারে কোনদিন ত্রুটি হয়নি। যখন আমি বোম্বায়ে কাজ আরম্ভ করি তখনও তারক বিলাত যাননি; তিনি বিলাত যান—আমি বিলাত থেকে ফিরে আসার বছর দুই পরে—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আসতে আসতেই প্রায় তিনি ব্যারিষ্টারীতে

প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমি যখন বিদেশে কর্ম্মস্থলে তখন তিনি এখানে থেকে আমাদের বিষয়-কর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শদাতা ও সর্ব্বতোভাবে হিতচিন্তক ছিলেন। আমাদের পরিবারের সবাইকে আপনার মত করেই দেখতেন। তাঁর ভালবাসার চিহ্নসকল আমার জীবনময় ছড়ানো রয়েছে আর তাঁর কাছ থেকে সময়ে অসময়ে যে সকল উপকার পেয়েছি তার জন্য আমি তাঁর নিকটে চিরঋণী। আমার জীবনের উপর দিয়ে কতশত ঘটনা গিয়েছে, অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হয়েছে যাঁদের নাম স্মৃতি মাত্রই রয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই যে বন্ধুতার কথা বলছি এ এখনো পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আমি যাঁর কথাগুলি এই লিখছি আমার সেই প্রিয়সুহৃৎ এ সময়ে রোগশয্যায় শয়ান। ৫, ৬ বৎসর পরে তিনি উৎকট পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি কখনো ম্লান হ'তে দেখিনি। কোন দিন একটু ভাল কোন দিন মন্দ, এই উত্থানপতনের মধ্যে তিনি ধীরভাবে দিনযাপন করছেন। এই দুঃখ কষ্টে তাঁর ধৈর্য্য অসীম, তাঁর বীর্য্য ও সাহসের হ্রাস নাই। তাঁর কি রোগ, চিকিৎসায় কি কি প্রয়োজন, তিনি এ সকলি তন্ন তন্ন করে জেনেছেন আর ডাক্তারেরা ঔষধ পথ্য যা কিছু ব্যবস্থা করেন, যাতে তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম না হয় তিনি নিজেই তার তত্ত্বাবধান করেন। বলতে গেলে তিনি আপনিই আপনার চিকিৎসক, আপনিই আপনার ধাত্রী। একজন ইংলণ্ডপ্রবাসী বন্ধু এদেশে এসে তাঁর এই অবস্থা দেখে বলছিলেন, "তারক যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন".— সত্যই করছেন—যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তিনি এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত রয়েছেন।

ডাক্তার Lukis বলতেন, "পালিত কেবল তাঁর Will-power-এর জোরে বেঁচে আছেন—আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের সবই যেন উল্‌টে দিয়েছেন।"

মৃত্যু আসুক তাতে তাঁর কোন ভয় নাই, কেবল ভয় এই যে, যে মহাৎকার্য্য সমাধা করতে তিনি উৎসুক, পাছে মৃত্যুতে সে কাজের কোন ব্যাঘাত হয়। তিনি তাঁর স্বোপার্জ্জিত প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেশের কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছেন, তা কারো অবিদিত নাই। আমাদের দেশে যাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার হয়, বিজ্ঞান-বলে যাতে কৃষিশিল্পের উন্নতি এবং ঐ সঙ্গে দেশীয় লোকের অর্থোপার্জ্জনের সহস্র দ্বার উন্মুক্ত হয়, এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি প্রথমে তাঁর ধনবল একত্র করে জাতীয় শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন, পরে যখন সেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত হ'ল না, তার স্থায়িত্বের প্রতি সন্দিহান হ'লেন তখন সেখানকার দান উঠিয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশে নূতন দান ব্যবস্থা করলেন— সামান্য দান নয় স্থাবর সম্পত্তি মিলে সাড়ে সাত লাখ টাকারও উপর। দানপত্রের

ব্যবস্থা দু কথায় এই যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-কলেজে—পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যা এই দুই বিদ্যায় দুইটি আসন প্রতিষ্ঠিত হবে—এই প্রথম। দ্বিতীয়, ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষাকার্য্যে দেশীয় লোকেরাই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হবেন। যদি তাঁদের যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক হয় তাহলে এই ব্যবস্থাপত্রের কর্ত্তৃপক্ষদের বিবেচনায় যাহা ধার্য্য হয় সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ ও দানপত্র গঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর্পিত হয়েছিল। সম্প্রতি আবার প্রায় আরও আট লক্ষ টাকার বিষয় তিনি লেখাপড়া করে সেনেটের হাতে সমর্পণ করেছেন। এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করে এখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন মনে তাঁর শেষ দিন প্রতীক্ষা করে রয়েছেন, ভৃত্য যেমন মাসের শেষে আপনার বেতন প্রতীক্ষা করে থাকে—"কালমের প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা।"

এই বিরাট দান উপলক্ষে য়ুনিবারসিটির Vice-Chancellor মহোদয় বলেছেন:—"প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বারবঙ্গাধিরাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাখো লাখো টাকা দান করিয়া আমাদের গৌরবের পাত্র হইয়াছেন সত্য কিন্তু তারকনাথ পালিত মহাশয় তাঁর এই অসামান্য বদান্যতাগুণে আর সকলকে পরাস্ত করিয়া এই দাতৃমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিলেন।"

ছেলেবেলা থেকেই তারকনাথ পালিত তেজস্বী, এইখানে তাঁর বাল্যকালের তেজস্বিতার একটি পরিচয় প্রদান করি। আমরা দুই বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মেডিকেল কলেজে কেমেষ্ট্রীর লেকচার শুনতে যেতুম। একদিন প্রোফেসার আসার আগে আমরা দুজনে একটু চেঁচিয়ে কথা কচ্ছিলুম। মেডিকেল কলেজের একজন ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা তাইতে রূঢ়স্বরে বল্লে—"This is not a Bazar. Don't make such a row"—তারক তাই শুনে ভারী রেগে উঠলেন আর বেশ দুকথা শুনিয়েও দিলেন। তখনই প্রোফেসার আসায় তখনকার মত বিবাদটা ঐখানেই থেমে গেল, কিন্তু লেকচার হয়ে যাবার পর ৫।৬ জন ফিরিঙ্গীপুঙ্গব দল বেঁধে তাঁকে আক্রমণ করতে এল, তিনি তাতে ভয় না পেয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে সর্ব্বাগ্রে দলপতিকে এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন। তখন চেলাগণ হাঁ হাঁ করে তাঁর উপর এসে পড়লো, ৪।৫ জনে মিলে তাঁকে কিল চড় বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু আমার বন্ধুটি ত কিছুতে দমবার পাত্র নন, তাহলে তিনি আজ এই দেশপূজ্য তারকনাথ পালিত হ'তে পারতেন না। তিনি দুই হাতে শত হস্তের বল ধরে তাদের উপর ঘুসি চড় কিল বর্ষণ করতে ছাড়লেন না। খুব মার খেলেন সত্য—কিন্তু মারতেও কিছুমাত্র কসুর করেন নি। আসলে যে তাঁরই জয় লাভ হল একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে

হবে। কিন্তু তার পর দিন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা এই খবরে ভারী রেগে গেল। রমানাথ নন্দী বলে একজন ছোকরা আমাদের দলের চাঁই হয়ে Awake, arise or be for ever fallen—এই লাইনটা কাগজে লিখে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলো। পর দিন দল বেঁধে মারামারি করতে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। তারক প্রথমটা এতে অমত করলেন, বল্লেন, কার্য্যক্ষেত্রে তারাও মেরেছে আমিও মেরেছি, শোধবোধ হয়ে গেছে—আবার এরকম সেজেগুজে মারামারি করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সকলে যখন স্থির করলে যে, না, মারতেই হবে তখন তিনিও আগুয়ান হয়ে দাঁড়ালেন। তার পর যখন দেখা গেল ফিরিঙ্গী অনেক তখন সর্ব্বাগ্রে আমাদের উত্তেজক মহাশয় রণে ভঙ্গ দিলেন; অনেকেই তার অনুসরণ করলে,—আমরা যে দুতিন জন শেষ পর্য্যন্ত অটল ছিলুম তার মধ্যে ভৈরব বাঁড়ুয্যে একজন। তিনি আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আসলে হার হ'ল আমাদের এই দ্বিতীয় দিনে, এদিনে তারক খুবই মার খেয়েছিলেন। তবুও ফিরিঙ্গীরা তাঁকে apology করাতে পারেনি। তাদের এ প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি মরে যাব তবু apology করব না।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল তখন ছিলেন সাট্‌ক্লিক সাহেব, তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল ইটুয়েল তাঁকে লিখে পাঠালেন যে, আমরা দল বেঁধে মেডিকেল কলেজের ছোকরাদের মারতে গিয়েছিলুম। প্রিন্‌সিপ্যালের কৈফিয়ৎ তলবে তারক তখন সমস্ত খুলে বল্লেন। সেই ফিরিঙ্গী কি রকম রূঢ় ব্যবহার করেছিল—যা থেকে এই মারামারির উৎপত্তি—একলা তাঁকে তারা ৮।৫ জন মিলে কি রকম আক্রমণ করেছিল—সব শুনে সাট্‌ক্লিক সাহেব নেপথ্যে বল্লেন—Served him right—, যাহোক প্রকাশ্যে দুজনেরই জরিমানা হয়ে মামলা মিটমাট হয়ে গেল।

আর কয়েক বৎসর পরে হিন্দু স্কুল থেকে কিছুকালের জন্যে St. Pauls' Schoolএ গিয়ে ভর্ত্তী হই। সেখানে ইংরাজ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল; তাদের সঙ্গে যে, সকল সময়ে মিলে মিশে সদ্ভাবে থাকতুম তা বলতে পারি না, কখন কখন টকরাটকরি ঘুসোঘুসিও হ'ত। এই রকম দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা আমার মনে আছে। একটি ছেলের সঙ্গে আমার হাতাহাতি ব্যাপারের কথা Rector-এর কাণে গিয়েছিল। কার দোষ সে বিষয় অনুসন্ধান না করেই বোধ করি আমাকেই প্রথমটা তিনি দোষী বলে সাব্যস্ত করে থাকবেন। কেননা আমাদের কিছু আগে একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল তাতে আমার যে প্রাইজ পাবার কথা ছিল তা বন্ধ করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার সেরূপ কোন

শাস্তি হয় নাই। আমি ইংরাজি সাহিত্যে বেশ ভাল রকমই পরীক্ষা দিয়েছিলুম ; Goldsmith-এর একটি সেট বই তাতে প্রাইজ পাই। আমার ক্লাসে ছেলেদের সন্তুষ্ট করবার এক সহজ উপায় ছিল—তাদের মসলা বিতরণ করা। আমার পকেটে সুপারি এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা থাকত, তাই খেতে তারা খুব ভালবাসত, কাজেই আমার সঙ্গে তাদের ভাব রাখতে হ'ত। মাষ্টারেরাও আমাকে ভালবাসতেন—Pridham সাহেব আমাকে বড় অনুগ্রহ করতেন—তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছবি দেখাতেন আর তিনি নিজে যখন ছবি আঁকতেন তখন আমি বসে বসে দেখতুম। অন্যান্য ছেলেদের মত মাষ্টারদের কাছ থেকে আমাকে বেত্রাঘাত সইতে হ'ত না। এক একটা মাষ্টার ভয়ানক গোঁয়ার ছিল—ছেলেরা তাঁর বেত্রাঘাতের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকত। আর দুই একটি ছেলের প্রতি তাঁর বিশেষ ক্রোধকটাক্ষ দেখতুম, তাদের প্রতি অকারণ অত্যাচার দেখে আমার ভারি কষ্ট হ'ত। বেচারাদের পিঠের চামড়া বোধ করি কোনখানে অক্ষত ছিল না।

সেণ্টপল ছেড়ে পুনর্ব্বার হিন্দু স্কুল। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করি।

রামচন্দ্র মিত্র

কলেজে আমাদের যে সব শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য ; তাঁর কাছে আমরা শ্যামাচরণ সরকারের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অন্যান্য বাঙ্গালা বই পড়তুম। তাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে ; অনেকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাও আমাদের স্বচক্ষে দেখা ;—তাঁর চেহারা ধরণ ধারণ সকলি কৌতুকাবহ। কোন বড় লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হ'লে পায়ে পা ঠেকিয়ে 'I beg your pardon' বলে ক্ষমা প্রার্থনা করা হ'ত ; সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্লাসের ছেলেরা দুষ্টুমি করে অনেক সময় তাঁকে জ্বালাতন করত কিন্তু কোন্ ছেলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে—কোথায় নরম কোথায় বা গরম—তা তাঁর পাকা জানা ছিল। পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের উপর তাঁর ভারি আক্রোশ, কেননা তিনি বেশ জানতেন তারা মুখের উপর কোন জবাব করতে সাহসী হবে না। অথচ অন্য অবাধ্য দুষ্ট ছেলে যাদের এক কথা বললে মুখের উপর দুকথা শুনিয়ে দেবে তাদের প্রতি অতি নম্র ব্যবহার। 'শক্তের ভক্ত নরমের গরম' তাঁর সম্বন্ধে অবিকল খাটত।

একদিন আমাদের ক্লাসের একজন পাড়াগেঁয়ে ছেলে পাঠ্য বই আনেনি এই নিয়ে

তিনি তার প্রতি মহা খাপ্পা হয়ে কটুকাটব্য বর্ষণ করছেন দেখে তারক বল্লেন, "ওকে ও রকম গালাগালি দিচ্ছেন কেন? ও কি করেছে? জানেন আমরা ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ি।"

তখনই তিনি নরম হয়ে অতি মৃদুস্বরে বল্লেন—"ও বই আনেনি তাই শাসন করলুম।" তারক উত্তর করলেন, "আমিও ত বই আনিনি আমাকেও কি ঐ রকম করে শাসন করবেন?" রামমিত্র বল্লেন (মৃদুমন্দ ভাবে) "ওঃ তুমি বই আননি—তা পাশের ছোকরার বই দেখে পড়।"

ছেলেরা যখন ভারি গোল করছে কিছুতেই বাগ মানে না তখন তিনি তাদের থামাবার একটি বিচিত্র উপায় অবলম্বন করতেন। নানা রকম মুখভঙ্গী করে কেদারা থেকে উঠে বোর্ডে খড়িতে বড় বড় অক্ষরে লিখতেন Silence! Silence! Silence! চুপ চুপ চুপ! তার পর চৌকিতে বসে বলতেন, "এখন কে গোল করবে করুক দেখি!"

আমরা বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী অনেক রকম শুনতে পাই, ওবিষয়ে নানা মুনির নানা মত—কিন্তু রামমিত্রের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, আর কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় না। দুএকটি নমুনা দিচ্ছি:—

পৃথিবী গোল কি করে মনে রাখতে হয়? রসগোল্লা খেতে খেতে তার গোলাকার ধ্যান করা।

ভূগোল শেখার সহজ উপায় কি? ষ্টুয়ার্টের জিওগ্রাফিখানি ২০ আনা মুখস্থ করা—লেখার সময় চার আনা ভুলে গেলেও—১৬ আনা মনে থাকবে।

Composition ভাল লিখতে হয় কি করে? ভাল ভাষায় প্রকৃতি বর্ণনা করতে গেলে সুশীতল সমীরণ এই দুটি কথা লিখতে হবে। তবে যেখানে সাধুভাষা মনে না আসে সেখনে 'ঠাণ্ডা বাতাস' বসিয়ে দেবে। কলসের স-টা কোন্ স যদি মনে না থাকে তাহলে সেখানে 'ঘট' শব্দটা করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার পরীক্ষা দেবার সময় কোন ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মশায় এই বইটার কোন্ কোন্ অংশ ভাল করে দেখে রাখা চাই, আমাকে বলে দিন।

উত্তর—(খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া)

Mark the first page! Mark the second page!!

বলতে বলতে বইটার কোন ভাগই বাদ গেল না, সে বেচারা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে প্রস্থান করলে।

রামমিত্রের নামে অনেক গল্প আছে, আর কত বলব। কেশবচন্দ্র তাঁর নকল

করতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। কেশববাবু রামমিত্রের সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন, সেটি হচ্ছে এই :—

একদিন রামমিত্র ছেলেদের বটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বাগানের মধ্যে যে একটা গাছের ঘর আছে সেইখানে তাঁর দলবল নিয়ে তিনি যেমন প্রবেশ করেছেন—অমনি সেখানে উপস্থিত একটা রুক্ষ মেজারের ইংরাজ রেগে তাঁকে সম্ভাষণ করলে—"Who the devil are you?" তিনি ভীত হয়ে বল্লেন—"Professor Ram Chandra Mittra, Professor Presidency College—"

আমরা সকলে একবার সিংহলে ব্যাড়াতে গিয়েছিলুম। ষ্টীমারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেশববাবু আর কালিকমল গাঙ্গুলী বলে একটি আমুদে মজলিসী লোক,—'কোলাই কোমল গাঙ্গুলাই' বলে আপনার পরিচয় দিতেন। সমুদ্রের উপরে রামমিত্রের গল্প আমাদের এক প্রধান খোরাক ছিল। সে সব কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের নাড়ী ছিঁড়ে যেত।

'কোলাই কোমল' শেষে আমাদের ভারি মুস্কিলে ফেলেছিলেন। দেশে ফেরবার সময় তিনি কি একটা কাজের ছুতো করে বোটে উঠে ডাঙ্গায় নেমে গেলেন। এই আসছি বলে কোথায় যে অন্তর্ধান হলেন তার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁকে ছেড়ে ষ্টীমার চলে গেল। তার দু এক-সপ্তাহ পরে তবে কলকাতায় আবার তাঁর দেখা পাই।

বিলাত যাত্রা

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমার বিলাত যাত্রা। আমি কখনও স্বপ্নেও যা ভাবি নাই আমার ভাগ্যে তাই ঘটল। আমাদের জীবনে পদে পদে দেখা যায়—দৈবের কি বিচিত্র গতি! এক একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনা এসে কত সময় আমাদের জীবনস্রোতকে কোন্ এক অজ্ঞাত নূতন পথে যেন বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে যায়—যার পূর্ব্বাভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই। আমার জীবনে এ কথা সপ্রমাণ দেখতে পাই। আমি বাল্যকালে একভাবে শিক্ষিত হচ্ছিলুম, আমার জীবন একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হচ্ছিল, দৈবঘটনায় কোন এক বন্ধু-মিলনে সে সমস্তই উল্টে গেল, আমার জীবন-প্রবাহ অন্য দিকে বিবর্ত্তিত হ'ল। সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশযাত্রা, ইংলণ্ডে গিয়ে সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কারণে আমার পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটল।

বাল্যকাল হ'তে ব্রহ্মসমাজের সঙ্গে আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত ছিল। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের এই সমাজ এমন মৃদু মন্দ গতিতে চলছিল যে, তার প্রভাব বিশেষ অনুভব করতে পারিনি। আমার পিতা সিমলা পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর এমন এক ঘটনা উপস্থিত হ'ল যাতে সেই সমাজের ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত হ'ল। সেই ঘটনা হচ্ছে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলন। কেশবের আগমনে আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হ'ল। তিনি কোন্ সূত্রে প্রথমে আমাদের এই দলে প্রবেশ করলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন—আমি তাঁকে আমার পিতার নিকটে নিয়ে যাই। তিনি আপনাদের কুলাচার অনুসারে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করবেন কিনা এই বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। পিতার সহিত তিনি এই বিষয় পরামর্শ করতে আসেন। পরামর্শে স্থির হ'ল যে, এই মন্ত্রে যখন তাঁর বিশ্বাস নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তি-সিদ্ধ নয়। মন্ত্র গ্রহণ না করাই তিনি স্থির করলেন। সেই অবধি তাঁর উপর তাঁর বাড়ীর লোকেদের অত্যাচার আরম্ভ হ'ল এবং পরিশেষে তিনি সব ছেড়েছুড়ে সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—পিতাও তাঁকে স্নেহপূর্ব্বক আপনার পুত্ররূপে বরণ করে নিলেন। সেই সময় থেকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর পত্নী আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে আমাদের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই মধ্যাহ্নকাল;—কেশবের প্রভাবে সমাজ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করলে। আমিও সেই উৎসাহ-তরঙ্গে গা ঢেলে দিলুম। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হ'তে পিতার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা ও উপদেশ, আর আমাদের রচিত নব নব ব্রহ্মসঙ্গীত মিলে সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে এক নূতন শ্রী, নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। আমি এই সব নিয়ে মেতে আছি এমন সময় মনোমোহন ঘোষ আমাদের বাড়ী অতিথি হয়ে থাকতে এলেন। যেন একটা বোমা আকাশ থেকে পড়ে সব ভেঙ্গে চূরে দিয়ে গেল।

মনোমোহন ঘোষ

মনোমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ। তাঁর পিতা রামলোচন ঘোষ আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন, ঐ বন্ধুতা সূত্রে মনোমোহনের সঙ্গে আমারও বন্ধুতা জন্মেছিল। একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন, তিনি মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন, "An old head on young shoulders"—যুবার ধড়ে বুড়ার মাথা। বাস্তবিক তাই। তিনি আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তাঁর

বয়স তখন ১৭ হবে অথচ Indian Mirror সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার তিনি অকাতরে স্কন্ধে নিলেন। ঐ বয়সে তাঁর মাথায় Civil Service পরীক্ষার কল্পনা খেলছিল। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর মনের সাধ পূর্ণ হ'ল না। তিনি ভেবেছিলেন এক, বলবত্তর দৈব তাঁকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। আমার জীবনক্ষেত্র বোম্বাই, তাঁর হ'ল বাঙ্গালা দেশ; আমার কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের চাকরী, তাঁর স্বাধীন আইন ব্যবসা; তিনি যে ক্ষেত্রে জয়লাভ করলেন সেই তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র, আমিও আমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পেলুম। কেবল দুঃখ রইল আমাদের একযাত্রায় পৃথক ফললাভ ঘটল।

আমাদের বিলাত যাওয়া একরকম ঠিক হয়েছে এমন সময় আমরা একদিন Botanical Garden-এ বেড়াতে যাই। পার হবার সময় একটা ষ্টিমারের ধাক্কায় আমাদের নৌকা উল্টে গেল। আমি সাঁতার জানতুম, নৌকার একভাগ কোনরকম করে আঁকড়ে ধরে রইলুম কিন্তু মনোমোহন নৌকার তলায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন, তাঁর আর উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। শেষে অনেক ডাকাডাকির পর পান্‌সীর মাঝি তাঁকে টেনে ওঠালে। আমরা কাউকে কিছু না বলে সেই ভিজে কাপড়ে আমাদের গম্য স্থানে চলে গেলুম—সেখানে কাপড় শুকিয়ে বেড়িয়ে চেড়িয়ে যথা সময়ে বাড়ী ফিরলুম। এই বৃত্তান্ত বাবামশাইয়ের কর্ণগোচর হওয়াতে আমাদের বিলাত যাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বল্লেন, "তোমরা এখানেই আপনাদের আপনারা সামলাতে পার না তোমাদের ঐ দূরদেশে পাঠান যায় কি করে? তোমাদের কেউ সঙ্গী নেই, রক্ষক নেই, আপনার উপরে নির্ভর করেই যেতে হবে, তোমরা তা পেরে উঠবে কিনা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।" বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে আমরা অসমসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম বলতে হবে। আমরা দুটি তরুণ-বয়স্ক বালক আর তখন ইংলণ্ডে যাওয়া এখনকার মত এপাড়া ওপাড়া নয়। Suez Canal তখন প্রস্তুত হয় নাই, Suez থেকে Alexandria পর্য্যন্ত রেলপথ। এই পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে যাওয়া আমাদের মত বালকের পক্ষে সহজ ছিল না। তখনকার কালে লোকে 'কালাপাণি' পার হওয়া এক অসাধ্য সাধন মনে করত—অকারণে নহে; কেননা আমাদের মধ্যে প্রথম যে দুইজন যাত্রী যান, রামমোহন রায় ও দ্বারিকনাথ ঠাকুর, তাঁদের আর দেশে ফিরে আসতে হয় নাই। কাজেই লোকেদের ধারণা ছিল যে ও-দেশে গেলে আর ফিরতে হবে না—

"The land from whose bourne
no traveller returns"

যা হোক্ শেষে আমাদের যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। আমি ত আমার প্রিয়জনেরা

কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অকূল পাথারে ভেসে পড়লুম। আমার সে সময়কার একটি বিদায়ের গান এই :—

কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন
কোন প্রাণে চলে যাব বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে,
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন॥
শরীর যদিও যাবে, মন সদা হেথা রবে,
যার ধন তারি কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত,
কভু না ছাড়য়ে তবু পাদপ-বন্ধন॥

আমরা পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে ভালয় ভালয় আমাদের গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলুম, আমাদের জাহাজ Southampton বন্দরে নোঙর করবামাত্র আমার আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর * আমাদের নিতে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে তাঁর বাড়িতে উঠলুম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও দুই কন্যা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিলেন। তাঁদের অতিথি হয়ে কিছুকাল সুখে কাটান গেল। তাঁদের বাড়ী খৃষ্ট-মিসনারিদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সুবিধা পেলুম। সেখানে Hodgson Pratt নামক একটি ভারতহিতৈষী মহাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল, তিনি অভিভাবকের ন্যায় আমাদের অত্যন্ত যত্ন করতেন। তাঁরই পরামর্শে আমরা মাসকতক পরে Windsor-এর নিকট-বর্তী একটি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাস করে আমাদের পরীক্ষার উপযোগী পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত রইলুম। গৃহটি ছাত্রাবাস ধরণের স্থান, আমরা ছাড়া আরো কয়েকজন ছাত্র ছিল। যিনি গৃহস্বামী তিনি আমাদের ইংরাজী শিক্ষক, সংস্কৃত, আরব্য, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি অন্য বিষয়ের জন্য অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। Dr.G. একজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও সেইরূপ মুখরা। বুড় বুড়ীর মধ্যে যে খুব বনিবনাও ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই খিটিখিটি চলত। তাঁদের কন্যারত্ন—একটি প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন, তিনি অনেক পরিমাণে এই অশান্তির প্রতিবিধান করতেন। আমাদের পড়ার মাঝে যা কিছু সময় থাকত তাঁরই সংসর্গে কাটাতুম। কাছে একটি ছোট্ট নদী ছিল, তাতে আমরা কেহ কেহ বোটে করে ব্যাড়াতে বেরতুম। মনে আছে একবার আমি কৌতুকক্রমে তাঁর মনে ভারি আঘাত দিয়েছিলুম। তিনি আমাকে একটি ফুল উপহার দেন—সযত্নে আমার বুকের উপর কোটে পরিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফুলটি শীঘ্র শুকিয়ে গেল। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—"এর মধ্যে ফুল শুকিয়ে গেল—এর কারণ কি ?"

আমি উত্তর দিলুম, "ভিতর থেকে রস পায়নি বলে বেচারা অত শীঘ্র মুষড়ে পড়েছে।' Miss G. মনে করলেন আমি তাঁর উপর কটাক্ষ করে এ কথা বল্লুম—যদিও আমি কেবল কথার কথামাত্র বলেছিলুম, কোনই গূঢ় অভিপ্রায় ছিল না। যা হোক্ আমার এই অনবধানের উক্তির দরুণ আমি তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলুম—কত সাধ্য সাধনার পর তাঁর মানভঞ্জন হ'ল। এই ছাত্রাবাসে থেকে পাঠাভ্যাসে আমাদের বিস্তর খাটতে হ'ত; মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা সকাল পর্যন্ত নিয়মিত পরিশ্রম করতে হ'ত; এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়েনি এই আশ্চর্য্য। এই পরিশ্রমের কুফল হওয়া দূরে থাকুক সদ্য সদ্যই সুফল ফললো। ১৮৬২ সালে আমি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম। যখন পরীক্ষায় ফল প্রকাশ হয় তখন আমি মনোমোহনের সঙ্গে য়ুরোপে ভ্রমণে বেরিয়েছি—প্যারী নগরীতে 'পাস' হওয়া সংবাদ আমার হাতে এল। আমি 'পাস' মনোমোহন ফেল। আমি প্রথম বৎসরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হ'তে পারব এরূপ আশা করি নাই। আমার আশাতীত ফল লাভ হ'ল তাতে আমার আনন্দ কিন্তু আমার বন্ধুর নৈরাশ্য সংবাদে সে এক রকম 'হরিষে বিষাদ' বোধ করলুম। সে যাই হোক আমাদের মনের কথা মনেই রইল। তখন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি—আমাদের ব্রত উদযাপন করা প্রথম কাজ। প্যারী হ'তে আমরা Switzerland প্রবেশ করলুম। 'প্যারী' এই নামের সঙ্গে কি মধুর স্মৃতি জড়িত আছে। নগরটি কি সুন্দর! দুই বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ গিয়েছে—(Boulevards), বিপণিগুলি সুসজ্জিত, কি লোভনীয়! প্রাসাদ চিত্রশালা সকলি মনোরম, প্যারীর কি এক সম্মোহন মন্ত্র আছে বিদেশীর মন লণ্ডন অপেক্ষা সহজে আকর্ষণ করে। লণ্ডন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, তার ভিতরে অনেক দেখবার জিনিস, অনেক শেখবার বিষয় আছে—তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া বিস্তর সময়সাপেক্ষ; কিন্তু প্যারীর সৌন্দর্য্য প্রথম দর্শনেই নয়নমন হরণ করে। প্যারী হ'তে Swiss-দের দেশে গিয়ে সেখানকার দর্শনীয় প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখে নিলুম। সরোবরের ক্রোড়লীন জেনেবা নগরী; Lausanne যেখানে গিবন তাঁর রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস সমাপন করেন;—Chillon দুর্গ যার বন্দী কাহিনী বাইরণের কবিতায় বর্ণিত,—রিগির পাহাড় যার উপর থেকে সূর্য্যের উদয়াস্ত শোভা দেখবার জন্যে যাত্রীরা দলে দলে সমাগত হয়। তখন পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্যন্ত রেলগাড়ী প্রস্তুত হয় নাই, পদব্রজে ওঠানামা শ্রান্তিজনক কিন্তু উপরে গিয়ে সূর্য্যাস্তের চমৎকার শোভা দর্শনের ফলে সকল শান্তি দূর হয়। Switzerland-এর পার্ব্বত্য দৃশ্য অতি সুন্দর। গিরি সরোবর সমন্বিত চমৎকার শোভা। সেখানকার পাহাড়গুলি হিমালয়ের মত বিরাট

ইনিই প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার;—অনেক হয়ত তা জানেন না!

মূর্ত্তি নয়—তারা অভ্রভেদী দেব আত্মা ভীষণ দর্শন নহে—সে গিরিশ্রী অন্তরূপ, যেন আমাদের অপেক্ষাকৃত আয়ত্তের ভিতর—ঘরের জিনিস। ও-দেশের ধবলগিরি হচ্ছে Mont Blanc—সেও 'সতত ধবলাকৃতি বিশাল অটল।' তার তুষারমণ্ডিত গাত্র দিয়ে ওঠানামা করে মনের সাধে বেড়িয়ে বেড়াতুম।

শামুনি হ'তে সেই গিরিরাজের সম্মুখীন হয়ে কবি কোলরিজের স্তব মনে পড়ত—

"O dread and silent Mount ! I gazed upon thee,
Till thou, still present to the bodily sense,
Did'st vanish from my thought. Entranced in prayer,
I worshipped the Invisible alone !—"

হে গিরিরাজ, তোমাকে ভুলিয়া সেই অমূর্ত্তের ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

শেষে ষ্টিমারে করে Lucerne সরোবরের উপর পরিভ্রমণে আমাদের ভ্রমণের পালা সাঙ্গ হ'ল। য়ুরোপের মুক্তক্ষেত্র হ'তে আবার আমরা ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করলুম। বাড়ী গিয়ে আমার এই জয়বার্ত্তা ঘোষণা করবার জন্য মন ছটফট করছে কিন্তু এই গেল প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য আর এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। সে বৎসর লণ্ডনে University Hall গৃহে সেই পরীক্ষার উপযোগী পড়াশুনায় সময় কেটে গেল। সেও এক ছাত্রাবাস কিন্তু প্রথমোক্ত পল্লীতে আমরা যে-ভাবে ছিলুম এখানে তা হ'তে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব। যিনি আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি নির্লিপ্তভাবে দূরে দূরে থাকতেন—তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলে যা আমাদের দেখা হ'ত। আমাদের সব নিজের নিজের গোছগাছ করে নিতে হ'ত। দু একটি ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখন কেবল একটির নাম (Schwanne) দেখতে পাই, যিনি এক্ষণে পার্লামেণ্টের মেম্বর। দ্বিতীয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমার দেশে ফেরবার সময় এল। তখন আমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবির আশীর্ব্বাদ সহকারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলুম। মনোমোহন 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' পণে সে দেশেই পড়ে রইলেন। কবির আশীর্ব্বাদ—

সুরপুরে সশরীরে, শূরকুলপতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে ; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী !

ধন্য ভাগ্য, হে সুভগা, তব ভবতলে!
যাও দ্রুতে, তরি
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী। যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!*

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের কাছে আমরা অল্প সময়ই থাকতুম। একালে যেমন পিতাপুত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে মেলামেশা দেখি, তখনকার কালে তেমনটি ছিল না, ছোটরা বড়দের অত্যন্ত সমীহ করে চলতো। আমাদের যা কিছু আমোদ আহ্লাদ মেলামেশা সে পিতার পরিষদবর্গের সহিত, তাঁদের কাছেই মন খুলে কথা কবার সুযোগ হ'ত।

দেবেন্দ্রসভা

দেবেন্দ্রসভায় নানা লোকের সমাগম ছিল, তার মধ্যে কতকজন খাস-দরবারের লোক। আম-দরবারে যে সব লোক যাওয়া আসা করত তাদের কথা পাড়বার আবশ্যক নেই। এইমাত্র বলে রাখি যে, এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত স্বর্ণবণিক শ্রেণীর লোক। এখন আর সে দলের লোক দেখতে পাই না—এমন হ'তে পারে যে, এক্ষণে কাঞ্চন-দেবতার আরাধনায় মগ্ন থেকে তাঁরা আর উচ্চতর সাধনার সময় পান না। যে সকল লোক এক সময়ে দেবেন্দ্রসভার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের দু চারজনের কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত—ছোট মানুষটি কিন্তু তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর মাথায় কতরকম speculation খেলত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারতেন না। আজ চায়ের ব্যবসা, কাল বই, পরশু কাপড়—তাঁর কথা শুনলে মনে হ'ত এবার বুঝি সোনার কাটি হাতে পেয়েছেন—যাতে ছোঁয়াবেন সোনা ফলবে। শেষে দেখা যেতো কোনটাতেই তাঁর মনোমত ফললাভ হ'ল না।

আর এক ছিলেন রাজা কালীকুমার; জাতিতে স্বর্ণবণিক, হৃষ্টপুষ্ট, শুচিবাইগ্রস্ত লোক, যিনি সন্দেশ ধুয়ে খেতেন। তিনি পারস্য সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন—তাঁর

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

সহচর একটি মুসলমান যুবক সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তাঁর ফারসী বয়েৎ আওড়ানো মনে পড়ে—একটি স্তোত্র মনে আছে, তা এই :—

তু জান পাক-অয় সব্‌বসর্‌ বে আব খাক, অয়ি নাজ্‌নি
(তুমি প্রাণ, পবিত্র সর্ব্বশঃ, না আপ মাটি, হে প্রিয়তম)
বল্লা জ্‌-জাঁ হম্‌ পাকতর রূহে ফদাক্‌ অয়ি নাজ্‌নি
(ও আল্লা প্রাণ হ'তেও পবিত্রতর লীন হে প্রিয়তম)

তুমি প্রাণ, তুমি ওহে পূর্ণ পুণ্যময়।
প্রপঞ্চ অতীত তুমি, ওহে প্রিয়তম।
প্রাণ হ'ত পুণ্যতর তুমি হে মহেশ,
একাত্মা তুমি ও আমি ওহে প্রিয়তম॥

বড়দাদা রাজার নাম রেখেছিলেন 'সম্ভোগ বিলাস।'

সম্ভোগ বিলাস নামে মাংসের ঢিবি
মধ্যে শিবে নেড়ে আর গুড়গুড়ি জীবী।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনবাবু ছিলেন দেবেন্দ্রসভার বিদূষক। তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে খুব হাস্য পরিহাস করতেন। আমাকে ডাকতেন 'পক্ষী' বলে। তিনি কখনো কখনো আমাদের কোন মিষ্টান্নের ভাগ দিয়ে বলতেন—

অর্দ্ধ রুটি যদি খায় ঈশ্বরের জন
তাহার অর্দ্ধেক করে অন্যে বিরতণ।

কত পাগলামী ছড়া আওড়াতেন সব মনে নেই। দু একটা বলি—

অজসা গরসা

দুই সাপ—এই কালীয়দমনের দুই সর্দ্দার রাম ও শ্যাম—

ধন্য ধন্য রাম শ্যাম তোমাদের কার্য্য
তোমাদের কার্য্য সকলের অনিবার্য্য
যখন তোমরা গিয়া চড় যার ঘাড়ে
অজসা গরসা আদি সবে তারে ছাড়ে।

অজসা গরসা যেন ছাড়ল, এখন রামশ্যামের হাত থেকে রক্ষা করে কে?

সাপ ও বেঙের কথোপকথন

সাপ—"জিহ্বা লিডি বিডি সিড়ি কিচডি করি কুপ—"

(আমি যদি কুপ করে তোকে খেয়ে ফেলি ?)

ব্যাঙ—"হম্ যদি পানিমে ডুব গয়া ভুসম ভুসড়ি খায়া গুজড়ি মুজরি করি গুপ—"

(আমি যদি গুপ করে জলে ডুবে যাই ?

নবীনবাবু চার রকম ভিন্ন প্রকৃতি লোকের কথা বলতেন—

বেগবেগা, বেগচেরা, চেরবেগা. চেরচেরা। স্মরণশক্তির তারতম্যে এই চার রকম লোক হয়।

বেগবেগা,—যে শীঘ্র শেখে শীঘ্র ভুলে যায় ;
বেগচেরা,—যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে ;
চেরবেগা,—যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায় ;
চেরচেরা,—যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে।

এর মধ্যে অবশ্য বেগচেরা হওয়াই প্রার্থনীয়। তার নীচে চেরচেরা। চেরবেগাই অধম। উপরে নবীনবাবুকে বিদূষকরূপেই চিত্রিত করে দেখান গেল, কেননা তাঁর ঐ দিক্‌টাই আমাদের চোখের সামনে থাকত ; কিন্তু তা ছাড়া আর আর দিকেও তিনি ব্যাখ্যানযোগ্য। সাহিত্য-সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। কেবল আমাদের ঐ বয়সে তাঁর বিদ্যাসাধ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারতুম না। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন ও দক্ষতাসহকারে কয়েক বৎসর সেই কার্য্য সম্পাদন করেন। তত্ত্ববোধিনী ভিন্ন তখনকার অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হ'ত। ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীতে তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল এবং বিশ্বকোষের পাতা উল্টে দেখলে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেকগুলি লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

অক্ষয় কুমার দত্ত

ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যগুরু। ১৮৪৩ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন, সেই সময় থেকে আমাদের বাড়ী তাঁর যাওয়া আসা।

এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার বিবরণ আমার পিতার আত্মচরিতে যা লেখা আছে তা এই :—

"আমি ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোক-হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথমে সে অভাব পূরণ করে।"

অক্ষয় বাবুর একটা উঁচু Standing desk ছিল ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন—"ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার।"

তখনকার কালে অক্ষয়কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁরা বঙ্গভাষার দুই স্তম্ভ ছিলেন। যখন তাঁরা সেই ভাষা গড়ে তুললেন তখন তা সংস্কৃতবহুল হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু "উভয়েই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তাঁরা বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরালেন তা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হ'ল। অক্ষয়বাবুর লেখার এক নমুনা আরম্ভে দিয়েছি, আর একটি নমুনা এখানে দিচ্ছি, তা হ'তেই এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে।

সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা

"অনন্তর বিশ্বলোচন তিমিরমোচন তরুণ বিভাকর, যবাকুসুম-সদৃশী আশ্চর্য্যময়ী মহীয়সী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, পূর্ব্বদিকস্থিত সুরাগ-রঞ্জিত প্রবাল-মণ্ডিত সুরম্য প্রাসাদ হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে এবং স্বকীয় সুবর্ণময় রশ্মিজাল বিকীর্ণপূর্ব্বক,

নবপল্লব-পরিবেষ্টিত সমুন্নত তরুশিখা সকল অতি মনোহর হিরণ্ময় মুকুটে ভূষিত করিতেছে এই আশ্চর্য্য দর্শন দর্শন করিয়া ইত্যাদি।"

"১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত অক্ষয়বাবু সুদক্ষতাসহকারে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে অর্থোপার্জ্জনের কত উপায় তাঁর হস্তের নিকট এসেছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। এই কার্য্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক একদিন জ্ঞানালোচনাতে ও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তিনি তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না।"

"অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমর্গের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারি প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মত হ'তে সুরক্ষিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারি প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত উভয় বিষয়ে গম্ভীর চিন্তা ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে বহু অনুসন্ধানে ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"*

বেদোপনিষদ্ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাভূমি হয় মহর্ষির ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহুপ্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। পিতার আত্মচরিতে এই বিষয়ে তাঁর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না, তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না—উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়েই তাহার পত্তন ভূমি।" * * * "উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতু সমস্ত খনিতে কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।

* রামতনু লাহিড়ী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

অক্ষয়বাবুর শেষ জীবনের কথা শাস্ত্রীমশায়ের বই থেকে এইখানে বলে এ ভাগ শেষ করি—

"ইহার পরেও অক্ষয়বাবু কয়েক বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধ্যে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রিয় তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৮ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনী প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন সময়ে মস্তিষ্কে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব জ্বালা হইয়া লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই।"

"ইহার পরে একপ্রকার জীবন্মৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। অধিক কি, তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক সুবিখ্যাত ও পণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সঙ্কলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালে সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোন দিন এক ঘণ্টা, কোন দিন দেড় ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া যাইত; এইরূপ করিয়া এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।"

ধন্য তাঁর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়! এই গ্রন্থখানি অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে বঙ্গ সাহিত্য সমাজে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে।

এইরূপে যখন তিনি শিরঃপীড়ায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমি কাশীপুরে গঙ্গার ধারের এক বাগানে মাস দুই কাটিয়েছিলুম। কি পরিবর্ত্তন! আগেকার সেদিন আর নাই, সে স্ফূর্ত্তি, সে উৎসাহ নির্ব্বাসিত হয়েছে—সে অক্ষয় আর নাই। শরীরে তৈল মর্দ্দন, ওজন করে ঔষধ সেবন, মাপ জোক করে আহারের ব্যবস্থা—এই প্রকার শরীর সেবাতেই দিনযাপন করতেন। সেই প্রখর জ্ঞানোজ্জ্বল চিত্ত সংশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

"জীবনের অবসানকালে তিনি বালিগ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উদ্যান-বাটীতে থাকিয়া এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাল উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আলোচনা ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানানুশীলনে কাটাতেন। সেখানে ১৮৮৬ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠে তাঁহার দেহান্ত হয়।" ২০৭—২০৮ পৃঃ

দেবেন্দ্রসভার সভাসদ আরো অনেক ছিলেন, তাঁদের কথা বলবার আর প্রয়োজন নাই। একবার আমরা বাবামশায়ের সঙ্গে এই সব দলবল নিয়ে বরাহনগরের

একটি উদ্যানে কিছুদিন যপেন করেছিলুম। সুখের দিন আমার স্মৃতিপটে চিত্রিত আছে। রাজা কালিকুমার ও পরিজনবর্গের আরো অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। পিতৃদেব এই দলবলে বেষ্টিত হয়ে একটি ধবল প্রস্তরাসনে বসতেন, তাঁর বর্ণনা বড় দাদার একটি কবিতায় আছে—

শুভ্রমূর্ত্তি কান্তিমান্, শুভ্র বেশ পরিধান,
উন্নত শরীর সুগঠন,
বেষ্টিত স্বজনগণে, ধবল প্রস্তরাসনে,
বসিয়া ব্রহ্মর্ষি তপোধন।
সংসার দুর্দ্দিনে ঝড় অসামান্য ঘোর
দিবারাত তাঁহার উপরে করে জোর।
অস্থির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়,
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়॥

এখানে আমার জীবনস্মৃতির এই একপালা সাড় হ'ল। এখনো পাঠকদের কাছ থেকে 'আমার কথাটি ফুরলো' বলে বিদায় নেবার সময় হয়নি, পরে আর এক ভাগ আরম্ভ করা যাচ্ছে।

———

পূর্ব্বভাষ

গতবৎসর রোগশয্যায় পড়িয়া যখন এই পুস্তকের লিখিত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন স্থির করিয়াছিলাম, ইহার নাম দিব "আমার শেষ কথা"। সেইজন্য এই পুস্তকের ভিতরে ঐ তিনটী শব্দ আছে। কিন্তু সেদিন বুঝিয়াছিলাম আমার পুত্রদ্বয়ের এবং কয়েকজন বন্ধুর ইচ্ছা নয় যে ঐ তিনটী শব্দ থাকে। কেন ইচ্ছা নয় তাহাও বুঝিয়াছি। ভয় পাছে সত্য সত্যই উহা আমার শেষ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তাই এ গ্রন্থের উপরিভাগে ঐ তিনটী শব্দ দিলাম না। আমি কিন্তু ওরূপ মনে করিয়া ঐ নাম দিব ভাবি নাই। আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহা কেহ কখনও লেখে নাই এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না। এই জন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম এদেশে তাহা আর কেহ লেখেন নাই। আর এই গ্রন্থে যে কথা লিখিলাম তাহা যে কেবল অন্য বাঙ্গালা গ্রন্থে দেখি নাই, এমন নয়, কোন ইংরাজী গ্রন্থেও দেখি নাই। অন্য কোন ভাষায় লিখিত আছে বলিয়াও অবগত নহি। এবং এই কথার অপেক্ষা বড় কথা কি হইতে পারে এখন তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। অথচ আমি চিরকাল যে রীতি অনুসরণ করিয়াছি তদনুসারে ইহার অপেক্ষা বড় কথা না পাইলে আর লিখিবও না। এইজন্য ভাবিয়াছিলাম এই পুস্তকের নাম দিব "আমার শেষ কথা"। এত বাঁচিব না যে আর বই লিখিতে পারিব না এরূপ ভাবিয়া ঐ নাম দিব মনে করি নাই। এই গ্রন্থের কথাগুলি কেবল আমার স্বদেশবাসীকে বলিলাম না, মনুষ্যমাত্রকেই বলিলাম। ১০৯ পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ পংক্তি হইতে শেষ পর্যন্ত * আমার পুত্র প্রকাশ নাথের লিখিত। তিনি বড় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু এবং তত্ত্বকথার আলোচনায় তাঁহার বড় আনন্দ

ইতি—

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ২১শে ফাল্গুন, ১৩১৫

* বর্ত্তমান গ্রন্থে ত্রয়োদশ পংক্তির আরম্ভ এই—"দুঃখের আর এক ব্যাপক মূর্ত্তি আছে"।

উৎসর্গ

ভুলুমা !

জন্মচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার একবার বাপমায়ের আদরের মেয়ে হইয়া জন্মিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই সেদিন আমাদের কাছে আসিয়াছিলে। আমাদের আদরে বোধ হয় তোমার তৃপ্তি হয় নাই। তাই বড় শীঘ্র চলিয়া গেলে। ইহাতে আমাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বলিলে তোমার বড় কষ্ট হইবে, মা। আমাদের কাছে যে কয়দিন ছিলে, অবিরাম রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলে, মা। কোন চিকিৎসাতে তাহা কমাইতে পারি নাই। তাই জগদম্বা তোমাকে লইয়া গেলেন। তাঁহার কোলে কাহারো কোন যন্ত্রণা থাকে না। সেই কোলেই অনন্তকাল থাকিয়া অনন্ত সুখভোগ কর, মা! জগদম্বা তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে লইয়া গিয়াছেন। তোমার মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। করুণাময়ী জগদম্বা মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করেন না।

তোমার চাতু কাতু বেশ ভাল আছে। আর বাবাজী সর্ব্বদা তাহাদিগকে দেখিতে আসেন।

বাবাজী কাতুচাঁদকে কত কি কিনিয়া দিয়াছেন। একবার দেখিতে আসিবে না, মা? যদি আস, দুই একদিন আগে আমাকে জানাইও, মা। বড় রৌদ্রের সময়ে গিয়াছিলে মা। তোমার জন্য ঠাণ্ডা সরবৎ প্রস্তুত করিয়া রাখিব। ইতি—

সস্ত্রীক

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

আমার শেষ কথা

আমার বয়স যখন ৩৫ বৎসর, তখন প্রথম আমার চোখের দোষ হয়। দূরে ভাল দেখিতে পাইতাম না। এ দোষকে তখন short sight বলা হইত; এখন near sight বলে। Short শব্দের পরিবর্ত্তে near শব্দ ব্যবহার করিয়া কি লাভ হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। ইংরাজেরা এখন এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন করিতেছেন, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা ভিন্ন তাহার অন্য কারণ দেখিতে পাই না—Change for the sake of change—ইংরাজদের একটা রোগ, একটা বাতিক, একটা নেশা হইয়া পড়িয়াছে। চিরকাল তাঁহাদিগকে বলিতে ও লিখিতে দেখিয়াছিলাম—"He did his best," এখন তাঁহাদিগকে বলিতে ও লিখিতে দেখি—"He did his

level best"; "level" শব্দটা কেন ঢোকানো হইল, বুঝিতে পারি না। আমার প্রিয়তম বন্ধু স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভাল ইংরাজী জানিতেন, এবং খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর অনেক ইংরাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"level" শব্দটা জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে কেন? তিনি বলিতে পারিলেন না। তাই বলি, আগেকার "short sight" ছাড়িয়া এখনকার "near sight"-এ আর কিছুই বুঝায় না, কেবল ইংরাজের একটা বাতিক বুঝায়। বাতিকের জন্য অনেক ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া যায়। দূরে ভাল দেখিতে না পাওয়াকে short sight বলিলে তাহা যেমন পরিষ্কার বুঝায়, near sight বলিলে তেমন পরিষ্কার বুঝায় না। Change for the sake of change যাহাদের সংসার-ধর্ম্মের একটা মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সংস্রবে থাকিয়া আমরাও অনেক ভাল জিনিস ছাড়িয়া মন্দ জিনিস ধরিতেছি—আর ঐ বাতিকগ্রস্তদের ন্যায় মনে করিতেছি যে, আমাদের নিৰ্জ্জীবিতার পরিবর্ত্তে সজীবতা হইতেছে। আমার short sight হইয়াছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমি চস্‌মা লই নাই। দুই কারণে লই নাই। তখন চস্‌মাধারী দেখিলেই লোকে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইত। সে রূপে ধৃত হওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না—কেন ছিল না, নাই বা এখন বলিলাম। অপর কারণ এই যে, অনেকে আমাকে বলিয়াছিলেন—ও দোষটা আপনা আপনি সারিয়া যাইবে, চস্‌মা লইলে বোধ হয় সারিবে না। ঔষধে বুঝি উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়, এই ভাবিয়া আমি চস্‌মা লই নাই। চারি পাঁচ বৎসরে দোষটা সত্য সত্যই সারিয়া গিয়াছিল। পরে কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে একটা দোষ জন্মিল—নিকটে আর ভাল দেখিতে পাইতাম না। ইহাকে বলে long sight। Long sight হওয়াতে বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। গবর্মেণ্টের কাজ করিয়া দিতে বিলম্ব হইলে তাঁহারা বড় রাগ করেন। ইংরাজ নিজে যেমন ঘোড়ায় জিন দিয়া থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের চাকর বাকরেরাও তেমনি ঘোড়ায় জিন দিয়া না থাকিলে তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। চাকরী হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে তখন ডাক্তারদের পরামর্শ লইলাম। তাঁহারা বলিলেন—চোখ strain করা ভাল নয়, আপনি চস্‌মা লউন। আমি চস্‌মা লইলাম। ডাক্তারেরা যখন আমাকে চস্‌মা লইতে বলেন, তখন আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, রাত্রে লেখাপড়া করিবেন না। এটা বড় চমৎকার উপদেশ। আমাদের দায়ে পড়িয়া লেখাপড়া করিতে হয়, যদি ইচ্ছাসুখে লেখাপড়া কবিতে হইত, তাহা হইলে দেখিতে, পৃথিবীতে একটি ছেলেও লেখাপড়া করিত না। আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমি রাত্রে লেখাপড়া বন্ধ করিলাম। সন্ধ্যার পরই আমার শয়নগৃহের একধারে একটি ডবল্ বোনা বালাম্ব্য মাদুর পাতিয়া

আর একটা তাকিয়া লইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে লাগিলাম। দুই চারিদিন এই রকম পড়িয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মনে নানা কথা ওঠে, উঠিয়া আবার চলিয়া যায়, আবার ওঠে, আবার চলিয়া যায়, যেন শৃঙ্খলাহীন, বন্ধনহীন, এলোমেলো, কিন্তু বড়ই মোহকর, বড়ই আনন্দজনক। টপ্ টপ্ করিয়া আসে, ঝপ্ ঝপ্ করিয়া যায়, কিন্তু যাইয়াও যায় না, আর পাঁচটাকে আনিয়া দেয়। আনিয়া আমাকে জালে জড়ায়। দুই চারিদিনের মধ্যেই ইহাকে চিনিয়া ফেলিলাম—ইহাকে Reverie বলিয়া চিনিলাম। ইংরাজ চিনাইয়া না দিলে আমরা এখন আর কিছুই চিনিতে পারি না। আমাদের বেদবেদান্তগুলিও আর চিনিতে পারি না। তাই ঐ এলোমেলো ব্যাপারটাকে যখন 'reverie বলিলাম,' তখন মনে হইল, ওগুলাকে নিজেও চিনিয়াছি, অপরকেও চিনাইয়াছি।

এখন ঐরূপ কথা দুইএকটি বলি :—এই রকম করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে একদিন আমার বাল্যকালের কথা মনে উঠিতে লাগিল। তখন আমার বয়স ৮/১০ বৎসরের বেশী নয়। আমি তখন পাঠশালায় পড়ি, আমার স্বভাব কিছু চঞ্চল, কিন্তু আমি দুষ্ট বা দুরন্ত নই। আমার চঞ্চলতা দেখিয়া আমাদের এক বয়স্ক কুটুম্ব আহ্লাদ করিয়া আমাকে বিচ্ছু বলিয়া ডাকেন। তাহাতে আমি ভারী খুসী। তখন আমার চক্ষু আর এক রকম ছিল কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু একথা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না যে, তখন যাহাই দেখিতাম,—রৌদ্র, জ্যোৎস্না, গাছপালার রঙ, মাটী, মাঠ, ঘাস—যাহাই দেখিতাম, তাহাই যেন এখন হইতে ভিন্ন রকম দেখিতাম—বড় মধুর, বড় মিঠা, বড় বিশুদ্ধ, বড় সুগন্ধ, বড় সরল, বড় নির্দ্দোষ, বড় পবিত্র, বড় সজীব। কিছুতেই মনে অপবিত্র বা আবিলভাব উঠাইয়া দিত না ; সকলই আমার মনে একটা কোমল, কলুষহীন আনন্দের ভাব তুলিয়া দিত। সে আনন্দের বর্ণনা হয় না, যে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, সে কি অপূর্ব্ব, কি অনিন্দ্য জিনিস, কত নির্ম্মল, কত শীতল, কত সাদাসিদে। সেই আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে কতবেলা অবধি মাঠে মাঠে কত বেড়াইতাম, দূরে চাষার গান শুনিতাম, আশেপাশে গরুর হাম্বারব শুনিতাম। বুঝিয়াছি, ব্রহ্মচারীর চক্ষে না দেখিলে বাহ্য প্রকৃতির সে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন প্রথম যৌবনোদ্গম (puberty) হইয়াছিল, এবং সেইজন্য মনে ভোগস্পৃহা জন্মিয়াছিল, তখন হইতে যাহাই দেখিয়াছি, তাহাই বাল্যকালের সেই নির্ম্মলতা, সেই অপূর্ব্বত্ব, সেই পবিত্রতাহীন, সেই সজীবতা শূন্য দেখিয়াছি, তাহা যেন সেই বাল্যদৃষ্ট স্বর্গীয় জিনিস নয়, তাহা যেন একটা আবিল জগতের আবিল জিনিস। যাহা নিথরকিচ ছিল তাহাতে যেন একটা খিরাকচ ঢুকিয়াছে। আবিল পৃথিবীকে চিরকাল নির্ম্মল স্বর্গ রূপে অনুভব করিতে হইলে

চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হয়। সমস্ত জীবন অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হয়। সমস্ত জীবন অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সমস্ত জীবন ব্রহ্মচারী থাকিতে হয়, বিধাতার এই বিধান। এই সব ভাবিতে ভাবিতে আবার যেন সেই জন্মস্থানে সেই রকম বালক হইয়া সেই রকম বাল্যলীলায় মত্ত হইয়া ঠিক সেই রকম নির্ম্মল বাল্যানন্দে ভরপুর হইয়াছি—কি সুখ, কি নির্ম্মল, নির্দ্দোষ ঠাণ্ডা, বিশুদ্ধ সুখ! বাল্যকালের সৌন্দর্য্য বালকে বুঝিতে পারে না, বৃদ্ধে বুঝিতে পারে। বৃদ্ধে যখন বুঝিতে পারে, তখন বাল্যকালের সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়; যৌবন ও বার্দ্ধক্যের আবিলতা অনুভূত হইয়া যাওয়ায়, যাহা নির্ম্মল, যাহা বিশুদ্ধ, তাহার আদর আরও বাড়িয়া যায়, তাহার পবিত্রতা আরও বেশী অনুভূত হয়। তখন বার্দ্ধক্যের রোগ শোক দুঃখ কোথায় চলিয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে সেই আনন্দপূর্ণ বাল্যকাল আবার আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে আবার সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ হইতে থাকে। নোনাপেতা, মনসাপোতা, ধনপোতা, চারিদিকে ধানক্ষেত, মাঝখানে খানিকটা করিয়া উঁচু জমি, তাহাতে চাষ হইত না, গরু চরিত, আর আমরা খেলা করিতাম। নোনাপেতা আমাদের বাড়ীর অতি নিকটে, ঘরে শুইয়া বসিয়া দেখিতাম। সেখানে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ আছে, নোনা গাছ কখনও দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে শুকনা পাতা ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িত, আর রাত হইলে আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিত। তাই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা বলিতেন, নোনাপেতায় ভূতপ্রেত আছে। আমরাও নোনাপেতার নামে একটু কাঁপিয়া উঠিতাম—তাই ভাবিয়া এখন কত আনন্দ। যে নোনাপেতায় ভূত-প্রেতের বাস, সেই নোনাপেতায় বল্‌দেরা তাঁবু ফেলিয়া* দু এক দিন করিয়া বাস করিত। যতক্ষণ তাহারা থাকিত, ততক্ষণ আমরা নোনাপেতাকে ভয় করিতাম না। প্রত্যূষে উঠিয়া গিয়া তাহাদের তাঁবুর ভিতর বসিয়া থাকিতাম। দেখিতাম, এক যায়গার ধান চাল আর এক যায়গায় যাইতেছে; বুঝিতাম না কেন যায়। কিন্তু যাহারা লইয়া যাইত, তাহাদিগকে দেখিয়া, আমরা শিশু, আমাদের ভূতের ভয় পর্য্যন্ত পলাইয়া যাইত। এখন বুঝিয়াছি ক্ষুধার্ত্তের মৃত্যুভয় পলাইয়া যায়। মনে মনে বাসনা হইত, তাহারা যেন ঘন ঘন আমাদের ভূতের ডাঙ্গায় তাঁবু ফেলে। সেই নোনাপেতায় আমার ভাইপো শ্রীমান সর্ব্বেশচন্দ্র সম্প্রতি একটী হাট বসাইয়া বহু গ্রামের বহু লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। মনসাপোতা আমাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে। শীতকালে প্রায় প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে সেখানে যাইতাম। এবং প্রকাণ্ড হরিদ্বর্ণ মাঠের আইলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই দিকের ধানক্ষেত হইতে ধানের শীষ ছিঁড়িতাম। তাহার পর

মনসাপোতায় প্রকাণ্ড হরিদ্বর্ণ মাঠে সূর্য্যাস্ত জনিত প্রকাণ্ড ছায়া, খেঁকশিয়ালের খেলা ও অদূরে বাগ্দীদের ঘরের চাল ভেদ করিয়া ধোঁয়া উঠিতে দেখিয়া কি যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না ; কিন্তু চক্ষু বুজিয়া এই রকম করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার তখনকার অপেক্ষা আমি অধিকমাত্রায় আনন্দ উপভোগ করি। মনসাপোতায় গোটা কতক গর্ত্তে খেঁকশিয়াল থাকিত। আমরা সেখানে গিয়া দেখিতাম, একটা কাঁকড়া মুখে করিয়া, একটা মাছ মুখে করিয়া, বোঁ করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া গর্ত্তে ঢুকিতেছে, তাই দেখিয়া আমরা হাততালি দিয়া উঠিতাম। ধনপোতা মনসাপোতার খানিক দক্ষিণে। উহার নিকটে মানুষের বাস দেখা যাইত না, সেখানে যাইতে গাটা যেন একটু ছম্ ছম্ করিত। একদিন একলা গিয়াছিলাম, বড় ভয় করিয়াছিল। তবু কিন্তু কতকগুলা লাল কুঁচ তুলিয়া আনিয়াছিলাম। লাল কুঁচ দেখিলে এখন ভয় করে। অনুজ অক্ষয়চন্দ্রের একটী ছেলে আমার দেওঘরের বাসায় একটী কথা বলিয়াছিল, সেই কথাটী মনে পড়ে, আর ভয় করে। সে কথাটী এই, "রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা, এ হেন সুন্দরী বনে কেন দেখা ?" রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা, একি সেই Lady Macbeth না কি ? আমি তবে ভারি দুঃসাহসিক, একলা Lady Macbeth-পোতায় গিয়াছিলাম! তখন Lady Macbeth-পোতায় গিয়া ভয় হইয়াছিল, সেই কথা ভাবিতে এখন আনন্দের সীমা থাকে না। মানুষের জীবন সত্যসত্যই আনন্দময়। আর একটা আনন্দের কথা বলি। সেই পূজার আনন্দ—৭ই আশ্বিন সপ্তমীপূজা। ৪ঠা আশ্বিন ইস্কুল করিয়া ছুটী হইবে। আমরা ৫ই আশ্বিন বাড়ী যাইব। ৫ই আশ্বিনের জন্য আমরা ধড়ফড় করিতেছি। আজ ২৯শে শ্রাবণ। আমরা সাতটী সমবয়স্ক ছেলে এক বাড়ীতে থাকিতাম। আমার অগ্রজ দ্বারকানাথ, আমার দুই ভাইপো প্রিয়নাথ ও অঘোরনাথ, আমার জাঠতুত ভাই উমেশচন্দ্র, আমার মাসতুত ভাই রাধিকাপ্রসাদ এবং আমার জাঠতুত ভাই বৃন্দাবনচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্যালক বৈঁচবাটী নিবাসী গিরিশচন্দ্র মিত্র। দ্বারকানাথ, প্রিয়নাথ, অঘোরনাথ ও উমেশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। আছি কেবল আমি, রাধিকা এবং গিরিশ ভায়া। কর্ত্তারা আমাদিগকে রাত্রি নয়টার সময় শুইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিনের পড়া যতক্ষণ না নিখুঁত রূপে আয়ত্ত হইত, ততক্ষণ আমরা শুইতাম না। শুইতে কোন দিন ১০টা, কোন দিন ১১টা, কোন দিন ১২টা বাজিয়া যাইত। তথাপি পূজা যখন নিকটবর্ত্তী হইত, তখন আমরা কয় জনে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে উঠিয়া একত্র হইতাম, এবং বাড়ী যাইবার আর ৩৫ দিন

---

* মহামহোপাধ্যায় হইলে লিখিতাম,—'তাঁবু গাড়িয়া।'

আছে, এই বলিয়া গা-টেপা-টেপি করিতাম, আর একটু চাপা রকম খিল্ খিল্ও করিতাম, আর ৩১ দিন আছে, আর গা-টেপা-টেপি ও খিল্ খিল্ করিতাম। এই রূপে যখন ৪ঠা আশ্বিন আসিত তখন আবার সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে উঠিয়া তেমনি একত্র হইয়া "কাল হে কাল" মহোল্লাসে এই কথা বলিতাম, আর শব্দ না হয় এমনি করিয়া নাচিতাম, কারণ কর্ত্তারা তখনও নিদ্রিত। এই সব কথা মনে উঠিলে ঠিক সেই সময়ে গিয়া পড়িতাম, দ্বারকানাথ, প্রিয়নাথ, অঘোরনাথ ও উমেশচন্দ্র, যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যেন আবার সশরীরে ফিরিয়া আসিতেন, আর সকলে জড়াজড়ি করিয়া "কাল হে কাল" বলিয়া আবার সেইরূপ উল্লাস উপভোগ করিতাম। এইরূপ পূর্ব্বকথা মনে উঠিলে, পূর্ব্বের সেই আনন্দ ও উল্লাসও যেন শরীর প্রাপ্ত হইয়া মনের ভিতর আসিত, বৃদ্ধ বয়সে আবার ঠিক সেইরূপ বালক হইয়া বাল্যকালের সেই নির্ম্মল শরীরী আনন্দ ও উল্লাস প্রত্যক্ষ করিয়া অসীম আনন্দ ও উল্লাস উপভোগ করিতাম। আজ ৫ই আশ্বিন আজ বাড়ী যাইব। কেমন আহ্লাদ করিতে করিতে যাইতাম, Oriental Miscellany নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রে একবার লিখিয়াছিলাম। সেই লেখাটুকু প্রথম ক্রোড়পত্রে তুলিয়া দিলাম। পূজার সময় বাড়ী যাইবার যে এত আনন্দ, তাহা কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম বলিয়া কত যে বাড়িয়া যাইত, তাহা আর কি বলিব! ইস্কুলে জল খাইবার জন্য যে পয়সা পাইতাম, তাহাই বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি এবং আটচালায় জ্বালাইবার জন্য একটী লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। কর্ত্তাদের প্রতিমার সাজসজ্জার দিকে বেশী দৃষ্টি ছিল না, তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি ছিল কাঙ্গালী বিদায়ের দিকে, এবং লোকজনের ভোজনের দিকে। আমরা তখন বালক, প্রতিমার সাজসজ্জা ভাল হয়, আমাদের তখন বড় ইচ্ছা তাই আমরা আপন হাতে প্রতিমা সাজাইতাম, এবং কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর কর্ত্তাদের বাহারের দিকে দৃষ্টি ছিল না বলিয়া আমাদের তত বড় আটচালায় চারটির বেশী বড় লণ্ঠন জ্বলিত না। সেটা আমাদের ভাল লাগিত না। তাই আমরা প্রতি বৎসর একটা করিয়া ছোট লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর সেই লণ্ঠনটি যখন জ্বলিত, তখন ভাবিতাম আমাদের খুদে লণ্ঠনটি সরকারী বড় বড় লণ্ঠন-গুলির চেয়েও বড়। এই সব করিয়াও যে ক্ষোভটুকু থাকিত, তাহা মিটাইবার জন্য সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী, চারিদিন খুব ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া আটচালায় সমস্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতাম। এইরূপে আমরা volunter-এর কাজ করিতাম।

এ কাজ করিয়া যে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতাম। তাহার বর্ণনা হয় না, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও এই রকম করিয়া আবার অনুভব করিয়াছি। বিধাতার কি অপূর্ব্ব মঙ্গলময় বিধান! তিনি বুড়ো মানুষকেও বালক করিয়া বাল্যকালের নির্ম্মল পবিত্র আনন্দের অধিকারী করেন! কয়দিনই সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেলে, আমরা মহা আনন্দে আটচালায় নাচিতাম। আর গাহিতাম—ষড়ানন ভাই, তোর কেন নবাবী এত, তোর ঘরে নাইক অষ্টরম্ভা, পরের বাড়ী কোঁচা লম্বা, তোর মা সেই জগদম্বা, পেটের জ্বালায় ছাগল খেত। ঢুলি নাচের বাজনা বাজাইত, আর আমরা নাচিতাম। চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঠিক সেই নাচানাচি, এবং ঠিক সেই আনন্দ অনুভব করি। হায়! দেশের কি দুর্ভাগ্য! এখনকার বালকে বুড়োর মত হইয়াছে, লজ্জায় ও গাম্ভীর্য্যে এক কিম্ভুতকিমাকার জীব। যাহাদের বালকে আনন্দ ও উল্লাস করিতে পারে না, তাহাদের মঙ্গল হওয়া কি সম্ভব? তখন বুড়াতেও বালকের ন্যায় আনন্দ করিত। আমাদের সেই পরাণ জেঠা বয়সে প্রায় সত্তর; কিন্তু আনন্দে উল্লাসে আমাদের সঙ্গে নাচিত ঠিক আমাদেরই মতন বালক। নবমীর বলিদানের পর যে কাদামাটী হইত পরাণ জেঠাই তো তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। নিজে কলসী কলসী জল ঢালিয়া নিজে প্রথমে গড়াগড়ি আরম্ভ করিতেন। আমরা অমনি নাচিয়া উঠিতাম। ১০।১৫ জনে গড়াগড়ি আরম্ভ করিতাম, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, সেই কাদা-মাখা গায়ে পরাণ জেঠার সঙ্গে পাড়ার অন্য অন্য পূজাবাড়ীতে গিয়া সেখানে আবার কাদামাটী করিতাম, আমাদের ঢাক ঢোল আমাদের সঙ্গে যাইত। ক্রমে অন্যান্য বাড়ীর ঢাক ঢোলও আমাদের সঙ্গ লইত। যখন শেষ বাড়ীতে কাদামাটী করিয়া নাচিতে নাচিতে পুকুরে নাইতাম তখন ঢাক ঢোলের শব্দে দশ খানা গ্রাম কাঁপিয়া উঠিত, দশখানা গ্রামের লোক ছুটিয়া দেখিতে আসিত। তখন আমাদের বড় পুকুরে ঝপাং ঝপাং করিয়া পড়িয়া পুকুর তোলপাড় করিতাম ও গাবাইয়া তুলিতাম। সেই সেকালের উল্লাস, কিন্তু বুড়ো বয়সে এই রকম করিয়া চক্ষু বুজিয়া যেন শরীরীবৎ আবার দেখিয়াছি, দেখিয়া তাহার সহিত আবার সেই তখনকার মতন মাতামাতি করিয়াছি। মানুষের সুখের সীমা আছে কি? মানুষের সুখের ভাণ্ডার ফুরাইবার নয়। সকলেরই জীবনে, বিশেষ বাল্যকালে, এইরূপ আনন্দোপভোগ হইয়া থাকে। বুড়া হইয়া সকলেই যদি আমার মতন চক্ষু বুজিয়া সেই বাল্যানন্দের ছবি মনে ফলাইয়া তোলেন, সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে, কৃপায় ভগবানের

মঙ্গলময় বিধানে পৃথিবীতে সকলেরই সুখের ভাণ্ডার যথার্থ্যই অসীম অনন্ত অফুরন্ত। লোকে যে এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পৃথিবীতে সুখ নাই, "অনেক দুঃখ আছে হেথা, এ জগৎ যে দুঃখে ভরা", এ কেবল কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণতার অভাবের ফলে বলিতেছে। ঐ যে ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—

ওটা এখনকার ইউরোপের একটা ঢং; সুতরাং ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালীর বড় ভাল লাগে, এবং ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্যে এত প্রবল এবং আদৃত হইতেছে। তা নয়, তা নয়; এই বুড়ো বয়সেই বাল্যকালের অসীম, নির্ম্মল আনন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া আমি জোর করিয়া বলিতেছি—এ জগৎ সুখে ভরা, মানুষের সুখের পরিমাণ হয় না—ভগবানের দয়া ও কৃপা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বৃদ্ধ বয়সে আমার বর্ণিত প্রণালীতে বাল্যকালকে মূর্ত্তিমান করিয়া বাল্যানন্দ প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। কাজ অতি সহজ। চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলে ভগবানেরই নিয়মে অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

পূজার কথা ভাবিতে ভাবিতে, সন্ধিপূজার ভীষণতা-পূর্ণ আনন্দের কথা মনে উঠিল। গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা না হইলে আমাদের মন খারাপ হইত। গভীর রাত্রে হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। সন্ধিবলিদান একটা বিষম ব্যাপার। ঠিক মুহূর্ত্তে না হইলে মায়ের পূজা একরকম পণ্ড হয়, গৃহস্থের ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা। মুহূর্ত্ত-মাহাত্ম্য সকল মহৎ কাজেই আছে; কিন্তু আমাদের সন্ধিপূজায় যেমন দেখিয়াছি, আর কিছুতেই তেমন দেখি নাই। একটু বলি :—

সন্ধিপূজা ও বলিদান আমাদের দুর্গাপূজার সর্ব্বপ্রধান অংশ। আজ রাত্রে সন্ধিপূজা ও বলিদান। সকাল হইতে মেয়ে পুরুষ, পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই মুখে কেবল ঐ কথা—সকলেই যেন ভীত সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যার সময় ঝাঁবি বসিল। সেটা কি, বোধ হয় অনেকে জানেন না। যখন ঘড়ি ছিল না, তখন সন্ধিপূজা ও বলিদানের মুহূর্ত্ত নিরূপণ করিবার জন্য ঝাঁবি পাতা হইত। ঘড়ির চলন হইলেও, পুরাতন বুনিয়াদি বাড়ীতে ঝাঁবি পাতা হইত। আমাদের বাড়ীতে এখনও পাতা হয়। আমাদের পাড়ার আচার্য্যেরা চিরকাল আমাদের বাড়ীতে ঝাঁবি পাতিতেছেন। এখনও তাঁহাদেরই একজন পাতেন। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়, বৈঠকখানায় একটা নূতন হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জল বসান হয়। একটা পাতলা তামার বাটীর তলায় এমন একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যে, বাটীটী হাঁড়ির জলের উপর বসাইয়া দিলে যতক্ষণে জলপূর্ণ হইয়া

ডুবিয়া যায়, ততক্ষণে ১ দণ্ড হয়। ডুবিবামাত্র উহা তুলিয়া আবার বসাইতে হয়। উহা যতবার ডোবে, হাঁড়ির গায়ে ততবার এক একটী চূণের দাগ দিতে হয়। তাহাতে দণ্ডের সংখ্যা ঠিক থাকে। রাত্রি যত দণ্ড হইলে সন্ধিপূজা আরম্ভ হয়, হাঁড়ির গায়ে ততগুলি চূণের দাগ পড়িলেই পূজারী মহাশয়কে চেঁচাইয়া বলা হয়, মহাশয় এতবার তাঁবি পড়িয়াছে। সন্ধিপূজা আরম্ভ হইবে শুনিলে, আমি তাঁবির জায়গা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধিপূজার মন্ত্র শুনিতে যাইতাম। চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিতাম, বসু গোষ্ঠীর সমস্ত স্ত্রীলোক সেখানে গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, চণ্ডীমণ্ডপ ধুনার ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ, মাকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আর চণ্ডীমণ্ডপে ৺কালীপূজার দীপান্বিতার ন্যায় অসংখ্য দুর্গাপ্রদীপ জ্বলিতেছে—কারণ, সন্ধিপূজায় মায়ের চামুণ্ডা রূপে পূজা করা হয়,—বড় শক্ত পূজা, সেই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে, দুই একটী নয়, কোটি যোগিনীর পূজাও শেষ করিতে হয়, আর সন্ধি বলিদানের সময় মহিষের শৃঙ্গোপরি রক্ষিত সরিষা যতটুকু সময় থাকে, ততটুকু সময়ের জন্য মায়ের একবার আবির্ভাব হয়, এবং সেই আবির্ভাব কালের মধ্যে যাহাতে সন্ধিবলিদান হয়, তাহাও করিতে হয়। বড় ভয়ানক, বড় শক্তপূজা! ঐ যে মহিষের শৃঙ্গের উপর সরিষার কথা, ওটা অতুলনীয় কবিকৌশল। সেই ভীষণ পূজার দুই একটা মন্ত্র শুনুন; শুনিলে বুঝিবেন, এ পূজার কল্পনা যাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল, সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, অন্ততঃ অসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এমন ভীষণতা যাহাদের এত প্রিয়, এত মনের ও হৃদয়ের সামগ্রী, তাহাদের কিছুতেই ভীত ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়; তাহারা ভীত ত্রস্ত হইলে বুঝিতে হয়, তাহাদের সারবত্তা ফুরাইয়াছে তাহারা মরিয়া গিয়াছে। এত স্ত্রী ও পুরুষ, কিন্তু কাহারও মুখে কথাটী নাই, এমন কি চপল চঞ্চল বালকেরা পর্য্যন্ত নির্ব্বাক নিস্তব্ধ, আমি যেন সে বিচ্ছু নই, সে বালক নই, রোমাঞ্চিত হইয়াছি; ঢাকী ঢুলী ঢাক ঢোল ঘাড়ে করিয়া তাহাদের সেই একচালাখানি ছাড়িয়া আটচালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা থাকিয়া থাকিয়া "মাগো" "মাগো" শব্দ করিতেছেন, ইংরাজীওয়ালারা পর্য্যন্ত তাকিয়া, সট্‌কা ছাড়িয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছেন, ধুনার ধোঁয়ায় আটচালা পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি কাঁপিয়া উঠিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছি, এমন সময়ে যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভীত ত্রস্ত করিয়া তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রপাঠ করিলেন:—

জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎপীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনাম্।
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়ৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়ৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গ পাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদস্ত্রবিভূষিতম্ ॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননম্ ॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধ্বং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ড নায়িকা ॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততাং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

ইহা দুর্গাপূজা নয়, কালীপূজা নয়, ইহা চামুণ্ডার পূজা—যে মূর্ত্তিতে মা অসুর নাশ করেন; ইহা মায়ের সেই চামুণ্ডা মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তির ধারণা আমাদের আর হয় না—ভীষণতা যতদিন আমরা এমনই করিয়া আবার ভোগ করিতে না পারিব,

ভীষণতায় যতদিন আবার এমনই করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে না পারিব, ততদিন আমাদের এ মূর্ত্তির ধারণা আর হইতে পারিবেও না। আমরা এখন বছর বছর শক্তি, আদ্যাশক্তির পূজার কথা কহিয়া থাকি, কিন্তু সে কেবল ফাঁকা কথা। আদ্যাশক্তির মর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া গিয়া আমরা বেজায় মোলায়েম হইয়া পড়িয়াছি, মোলায়েম হইয়া আমরা আর কষ্ট সহিতে পারি না, সুতরাং কঠোর হইতেও পারি না। তাই আজ পিতৃ-মাতৃবিয়োগে এক মাস কাল কষ্টকর অশৌচ পালন করিতে অশক্ত ও অনিচ্ছুক বলিয়া সভা করিয়া পৈতা লইয়া ক্ষত্রিয় ভাণ করিয়া অশৌচকাল কমাইয়া ১২ দিন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। তাই আমরা ভীষণতা দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দে ভরপুর না হইয়া ভীত ত্রস্ত হই—বলিয়া থাকি, ও ছাগবলি বন্ধ কর, ও রক্তপাত বড় নিষ্ঠুরতা। আরে দেবার্চ্চনায় রক্তপাত যদি নিষ্ঠুরতা তবে উদরা-র্চ্চনার জন্য রক্তপাতে নিষ্ঠুরতা দেখ না কেন? যাহারা এই ভীষণ পূজার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের করুণা কোমলতার কথা এখনি বলিব, শুনিও।

সন্ধিপূজা শেষ হইলেই দেখিলাম, আটচালায় হাড়িকাঠ পোঁতা হইয়াছে, বৃদ্ধ কালী কামার স্নান করিয়া ছাগল নাওয়াইয়া আনিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত। আমি অমনই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নদীর ধারে গেলাম। আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকেই কৌশিকী নদী। আমরা ৪।৫ জনে সেই নদীর ধারে গিয়া বসিলাম। ঘড়ি দেখিয়াও সন্তুষ্ট নয়, তাঁবি পাতিয়াও সন্তুষ্ট নয়, শুনিতে হইবে হরিপালের রায়েদের বাড়ীর বন্দুকের শব্দ। সেখানে যেমন সন্ধিবলিদানের কোপ হয়, চিরকাল অমনই বন্দুক ছোঁড়া হয়। যেমন বন্দুকের শব্দ শুনা, অমনই চেঁচাইয়া বলা—বন্দুক হইয়াছে। অমনই পুরোহিত হাড়িকাঠ পূজা করিলেন—কর্ত্তারা তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয়ের অনুমতি চাহিলেন—ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—হাঁ, ঠিক সময় হইয়াছে, অষ্টমী দণ্ড কাটিয়াছে। অমনই মা মা শব্দে সেই ভীষণতা ভীষণতর হইয়া উঠিল। ঈশ্বর দাদা ও কানাই জেঠার বাড়ীর লোক সেই সংবাদ লইয়া ছুটিল। খুঁটি ছাড়, খুঁটি ছাড় শব্দ উঠিল; বৃদ্ধ কালী কামার সেই বৃহৎ খাঁড়া তুলিয়া কোপ করিল—বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল—যে সকল বাড়ীতে পূজা, সর্ব্বত্রই সন্ধিবলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ঘর দ্বার গাছপালা পথঘাট স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকা—সমস্ত গ্রাম যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে যে সন্ধিবলিদান হইয়া গেল, ইহাতে সমস্ত গ্রাম আনন্দে ভরপুর হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এমন তন্ন তন্ন করিয়া যাঁহারা ভীষণতার

সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হইলেও তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মানুষ, মনুষ্য মধ্যে যথার্থ আর্য্য। ভীষণতা লইয়া যে খেলা করিতে ভালবাসে সেই পৃথিবী লাভ করে—প্রকৃত মানুষ হয়। আট্‌লান্টিকরূপ ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইউরোপ আমেরিকার অন্নভাণ্ডার লাভ করিয়াছে। আর উত্তমাশা অন্তরীপের ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক সাধক ভীষণতা লইয়া খেলা করে বলিয়া সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—মানুষের মধ্যে jelly নয়, লৌহদণ্ডবৎ কঠিন ও শক্ত। ধ্রুব ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাই বিধাতার নিকট হইতে ধ্রুবলোক আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। তান্ত্রিকের শবসাধনাদি বড় ভীষণ সাধনা। বোধ হয়, প্রহ্লাদও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তেমন অষ্টেপৃষ্ঠে দড়—জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, বিষ খাইয়া হজম করে, হাতীর পদভরে ভাঙ্গে না—তান্ত্রিক সাধক না হইলে হইতে পারে কি ? ভবানীর বরপুত্র ছত্রপতি শিবাজী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। আমরা jelly হইয়া পড়িয়াছি—তাই কষ্ট দেখিলে কাতর হইয়া পড়ি, কঠোরতাকে বর্ব্বরতা বলি, আর কঠিন কাজে পশ্চাৎপদ হই। আমাদের দুর্গোৎসব, দুর্গোৎসব নয়, আমাদের দুর্গোৎসব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য—Iliad অপেক্ষা বড়, AEnied অপেক্ষা বড়, Paradise Lost অপেক্ষা বড়, Inferno অপেক্ষা বড়, Jerusalem Delivered অপেক্ষা বড়। এই মহাকাব্য যাহাদের হৃদয়োদ্ভূত, আমরা তাহাদের উপযুক্ত বংশধর নহি। যদি জগতে আবার উঠিতে হয় আমাদিগকে তান্ত্রিক সাধক হইতে হইবে—তান্ত্রিকসাধনায় ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। সে সাধনায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বাড়ে, ওটা ভুল কথা। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্যই সে সাধনা। আমরা বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছি। তাই আমাদের তান্ত্রিক সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদিগকে লোহার সমান কঠিন হইতে হইবে।

আবার ভোরে বাজনা শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিল—অমনই প্রাণ যেন কাঁপিয়া উঠিল—আজ যে বিজয়া দশমী—মা আজ বাড়ী যাবেন। স্নান করিয়া নৈবেদ্য করিয়া দিলাম। কিন্তু আজ নৈবেদ্যের সংখ্যা অল্প, প্রধান নৈবেদ্য একেবারেই নাই—মন বড় খারাপ ; আনন্দের পরিবর্ত্তে আজ ঘোর নিরানন্দ—কিন্তু বড় আনন্দময় নিরানন্দ। আনন্দময়ী তিন দিন—তিন দিন কেন—তিন মাসের অধিক আনন্দ দান করিয়া বাড়ী যাইবেন বলিয়া আজ আনন্দময় নিরানন্দ—আনন্দাত্মক বিষাদ। চণ্ডীমণ্ডপে দর্পণ বিসর্জ্জন

আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকেরা আজ মলিন বস্ত্র পরিয়া গলায় কাপড় দিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। কর্ত্তারা বৈঠকখানা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছেন—আটচালায় অসংখ্য গ্রামবাসী গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয়ের গলা বড় মিষ্ট ছিল, এবং অনুরাগভরে কথা কহিলে সে গলা একটু কাঁপিত। সেই মিষ্ট গলায় ঈষৎ কম্পিত স্বরে ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন :

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥

মন্ত্র শুনিয়া সকলেরই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সকলেই ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কচি মেয়েটি বিবাহের পর দিন যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন বিবাহবাড়ীতে কেবলই যেমন ফোঁস ফোঁসানি, আজ বিজয়া দশমীর দিন বাঙ্গালীর বাড়ীতে তেমনই কেবল ফোঁস ফোঁসানি। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তো আমাদের দেবী নহেন, আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের সতীসাধ্বীদের গর্ভের সন্তান। তাই ত আজ বৈকালের সেই অপূর্ব্ব, অননুভবনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয় ব্যাপার। মায়ের প্রতিমা নদীতে নিক্ষেপ করিবার সময় হইয়াছে। প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আটচালায় নামান হইয়াছে। পুরুষেরা বাটীর বাহিরে গিয়াছেন—ঢাকী ঢুলী বাটীর বাহিরে গিয়া বিসর্জ্জনের বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। সদর দরজা বন্ধ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা মাকে বরণ করিতে আসিয়াছেন। জলের ঝারা দিয়া তাঁহারা প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার পর মাকে বরণ করিলেন। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের, লক্ষ্মীঠাকুরাণীর, সরস্বতীর, গণেশের, কার্ত্তিকের, সিংহবাহিনীর সিংহের, মায়ের বর্ষাবিদ্ধ অসুরের পর্য্যন্ত মুখে সন্দেশ গুঁড়া করিয়া এবং ছেঁচাপান টিপিয়া টিপিয়া দিলেন, এবং প্রত্যেককে মাথার দিব্য দিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আবার আসিতে বলিলেন, সর্ব্বশেষে আপন আপন বস্ত্রাঞ্চলে সিংহটি অসুরটির পর্য্যন্ত প্রত্যেকের পদধূলি পরম পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেন—তাহার পর আবার কাঁদিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে আমার মা প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চল পাতিলেন, আমার পিতা সম্মুখ দিক হইতে তাহাতে কনকাঞ্জলি অর্থাৎ থালা শুদ্ধ চাল ও টাকা ফেলিয়া দিলেন। তখন পুরুষেরা প্রতিমা নদীতীরে লইয়া গেলেন। আচার্য্যদিগের নদীতে চিরকাল আমাদের প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়। সেই নদীতীরে

প্রতিমা বসান হইল। অনেকক্ষণ রাখা হইল। কারণ নদীর অপরপারে অনেক স্ত্রীলোক মাকে দেখিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও কাঁদিতেছেন। তাহার পর প্রতিমা নদীর জলে নিমজ্জিত হইল। আমরা বালক—দুই একখানা ডাক খুলিয়া লইলাম। তাহার পর ঢাকী ঢুলী সঙ্গে লইয়া নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাওয়া হইল। ঢাক ঢোল কিন্তু বাজিতেছে না। প্রতি বৎসরই নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়া তবে বাড়ী ফেরা হয়। চিরকাল শুনা আছে যে, বিসর্জ্জনের পর মহাদেব নীলকণ্ঠ পাখীর রূপ ধারণ করিয়া একবার দেখা দিতে আসেন। প্রতি বৎসরই বাগদীপাড়ায় একটা নয় আর একটা গাছে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়াছি। দেখিতে পাওয়া গেলেই ঢাক ঢোল বাজিয়া ওঠে, আর পাখী উড়িয়া যায়। সকলে পাখীকে প্রণাম করিয়া বাড়ীতে ফিরি। বাড়ীতে ঢুকিয়া চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু তখনই আবার আহ্লাদে বুক নাচিয়া উঠে। সে কিসের আহ্লাদ বলি শুন। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর সমস্ত বাঙ্গালার স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ শিশুকন্যা শিশুপুত্র ধনী নির্ধন সকলেই আপন আপন অবস্থানুসারে আজিও নূতন বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে। আমরাও তখন পরিতাম। কিন্তু সে জন্য তখন আমার এত আহ্লাদ হইত কেন? সমস্ত বৎসর ধরিয়া সেই আনন্দোপভোগের প্রতীক্ষায় থাকিতাম কেন, খুলিয়া না বলিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে না। আমি এবং আমার দাদা দ্বারকানাথ আমাদের বাপের দুইটি মাত্র পুত্র ছিলাম। বাবা আমাদিগকে কখন ভাল কাপড় জুতা দিতেন না। আমরা সংবৎসর মোটা কাপড় পরিয়া, মোটা মার্কিন থানের পিরাণ এবং মুড়ি শেলাই চাদর গায়ে দিয়া এবং নাগরা জুতা পায় দিয়া স্কুলে বল, নিমন্ত্রণে বল, সর্ব্বত্রই যাইতাম। কেবল পূজার সময় বাবা আমাদের দুই ভাইকে এক খানি করিয়া ঢাকায় কাপড় ও চাদর, একটি করিয়া সাদা ফুলতোলা কাপড়ের জামা, একজোড়া করিয়া সাদা মোজা এবং এক জোড়া করিয়া জরির জুতা দিতেন। সেগুলি আমরা বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর পরিয়া যাত্রা করিয়া আসিয়া সদরবাটীতে শান্তিজল লইয়া সকলকে প্রণাম করিয়া বেড়াইতাম। সেই কাপড় জুতা পরিবার আনন্দের প্রত্যাশায় সংবৎসর থাকিতাম। তাই আজ বিসর্জ্জন-জনিত অত বিষাদের মধ্যেও অত আনন্দ। চক্ষু বুজিয়া যখন বিজয়া দশমীর কথা ভাবি, তখন সেই অতুলনীয় বিষাদও যেমন, সেই অপরিমিত আনন্দও তেমনই শরীর লাভ করিয়া আবার আমার কাছে আসে, আর তখনকারই মতন আমাকে উৎফুল্ল করিয়া দেয়।

সেটা কত প্রত্যক্ষবৎ বলি শুন। একদিন চক্ষু বুজিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমার স্ত্রী বলিলেন—শুধু শুধু অত হাসি কেন? আমি বলিলাম—শুধু শুধু নয়। ও আমার বাল্যকালের হাসি। স্ত্রী—সে আবার কি রকম? আমি—তবে বলি শুন। আমরা নয়ান চাঁদ দত্তের গলির একটা বাড়ীতে অনেকদিন ছিলাম। তখন ইস্কুলে পড়িতাম। কিন্তু বৃন্দাবন দাদার এমনই শাসন ছিল যে, ইস্কুলে যাইবার সময়ে ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে আমরা সদর দরজার চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে পারিতাম না। একটা রবিবারে বেলা ৮টা কি ৯টার সময় চৌকাঠের উপর বসিয়া আছি, এমন সময় একটি লোক আসিল। কিছু দীর্ঘাকার, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার চক্ষু দুইটি এত বড় যে, ঘুমাইলেও বোধ হয় সমস্তটা বুজিত না। বোধ হয় নেশা করিবার দরুণ তাহার চক্ষু এরূপ হইয়াছিল। কোন্ নেশায় চোখ ওরূপ হয় বলিতে পারি না। নেশাখোর ও ডাক্তারে বোধ হয় বলিতে পারেন। সে প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে তিলকুটো সন্দেশ দিয়া আসিত। সেদিন কিন্তু তাহার হাতে সন্দেশের হাঁড়ি ছিলনা। আমি মনে করিলাম—বোধ হয় সন্দেশের দাম পাওনা আছে, তাহাই আদায় করিতে আসিয়াছে। এমন সময়ে আমার গিরিশ ভায়া আসিয়া তাঁহার সেই স্বাভাবিক উদ্ধত ভাবে বলিলেন—কে হে তুমি, যাও, যাও, যাও। সে কিন্তু গম্ভীরভাবে তাহার সেই মোটা গলায় আধ বোজা চক্ষে উত্তর করিল—চিন্তে পারবে কেন? চিন্তে পারবে কেন? হাঁড়ি নাই যে। হাঁড়ি নাই যে। আমরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। এ সেই হাসি; বুঝিলে? আটচালা জুড়িয়া সপ পাতা হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছেন। ঘোষাল মহাশয় এবং আমাদের কুলপুরোহিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বালিয়াল মহাশয় এবং আমাদের পাড়ার ৺কালাচাঁদ আচার্য্য মহাশয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের মস্তকে মায়ের অর্ঘ্য বুলাইয়া ছোঁয়াইয়া, মায়ের ফুল দিয়া আম্রশাখা দ্বারা সর্ব্বশরীরে শান্তিজল সেচন করিতেন। তাহার পর নূতন দেশী কাগজে নূতন লাল কালি দিয়া নূতন কলমে তিনবার করিয়া এইরূপে দুর্গানাম লেখা হইত।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং   শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং   শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত পর পর দুর্গানাম লিখিত হইত। তাহার পর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিত, তাঁহাদের পায়ের

ধূলা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহাদের সহিত কোলাকুলি করিত। তাহার পর অন্দরে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে প্রণাম করিতাম, এবং তাঁহাদের পায়ের ধূলা লইতাম, তাঁহারাও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং চিরকাল বেঁচে থাক, বিদ্যা হউক, ধন হউক চিরকাল এমনি করিয়া মাকে আনিও, এই বলিয়া আমাদের দাড়িতে হাত দিয়া চুমো খাইতেন। আমরা আর এক যায়গায় যাইতাম, সেখানেও ঐরূপ হইত, এবং রসকরা বা থৈচুর একটু একটু খাইতাম। বাগ্দীপাড়ায়, মুসলমান পাড়ায় এবং চাষাপাড়ায় গিয়াও এইরূপে প্রণাম করিতাম, পায়ের ধূলা লইতাম, হইল বা মিষ্টমুখ করিতাম, আর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। সে যে কি অপূর্ব্ব সুখ, এখনকার লোকে তাহা জানেন না, জানেন না বলিয়াই কাহারও সুখে সুখানুভব, কাহারও দুঃখে দুঃখানুভব করেন না। বঙ্গে বিজয়া দশমী আর হয় না। বঙ্গে সুখে সুখী দুঃখে দুঃখীও আর নাই। বাঙ্গালীর উত্থান বড় কঠিন সমস্যা হইয়াছে। কিন্তু বলি ভিন্ন বল ও বিভব অসম্ভব। তাই সন্ধি বলিদানের কথা বাঙ্গালীকে বলিলাম। ভীষণতায় ভীত হইলে, ভীষণতায় উন্মত্ত না হইলে, আমরা বলি দিতে পারিব না, বলি দিতে না পারিলে বড় হইতেও পারিব না। "শক্তিপূজা" "শক্তিপূজা" করিলে কিছুই হইবে না। বলি দিতে হইবে। বলিই যে শক্তিপূজার সার বস্তু। বলি দিতে শেখ, সন্ধিবলিদানের ন্যায়, ভীষণ বলি দিতে শেখ, তবেই শক্তি লাভ করিবে, নহিলে কিছুই হইবে না। তান্ত্রিক বাঙ্গালীর তান্ত্রিক প্রণালীতে মায়ের পূজা হউক, শক্তি সামর্থ্য সুখৈশ্বর্য্য আসিয়া পড়িবে।

আর একটা আনন্দের কথা বলি। বৈশাখ মাসে ইস্কুলে গ্রীষ্মের ছুটী হইলে বাড়ী যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, কৌশিকী শুষ্কপ্রায়া। নদীতে মাছ ধরিবার সুবিধা। নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত ৪।৫ হাত অন্তর দুইটা মাটীর বাঁধ দেওয়া হইত। তাহাকে আমরা ডেঁ বলিতাম—আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় হইলে নিশ্চয় বলিতাম, ইউরোপে হলাও দেশকে সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ডাইক (dyke) আছে, আমাদের এই ডেঁ শব্দ গ্রিম সাহেবের নিয়মানুসারে তাহারই অপভ্রংশ। দুই বাঁধেই একটা করিয়া ঘুনি বসান হইত। দুই দিক হইতে চুণা মাছ আসিয়া ঘুনিতে ঢুকিত, মধ্যে মধ্যে ঘুনি তুলিয়া তাহা ঝাড়িয়া লওয়া হইত। এইরূপ করিয়া প্রতিদিন ১৷০ মণ ১৷৷০ মণ করিয়া চুণা মাছই ধরা হইত। আর বোয়াল প্রভৃতি বড় বড় মাছ দুই দিক হইতে জোরে আসিতে আসিতে বাঁধের ধাক্কা পাইয়া বাঁধের মধ্যস্থিত স্থানে লাফাইয়া পড়িত। অমনিই চাবিজালে* গ্রেপ্তার

* চাবিজাল কাহাকে বলে, যিনি না জানেন, তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলি আপনি এই পাড়াগেঁয়ে লোকের পাড়াগেঁয়ে কথা না পড়িলেই ভাল হয়।

হইত। কাঁচা তেতুল দিয়া সেই বোয়াল মাছের অম্ল রান্না হইত—তাহা খাইতে অমৃততুল্য হইত—রাশি রাশি খাইতাম, কিছুমাত্র অসুখ হইত না। এখন ইস্কুল পাঠশালায় স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থে পড়িয়া আমরা শিখিতেছি যে এ-মাছ যে মাছ খাইলে অসুখ হয় তাই মাছ খাওয়ায় সেকালের সে বীরত্ব আর নাই। প্রকৃতার্থে স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে স্বাস্থ্যের বড় হানি করিতেছে আর কিছুতে তত করিতেছে কিনা সন্দেহ। ভেঁতে যখন আর বেশী মাছ পড়িত না, তখন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমস্ত নদী গাবান হইত; অর্থাৎ নদীর জল এমনই আলোড়িত করা হইত যে, তলার পাঁক উপরে উঠিয়া পড়িত, সমস্ত জল ঘোলা হইত, আর সমস্ত মাছ তাড়া পাইয়া ভাসিয়া উঠিত। আমরা ছেলেরা নদী গাবাইতাম, আর সেই মাছ ধরিতাম। অধিকাংশই টেংরা মাছ। কিন্তু টেংরার কাঁটার ভয় করিতাম না। টপাটপ ধরিতাম, আর কোঁচড়ে ফেলিতাম। উপরে অসংখ্য চিল উড়িতেছে, জলে অসংখ্য মাছ ছুটিতেছে, আমরা অদম্য সাহসে এবং অসীম আনন্দে একবেলা ধরিয়া পাঁক ভাঙ্গিয়া মাছ ধরিতেছি, আর সেই ডুমুর গাছের তলায় মাকাল ঠাকুরের পূজা হইতেছে। শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত রেল বসিয়াছে। পোড়া রেল রাস্তার জন্য আমাদের সেই ডুমুর গাছটি মারা গিয়াছে। পোড়া পথটা ঐখানে দু'হাত বাঁকাইয়া লইয়া গেলে আমাদের মনে এত ঘা লাগিত না। একটু বিবেচনা করিয়া লোকের প্রিয় বস্তুর প্রতি একটু একটু লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথ নির্ম্মান করিলে উহা এত অভিশাপগ্রস্ত হয় না; লোকের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণও হয় না। কি আনন্দের ব্যাপার, এই বৃদ্ধ বয়সে চক্ষু বুজিয়া তাহা আবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সেই অতুলনীয় নির্ম্মল আনন্দ শরীরী হইয়া আবার আমার কাছে আসিয়া আমাকে কোল দিয়াছে। বিধাতার কি করুণা, মানুষের জন্য তিনি অসীম সুখের কি সহজ, সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তবু মানুষ বলে, জগতে সুখ নাই, কেবলই দুঃখ। মানুষ বড়ই নিমকহারাম, ঈশ্বরে অনস্থাবান্—নহিলে শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখের স্রোতে ভাসিত, আনন্দের ঢেউ সামলাইতে পারিত না। আর কবি—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

এরূপ গান না গাহিয়া গাহিতেন,—

Our sweetes songs are those that tell of purest thought.

বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, যাহাকে Puberty বা যৌবনোদ্ভেদ বলে, তাহা ঘটিলে বুঝিতে পারা যায়, মন মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শৈশবের সে রৌদ্রের সেই রং, উদ্ভিজ্জের সেই রং, বাতাসের সেই সুন্দর শান্তিময় নিশ্বাস আর নাই—অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ সবই যেন মলিন বা আবিল হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুই যেন পূর্ব্বের ন্যায় নিখিরকিচ নাই, সকলেতেই যেন কি রকম একটা খিরকিচ আসিয়া ঢুকিয়াছে। তখন শৈশবের সেই আনন্দে আমার আর কুলাইল না। অন্য আনন্দের স্পৃহা হইল। বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া যত সুখ যত আনন্দ পাইব মনে করিয়াছিলাম—বিবাহ করিবার পর তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সুখ ও আনন্দ পাইলাম। যাঁহার সহিত বিবাহ হইল, তিনি আমাতে এত মিশিলেন যে, তাঁহাকে একদিন না দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়িতাম। এই যে ৪৫ বৎসর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছি, ইহার মধ্যে ২৫ দিন মাত্র তাঁহার কাছ ছাড়া থাকিয়াছি। এই ২৫ দিনের মধ্যে ১৯ দিন তাঁহাকে দেওঘরে রাখিয়া কলিকাতায় আসিয়া ছুটী মঞ্জুর করাইতে লাগিয়াছিল। ২০ দিনের দিন দেওঘরে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে আর দেখি নাই, তাঁহার কেবল কঙ্কালখানা দেখিয়াছিলাম। তবুও ঐ ১৯ দিনে কলিকাতা হইতে তাঁহাকে ১৯ খানা পত্র লিখিয়াছিলাম। যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না বলিয়া আমার ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়াছিলাম। যখন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যাই, তখনও ঠিক তাই করিয়াছিলাম। সে ঋণ আমার শোধ হইয়াছে। তাঁহাতে এত মিশিবার কারণ এই যে, তাঁহার গুণে তিনি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সচরাচর যাহাকে রূপসী বা রূপবতী বলে তিনি তাহা নহেন, কিন্তু তাঁহার মতন মিষ্ট মুখশ্রী আর কোন স্ত্রীলোকের দেখি নাই। সে কেবল তাঁহার গুণের বাহ্য অভিব্যক্তি বলিয়া। তাঁহার কোনও পার্থিব কামনাই দেখি নাই। কখনও আমার কাছে একখানি অলঙ্কার কি একখানি ভাল কাপড় কি নিজ প্রয়োজনে একটি টাকা চান নাই। তীর্থে যাইতে বলিলে, বলেন, তুমিই আমার তীর্থ, আমি তীর্থে যাইব না। তাই সম্প্রতি আমার মেজ মেয়ে, নানুমা, আমার বাড়ীতে আসিয়া গঙ্গাস্নানের কথায় বলিয়াছিল, মাকে একদিনও গঙ্গা নাইতে বা কালীঘাটে যাইতে দেখিলাম না। যখন জয়পুরে ছিলাম, তখন পুষ্কর তীর্থ আমাদের অতি নিকটে, কিন্তু আমার পত্নী সাবিত্রীর মাথায় সিঁদুর দিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন নাই। যখন জয়পুর হইতে ফিরিয়া আসি, তখন এলাহাবাদে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ২ দিন ছিলাম। কিন্তু তখনও তিনি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ডুব দিতে চাহেন নাই। এইরূপ পত্নী পাইয়া আমি চিরজীবন সেই বাল্যকালের নির্ম্মল আনন্দের ন্যায় আনন্দে ভরপুর হইয়া আছি। আমার রোগশোকের এত যে বাহুল্য, তাহাতে আমি সেইজন্য কাতর নহি। আমার পত্নীর সন্তান বলিয়া আমার হরনাথ, আমার প্রকাশনাথ, আমার নানু, আমার বুলা আমার এত প্রিয়। ইহাদের ভালবাসা ভক্তি আর সেবায় আমি চরিতার্থ। ইহাদিগকে সন্তানরূপে

পাইয়া আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে। ভগবান ইহাদিগকে চিরকাল সুখে ও সাধুতায় রক্ষা করুন। ইহাদের সাধুতায় আমি সর্ব্বসুখে সুখী। বিধাতার পৃথিবী সুখে ভরা। আর প্রিয়তমা হইয়াছিল আমার সেই তুলুমা সে আজ কয়মাস মাত্র স্বর্গে গিয়াছে। আমার মহালক্ষ্মীর চক্ষে জল পড়িতেছে। এমন পুণ্যবতীর এমন শোক কেন হয়? কেন হয়, বুঝিয়াছি। আমি মহাপাতকী —আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার এমন শোক, আমার পত্নীর ন্যায় আমার মেয়েগুলিরও ভাল বস্ত্রালঙ্কারের কামনা নাই। ভগবানের অসীম কৃপায় আমার তিনটি পুত্রবধূও সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্যা—ভাল জামা, ভাল অলঙ্কার কিছুই চান না, গরীবের পুত্রবধূর ন্যায় দিনরাত কেবল সংসারের কাজ করেন। বিধাতার কৃপায় আমার তিনটি জামাই এক একটি রত্ন। তিন জনেই অর্থাৎ শ্রীমান উমাপতি, শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রলাল, এবং শ্রীমান আশুতোষ, তিন জনেই সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র, তিনজনেই নিষ্কলঙ্ক। আমার এখন পাঁচটি পুত্র—উমাপতি, জ্ঞানেন্দ্রলাল, আশুতোষ, হরনাথ এবং প্রকাশনাথ। পাঁচটি পুত্রের চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও সর্ব্বপ্রকার সাধুতার জন্য আমি অসীম সুখের অধিকারী। ইহাদের কাহারও ভোগবিলাসের স্পৃহা নাই। হরনাথ কিছু সৌখীন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় পরোপকারপ্রিয় হৃদয়বান উদারচেতা সদালাপী সামাজিক মহামনা বালক আমি আর দেখি নাই। গৃহস্থালী কর্ম্মে প্রকাশনাথ অতুলনীয়। তাঁহাকে মুটেও বলিতে পার, মজুরও বলিতে পার। অল্পবয়সে আশুতোষের ঘাড়ে বৃহৎ সংসারের ভার পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি অতি সাবধানে অতি সুবোধের ন্যায় সেই ভার বহন করিতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল স্বাধীনচেতা পিতার স্বাধীনচেতা পুত্র—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যয়ন প্রিয়; উমাপতি অল্প বয়সে বড় ঘা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনের মাটা শক্ত, তিনি অটল অবিচলিত থাকিতেন। ইঁহারা সকলেই দরিদ্রের মহামনা সন্তানের ন্যায় দরিদ্রতা শ্লাঘার বস্তু মনে করেন, এবং দরিদ্রের ন্যায় মোটা চালচলনে জীবন যাপন করিতে ভালবাসেন। আমার এখন যে পাঁচটি কন্যা আছেন—অর্থাৎ তিন পুত্রবধূ ও দুই কন্যা—ইঁহারা এখনকার মেয়ের মত নহেন; ভাল গহনা, ভাল কাপড়, ভাল জামা, গন্ধদ্রব্য, এই সকলের অভাবে ইঁহারা অসুখী বা অসন্তুষ্ট নহেন, এবং এ সকল থাকিলেও তাহাতে ইঁহাদের একরূপ অনাদর—এই সকল গুণের জন্য আমি ইঁহাদের পাইয়া অনন্ত সুখে সুখী। আমার সুখের কি পরিমাণ আছে? আমার দুইটি বড় নাতিনী—ইন্দুবালা এবং সরযূবালা বা চমু—ইহারাও ইহাদের ঠাকুরমা, মা, খুড়ী জেঠাইয়ের মতন সর্ব্বরকমে নিস্পৃহ—সদাই গৃহকাজে ব্যাপৃত, এবং বুড়ো ঠাকুরদাদার সেবায় নিযুক্ত। আর আমার জামাই-গুলির ন্যায় আমার নাতিনী জামাই, আমার ইন্দুরাণীর পতি, দাদা অমূল্যচন্দ্র মিত্রও

নানাগুণের অধিকারী,—সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক, চরিত্রের বিশুদ্ধতায় বৃথাভিমান-শূন্যতায় এবং চালচলনের নম্রতায় আমার অমূল্যচন্দ্র যথার্থই অমূল্য। আমার নাতিনী সরযূবালা বা চমুরাণীর পতি পঙ্কজভায়া বিশুদ্ধ চরিত ও বিনয়ী এবং শ্রেষ্ঠে শ্রদ্ধাবান্। আমার পৌত্র শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে পিতৃহীন, কিন্তু প্রলোভন-পূর্ণ কলিকাতা সহরে নিষ্কলঙ্ক আছেন। আমার সুখের সীমা নাই। আমি বড় ভাগ্যবান্। আমার উপর বিধাতার বড়ই কৃপা। আমার কর্ম্মফলে দুই চারিটা শোক পাইয়াছি বলিয়া বিধাতার নিন্দা করিলে বা তাঁহার উপর রাগ করিলে আমার নিমকহারামীর সীমা থাকিবেনা, পরকালে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। বিধাতা পরম সুখদাতা—পৃথিবী নানা সুখে পরিপূর্ণ। কে বলে জগতে সুখ নাই! যে বলে, সে সংসারের শত্রু, ভগবানের শত্রু।

চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ভরিয়া গেল, সেই কালীপূজার আনন্দে। দুর্গাপূজা হইয়া গেল, স্কুলের ছুটী ফুরাইল, তবুও কিন্তু আমরা দেশেই রহিয়াছি। কালীপূজা আসিল—কালীপূজার দিন আজো পাঁজো না করিয়া কলিকাতায় আসা হইতে পারে না। পাঁকাটীর আজো পাঁজো ত হইবেই। তাহার উপর একটা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড করিতে হইবে। আজ প্রায় এক মাস কাল ধরিয়া আমরা শুক্‌না তালপাতা কুড়াইয়াছি, এবং ১৫।২০ হাত লম্বা একটা বাঁশে সেইসকল তালপাতায় বাঁধিয়াছি, এবং আমাদের বড় পুকুরের পশ্চিম পাড়ে সেই বাঁশটা পুঁতিয়াছি। আজ কালী-পূজা; সন্ধ্যার পরই পাঁকাটির আঁটি জ্বালাইয়া আঁজো পাঁজো করিয়াছি—আঁজো পাঁজো করিতে করিতে সমস্বরে চীৎকার করিয়াছি:—

আঁজোরে পাঁজোরে বুড়ো বাপ্পারে।
ডাব নারিকেল চিনির পানা খাওরে।

পাঁকাটির আঁজো পাঁজো শেষ করিয়া নাচিতে নাচিতে বড় পুকুরের ধারে গিয়া সেই তালপাতায় আগুন দিয়াছি, শুক্‌নো তালপাতা জ্বলিয়া সমস্ত কৈকালার মাঠ আলোকিত করিয়াছি—কি আহ্লাদ বল দেখি! শুনিতাম মাঠের অপর পারের ডুল্লা প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা সেই ভীষণ আলোক দেখিয়া ভীত হইত। তাহাতেই আমাদের আরও মজা, আরও আহ্লাদ! সেই আহ্লাদ যেন জমাট বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই জমাট বাঁধা এবং শরীরী আহ্লাদের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াছি। তেমনই আর একটা আহ্লাদের কথা বলি শুন। বৈশাখ মাস গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। কালবৈশাখী আরম্ভ হইল। তেমন কালবৈশাখী এখন আর হয় না। দিগন্তব্যাপী কালো মেঘ, তাহার পরেই ঝড়। অমনই মেয়ে পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেরই আঁব বাগানে যাওয়া। ঝড়ে আঁব পড়িতেছে—সেই আঁব কুড়োনো—যত আনন্দের কথা

মনে ওঠে, এ আনন্দ সে সব আনন্দের চেয়ে বেশী। আঁধার আকাশের নীচে আঁধার পৃথিবীতে আঁব পড়িতেছে—দেখা যাইতেছে না। আঁব খুঁজিতেছি, আর চীৎকার করিতেছি,—

খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।

এমন করিয়া কত আঁব কুড়াইয়াছি, বলিতে পারি না। সেই মাছ ধরিবার আমোদ ও আঁব কুড়াইবার আমোদের ঝটকা এত বেশী ছিল যে, সহ্য করিয়া উঠা যাইত না। এই দুইটা আমোদ, আমোদের কালবৈশাখী ছিল। বড় প্রচণ্ড আমোদ। আর একদিন একটা পবিত্র ও প্রশান্ত আমাদের কথা মনে উঠিয়াছিল। সেই পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মাঠে লক্ষ্মীপূজার আমোদের কথা। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙিলে গণ্ডা চারেক গুড়পিঠা বা নূতন গুড়ের পরমান্ন দিয়া কুড়িখানা সরুচাকলি বা সুরভি পয়রা গুড় দিয়া ১০।১২ খানা বাসি লুচি না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইতাম না। সে-দিন কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আমরা ৪।৫ জনে ধানের শীষের এক একটা মোটা আটি বা গোছা হাতে লইয়া মনসাপোতায় যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, রাইপিসী এবং কুড়ুনী দিদি আসন নৈবেদ্য ফুল তুলসী শাঁক ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি সব আনিয়াছেন। একটু বেলা হইলে ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতেন। আমরা আহ্লাদে এত জোরে কাঁসর বাজাইতাম যে, দুই একবার কাঁসর ফাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আমাদের খাওয়া আরম্ভ হইত। একজন ময়রা একটা ধামায় করিয়া নূতন গুড়ের মুড়কী, মোয়া প্রভৃতি বেচিতে আসিত। ধানের শীষের গোছা বা আটি তাহাকে দিয়া আমরা খাবার কিনিয়া খাইতাম, এবং যে সব গরীব বাগ্দীর ছেলে মেয়ে পূজা দেখিতে আসিত, তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। খানিক পরে কুড়ুনী দিদি আমাদিগকে চড়ুইভাতি রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। যে বালক চড়ুইভাতির আমোদ উপভোগ না করিয়াছে তাহার জন্ম বৃথা হইয়াছে। সেই জন্যই ত নিম্ন-পাঠে চড়ুই-ভাতির কথা লিখিয়াছি। এক একদিন সেইরূপ আর একটা আমোদে মন ভরিয়া উঠে। শীতকালের প্রত্যুষে খেজুর রস খাইবার আমোদ। কালকেতুসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ষণ্ডা পরাণ মাল খেজুর গাছ চাঁচিয়া রস সংগ্রহ করিত। ভোরে কামারদের বাড়ীর সম্মুখের খোলা জায়গায় পরাণ সমস্ত রাত্রের রসে জাল দিত। সেই মিহি, অনির্ব্বচনীয় সৌরভে দশখানা গ্রাম মাতিয়া উঠিত। আমাদেরও ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমরা মুড়ি এবং দুই একটা করিয়া ঘটি ও বাটি লইয়া সেইখানে গিয়া আগুন পোহাইতাম, এবং তাতরসিতে মুড়ি ভিজাইয়া মহা আনন্দে খাইতাম। গ্রামের বিস্তর লোককে সেখানে দেখিতাম। তাহারা তামাক খাইত, আর নানা কথা কহিত। এখন বোধ হয় যে, তাহারা সেইখানে আগুন পোহাইতে পোহাইতে মনের

মুখে oillage politics অর্থাৎ দলাদলি প্রভৃতির আলোচনা করিত। পরাণ বড় ভাল লোক ছিল। আমাদিগকে বিস্তর রস দিত; আমরা ঘটি বাটি করিয়া তাহা বাড়ীতে আনিতাম। এই ব্যাপার মনে করিয়া আমার নিম্নপাঠে রামধনের খেজুর রস, এই নামের একটা পাঠ দিয়াছি। পরাণ মালের কথায় আর একটা আনন্দের কথা আর একদিন মনে উঠিয়াছিল। আমি যখন শিশু, তখন কর্ত্তারা বাগবাজারের ৺রাজীবলোচন দত্তের বাড়ীতে থাকিতেন। কি সূত্রে থাকিতেন, জানি না; তাঁহাদিগকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসা করা বালকের বেয়াদবি মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর অতি নিকটে এক কলুর বাড়ী ছিল। সেখান হইতে আমি প্রতিদিন তেল নুন কিনিয়া আনিতাম। এই কারণে কলুর সহিত ভাব হইয়াছিল। কলু বেশ মানুষ; আমাকে তাহার ঘানি-গাছে বসিয়া ঘুরিতে দিত। সেটা ভারি একটা আমোদ ছিল। আমাদের কৈকালার পাশেই চোতাড়া গ্রাম। তখনকার খাঁটী সরিষার তেলের রং যেমন ছিল কটা কলুর গায়ের রংও তেমনি ছিল। তাই তাহাকে কটা কলু বলা হইত। তেল আনিবার জন্য তাহার বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতাম। সেও আমাকে তাহার ঘানি-গাছে বসিয়া ঘুরিতে দিত। ভারি আনন্দ। এইরূপে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহাতে বড় সুখ; আমার মনে সেই সুখের স্মৃতি বড় প্রবল বলিয়া সিমলার বাজারে এখনও বাজার করিবার সময় চাষীদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া থাকি। দেখি, তাহারা সুন্দর লোক, আলাপ করিলে কত কথাই কয়, কত সদ্ব্যবহারই করে। তাহাদের জন কয়েকের নাম না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না,— যুধিষ্ঠির, গয়ারাম, ভুলু, অধর, অঘোর, নিবাস বক্সী, তিনকড়ি, ঈশান। গয়ারাম বড়ই ভাল মানুষ কিন্তু বুড়া হইয়া বাজারে আসিতে অসমর্থ হইয়াছে। তাহার পুত্র নগেনটি বড় ভাল ছেলে—বাপের বেটা বটে, কিন্তু তাহাকেও ৫।৬ মাস বাজারে আসিতে না দেখিয়া বড় ভাবিত হইয়াছি। নিবাস গয়ারামেরই ন্যায় ভাল মানুষ। ভুলু কখনও মন্দ জিনিস ভাল বলিয়া বেচে না, ভাল জিনিস না থাকিলে আমাকে স্পষ্টই বলে—আপনাকে দিবার মতন জিনিস আজ নাই। তাহারা আমাকে নমস্কার করে। আমিও তাহাদিগকে নমস্কার করি। যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করিলে সে একদিন একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল—বলিয়াছিল সে কি? আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, নমস্কার করিতেছেন কেন? আমি বলিলাম,—দেখ যুধিষ্ঠির! সকলেরই ভিতর ভগবান আছেন। অতএব সকলেই সকলকে নমস্কার করিতে পারে। পাঁচ বছরের ছেলেকেও নমস্কার করিতে পারা যায়। বোধ হয়, যুধিষ্ঠির কথাটা বুঝিয়াছিল। সেই অবধি নমস্কার করিলে আর কিছু বলে না।

হাসিতে হাসিতে আমাকেও নমস্কার করে। আর ভাল জিনিস যাহা থাকে, তাহা আমাকে দেখায়। এই সকল মূর্খ সাদা সরল লোকের সহিত সদালাপে বড়ই সুখ হয়।

আর পরীক্ষান্তের সেই আমোদ কি বিশুদ্ধ, কি মর্ম্মস্পর্শী। পরীক্ষার বহু পূর্ব্ব হইতে কেবলই পড়িতেছি, পড়িয়া পড়িয়া ক্লান্ত, তবু একটু বিশ্রাম নাই—কাহারও সঙ্গে দুইটা কথা কহি; অথবা দিবসে দুই পা বেড়াই, এমন অবসর নাই। না খাইলে নয়, তাই মৌনীর ন্যায় খাই; না শুইলে নয় তাই শুই, শুইয়াও কেবল সেই পড়ার কথা ভাবি। আমি প্রতিদিনই সমস্ত পঠিত বিষয়ের আদ্যোপান্ত পুনরালোচনা করিতাম। তাই ঘরে পড়ার সুব্যবস্থার জন্য আমার একখানি রুটিন থাকিত; যথা,— প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ইতিহাস। ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভূগোল। ৮টা হইতে ৯॥০ পর্য্যন্ত ইংরাজী—তাহার পর স্নানাহার ও কলেজ গমন। বৈকালেরও ঐরূপ নিয়ম ছিল। ইহার এক চুল এদিক্ ওদিক্ করিতাম না। সন্ধ্যার পর মহা ধুমধাম করিয়া বাড়ীর সুমুখ দিয়া একটা বর গেলেও তাহা দেখিবার জন্য এক মিনিটের জন্যও বই ছাড়িতাম না। এই প্রণালীতে পড়িতাম এই জন্য যে, আমার একটা সঙ্কল্প ছিল যে, যখনই পরীক্ষা দিতে বলিবে, তখনই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব, দু'ঘণ্টা পরে পরীক্ষা দিতে হইলেও পশ্চাৎপদ হইব না। প্রতিদিনই এইরূপে পড়িবার কয়েকটি সুবিধা দেখিতাম। আমাকে কখনও রাত্রি জাগিয়া বা midnight oil পোড়াইয়া পড়িতে হইত না। তখন সন্ধ্যার পর ৯টার সময় তোপ পড়িত। তোপ পড়িলেই আমি শুইতে পারিতাম। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পাঠ করিলে পাঠে যে স্বল্পাধিকার অবশ্যম্ভাবী, আমার বোধ হয়, তাহা ঘটিত না। পরীক্ষার্থ পাঠ্য নয় এমন অনেক পুস্তক পড়িবার সময়ও পাইতাম। আমার পাঠের প্রণালীর আর একটি লক্ষণ ছিল। আমি important unimportant দরকারী অদরকারী প্রভেদ করিয়া পড়িতাম না, সমস্তই important দরকারী ভাবিয়া সমস্তই পড়িতাম। এই জন্য পরীক্ষা গৃহে কোন প্রশ্ন দেখিয়া হাঁ করিয়া ভাবিতে হইত না, এটা আবার কি। অত কম বয়সে ওরূপ প্রভেদ করাও নিরাপদ নয়। আর যে কেহ ওরূপ প্রভেদ করিয়া দিলেও তাহা মানিয়া লওয়া সমীচীন নয়। পরীক্ষার কয়দিন সন্ধ্যার পর ৮টার সময় শুইতে পারিতাম। আর সম্বৎসর রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া ২ ক্রোশ ২॥ ক্রোশ বেড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের সময় বাড়ীতে ফিরিতাম। have not for tomorrow what can be done today—আজ যে কাজ করিতে পারা যায়, কাল করিব বলিয়া তাহা রাখিয়া দিও না পাঠোদ্দেশ্যতেও এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতাম, চাকরী করিবার সময়ও করিতাম। করিয়া দেখিয়াছি, কি পড়ায়, কি কর্ম্মকাজে কৃতকার্য্য হইবার এমন অব্যর্থ উপায় আর

নাই। মাসের পর মাস এইভাবে চলিতেছে, আর যেন পারা যায় না,—মনে হয়, আর না, পরীক্ষা দিব না,—এত কষ্ট আর সহ্য হয় না, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করে। পরীক্ষার কয়দিন কি কষ্টে, কি ভয়ে গেল, বলা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল, আর বুঝা গেল, পরীক্ষা মন্দ দেওয়া হয় নাই, সেদিনের সেই আনন্দ কত গাঢ়, কত গভীর, কত নির্ম্মল, কত ব্যাপক,—তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী যেন আমারই ন্যায় বন্ধনমুক্ত, আহার নিদ্রা যেন নূতন জিনিস, কত মিষ্ট, কেমন স্বেচ্ছাধীন! যে সে আনন্দ অনুভব করিয়াছে, কেবল সেই তাহার ধ্যান ধারণা করিতে পারে। ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পুস্তকাগার ছিল, সেই ঘরে আমাদের এম. এ., পরীক্ষা হয়। পরীক্ষক ছিলেন Lobb সাহেব, এবং Macrindle সাহেব। পরীক্ষার শেষ দিনে প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল,—on the causes of the comparative moderation with which the English Revolution of 1688 was on the whole affected. বুঝিয়াছিলাম, প্রবন্ধ মন্দ লেখা হয় নাই। পূর্ব্বের কয়দিনের লেখাও মন্দ হয় নাই। তাই শেষ দিন কাগজ দিয়া চলিয়া আসিবার সময় ঘরের ভিতরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম—"হরিবোল দাও।" কি আনন্দ বল দেখি! বুড়া বয়সে আবার ঠিক সেই যৌবনের আনন্দ! কম সৌভাগ্য কি! বিধাতার কি কম কৃপা! আর একদিন চোখ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে আর একটা সুন্দর কথা মনে উঠায় আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। ইস্কুল কলেজের ছুটীতে যখন দেশে থাকিতাম, তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর খানিক ঘুমাইতাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতাম, অনেকগুলি প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা আমার ঘরে বসিয়া আছেন। আমার কাছে কৃত্তিবাস কাশীদাস, কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি শুনিবার জন্য তাঁহারা প্রতিদিন আসিতেন। আমাকে সুর করিয়া পড়িতে হইত। চোখে মুখে জল দিয়া কাঠাখানেক মুড়ি এবং একতাল মোহনভোগ খাইয়া আমি পড়িতে আরম্ভ করিতাম, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িতাম। তাঁহারা আমার পড়ার খুব তারিফ করিতেন, তাহা শুনিয়া আমিও যে একটু ফুলিয়া উঠিতাম না, এমন নয়! জটিলা কুটিলার দর্পনাশের কথা শুনিয়া তাঁহাদের ভারি উল্লাস হইত। বলিতেন,—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, সতীত্বের আবার নাড়া কি না! জানিস না মরবে মেয়ে, উড়বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, আমাদের রোজ রোজ শুনাইও চাঁদ। আমিও রোজ রোজ শুনাইতাম। তাহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইত। চোখ বুজিয়া এখনও সেই আনন্দ ভোগ করিবার কোনও বাধাই দেখি না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ হয়, আমার জননীকে সকাল সন্ধ্যায় সেই সেকালের গঙ্গার বন্দনা সুর করিয়া পড়িয়া শুনাইবার কথা মনে করিয়া। ঐ বন্দনার ন্যায় সুন্দর

জিনিস বাঙ্গালায় আর দেখি নাই, উহা যথার্থই বাঙ্গালীর লেখা বাঙ্গালা কবিতা। কোটী কোটী বাঙ্গালী নরনারীর চিরপোষিত আন্তরিক আশা আকাঙ্ক্ষা উহাতে অতি সহজ, অতি সাদা, অতি সরল, অলঙ্কারশূন্য, আস্ফালন বর্জ্জিত ঘরের ভাষায় ব্যক্ত। ঐরূপ কবিতাই বঙ্গের জাতীয় (National) বা স্বদেশী কবিতা। এখনকার রচনা হইলে উহা অসীম, অনন্ত, উত্তাল, অভ্রভেদী, কূলপ্লাবী, ঊর্ম্মি, হিমাচল প্রভৃতি লোকসাধারণের—বিশেষতঃ বঙ্গমহিলার অচেনা শব্দের দাপটে একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস হইত। এইরূপ কবিতা পড়িতে পড়িতে অর্থাৎ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, গঙ্গার বন্দনা প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এ সকল আমাদের ঘরের কথা, ঘরের লোকের দ্বারা ঘরের ভাষায় লিখিত। মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা, নানা গুণ সত্ত্বেও, যেন আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা নয়। সুতরাং মাইকেলের, হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে বাঙ্গালী নরনারীর অন্তরের কথা নাই, যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা দেখি না। তাই বলি, তাঁহাদের কবিতা বাঙ্গালীর জাতীয় (National) কবিতাও নয়, স্বদেশী কবিতাও নয়; সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কথা, বাঙ্গালী ভক্তের কবিতাও নয়। বঙ্গে এখন আর ভক্ত জন্মিতেছে না, রামপ্রসাদের পর ভক্ত হয় নাই বলিলেই হয়। একবার মাত্র দুই দিনের জন্য কেবল পরমহংসদেব দেখা দিয়াছিলেন। সুতরাং মর্ম্মস্পর্শী কবিতা বা গান আর রচিত হইতেছে না। একটা গল্প মনে পড়িল। বঙ্কিম দাদা হুগলীর ডিপুটী। ঘোড়াঘাটের উপর তাঁহার বৈঠকখানা। একদিন সেইখানে বসিয়া বলিয়াছিলেন—মাইকেল পড়িলাম, ভাল লাগিল না। হেম পড়িলাম, ভাল লাগিল না। তখন শুনিলাম, এক ডিঙ্গীওয়ালা ডিঙ্গী বাহিয়া যাইতেছে, আর গাহিতেছে,—"সাধ আছে মা মনে, দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে।" গান বড় ভাল লাগিল। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের সংস্কার সাধন করিতে হইলে, উহাতে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইলে, বাঙ্গালা গান বদলাইতে হইবে, নূতন করিয়া গান রচনা করিতে হইবে। নব্য বাঙ্গালায় এখনও জাতীয় এবং স্বদেশী কবিতা লিখিত হয় নাই। এখনও কেবল বিজাতীয় বিদেশী কাব্য ও কবিতা লিখিত হইতেছে। যখন দেখিব, বঙ্গের নূতন কাব্য বা কবিতায় সুপরিচিত ঘরের কথা দেখিয়া দোকানী পশারী পর্য্যন্ত গাছতলায় বসিয়া কাশীদাস, কৃত্তিবাস যেমন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তেমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বুঝিব, বঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় ও স্বদেশী কাব্য বা কবিতা লিখিত হইতেছে। সাহিত্য যখন মূর্খের মন পর্য্যন্ত অধিকার করে, তখনই উহা শক্তিস্বরূপ হইয়া সমস্ত জাতির মনে শক্তি সঞ্চারিত করে, তাহার আগে করে না। আমাদের কাশীদাস ও কৃত্তিবাস বহুকাল শক্তিরূপ ধারণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, সকলকেই অধিকার করিয়াছেন। মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার এবং কুরুক্ষেত্র, এখনও শক্তিশালী হয় নাই। কখনও হইবে কি না সন্দেহ। আর যাঁহারা "জানালার ধারে", "কপাটের ফাঁকে", "পর্দ্দার আড়ালে", "আকাশ পানে", "আর বলিব না" প্রভৃতি উদ্ভুটে নাম দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লেখেন, তাঁহাদের কূল কিনারাই খুঁজিয়া পাই না। এইরূপ কবিতা, এমন কি মাইকেল প্রভৃতি পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতে মনে হয়,—এসব বাহিরের লোকের লিখিত বাহিরের কথা, কৃত্তিবাসাদির ন্যায় এবং সেই গঙ্গার বন্দনাদির ন্যায় ঘরের লোকের লিখিত ঘরের কথা নয়। বাহিরের কথা লিখিলে যে মহাপাতক হয় তাহা নয়; কিন্তু বাহিরের কথা ঘরের কথার মতন করিয়া না লিখিলে মহাপাতক হয় বৈ কি। বাঙ্গালা সাহিত্য যখন এখনও বৈদেশিকতায় পরিপূর্ণ, তখন কেমন করিয়া বলি যে, বাঙ্গালী স্বদেশভক্ত ও স্বদেশপ্রিয় হইয়াছে? কাজেই বলিতে হয়, এই যে স্বদেশী সুর শুনা যাইতেছে, ইহা জোর করিয়া গাওয়া সুর। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও বৈদেশিকতার বিরাট মূর্ত্তি দেখিতেছি। তাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় এখনও বঙ্গে হয় নাই। বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। কাজেই যে সকল মহিলাকে কৃত্তিবাসাদি পড়িয়া শুনাইতাম, তাঁহাদের মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী থাকিতেন না। এখন তিনি নিজে একটু একটু পড়েন। বলেন রামায়ণ, মহাভারত যতবারই পড়ি, ততবারই ভাল লাগে। অন্য বই একবার পড়িলে আর ভাল লাগে না। এইজন্য আমার অন্দর মহলে, অর্থাৎ যেখানে আমার পত্নীর প্রভুত্ব, সেখানে নবেলের বড় একটা দৌরাত্ম্য নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর তিনি কিছু বিরক্ত। বোধ হয় স্কুল কলেজে পড়া স্ত্রীলোক ছাড়া অপর সকল স্ত্রীলোকই কিছু বিরক্ত। আমারও উহা মিষ্ট লাগে না। আমার মনে হয়, ঐ ছন্দে কবিতা লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়া গিয়াছেন। সেই সেকালের পয়ার ও ত্রিপদী আমার বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু এখন ঐ সকল সোজা সরল ছন্দ কিছু ঘৃণিত, মূর্খের ছন্দ বলিয়া উপেক্ষিত। হেমচন্দ্র মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের হেঁপায় না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বৃত্রসংহারখানা পয়ারে লিখিয়া বঙ্গে যথার্থই বাঙ্গালীর প্রিয় বাঙ্গালা কাব্য একখানা রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্যখানাকে বাঙ্গালী জাতীয় (National) এবং স্বদেশী কাব্যজ্ঞানে পুলকিত হইত। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান এবং দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য পুরাতন ছন্দে লেখা। পড়িতে পড়িতে সকলেই আমাদের ঘরের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা বলিয়া অনুভব করে। রঙ্গলালের কাব্যে হিন্দু রমণীর সতীত্বরক্ষার্থ আপন প্রাণ বিসর্জ্জনের কথা সেকালের ধরণে লিখিত হইয়াছে। আর সুরধুনী কাব্যের ত কথাই নাই। আমাদের

গঙ্গামায়ের উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত মায়ের যে কূলে যত স্থানে আমাদের ধনধান্য বিদ্যালয় অতিথিশালা পণ্ডিতসমাজ দেবালয় রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শিবমন্দির প্রভৃতি বিশাল হিন্দু সভ্যতার অগণ্য নিদর্শন আছে, আমাদের ঘরের কথায় তাহার অপূর্ব্ব বিবরণ দেখিতে পাই। যথা,—

(১)

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরী বাণিজ্য বাহন,
সরিষা, মসিনা, মুগ, কলাই মসুরি,
চাল, ছোলা বিরাজিত দেখি ভূরি ভূরি।

(২)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যার ভাণ্ডার,
লোকাতীত মেধামতি অতি চমৎকার।

(৩)

অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণবসুন্দরী,
বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্যধামে,
সেবা হেতু জমিদারী লেখা তাঁর নামে,
সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর
অতিথির বাস জন্য বহুবিধ ঘর॥

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যালয়, অতিথিশালা, দেবালয়, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের সভ্যতার সমস্ত ইতিহাস এই সুরধুনী কাব্যে দেখিয়া মোহিত ও উল্লসিত হইতে হয়। একটা নদীর ধারে একটা বিরাট জাতির বিরাট ইতিহাস চিত্রিত—একি সামান্য জিনিস! মনে হয়, যেন আমাদের ঐশ্বর্য্যরূপিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মায়ের দুই কূল আমাদের বিপুল সভ্যতা দ্বারা বাঁধানো। আর মা আমাদের উচ্ছ্বসিত প্রাণে যখন সেই বাঁধ ছাপাইয়া যান, তখন মাঠকে মাঠ, গ্রামকে গ্রাম, জেলাকে জেলা মায়ের সোনার জলে ডুবিয়া যায়, আর যথাসময়ে সেই জল সুবর্ণ বর্ণের শস্যরাশিতে পরিণত হয়। এমন মা কি আর কাহারও আছে! যেরূপ মায়ের দুইটি কূলমাত্র দেখিয়া সকলেরই একটা বৃহৎ বৃহৎ সভ্যতার প্রকৃতি বুঝিতে পারে, সেরূপ মা কি আর কাহারও আছে! ঘরের কথায় পুণ্যাত্মা সুরধুনীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দীনবন্ধু অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ধিক আমাদের, আমরা তাঁহার নাটক লইয়া উন্মত্ত, কিন্তু সুরধুনী কাব্য পড়ি না। সুরধুনী কাব্য কেবল

কাব্য নয়, ভারতবর্ষের অমন সজীব, সুন্দর সংক্ষিপ্ত পবিত্র ইতিহাস আমি ত আর দেখিতে পাই না!

সুরধুনী কাব্যের কথায় আমার স্বর্গীয়া মাতৃরূপিণী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা মনে হইল। তাঁহারও নাম ছিল সুরধুনী। মায়ের আদর, মায়ের স্নেহ, মায়ের যত্ন, মায়ের সোহাগ তাঁহার কাছে পাইতাম। মনে মনে এখনও পাই। আমার সৌভাগ্যবলে দিদি আমার শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আমার মেজ ভগ্নী মন্দাকিনী অতি নিরীহ সরল প্রকৃতি ছিল। সাত কাহাকে বলে, তাহাও সে জানিত না, পাঁচ কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেও শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিল। এখন কেবল আমার কোলের বোন বরদাসুন্দরী আছেন। তিনি কোন্নগর-নিবাসী ডাক্তার অমৃতলাল দেবের পত্নী। তিনি বড় বুদ্ধিমতী। আমার পূজ্যপাদ বন্ধু ডাক্তার প্রাণধন বসু তাঁহার বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার ভগ্নীর মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আমি দেখি নাই।" কিন্তু অমৃতভায়া বহুমূত্র রোগে আমারই মত জীর্ণ হইয়াছেন। কখন আছেন, কখন নাই বলা যায় না। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার বরদাসুন্দরীও যেন আমার অপর দুই ভগিনীর ন্যায় শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

আমাদের শেষ পয়ার-প্রিয় ছিলেন অক্ষয়ভায়ার সর্ব্বজন সম্মানিত স্বর্গীয় পিতা রামসাগর গঙ্গাচরণ। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি। আর মনে করিলে সেই রকম কবিতা লিখিতে পারেন অক্ষয়ভায়া নিজে। বিশেষ, বঙ্গ ও বাঙ্গালী তিনি যেমন জানেন ও বোঝেন ও ভালবাসেন, তেমন আর কেহ নহে। সুতরাং মনে করিলে তিনি বঙ্গের কথা অতুলনীয় কবিতায় লিখিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে করিবেন বলিয়া আমার আশা নাই। এ জন্মটা তিনি ঘটি ঘটি জল খাইয়া এবং লম্বা লম্বা ঢেঁকুর তুলিয়াই কাটাইয়া দিলেন। পদ্যে রবীন্দ্রনাথের অসাধ্য কিছুই নাই। কি জানি কেন, আমার এখনও কিন্তু মনে হয় যে, তিনি বাঙ্গালার ঘরের কথা এবং মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন না। তিনি বাঙ্গালা কবিতাকে জাতীয় ও স্বদেশী করিয়া তুলিবেন বলিয়া আশা হয় না। এক অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন, এবং পাঁতি পাঁতি করিয়া দেখেনও বটে। কিন্তু তাঁহার বিরাট আলস্যের কথা কথা মনে হইলে তাঁহার কাছে যাইতে সাহস হয় না। তাঁহার বঙ্গপ্রিয়তার কথা একদিন কহিবার ইচ্ছা আছে। কহিতে পারিব কিনা, জানি না। অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় যে অতলস্পর্শ।

আমার বড়াই করিবার কথা একটা আছে। কথাটা সর্ব্বদাই মনে হয়, আর মনে হইলেই আনন্দ এবং একটু অহঙ্কারও হইয়া থাকে। আমার বয়স যখন ১২ কি ১৩ বৎসর, তখন আমাকে একবার কৈকালা হইতে একক কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাস, অল্প শীত পড়িয়াছে। প্রাতে বেলা ৯টার সময় ভাত খাইয়া রওয়ানা হইলাম। মাকে ছাড়িয়া আসিতেছি, এবং সঙ্গে কেহ নাই, নিতান্ত একলাটি আসিতেছি, এইজন্য মন বড় বিষণ্ণ। কিন্তু ইস্কুলের ছুটী অনেকদিন ফুরাইয়াছে, বাবা বারবার কলিকাতায় আসিতে লিখিতেছেন, সুতরাং বুক বাঁধিয়া আসিতেছি। আসিব বৈদ্যবাটী স্টেশনে—কৈকালা হইতে পাকা ৮ ক্রোশ। বেলা ২৷৷•টার সময় বৈদ্যবাটী স্টেশনে গাড়ী আসিবে। তাহাতেই কলিকাতায় আসিব। বৈদ্যবাটীতে বেলা ১টার পরেই আসিলাম। দোকানে বসিয়া রহিলাম এক ঘণ্টার কম নয়। তাহার পর গাড়ি আসিলে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। চারি ঘণ্টায় পাকা ৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়াছিলাম। ১২ বছরের বালকের পক্ষে এটা একটা বিক্রম বলিয়া মনে করিয়া একটু অহঙ্কার অনুভব করি। অন্যায় করি কি! এখনকার বয়স্কেরা চারি ঘণ্টায় ৮ ক্রোশ হাঁটিতে পারেন কি?

আর একটি কথা মনে হইলে বড়ই বিমল আনন্দ অনুভব করি। Branch Oriental Seminary-তে পড়ি। বয়স ১৪ বৎসর। আমাদের শ্রেণীতে একটি নূতন মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। Main ইস্কুলের হেডমাষ্টার স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় অর্থাৎ Star থিয়েটারের অমৃতলালের পিতা শিক্ষকটিকে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সব ভাল, কিন্তু বয়স বড় কম। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড় এমন অনেক দুর্দ্দান্ত ছেলে আমাদের শ্রেণীতে পড়িত। তাহারা নূতন শিক্ষকের শত্রুতা করিতে লাগিল। ইহা নয় যে, তাহাদের অপেক্ষা কম বয়সের লোক তাহাদের শিক্ষকতা করে। তাহাতে তাহাদের লজ্জাবোধ হয়। সেইজন্য তাহারা তাঁহাকে নানারূপে জ্বালাতন করিতে লাগিল। আহিরীটোলার ছেলেদের দুষ্ট বলিয়া অখ্যাতি ছিল। শিক্ষকটির নাম মনে নাই—বোধ হয়, সারদা। তিনি পড়াইতে আসিলেই বিদ্রোহী বালকগুলি গোল করিয়া তাঁহাকে পড়াইতে দিত না। তিনি এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছিলেন। আহা, বেচারা একদিন এণ্ট্রান্সের সার্টিফিকেটখানি আনিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন, এণ্ট্রান্সের সার্টিফিকেটে তত লেখা এখন থাকে না; তখনকার সার্টিফিকেট foolscap কাগজের আধখানা ছিল, খরচ কমাইবার জন্য এখনকার সার্টিফিকেট এক চিলতে কাগজ—দেখিলে অশ্রদ্ধা হয়। বোধ হয়, আশা করিয়াছিলেন যে, উহা দেখিলে সকল ছেলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। বিদ্রোহীরা তেমনই বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার মুখ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। আমি অনেককে বুঝাইলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি কৈলাসবাবুকে জানাইলেন। কৈলাসবাবু আমাদের ক্লাসে আসিলেন। কে বিরুদ্ধাচরণ করে। আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলাম, আমার উপর বড় বড় কটাক্ষ পড়িতে লাগিল। আমি কিন্তু নির্ভয়ে তাহাদের নাম বলিয়া দিলাম। কৈলাসবাবু গোঁপের বাম প্রান্ত কামড়াইতে কামড়াইতে চলিয়া গেলেন। এক মনে চিন্তা করিবার সময় ঐরূপ করা তাঁহার রীতি ছিল। দণ্ডের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু তাহার পর দিন হইতে গরীব শিক্ষকটিকে আর কেহ বিরক্ত করিল না। বুঝিলাম একটি অতি সুশিক্ষিত কর্ত্তব্যপরায়ণ অন্নহীনের অন্ন বজায় রহিল। এরূপ না হইলে তাঁহাকে ছেলেগুলোর জ্বালায় চাকরী ছাড়িয়া পলাইতে হইত। আর তাঁহাকে সেই বিপদে রক্ষা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ করিতে পারিয়াছিলাম মনে হইলে এখনও কি একটা আনন্দ জন্মে, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আমার মনই জানে, সে কি আনন্দ! আর জানেন সর্ব্বসুখদাতা বিধাতা। তাই মনে হয় যে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া যখন পরলোকের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইব, তখন বোধ হয় সেখান হইতে আমাকে বিতাড়িত হইতে হইবে না। হইলেই বা কি করিতে পারিব? যাহা ঘটিবে, তাহাই কর্ম্মফল বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই যে আত্মপ্রসাদটুকু, এটুকু বোধ হয় মারা যাইবে না। না গেলেই আমার যথেষ্ট হইবে। তাহার বেশী পাইবার অধিকার বা প্রয়োজন আমার আছে, এরূপ বিশ্বাস বা ধারণা আমার এ পর্যন্ত নাই।

আর একদিন চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে মাধব কাকার সেই খাওয়ার কথা মনে হইল। আমাদের পাড়ায় মাধবচন্দ্র বসু এবং ঈশানচন্দ্র বসু নামে আমার দুই কাকা ছিলেন। কাকারা এবং কাকীরা আমাদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতাম, গল্প করিতাম, মুড়ি চালভাজা খাইতাম, ইত্যাদি। একদিন সন্ধ্যার সময় গিয়া শুনিলাম যে, আজ মাধব কাকা দিগম্বর দাদার সঙ্গে বাজি রাখিয়া নাকি ১ সের ময়দার রুটী খাইবেন। নাকি ২ সের ময়দার রুটী হইল। প্রতি সেরে ৪১॥ খানা করিয়া মাঝারি রুটী হইল। মাধব কাকা ১ সের ময়দার রুটী খাইতে বসিলেন। বাকী /১ সের ময়দার রুটীতে আমাদের ৫।৭ জনের জলযোগ হইল। রুটীর সঙ্গে মাধব কাকা পোয়া তিনেক দুধ, খানিকটা গুড়, আর আধসের আড়াই পোয়া তরকারি লইলেন। দুধে খান আষ্টেক রুটী ফেলিলেন। তারপর খাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন অর্দ্ধেকেরও বেশী খাওয়া হইল, তখন বোধ হইল যেন মাধব কাকার কিছু কষ্ট হইতেছে। তাঁহার বড় মেয়ে প্রসন্নময়ী তাই দেখিয়া

আমাদিগকে বলিলেন, বাবাকে ভোরে ভাত খাইয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে। উহাকে আর খাইতে বারণ কর, আমি পাঁচ টাকা দিব। মাধব কাকা শুনিয়া বলিলেন—তোদের ভাবিতে হইবে না, তোরা ভোরে আমার জন্য ভাত রাঁধিস, আমি খাইয়া কলিকাতায় যাইব। খানিক পরে মাধব কাকা সেই কুটীর কাঁড়ি, দুধ, গুড় ও তরকারি শেষ করিলেন। আমরা মহোল্লাসে শাঁক ঘণ্টা কাঁসর বাজাইলাম। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মাধব কাকার বাড়ীতে ছুটিয়া গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তিনি অনেক আগে যেমন ভাত খাইয়া থাকেন, তেমনি ভাত খাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু সেই কথা মনে হইলে এখন কেবল ভয় ভাবনা হয়। আমাদের সে খাওয়া কোথায় গেল, ভাবিয়া বিষাদে মগ্ন হই। আমাদের ভোজনশক্তি যে কমিয়াছে, হীরেন্দ্রনাথ নাকি তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাকে জানাইবার জন্য মাধব কাকার খাওয়ার কথা লিখিলাম।

চক্ষু বুজিয়া ইহার অপেক্ষা উচ্চতর গাঢ়তর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। উহা মানুষের পরার্থপরতা, পরোপকারপ্রিয়তা এবং মহত্ত্ব দেখিবার আনন্দ। যাঁহারা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, এবং যাঁহাদের প্রাণ লইয়া আমার প্রাণ, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপন আপন স্বার্থ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান, এজন্মে তাঁহাদিগকে ভুলিতে ত পারিবই না, অধিকন্তু তাঁহাদের মহত্ত্ব ভাবিয়া অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিব, এবং কেমন করিয়া মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিব। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না:-

(১) স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

(২) স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু।

(৩) ভারতের প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রচিকিৎসক শ্রীসুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

(৪) পূজ্যপাদ ডাক্তার প্রাণধন বসু।

(৫) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন।

(৬) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন।

(৭) কবিরাজ ও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

(৮) কবিরাজ গোপালচন্দ্র [illegible]।

(৯) কবিরাজ [illegible] সেন।

(১০) ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।

(১১) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত।

(১২) পরম স্নেহাস্পদ ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী।

আর যাঁহারা আমার ভাবনায় ভাবিত হন, আমার কঠিন পীড়া হইলে আকুল হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সংখ্যা করিতে পারি না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন তাঁহারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহাদেরও নাম করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁহাদের নামের তালিকা পাঠকের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারা আমার আত্মীয় নহেন, কিন্তু আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়; আমি তাঁহাদের কাহারও কোন উপকার করি নাই, তথাপি আমার প্রতি তাঁহাদের অসীম স্নেহ। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, মানব-প্রকৃতিতে এখনও মহত্ব পরার্থপরতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণ-সকল বিদ্যমান আছে; মানুষ এখনও নীচ হয় নাই; মনুষ্যকুলে এখনও বহু ব্রাহ্মণ জন্মিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বড় আনন্দিত, বড় উৎসাহিত হইতে হয়। বিধাতার সৃষ্টিকৌশল এতই সুন্দর যে, উচ্চনীচ মধ্যবিত্ত সকলেরই ভাগ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির মানবের সংসর্গ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ সুখ ও আনন্দ কাহারো দুষ্প্রাপ্য নয়। শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষ দশায় মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে Misanthropic হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেন হইয়াছিলেন তাঁহার জীবনচরিতে লেখে না। তাঁহার একখানা জীবনচরিত পড়িয়াছি। তাহাতে ওকথা দেখি নাই। উহা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবনচরিত। জীবনচরিতে ঐরূপ কথাই আবশ্যক থাকা। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের দুরদৃষ্টক্রমে উহা প্রায়ই বাজে কথায় পরিপূর্ণ থাকে। আমি যাঁহাদের কাছে চিরঋণী, তাঁহাদের ২।৪ জনের কথা আমাকে বলিতেই হইবে। যাঁহাদের কথা বলিলাম না, তাঁহারা সকলেই কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাকে জগতের আনন্দময় কোষে রাখিয়া দিলেন।

আমার আর্থিক অবস্থা যখন বড়ই শোচনীয়, এবং আমার ঋণের পরিমাণ চারি পাঁচ হাজার টাকা, তখন আমি হাইকোর্ট যাই। কিন্তু হাইকোর্ট আমার ভাল লাগিল না। সেখানকার হাওয়া প্রীতিকর নয়। উকিলেরা শিক্ষিত, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব অপেক্ষা অসদ্ভাবই বেশী। তাঁহারা পরস্পরের কুৎসা করেন, এবং অনিষ্টের চেষ্টা করেন। বড় ঈর্ষাপরায়ণ। সেখানে যত টাকা আপীল করিবার পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, মোক্তার মহাশয়কে তাহার অনেক অধিক টাকার রসীদ লিখিয়া দিতে হয়। একদিন আমার কাছে আমার মুহুরী একটা খাস আপীলের কাগজপত্র আনিয়াছিল। কিরূপ অপদার্থ অজুহাতে খাস আপীল দাখিল করা হয়, আমি জানিতাম। আমি দেখিতাম উকীল মহাশয়রা নিম্ন আদালতের বিচারে দোষ-ত্রুটী হইয়া থাকিলে তাহার প্রতিকার করাইবার জন্য যত না হউক, আদালত দ্বারা তিরস্কৃত হইতে না হয় এমনি কৌশল করিয়া আপীলের দরখাস্ত রচনা করিয়া গোটাকতক টাকা হাতাইবার জন্য বেশীর ভাগ আপীলের দরখাস্ত দাখিল করেন।

আমার টাকার বড় দরকার। সুতরাং কাগজপত্র দেখিয়া বলিলাম, আপীল দাখিল করিব, কিন্তু ২৫ পারিশ্রমিক লইব। মওয়াকেল সম্মত হইয়া ষ্টাম্প কিনিতে গেল; কিন্তু আজও গেল, কালও গেল। আমার মুহুরীকে অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। মুহুরী আসিয়া বলিল, অমুক উকীল ২০ টাকায় করিয়া দিব বলিয়া তাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। শুনিয়া আমার বিজাতীয় ঘৃণা হইল। এক ব্যক্তি নিজের মকদ্দমা নিজে আমার কাছে আনিয়াছিল অর্থাৎ তাহার সঙ্গে মোক্তার ছিল না। মোক্তার থাকিলে আমি ২০ কি ২৫ টাকায় বেশী পাইতাম না। কিন্তু মোক্তার নাই দেখিয়া সুবিধা বুঝিয়া কোপ করিয়াছিলাম, ২৫ টাকার স্থলে ১২৫ টাকা লইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম এ ব্যবসায়ের প্রলোভন বড়। এ ব্যবসায় দরিদ্রের পক্ষে মারাত্মক। আমি দরিদ্র। এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এ সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের কথা মনে হইল। তাঁহার একখানি চিঠির জোরে আমি ডিপুটী মেজেস্টারী পাইলাম। পাইয়া ঢাকায় গেলাম। যখন যাই, বঙ্কিমদাদা আমাকে বলিলেন,—যাইতেছ যাও, কিন্তু টিকিতে পারিবে না। টিকিতে পারিও নাই। দেখিয়াছিলাম, হাকিম পুলিসের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ। পুলিসের মনোমত জেল জরিমানা না করিলে, কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তোষ ভাজন হইবার সম্ভাবনা। একটা মোকদ্দমায় পুলিস আমাকে শাসাইয়া এক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা অন্যায় না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পুলিসের আচরণ যে নিতান্ত অসভ্য, অসম্মানজনক ও উদ্ধত হইয়াছিল, তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি মেজেস্টর সাহেবের কাছে পত্র লিখিয়া নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি লিখিলেন,—I see no reason to interfere। আমি বুঝিলাম, পুলিসের মন যোগাইয়া চলিতে না পারিলে ডিপুটিগিরি করিতে পারা কঠিন। ডিপুটিগিরি ছাড়িয়া দিলাম। এইবারে স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথা আমার মনে উঠিল। ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া জয়পুরে গেলাম। পথখরচের জন্য জয়পুর হইতে একশত টাকা আসিল। কিন্তু তাহাতে সপরিবারে অত দূর যাওয়া হয় না। পত্নীকে কলিকাতায় রাখিয়া যাইতেও পারিব না। আবার দেনা করিয়া সপরিবারে জয়পুর গেলাম। সেখানে কান্তিবাবু আমায় বড়ই আদরযত্ন করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন আমাকে খুব বড় করিবেন। তা তিনি করিতে পারিতেন। তিনি তখন জয়পুরের রাজা বলিলেই হয়। Conscience টাকে একটু মুচড়াইয়া ৫/৭ বৎসর থাকিলে আমি মস্ত ধনী হইয়া যাইতাম। কিন্তু জয়পুরের তাত আমার সহ্য হইল

না, এবং রাজসভার হাওয়াও ভাল লাগিল না। সেখানে সাহেব ও ভক্তিন নামে অভিহিত চরিত্র শ্রীহীনাদের প্রতিপত্তি কিছু বেশী। একটী ঘটনায় ইহাও বুঝিলাম যে, স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আমার জয়পুরে থাকা সম্ভব হইবে না। আমি দু'মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তখনকার মহারাজ রাম সিংহকে বড় বিনয়ী ও অমায়িক দেখিয়াছিলাম, এবং উৎকোচাদি লয়েন না বলিয়া অনেকের মুখে কান্তি-বাবুর সুখ্যাতিও শুনিয়া আসিয়াছিলাম। জয়পুরে কেবল পাহাড় ও বালি—আমি ভারতের উদ্যানসদৃশ বঙ্গের মানুষ, সে কঠোর দৃশ্য আমার ভাল লাগিল না। সহর দেখিতে বড় সুন্দর, কিন্তু তাহাতে একটি তৃণ বা এক ফোঁটা জল দেখিতে পাইবার জো নাই। আমি দু'মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম জয়পুরে আর যাইব না। না খাইয়া মরি, সেও ভাল, তবু যাইব না। বিধাতার কৃপায় না খাইয়া মরিতে হইল না। সেই সময়ে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ Lawler সাহেবের মৃত্যু ঘটিল। আমি তাহা জানিতে পারি নাই। আমার পরম হিতৈষী কৃষ্ণদাস পাল আমাকে সে কথা জানাইলেন। আমি সেই কর্ম্মের জন্য শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ Corft সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিলাম। দরখাস্ত লিখিয়া নিজেই লইয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—Shall I guess why you have come? আমি বলিলাম,—আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। বুঝিলাম,—কর্ম্মটি তিনি আমাকে দিবেন। আমি বলিতে বলি নাই, তথাপি স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস ঐ কর্ম্মটি আমাকে দিবার জন্য Croft সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। Croft সাহেব জানিতেন, আমি ডিপুটিগিরি ছাড়িয়াছিলাম, এবং জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষগিরিও ছাড়িয়াছিলাম। তিনি আমার হিতৈষীকে বলিলেন,—"If he again proves a rascal, the responsibility will be both yours and line." আমার হিতৈষী উত্তর করিয়াছিলেন, "He is not to blame. He cannot settle down to what he does not fully like." Croft সাহেব ছুটী লইয়া বিলাতে গেলেন। আমার শিক্ষাগুরু তাঁহার কাজে বসিলেন। লাইব্রেরীর জন্য লোক নির্ব্বাচনের ভার এখন তাঁহার হাতে। তিনি আমাকে ঐ কর্ম্ম দিলেন। বেতন ২০০৲ হইতে ২৫০৲। আমি কিন্তু চিরকালের জন্য বাঁচিয়া গেলাম। এবং বিধাতার কাছে এখনও Croft ও Tawney সাহেবের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

আমার চাকরী হইলেই আমার পাওনাদারেরা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদিগকে টাকা দিই কেমন করিয়া? মাসে দুই শত করিয়া টাকা ঘরে আনিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু আমার খরচের অবধি ছিল না। তখন তিনটি পরিবারের উদরান্নের ভার আমার উপর। তাহাদিগকে অনাহারে

রাখিয়া আহার করিতে হইলে আমার শূকরের বিষ্ঠা ভোজন করা হইত এবং হৃদয়ের যন্ত্রণায় আমাকে ছটফট করিয়া মরিতে হইত। ঐ কয়টি পরিবারকে মাসে মাসে কিছু টাকা দিতাম। অনেক স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রী ভিন্ন আর কাহারো অধিকার নাই, এবং অপরকে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থের ভাগ পাইতে দেখিলে তাঁহারা মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া থাকেন। স্বামীকে তাঁহাদের অর্থ সাহায্য করিতে না দিয়া তাঁহাদিগকে বিষম অনশন কষ্টে ফেলিয়া দেন, এবং স্বামীর যন্ত্রণায় একশেষ করিয়া থাকেন। ভগবানের অসীম কৃপায় এবং আপন স্বভাবের গুণে আমার পত্নী আমাকে কখনও ঐ সকল অনশনক্লিষ্ট পরিবারের অর্থসাহায্য করিতে নিষেধ করেন নাই। নিষেধ করা দূরে থাকুক, কোন্ পরিবারের জন্য কত টাকা দিতাম, তাহা আমাকে কখনও জিজ্ঞাসাও করেন নাই। এবং এখনও জানেন না। যাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতাম, তাহাদের কাহারো কাহারো সহিত তাঁহার একটু দা-দেয়িজির ভাব ছিল। তিনি যদি আমাকে ধরিয়া বসিতেন, উহাদিগকে তুমি কিছুতেই টাকা দিতে পারিবে না, তাহা হইলে নিরুপায় হইয়া আমাকে অনশনের কষ্ট দেখিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু আমার পত্নীর জন্য তাহা ভোগ করিতে হয় নাই। ইহা কি সাধারণ সুখ? এ সুখের পরিমাণও হয় না। কল্পনাও হয় না। বিধাতার কৃপায় আমার পত্নীভাগ্য অতুলনীয়। তাঁহার এইরূপ মহত্ত্ব না থাকিলে এজন্মটা আমাকে মনুষ্যমধ্যে চণ্ডাল হইয়া এবং চক্ষের জলে ডুবিয়া থাকিতে হইত। আশীর্ব্বাদ করি, এবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমার মহালক্ষ্মীকে যেন আমার মত মহাপাতকীর সহধর্ম্মিণী হইবার ফলে চোখের জল ফেলিতে না হয়। অথবা আমি কি এমন মানুষ যে, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব? তিনিই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন জন্ম জন্ম তাঁহাকে পাইবার আশা আকাঙ্ক্ষা রাখিতে পারি। যে কয়টি পরিবারকে ভাত দিতে হইত, আমার পত্নীর পুণ্যবলে তাহাদিগকে আমার আর অর্থ সাহায্য করিতে হয় না, তাহারা আপনাদের অন্ন আপনার বিধাতার কাছে পাইতেছে; প্রার্থনা করি, চিরকাল পাউক। কিন্তু তাহাদের কাহাকে কত টাকা দিতাম, আমার পত্নী তাহা এখনও জানেন না, আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন না, আমিও বলি নাই। বলিবও না। তাঁহাকে কেহ (অবশ্য একটু কুমতলবে) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া থাকেন,—"ওসব টাকাকড়ির কথা, আমি কি জানি বোন? ওসব পুরুষেরা জানেন। জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিও।" বড় ভাগ্যবান্ না হইলে, এমন সহধর্ম্মিণী পাওয়া যায় না। আরো একটু বলি:

দেনা শোধ হয় কেমন করিয়া করিব ভাবিতে লাগিলাম। দেনা ৪/৫ হাজারের কম নয়, এবং প্রতিদিন সুদ বাড়িতেছে। পত্নী বলিলেন,—আমার গহনা বন্ধক দিয়া যে

ঋণ করা হইয়াছে, আগে সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তাহা শোধ করা হউক। আমি বলিলাম, তা আমি পারিব না, একে তোমার গহনা অল্প, তাও বেচিয়া ফেলিব? আমা দ্বারা তাহা হইবে না। তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে গহনা আর নাই। তুমি বিক্রয় কর। তাহা হইলে তোমার দেনা আর বড় বেশী থাকিবে না, অল্প টাকা কর্জ্জ করিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। আমি আর অমত করিতে পারিলাম না। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইল। হইয়াও কিন্তু এত দেনা রহিল যে, টাকা কর্জ্জ না করিলে তাহার পরিশোধ হয় না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ৺প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ইষ্টেটের ম্যানেজার এবং গৌরমোহন আঢ্যের ইস্কুলের সেক্রেটারী আমার চিরসুহৃৎ এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরতুল্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিলাম। তিনি অল্প সুদে অর্থাৎ শতকরা ৬৲ টাকা সুদে আমাকে হাজার টাকা কর্জ্জ দেওয়াইলেন। কর্জ্জ দিলেন ৺ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সাধু সুপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ৺ অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র আমার চিরকৃতজ্ঞতাভাজন শ্রীরূপলাল মিত্র মহাশয়। প্রতি মাসে সুদ সহ পঞ্চাশ টাকা করিয়া পরিশোধ করিতাম। আমার বৃহৎ সংসার পালনের জন্য দেড়শতেরও কম টাকা থাকিত। আমার পত্নী তাহাতেই সংসার চালাইয়া প্রতিমাসে আমার হাতে কিছু কিছু দিতেন। সংসারে কাহারো কষ্ট বা অসন্তোষ ছিল না। এইরূপে চারি পাঁচ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করিয়াও যে ভাবে ছিলাম, তাহাতে লোকে মনে করিত, আমার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ঋণ পরিশোধ হইলে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহার তুলনাও জানি না, পরিমাণও করিতে পারি না। বাল্যকালের সেই সব আনন্দ অপেক্ষাও তাহা বেশী। এ আনন্দের সহিত তুলনায় সে সব আনন্দ অতি সামান্য। সাধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, অঋণী অপ্রবাসী চ ইত্যাদি? এখন আমার প্রবাসও ঘুচিল, ঋণও ঘুচিল। আমার আনন্দ বড় বেশী হইবার কারণ এই যে, আমার ঋণ পরিশোধে আমার পত্নী আমায় বড় সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার যখন ঋণ ছিল তখন তিনি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে একবার এক জোড়া নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,—তুমি দেবতা সাক্ষী করিয়া আমার চিরকালের ভাত-কাপড়ের ভার লইয়াছ!—ও দেবতার দেওয়া কাপড়, দাও, আমি মাথায় করিয়া রাখি, কিন্তু পরিব না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—পরিবে না কেন? উত্তর,—তোমার দেনা থাকিতে নূতন কাপড় পরিব না। এখন আমার দেনা নাই, তথাপি কিন্তু তিনি রাত্রে মাথায় বালিশ না দিয়া নেকড়ার বোচকা মাথায় দেন, শীতকালে রাত্রে লেপ গায়ে না দিয়া ছেঁড়া মশারি এবং দিনের বেলা কেবল ছেঁড়া কাপড় পাট করিয়া গায়ে দেন। এমন সহধর্ম্মিণী পাইয়াছি বলিয়া

অঋণী হইতে পারিয়াছি। একটু চেষ্টা করিলে অনেকে এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইয়া অঋণী থাকিতে পারেন। শাস্ত্রকারেরা বালিকাদের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইবার সুবিধা হয়।

আমার পত্নী সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য কথা বলিতে বাকি আছে। শিশু সন্তান অধিক কাঁদিলে বা ঘুমাইতে না দিলে প্রায় সকল স্ত্রীলোকেই বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে থামাইবার নিমিত্ত—বিশেষতঃ রাত্রিকালে টিপ্ টিপ্ বা চটাচট্ মারেন, বা ঠোনা মারেন, বা টিপুনি দেন। তাহাতে তাহারা এমন ককাইয়া ওঠে যে, শুনিলে বড় কষ্ট হয়, এবং সময়ে সময়ে দম বন্ধ হইয়া মারা যাইবে বলিয়া ভয়ও হয়। ইহাতে অশান্তির সীমা থাকে না। আমার সৌভাগ্যবলে ওরূপ অসুখ অশান্তি আমাকে একেবারেই ভোগ করিতে হয় নাই। ছেলেতে মেয়েতে আমাদের ১২টি হইয়াছিল। কোনটির জন্তই আমার পত্নী আমাকে দাস বা দাসী নিযুক্ত করিতে বলেন নাই। কেবল অম্লরোগে তাঁহাকে জীর্ণ দেখিয়া আমি আপনিই তাহার দুইটি পুত্রের জন্য দুইটি দাসী নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। বাকী সবগুলিকে তিনি স্বয়ং পালন করিয়াছিলেন। পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী কাহাকেও তাঁহাকে কখনও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে মারিতে দেখি নাই। সকল দেশেই স্ত্রীলোক ছেলে ঠেঙ্গায়। আমার ঘরে কোনও ছেলেই মার খায় না। ইহা আমার যেন সুখ ও সৌভাগ্য। তবুও কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি আমাদের শান্তিময় ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহা তাহাদিগের দুর্ভাগ্য, আমার কি আমার শান্তিদায়িনীর দুর্ভাগ্য নয়। আমার স্ত্রীর এই গুণের কথা তাঁহার বড়াই করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম না। স্ত্রী প্রকৃতিতত্ত্বে একটা রহস্যময় কথা সুধী ব্যক্তিমাত্রেই এবং আমার বিদুষী পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখিয়া বুঝাইবেন, এই আশায় বলিলাম। ইহা যথার্থই স্ত্রীপ্রকৃতিগত একটা রহস্য। এ রহস্য কেবল আমার ঘরে নাই। অনেক ঘরে আছে। শুনিলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকিবে না। আর শিশুকুলের সৌভাগ্য বৃদ্ধিতে শিশুশিক্ষারও সুবিধা হইবে। যে রমণী শিশুকে মারিতে পারেন না, বড় রাগ বা বিরক্তি হইলে কেবল একটু বকেন, বোধ হয় দেবতাদের কাছে তাঁহার আদর ও সম্মান কিছু বেশী হয়। এই সমস্ত কারণে আমার পত্নী চির আরাধ্যা হইয়া আছেন। জামতাড়া হইতে আসিয়া একটু অসুখ হইয়াছিল। হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবার পর একথা সেকথার মধ্যে বলিয়াছিলেন :—আপনাদের মত couple (দম্পতি) আমি আর দেখি নাই, আপনাদের কথা আমি অনেকের কাছে বলি। তিনি কিন্তু আমাদের ভিতরের

কথা কেমন করিয়া বুঝিলেন, তাহা জানি না—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবও না। আপন ইচ্ছায় বলেন, ত শুনিব।

উপরে লিখিয়াছি যে, বড় অনটনের সময় একবার হাইকোর্টে গিয়াছিলাম। কেন গিয়াছিলাম, এইবার বলিব। এখনও যেমন তখনও তেমনি, ইংরাজী শিখিলে সকল যুবকেরই আদালতের দিকে দৃষ্টি পড়ে—তাহারা বোধ হয় মনে করে যে, আদালতে টাকা ছড়ানো আছে, গেলেই যত ইচ্ছা পাইতে পারা যাইবে। এ বিশ্বাস এখনও আছে, তাই অনেকেই এখনও ওকালতী করিতে যায়। শিক্ষিত অনেকে গড্ডলিকার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া উপহাস করে। আমার বিবেচনায় এরূপ উপহাস অন্যায়। তাহাতে ২/৪ জন কৃতকার্য্য হয়, দশজনের তাহা করিতে যাওয়া সকল দেশেই স্বাভাবিক কার্য্য, অতএব ২/৪ জনকে ওকালতী দ্বারা টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিয়া অনেকেই যে আদালতের দিকে ছোটে, সেটা আমাদের অন্যায় কাজ নয়। আমার কিন্তু মনে হয় যে, আমাদের আদালতে ছুটিবার ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কারণ আছে। আমার বেশ মনে আছে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য যাহা অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহাতে স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম্ম বা কারবারের দিকে মন যায় না, এমন কি, একখানা দোকান করিয়া দু'টাকা উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তিও জন্মে না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ Literary শিক্ষা, তাহাতে কোনওরকম Practical প্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে না। প্রধানতঃ এই কারণে আমরা দলে দলে আদালতে ছুটি। National কলেজে নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেখা যাক্ যাঁহারা তথায় পড়িতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটু practical tendency দেখা দেয় কিনা। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ literary শিক্ষা হইয়াছিল বলিয়া আমিও টাকার জন্য হাইকোর্টে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার টাকা হয় নাই। কেন হয় নাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপরের ন্যায় আমারও হাইকোর্টে যাইবার আর একটা কারণ ছিল। স্বাধীন থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব, চাকরীতে গিয়া পরাধীনতা স্বীকার করিয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট করিব না, এই ইচ্ছাই সেই কারণ। এই ধারণাটা যে বিষম ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর ধারণা, তাহা এখন বুঝিয়াছি। চাকরীতে মনুষ্যত্ব যায়, অতএব চাকরী করিব না, Bengal library-র অধ্যক্ষতা গ্রহণ করাতেই আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। অথচ ঐ চাকরী করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীর কাজ বেশীও নয়, কঠিনও নয়, একরকম চোখ বুজিয়া বুজিয়া সম্পন্ন করিতাম। সুতরাং কাজের মতন কাজ বলিয়া বোধ করিতাম না। কাজেই চাকরীতে যে ঘৃণা ছিল, ঐ কাজ করাতে তাহা বাড়িয়াই গেল। কিন্তু এই কাজ করিবার পর যে কাজ উপস্থিত হইল, তাহার

কঠিনতা ও পরিমাণ দেখিয়া আমার ভয় হইল। তাহা বঙ্গানুবাদের কাজ। ঐ কাজ করিয়া অসুর Robinson সাহেব বহুমূত্র রোগে মারা গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরে আমার ভ্রাতৃসম অসুরসদৃশ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ঐ রোগে মারা গিয়াছিলেন। তাই ঐ কাজ লইতে আমার ভয় হইয়াছিল। তাই আমি ঐ কাজের জন্য দরখাস্তও করি নাই। Croft সাহেবের উপর ঐ কাজের জন্য লোক নির্ব্বাচনের ভার ছিল। তিনি আমাকে নানা রকমে ঐ কাজ লওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমিও অবশেষে লইয়াছিলাম। কাজের মতন কাজ বটে। পরিমাণও যেমন বেশী, প্রকৃতিও তেমনি কঠিন। ইংরাজী আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ কি দুরূহ ব্যাপার, যিনি না করিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না, বুঝাইলে বুঝাইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। অনেককে বঙ্গানুবাদকের অনুবাদের ঠাট্টা করিতে দেখিয়াছি। ঠাট্টা করা যাইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু অনুবাদককে যে সকল নিয়ম পালন করিয়া অনুবাদ করিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া স্বয়ং বৃহস্পতি অনুবাদ করিলে, তাঁহার অনুবাদেরও যে ঠাট্টা করিতে পারা যায়, ইহা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। না জানিয়া না শুনিয়া না বুঝিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করা এখনকার একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বড় বেয়াড়া, বড় দুশ্চিকিৎস্য রোগ। আমরা প্রত্যেকেই এখন ভাবি আমরা সকলের চেয়েই পণ্ডিত, তাই অপর সকলকে ঠাট্টা করিতে কুণ্ঠিত হই না। অনুবাদকের কাজ লইয়া দেখিলাম—কাজের পরিমাণের যেমন সীমা নাই, উহার প্রকৃতিও তেমন কঠিন। আর ঐ কাজ করিয়া দিতে বড় তাড়াতাড়ি করিতে হইত; দুই দিনের কাজ দু'ঘণ্টায়, ১০ দিনের কাজ পাঁচ ঘণ্টায়, ইত্যাদি। আদেশমত কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। কখনও একটি কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। কোনও কাজ করিয়া দিতে একটু বিলম্ব হইলে, যে আপিসের কাজ, সে আপিস হইতে non-official enquiry মাত্র হইত, অর্থাৎ কাজ কত দিনে হইবে জানিয়া যাইবার জন্য একজন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইত। কখনও কড়া চিঠি আসিত না। এই কাজ যখন লইয়াছিলাম, তখন গবর্মেণ্টের সহিত সর্ত্ত করিয়াছিলাম যে, ছয় মাস কাজ করিয়া দেখিব, যদি শরীর না বয়, ছয় মাসান্তে লাইব্রেরীর কাজে ফিরিয়া যাইতে পারিব। কাজ কিন্তু এত অধিক ও কঠিন যে, ৩।৪ দিন মাত্র করিয়া আমার মাথা এত ঘুরিয়াছিল যে, ভয় পাইয়া Croft সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়াছিলাম—এ কাজ আমার দ্বারা হইবে না, আমাকে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া যাইতে দিন। তিনি আমাকে নিরুৎসাহ করিলেন না, কিন্তু কৌশল করিয়া আমাকে একাজে এক মাস রাখিলেন। কৌশল এইরূপ, যে দিন সাহেবের কাছে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিয়া আসিলাম,

তাহার পরদিন প্রাতে রাধিকাবাবু আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—কাল Croft সাহেবের কাছে গিয়া দেখিলাম, তিনি বড় বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—অমন করিয়া বসিয়া আছেন কেন? তিনি বলিলেন,—চন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিতেছে, সে Library-তে ফিরিয়া আসিতে চায়। কিন্তু অনুবাদকের পদের উপযুক্ত লোক আর দেখিতে পাইতেছি না, তাই ভাবিতেছি। তা ভাই, এত শীঘ্র Libraryতে ফিরিয়া গেলে, Croft সাহেবের বড় দুঃখ হইবে, এবং গবর্মেণ্টের কাছে তাঁহাকে অপ্রতিভ হইতে হইবে। তিনি আমাদের হিতৈষী—গবর্মেণ্টের কাছে তাঁহাকে অপ্রতিভ করা আমাদের বড় অন্যায় হইবে। তুমি অন্ততঃ এক মাস এই কাজ কর। রাধিকা দাদার উপদেশ যে বড় সমীচীন, তাহা বুঝিলাম। বুঝিয়া বলিলাম, যতই কষ্ট হউক, এক মাস এই কাজ করিবই করিব। আমাকে এ কাজে এক মাস রাখিলেন। এক মাস এই কাজ করিতে করিতে আমার স্থৈর্য্য আসিল, ধৈর্য্য আসিল, সাহস আসিল, কষ্টসহিষ্ণুতা আসিল, শ্রমে শক্তি বাড়িতে লাগিল, আর এই ধারণা জন্মিল যে, একাজ ভগবানের কাজ। গবর্মেণ্টের বা মানুষের কাজ নয়। তখন এই কাজ ভাল লাগিতে লাগিল, আর আলস্য গেল, শ্রমকাতরতা গেল, শ্রমে আনন্দ ও উৎসাহ হইতে লাগিল। সুতরাং তখন ২ দিনের কাজ ১দিনে; ১০ দিনের কাজ ৬ ঘণ্টায় শেষ করিয়া এতই আনন্দ হইতে লাগিল যে, প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, চাকরী যদি করি, তবে এইরূপ চাকরীই করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং ভগবানের চাকরী করিতেছি ভাবিয়া, এই চাকরী করিতে লাগিলাম। তথাপি বুঝিলাম, একাজে থাকিলে শীঘ্রই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। Tawney সাহেব তখন Croft সাহেবের কাজ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ইস্তফা পত্র পাঠাইয়া দিলাম। তিনি তাহা লইলেন না। আমাকে আরো ছয় মাস থাকিতে বলিলেন। বলিলেন,—আমি লোক পাইতেছি না, তুমি আরো ছয় মাস থাক। আমি গবর্মেণ্টে লিখিয়া তোমার কাজের পরিমাণ কিছু কমাইয়া দিব। তাহাই দিলেন।

তিনি আমার শিক্ষাগুরু, আমি আর না বলিতে পারিলাম না। কাজ যাহা কমাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে আমার নিজের শ্রমের লাঘব হইল না। আমার আপিসের পণ্ডিত মহাশয়ের কিছু আসান হইল। তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমি কাজ করিতে লাগিলাম। রাত দিন কাজ। রবিবারেও কাজ। প্রতিদিন প্রাতে কাজ। পূজার ছুটীতে আপিস বন্ধ করি, কিন্তু বাড়ীতে কাজ করি। সকল ছুটীতেই তাই। অসুখ হইলেও কাজ করি, না খাইয়াও কাজ করি। কাজ আমার জপমালা হইয়াছিল। দুইবার ছুটী লইয়া হাওয়া খাইতে মধুপুরে ও বৈদ্যনাথে গিয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও

রাশি রাশি কাজ করিতে হইয়াছিল। ইং ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরেশনাথের পরলোক হয়। কলিকাতার বাড়ীতে আর কেহ থাকিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া প্যারী দাদা (রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়) আমাদিগকে যেন কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার গঙ্গাতীরস্থ সুন্দর বাটীতে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন, এবং সপরিবারে আমাদের অশেষ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। সে আদর যত্ন আমরা ভুলিতে পারিব না। আমাকে প্রাতে তাঁহার কাছে গিয়া কাজ করিতে দেখিয়া, তিনি বলিলেন, এখানে আসিয়াও নিষ্কৃতি নাই? আমি কোনও উত্তর করিলাম না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম,—"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" কাজ ছাড়িয়া দিব শুনিয়া আমার এক বন্ধু (আহা, তিনি আর ইহলোকে নাই!) একজন মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন,—সংবাদপত্রের রিপোর্ট অত বেশী করিয়া নাই লিখিলেন, কম করিয়া লিখিলে কেহত ধরিতে পারি না। এমন কাজটা ছাড়িবেন কেন? আমি বলিলাম, তা আমি পারিব না। আর কেহ ধরিতে পারিবে না বটে—কিন্তু আমার মন যে আমাকে ধরিবে। ফলতঃ ভগবানের কাছে অপরাধী না হই এমন করিয়া কাজ করিয়াছিলাম বলিয়াই এতদিন এই কঠিন কাজ আমার নিজের সন্তোষজনক রূপে করিতে পারিয়াছিলাম। এবং পেন্সন লইবার পর Croft সাহেবকে এইরূপ লিখিতে পারিয়াছিলাম—Looking backword, I cannot call to mind a single item of work, big or small, regarding which I could not wish that, given the time and the staff, I had done it better or more carefully, না, আমার মনের কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র আত্মগ্লানি নাই। বিধাতা পুরুষ স্বয়ং অনুসন্ধান করিলেও আমার কাজে অমনোযোগ, অসাবধানতা, বা অবহেলার নিদর্শন খুঁজিয়া পাইবেন না। কেমন করিয়া পাইবেন, আমি যে তাঁহারই চাকরী করিতেছি ভাবিয়া গবর্মেণ্টের চাকরী করিয়াছিলাম। সকলকেই বলি,—বিধাতার চাকরী করিতেছ ভাবিয়া যাহার ইচ্ছা তাহার চাকরী করিও, চাকরীতে হীনতা দেখিবে না, গৌরবই দেখিবে, আর নিখুঁত কাজ করিয়া ও ধার্ম্মিকের ন্যায় কাজ করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, এবং নির্ম্মল, অক্ষয়, পবিত্র সুখ ভোগ করিবে, তাহার তুলনা পাইবে না।—বলিতেও ভয় করে, কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারি না, সচ্চিদানন্দের আনন্দ বুঝি সেই প্রকৃতির আনন্দ। অনুবাদককে বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের রিপোর্ট গবর্মেণ্টকে প্রতি সপ্তাহে দিতে হয়। ৬০।৭০ খানা কাগজ স্বয়ং অনুবাদককে আদ্যোপান্ত পড়িয়া রিপোর্ট করণার্থ চিহ্নিত করিয়া দিতে হয়। সহকারীরা চিহ্নিত অংশগুলির রিপোর্ট লিখিলে অনুবাদক স্বয়ং তাহা পড়িয়া ও মূলের সহিত মিলাইয়া আবশ্যক মত সংশোধন করিয়া দেন। কোনও

কোনও কাগজে বলা হয় যে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনেক সময় ঠিক হয় না, এবং গবর্মেণ্টের মনে সেইজন্য সংবাদপত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা অন্যথা ধারণা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট যে কত সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করা হয়, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। উহা ভাল না হইলে অধর্ম্ম হইবে—উহাতে দোষ বা ত্রুটী হইলে অনুবাদকের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সংবাদপত্রের রিপোর্ট করা হয়। আমি সতের বৎসর রিপোর্ট করিয়াছি—একটিও অযথা রিপোর্ট করিয়াছি বলিয়া আমার মনে কাঁটা বেঁধে না। বড় আদালতে আমার অনুবাদের ফড়া ছেঁড়া হইয়াছে, তথাপি আমাকে আঘাত পাইতে হয় নাই, লেখকেরা আপনারা দোষ করিয়া অনুবাদকের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজেরা নিষ্কৃতি পাইবার অসাধু চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে অনুবাদকদের যে একটিও ভুল হয় না, এমন কথাও বলি না। হয় বই কি, বিশেষ slang বাঙ্গালায় বা খ্যাচড়া বাঙ্গালায় লেখা কাগজের অনুবাদে ভুল হইবার বড়ই সম্ভাবনা। তবে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, নিরতিশয় সাবধানতা সহকারে রিপোর্ট করিলেও অমন ভুল হইয়া থাকে। সকল দেশেই হয়, সকলেরই হয়। তজ্জন্য অনুবাদককে গালি দেওয়া বা ঠাট্টা করা অতি অন্যায়, এবং অসজ্জনতার কাজ। একজন সংবাদপত্র লেখক আপন সম্পাদিত কাগজে বাঙ্গালার ঠিক ইংরাজী অনুবাদ হইতেই পারে না ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

চাকি ডুবুডুবু (আর মনে নাই)

করুক দেখি কে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারে? আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছিলাম :—

চাকি ডুবুডুবু—The sun's disc is about to sink, যাহা মনে নাই, তাহারও অনুবাদ করিয়াছিলাম। অনুবাদ অসাধ্য হইয়াছিল, এইরূপ মনে হয় না।

ফল কথা, ইংরাজীতে একটু অধিকার না থাকিলে বাঙ্গালার, বিশেষতঃ নীচতাদুষ্ট (slang) বাঙ্গালার ঠিক ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারা বড়ই কঠিন। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রে আজকাল নীচতাদুষ্ট বা slang বাঙ্গালার প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। ইহার এই ফল হইয়াছে যে, এখনকার বাঙ্গালী সকল দিকেই মর্যাদাহীন এবং অভদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং সংবাদপত্র গবর্মেণ্টের বোধগম্য হইতেছে না বলিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের মনের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ বাড়িতেছে। সংবাদপত্রে অভদ্র বা নীচতাদুষ্ট বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধু ভাষার ব্যবহার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। নহিলে আমরা অভদ্র (ungentlemanly) হইয়া উঠিব। ইহারই মধ্যে অভদ্র বা ungentlemanly হইয়াছি।

স্বভাব অভদ্র বা নীচ হইলে ভাষাও ভদ্রোচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এই যে অভদ্রোচিত ভাব এত প্রবল হইতেছে ইহা আমাদের ভয় ভাবনার কারণ সন্দেহ নাই। নীচতাদুষ্ট রচনা অবিলম্বে পরিত্যক্ত হওয়া আবশ্যক। এখন অনেকেই চলিত বা colloquial বাঙ্গালার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহা দোষের কথা নয়। ভাষা colloquial না হইলে সাহিত্য মূর্খের আরও বা বোধগম্য হয় না; সুতরাং সমস্ত লোকের সমান হিতকর হয় না। কিন্তু colloquial বাঙ্গালা লিখিবার একটা বিষম দোষও আছে। colloquial বাঙ্গালা লিখিতে লিখিতে slang বাঙ্গালা আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ নীচতাদুষ্ট বাঙ্গালা আসিয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে আসিয়াছেও তাই। সেইজন্য অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়া অনেক সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের অতিশয় বিরক্তিকর, এমন কি ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে, এবং সমস্ত সমাজে একটা নীচতাপ্রিয়তা জন্মিয়া গিয়াছে। ইহার সংস্কার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এইরূপ এবং অন্যান্য কারণে অনেক বাঙ্গলা সংবাদপত্রে আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইতেছে। এই অনিষ্ট নিবারণ করা বড় আবশ্যক। এ বিষয়ের অধিক আলোচনা এখানে হইতে পারে না। স্থানান্তরে ও সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই কঠিন কাজ সতের বৎসর করিয়াছিলাম। তাহার পরে পেন্সন লইয়া চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করি। এমন কঠিন চাকরী এত দীর্ঘকাল করাতেও কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল সাক্ষ্য দিয়া আমাকে কখনও কষ্ট বা যন্ত্রণা দেন নাই। বরং অনুকূল সাক্ষ্য দিয়া আমাকে আশ্বস্তই করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে, আমার অন্তরাত্মা আমার নিজের লোক, আমার দিকে টানিয়া কথা কহিবেন ইহা বিচিত্র নয়। তাঁহাদের বিশ্বাস হইতে পারে, এই আশায় আমার অন্তরাত্মার সাক্ষ্যের অপর অনুকূল বা পোষক সাক্ষ্য (corroborative evidence) দিতেছি। আমি ৩৫ বৎসর বয়সে চাকরীতে গিয়াছিলাম, পেন্সন আইন অনুসারে আমার ১৭৫ টি টাকা পেন্সন প্রাপ্য হইয়াছিল। তাহাতে আমার সংসার চলিবে না বলিয়া আমি special বা অতিরিক্ত পেন্সনের দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমার কাজকর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, এমন অনেক বড় বড় কর্ম্মচারীর অভিমত ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দিয়াছিলাম। অতিরিক্ত বা special pension ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমতি ভিন্ন হইতে পারে না। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীকে পত্র লেখেন। সেই সকল পত্র এবং কর্ম্মচারীদিগের অভিমত হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

The work of the Bengali translator requires capacity of a high order, good judgement, and scrupulous fairness. All

these qualifies have been continously exhibited by Babu Chandra Nath Bose. The selecting of passages for translation from the various vernacular newspapers makes large demands upon the discretion and good faith & the officer entrusted with the work ; and in this important matter this officer has rendered very marked services to Government.—বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী আরল্ সাহেবের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

We agree with the Government of Bengal in its estimate of the high qualities required for the efficient conduct of the duties of its Bengali translator, and in its appreciation of the loyalty and ability with which Babu Chandra Nath Bose has discharged those duties * * * In the performance of both these ordinary and these special duties, Babu Chandra Nath Bose has displayed great ability and fairness, sometimes at the cost of much obloquy from his countrymen—সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য অ্যাম্পথিল, কিচেনার, ল, এলিস, অরগুেল, ইবেট সন্ ও রিচার্ড সাহেবদিগের স্বাক্ষরিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

They were always faithfully and efficiently discharged, and his work was ever animated by a deep sense of responsibility and distinguished by conscientious accuracy—কটন সাহেবের প্রশংসা-পত্র হইতে উদ্ধৃত।

In the delicate and difficult duties that you have to discharge as translator to Government, and especially in that branch of your work which deels with the weekly report on the vernacular newspapers, you have displayed equal judgement and fearlessness. The annual and other special reports that you have from time to time submitted on this subject have shown remarkable insight into the currents of thought and feeling which sway the writers in the vernacular press, and have elicited the warm commendations of Government, to whom they afforded material help.

Your personal character for independence and probity stands so high that it is quite needless for me to do more than refer to it.—শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I was delighted to hear from your letter of the 4th August that the Government had granted you a special pension. No man has deserved it better than you, and I offer you my hearty congratulations. It is not the amount that I value, but the recognition of thoroughly good and scholarly work continued for many years.—ক্রফ্‌ট সাহেবের লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

I know nothing but good of your work and have several times had occasion to notice that it was faithfully and conscientiously done—ম্যাক্‌ফার্সন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I have always had the highest opinion of your ability and trust worthiness; and I believe that Sir John Edgar held the same opinion.

Your office as official translator is one of very considerable difficulty and delicacy, You have not escaped attacks by same newspapers from time to time for doing your duty loyally to Government.—স্মিন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I have much pleasure in testifying, as you ask me, to the able and conscientious manner in which you always discharged your duties in the responsible post of translator to Government while I was under Secretary to Government in the political and Judicial departments. * * * your retirement will be a loss to the Government in my opinion.—ওল্ডহাম সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

Your work as Bengali translator always seemed to me excellent.—ক্রগইন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

এই সকল অভিমত পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এতদিন এই কঠিন কাজ করিয়াছিলাম, কিন্তু অধর্ম করি নাই, গবর্মেণ্ট এবং বড় বড় কর্মচারী সকলেরই এই ধারণা, এবং সেই জন্য সকলেই আমার উপর সন্তুষ্ট। এইজন্যই ত আজ আমার মুখ এত নির্মল, এখন

অবিনশ্বর। এ সুখের হ্রাস নাই। এ সুখে তরঙ্গ নাই। এ সুখের বিনাশ নাই। আমি হাসি, কাঁদি, দুঃখ পাই ;—কিন্তু সবই আমার সেই নিত্য নির্ব্বিকার সুখরূপ জমির উপর করি। যেমন এক যন্ত্ররূপ জমির উপর নানাবিধ ফুল প্রভৃতি তোলা হয়, তেমনি আমার এই অনন্ত সুখরূপ জমির উপর হাসি কান্না সবই ফোটে। তাই ত মনে হয়, সচ্চিদানন্দের বুঝি এই প্রকৃতির আনন্দ, ধর্ম্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং যতদূর সাধ্য প্রবল রাখিয়া কঠিন চাকরী করিয়া আমি অক্ষয় ও অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু দু'দিনের জন্য স্বাধীনতা ফলাইতে গিয়া যে আত্মগ্লানি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা এখনও যায় নাই ; বোধ হয়, এ জীবন থাকিতে যাইবে না। কেবল চাকরীর এই সুখে উহা কতকটা চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিয়া এই যে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করিয়াছি, ইহার অপেক্ষাও একটা বড় ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। সে ফলের নাম discipline—নিয়মানুবর্ত্তিতা। এই কঠিন চাকরী করিতে করিতে যেন স্থৈর্য্য আসিয়াছিল, কষ্টসহিষ্ণুতা আসিয়াছিল, তেমনি আলস্য, অস্থিরতা, শ্রমকাতরতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি দোষ কাটিয়া গিয়াছিল। সংসার-যাত্রায় ঐ সকল গুণও যেমন আবশ্যক, ঐ সকল দোষের পরিহারও তেমনি প্রয়োজনীয়। নহিলে সংসার-যাত্রায় বিপদ বিভ্রাট অশান্তি অমঙ্গলের সীমা থাকে না। অর্থাৎ কঠিন চাকরী কঠোরভাবে সম্পন্ন করিলে, মনুষ্যোচিত গুণ আপনা-আপনিই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ, অপক্ক মানুষ পরিপক্ক হয়। অপর দিকে পরিপক্ক মানুষ স্বাধীনতা ফলাইতে গেলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কঠিন চাকরীতে মানুষ গড়ে, স্বাধীন ব্যবসায় মানুষকে নষ্ট করে। এমন কঠিন কাজ যে সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমার সহকারীরা, নারায়ণ চন্দ্র, রাজেন্দ্র চন্দ্র, বিধুভূষণ, মন্মথ নাথ, জ্ঞানেন্দ্রলাল, প্রবোধপ্রকাশ সকলেই ভক্তের ন্যায় প্রাণপণে আমার সহকারিতা করিয়াছিলেন। প্রবোধ প্রকাশ অল্প বয়সে আমাদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান অপর সকলের মঙ্গল করুন।

এই স্থানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। আমার সহকারীদের ছুটী লওয়া আবশ্যক হইলে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের প্রথম শ্রেণীর এম্, এ উপাধিধারী নিযুক্ত করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী করিতে এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা করিতে সমান অপটু। ১৭ বৎসর অনুবাদকের কর্ম্মে থাকিয়া অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত কেবল তিনটী ছেলেকে ভাল ইংরাজী লিখিতে দেখিয়াছিলাম—(১) আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের পুত্র প্রবোধপ্রকাশ সেনগুপ্ত (২) প্রখ্যাতনামা রাখাল দাস হালদার মহাশয়ের পুত্র সুকুমার হালদার এবং আমার সহপাঠী ৺উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের

অকালমৃত পুত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের literary education-এ literary যোগ্যতাও বেশী হয় না।

প্রকৃত অধীনতা চাকরীতে নাই। উহাতে হীনতাও নাই; হীন কাজ না করিলে কিছুতেই হীনতা নাই। আমাকে একবার একটা হীন কাজ করিতে বলা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ফোঁস করিয়া উঠিয়া একটা ছোবল মারিয়াছিলাম। আর আমাকে কেহ কখনও হীন কাজ করিতে বলিতে সাহস করে নাই। ওকালতীতে টাকার গোলামী করিতে হয়—চাকরীতে তাহা হয় না। টাকার গোলামী সকল গোলামীর অধম। ৫/৬ বৎসর হইল, কলিকাতার দুইজন সম্ভ্রান্ত আইন-ব্যবসায়ী অধিকন্তু ধনীলোকেও বটে, আমাকে বলিয়াছিলেন,—আর দু'বছরের বেশী এ ব্যবসা চালাইব না—কিন্তু এখনও চালাইতেছেন। আমি পেন্সন লইবার পর ভাই রাসবিহারী আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, you acted wisely in leaving the legal profession আমি এখনও chained like a galley slave তাই বলি, চাকরীতে সুখও যেমন, স্বাধীনতাও তেমনি, আর discipline শিক্ষা হয় বলিয়া মনুষ্যত্বের উন্নতিও তেমনি; ওকালতীতে অনেকের পক্ষে অধীনতাই বেশী এবং মনুষ্যত্বের অপলাপ হয় ও প্রতিবন্ধক ঘটে। স্বাধীন বৃত্তিরূপ মাকাল ফলের প্রয়াসী হইয়া সুখ শান্তি মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সমস্ত স্পৃহনীয় পদার্থে জলাঞ্জলি না দিয়া ধর্ম্মজ্ঞানে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিও। ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা আপনাদের অভাব আপনারা মোচন করিতে পার, অগ্রে তাহাই করিও, তাহা না পার, চাকরী করিও। সচ্চিদানন্দের আনন্দের আস্বাদ পাইবে, সংসার-যাত্রার সুচারু নির্ব্বাহ যে সকল গুণ না থাকিলে হয় না, তাহা লাভ করিবে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে, এবং প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

এই অনুপম আনন্দে এখন আমার দিন কাটিতেছে। শোক দুঃখ আমার আছে, বিশেষতঃ আমার তুলু মায়ের বিয়োগবশতঃ। কিন্তু যখন ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া থাকি, আর আমার সহধর্ম্মিণী নিঃশব্দে আমার অজ্ঞাতসারে আমার ঘরে আসেন, বলিতে পারি না, কেমন করিয়া আমার বিষণ্ণতা আমার অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যায়। অক্ষয়কুমার আমাকে আর একদিন দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—আপনার জোরে তিনি আছেন; তাঁর জোরে আপনি আছেন। এত গুপ্ত কথা অক্ষয় কেমন করিয়া জানিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু কথা বড়ই সত্য। বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি; স্ত্রীই পুরুষের শক্তি—শিবের শক্তি শিবানী, ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী, বিষ্ণুর শক্তি রমা। শুনিতাম, কিন্তু বুঝিতাম না। এখন বুঝিয়াছি। বুঝিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কৃতার্থ হইয়াছি এইজন্য যে, আমরা সকলেই ত শক্তির সৃষ্টি করিয়া লইয়া সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারি। এখন

বুঝিয়াছি, প্রেম, প্রেম বড় কাজের কথা নয়, এক মুহূর্তে হয়, এক মুহূর্তে যায়। ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহাতে তেমন কাজ হয় না। ভক্তির অভাবে প্রেম পবিত্র হয় না, সুতরাং সমাজের প্রকৃত মঙ্গলজনকও হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেম ভক্তিমূলক, রামচন্দ্রের সহিত সীতার প্রেম ভক্তিমূলক, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রেম ভক্তিমূলক, পাণ্ডবদের সহিত দ্রৌপদীর প্রেম ভক্তিমূলক, দার্শনিক মিলের সহিত কুমারী হেলেন টেলরের প্রেম ভক্তিমূলক। বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ণিত প্রেম ভক্তিমূলক নয়, লালসামূলক। বাঙ্গালা কবিতা ও উপন্যাসে ভক্তিমূলক প্রেম বর্ণিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্যের মধ্যে উচ্চতম ও অদ্বিতীয় হইবে।

চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে বাল্যকালের যে সকল কথা এবং অধিক বয়সের হিতৈষীদিগের যে সকল কথা মনে উঠিয়া মন সুখে ও আনন্দে ভরাইয়া দেয়, অনেকেরই ভাগ্যে সেরূপ ঘটনাদি হইয়াছে এবং হইয়া থাকে। অতএব পৃথিবীতে সুখ বা আনন্দ নাই বলিয়া কাহারও দুঃখ করিবার বা বিধাতার উপর দোষারোপ করিবার কারণ নাই। এই যে এখন একটা সুর উঠিয়াছে যে জগৎ দুঃখময়, ইহাতে সুখ নাই—এটা মানবের ঘোর দুর্মতির ফল। ইহাতে মানুষকে ঈশ্বরে অনাস্থাবান করিয়া জগতে ঈশ্বরপরায়ণতার খর্ব্বতা করিতেছে। ঈশ্বরপরায়ণতার খর্ব্বতাতে শুধু নাস্তিকতা বাড়ে তা নয় স্বার্থপরতা এবং মানবের মধ্যে অসদ্ভাবও ঘটে। চক্ষু বুজিয়া reverieতে যেরূপ পুরাতন কথা পাইয়া এত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিয়াছি এবং করি, বিনা আয়াসে সকলেই সেইরূপ পুরাতন কথা পাইয়া অতুলনীয় সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, এখন বোধ হয় বলিতে পারি যে, ইংরাজীতে যাহাকে reverie বলে বাঙ্গালায় তাহাকে রোমন্থন বলিলে ভুল করা হয় না। রোমন্থক জন্তুদিগের রোমন্থনের প্রকৃতি দেখিলে বোধ হয় প্রথম গ্রাস অপেক্ষা রোমন্থনের গ্রাস তাহাদের বেশী মিষ্ট লাগে। আমিও দেখিলাম, বাল্যকালের সেই আনন্দ অপেক্ষা বৃদ্ধ বয়সের সেই আনন্দের রোমন্থন বেশী আনন্দজনক। কিন্তু বাল্যকালে আমি গ্রামে থাকিয়া যেরূপ আনন্দভোগ করিয়াছিলাম, এখনকার ছেলেদের সেরূপ আনন্দোপভোগের আর উপায় নাই। কারণ ম্যালেরিয়া প্রভৃতির জন্য পল্লীবাস আর আমাদের নাই বলিলেই হয়। সুতরাং আমাদের ছেলেদের পল্লীজীবনও নাই। পল্লীজীবনের অভাবে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বোধ হয় এখন আর কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না।

সহর ছাড়িয়া যাহাতে আবার পল্লীতে বাস করিতে পারি অপর সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আমাদের সকলেরই এখন প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়াছে। এ চেষ্টা ফলবতী করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর

কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে। কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক সকলে ভাবিয়া দেখুন। ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম আমাদিগকেই করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট করিবেন মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। গ্রামে গ্রামে গিয়া সকলকে এই কথা বুঝাইতে হইবে এবং এই কাজে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। একাজের সহিত রাজনীতি জড়ান হইবে না। জড়াইলে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এ কাজ করিতে দিবেন না। এখন ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ এই কাজ। করিবার সামর্থ্য লাভের জন্য স্বদেশীর যত প্রয়োজন, উদরান্নের জন্য তত প্রয়োজন নয়। যাহাদের উদরান্ন আছে তাহারাও যে ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবেই এখন আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ভাল পানীয় জল পাইলে সকল রোগেরই উপশম হইবে, ম্যালেরিয়াও কমিবে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান হয় এবং বদ্ধ জল নিকাশের উপায় হয় সকলের সমবেত চেষ্টায় সেই কাজ করাই আমাদের এখন সর্ব্বপ্রধান কাজ। সে কাজের জন্য যদি স্বদেশীও একটু চাপা রাখিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। কারণ একসঙ্গে দুইটা বড় কাজ করিবার শক্তিসামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদিগকে একটা একটা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

পৃথিবীতে সুখের যদি সীমা নাই তবে কি তথায় দুঃখ নাই। আছে বৈকি, খুবই আছে। লোকমধ্যে সেইজন্যই সুখের পিপাসা এত প্রবল এবং সুখের অনুসন্ধানে কাহারো বিরাম নাই। কিন্তু যিনি অসীম সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি এত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? তিনি কি তবে নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়? অনেকে তাই বলেন বটে। সেদিন বৈকালে একটী ভিখারী বালক "দয়াময়ি! কোন্ গুণে তোমায় দয়াময়ী বলে" অতি করুণ কণ্ঠে এই গানটী গাহিয়া আমায় কাঁদাইয়া গিয়াছিল। তেমন কান্না অনেককেই কাঁদিতে হয়। এমন দয়াময় এমন নির্দ্দয় কেন, এত কাল বুঝি নাই। রোগ যন্ত্রণা দেখিয়া ও ভুগিয়া এবং গোটাকতক শোক পাইয়া বুঝিয়াছি যে দুঃখেই বিধাতার পরম কৃপার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, বুঝিয়াছি যে দুঃখের ন্যায় আর সুখ নাই। আমাদের ছুলুমার শোকে আমরা পতি-পত্নী বড়ই কাতর। কিন্তু সেদিন আমার পত্নী বলিতেছিলেন—"সে থাকিতে তাহার যে সব কথা মনে হইত না, এখন তাহা মনে হয়।" ঠিক কথা, শোকে স্মৃতিশক্তি বাড়াইয়া দেয়। তাইত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আমার সেই মায়ের কথা ভাবিতে যত সুখ হয়, বোধহয় মা আমার চিতাভস্ম হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইলেও তত সুখ হইবে না। তাই বলি, শোকের ন্যায় সুখ আর নাই। এবং সেইজন্য পুত্র শোকাতুরা নিরক্ষরা বঙ্গীয়া জননীর ক্রন্দনে এত করুণা ও কবিত্ব নির্গত হয় এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শোকের

কথায় এত নৈপুণ্য বা চমৎকারিত্ব দৃষ্ট হয়। শোকমগ্ন মানব-মানবীর শোকের কথা ভিন্ন অন্য কথা ভাল লাগে না, অন্য কথায় তাঁহারা বিরক্ত হন। তাঁহাদের ধ্যান বড় গাঢ় ও গূঢ়—তেমন সুখ এক জগদম্বার ধ্যান ভিন্ন অন্যকোন ধ্যানে আছে কিনা সন্দেহ। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, দুঃখের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর নাই—আর পবিত্রতম বলিয়াই ইহার ন্যায় সুখকর ধ্যানও নাই। কেন একথা বলিলাম এখনই বুঝিবে। আর একটা কথা। দুঃখ না থাকিলে জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভাল লাগে না। নিছক মিষ্ট বোম্বাই আঁব নিবীর্য্য বালকের ভাল লাগে; কিন্তু বীর্য্যবান বয়স্কের অম্লমধুর ন্যাংড়াই রুচিকর। দিন রাত তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিলে তাকিয়া কণ্টকের বস্তা হইয়া উঠে। জীবনের পথ দুরূহ না হইলে জীবনযাত্রা সুখকর হয় না। সহজ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃপ্তি হয় না। কঠিন প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে পরীক্ষা দিয়া সুখ ও গৌরব বোধ হয়। জীবনযাত্রায়ও তেমনি যদি নানা দুঃখকষ্টে পড়া যায় এবং সেই সব দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া ওঠা যায় তবেই দেখা যায় যে, মনের বল বাড়িয়াছে এবং যাহাকে মনুষ্যত্ব বলে তাহারও উন্মেষ হইয়াছে। এবং মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইলে সকল দিকেই উন্নতি সম্ভব হয়। তোমার একটী ছেলের জ্বর-বিকার চলিতেছে। তুমি নানা বিভীষিকা দেখিতেছ। যদি অধীর অস্থির ভীতিবিহ্বল হও তবে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটাইয়া নিশ্চয়ই তোমার বিপদ বাড়াইয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি ধৈর্য্য স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া চিকিৎসা বিভ্রাট না বাধাও তাহা হইলে বিপদে তুমি কূল পাইবে। এইরূপে বিপদে কূল পাইতে হইলে মনের যে শক্তির প্রয়োজন তাহা লাভ হইলে যে মানুষ নয় সেও মানুষ হইয়া যায়। শোকে মানুষকে বিহ্বল করিয়া থাকে। কিন্তু শোক সংযত ও অবিচলিত থাকিতে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন তাহা লাভ হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। তাই বলি দুঃখ-কষ্টে মানবের পরম মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। অতএব দুঃখ-কষ্ট পাইতে হয় বলিয়া বিধাতাকে গালি দিও না বা তাঁহার নিন্দা করিও না। বিধাতা অমঙ্গল হইতে মঙ্গল আনিয়া দেন। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম! কঠিন ও কঠোর না হইলে শক্তিশালী হওয়া যায় না; মনুষ্যত্ব লাভে অক্ষম হইতে হয়। দুঃখ-কষ্টে স্থির ধীর ও অবিচলিত থাকিতে হইলে কঠিন ও কঠোর হইতে হয়। নহিলে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হয়। দুঃখে মানুষ গঠিত হয়, সুখে মানুষ এলাইয়া যায়। যীশুখৃষ্ট বড় কষ্ট সহিয়াও, শত্রুর জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া আধখানা পৃথিবীর আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন। সীতা দেবী বিষম কষ্ট সহিয়াছিলেন তাই আজ সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ রমণী। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ অম্লান মুখে চৌদ্দ বৎসর বনবাস কষ্ট সহিয়াছিলেন বলিয়া চিরকাল

মানবের মধ্যে প্রধান পুরুষ হইয়া আছেন ও থাকিবেন। যুধিষ্ঠিরাদির এত যে গৌরব সেও সেই জন্য। মানবের হিতার্থই বিশ্বে বিধাতার দুঃখের সৃষ্টি। দুঃখ ভোগ করিতে শেখ, দুঃখ অতিক্রম করিবার শক্তি যাহাতে জন্মে তাহা কর, মানুষ হইয়া যাইবে। আমার মধ্যম জেঠামহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন চন্দ্র বসু প্রথমে ট্রেজারিতে ৮০ টাকা বেতনের চাকরী করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা বেশী বেতনের একটা চাকরী খালি হইলে সাহেবেরা তাঁহাকে তাহা না দিয়া আর একজনকে দিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাদা রাগ করিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আমাদের সংসারের বড় কষ্ট হইয়াছিল। আমার পিতা তখন আমাদের সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন দাদাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাদা এক বন্ধুর কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া কণ্ট্রাক্টের কাজ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কিন্তু তাঁহার লোকসান হইল। তখন তাঁহার দুরবস্থার সীমা রহিল না। তিনি অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করিলেন কোথায় ছিলেন আমরাও জানিতে পারি নাই। বোধ হয় সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ধনাঢ্য না হইলে লোকালয়ে আর মুখ দেখাইবেন না। হইলও তাই। তিনি বড় বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী মানুষ ছিলেন। তাঁহার বন্ধু ছিলেন আমার আচার্য্যদেব শক্তিউপাসক শক্তিশালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। অজ্ঞাতবাসের ২/১ বৎসর পরেই বৃন্দাবন দাদা কৃতী লোক বলিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কষ্টে পড়িয়া তাঁহার মানসিক শক্তির অসাধারণ বিকাশ হইয়াছিল—সেইজন্য যে কাজে হাত দিতেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন। সেইজন্যই ত যখন আউধ ও রোহিলখন্দ রেলপথ প্রস্তুত হইতেছিল তখন ডাক্তার মেক্রে (Dr. Alexander Macrae) বৃন্দাবন দাদাকে অংশীদার করিয়া ঐ রেলপথ নির্ম্মাণার্থ দ্রব্য সরবরাহের জন্য Alexander Bose & co.—এই নামে রাধাবাজারে হৌস করিয়াছিলেন। এইজন্য আমার শক্তিশালী আচার্য্য এবং বৃন্দাবন দাদা হরিহরাত্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুঃখ-কষ্টে পড়িলে বিধাতাকে গালি দিও না, বৃন্দাবন দাদার মত দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিবার শক্তি সঞ্চয় করিও, মানুষ বলিয়া গণ্য হইবে। যে মাঝি বার বার তুফানে পড়িয়া নৌকা রক্ষা করিতে পারে সেই পাকা মাঝি হয়। যে মাঝি কখনও তুফানে পড়ে না সে কাঁচা মাঝি—তাহার নৌকায় উঠিতে সাহস হয় না। সংসারের তুফানে ভীত না হইয়া শক্ত করিয়া মনের হাল ধরিয়া থাকিও, দেখিবে তুফান ঠেলিতে কত সুখ! কত আনন্দ! পৃথিবীতে অসীম সুখত আছেই, আবার যে দুঃখ আছে তাহাতেও কি উচ্চ আনন্দ! এমন পৃথিবী কি আর হয়! আর তুফান ঠেলিতে ঠেলিতে জীবনযাত্রা যখন শেষ হইয়া আইসে তখন উহা কেবল ছেলেখেলা হয় নাই ভাবিয়া কৃতার্থ হইতে হয়।

দুঃখের আর এক ব্যাপক মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সে রূপ দেখা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মপর ভেদ না ভুলিলে তাহার কল্পনাও হইবে না। সাধনা বলে যাঁহারা লোকাতীত দৃষ্টির সাহায্যে সেই বিরাট দুঃখের বিরাট চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—আমরা অযোগ্য হইলেও আমাদের জন্য তাঁহারা অবিনশ্বর তুলিকায় যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। আইস দেখি সে ছবি কেমন? সে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি—সাধক তাঁহাকে ধ্যানে দেখিয়াছিলেন। ত্রিভুবনের যাবতীয় সুন্দর বস্তু হইতে যেমন তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া দেব সুন্দরী তিলোত্তমার সৃষ্টি—সে নারীরও তেমনি পদনখর হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত দুঃখে গড়া—তাঁর বেদনার চরণ, বেদনাময় কর, ব্যথাভরা ব্রহ্মাণ্ডজোড়া বুক। সাধক তাঁহাকে ভাবের ঘোরে অনন্ত পুরাইয়া অনন্ত মাতাইয়া মা বলিয়া ডাকেন। বিশ্বের দুঃখে দ্রবময়ী সে মায়ের আলুলায়িত কেশ, বিগলিত বেশ—তাঁর অঙ্গে অঙ্গে, তিলে তিলে নয়, পুঞ্জে পুঞ্জে রাশিতে রাশিতে সমুদয় জগতের সমগ্র বেদনার একত্র সমাবেশ। তাই তিনি মসিবর্ণা—সাধকের বড় সাধের কাল মেয়ে কালী। সাধক তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে পান নাই—গোলোকে দেখেন নাই—দেখিয়াছিলেন দুঃখের লীলানিকেতন শ্মশানে—দুঃখের সঙ্গিনী ভুত-যোগিনীর সনে। যখন মনে হয় সব ফুরাইল—মুষ্টিমেয় ভস্ম এবং কয়েক খণ্ড অস্থিমাত্র অবশেষ রাখিয়া—আশা-আকাঙ্ক্ষার আধার জীব শূন্যে লীন হইল—তখন সাধক দেখেন সেই উপেক্ষিত অস্থি—সেই অনাদৃত ভস্ম একজন অতি সমাদরে সংগ্রহ করিতেছেন—শ্মশানের ধূলিতে তাঁর রাঙা পা ধূসরিত। সেই অস্থির হাড় গাঁথিয়া তিনি বক্ষে ধারণ করেন—সেই ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তিনি অন্তরের জ্বালা জুড়ান। এত যাঁর মমতা তাঁর জীবন নাকি আবার লোপ পায়! মায়ের অঙ্কে উঠিয়া দুঃখের কি অপরূপ রূপ ফুটিয়াছে বল দেখি! এ দুঃখ যদি পতিতপাবন না হয়—তবে পতিতপাবন কাহাকে বলে জানি না। ইহাই তন্ত্রকারের ধ্যানলব্ধ দুঃখের প্রতিমা। এই দুঃখরূপিণীকেই তিনি অজা, অসংখ্য প্রজার জননী এবং ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা শুধু কবিকল্পনা নহে—এ নির্দ্দেশের গুরুত্ব যে কত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কর্ম্মবাদীর নিকট শুনিয়া থাকিবে বিশ্বের কর্ম্মেই উৎপত্তি—কর্ম্মেই স্থিতি—কর্ম্মেই লয়—অনাদি কর্ম্মপ্রবাহ অনন্তকাল প্রবাহিত। বিশ্ব তাহাতেই একবার উঠিতেছে একবার ডুবিতেছে। সাংখ্যকারও বুঝাইয়াছেন—সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সবই এক অব্যক্তের বিকার—তিনিই ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী। আবার বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকের মুখে শুনি:

"জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতং মায়য়া"—জগৎ মায়ার লীলা, ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবৎ এক অনির্ব্বাচ্য বস্তুর খেলামাত্র। তান্ত্রিক-সাধক তাঁর

জননী মূর্ত্তিতে দুঃখের আকারে এই বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি কর্ম্মবাদীর কর্ম্মের পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁর সেই ব্যথাময়ীকেই ব্রহ্মের অঙ্কশোভিনী আনন্দময়ী বলিয়া অর্চ্চনা করেন।

বাস্তবিক সমগ্র তন্ত্রই জীবনিস্তারার্থ এই মায়ের অলৌকিক উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। তন্ত্রের যে স্থান ইচ্ছা খোল দেখিবে—মা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছেন বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ছেদ নাই। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা সুরধুনীর ন্যায় তন্ত্রকে মাতৃহৃদয়োল সমবেদনার এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা বলিলেও হয়। জীবের জন্য এত ব্যাকুলতা এত সহানুভূতি এত ভাবনা আর কোথাও মিলে কিনা সন্দেহ—মিলিবার কথাও নয়। মহেশ্বরী প্রশ্ন করিতেছেন উত্তর দিতেছেন স্বয়ং সদাশিব। এই প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে মহেশ্বর একস্থলে বলিয়াছেন :

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥"

'সাধিয়া বিশ্বের হিত তোষ বিশ্বাত্মায়'—হিতের দ্বারা অহিতের অর্চনা করিতে হয়—সুখের উপচারে দুঃখের পূজা করিতে হয়—মঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গলের সেবা করিতে হয়; সর্ব্বমঙ্গলা যে মঙ্গলামঙ্গল উভয়েরই জননী, কোনটাই ত তাঁহার উপেক্ষণীয় নয়। যতদিন দ্বৈতবোধ, ততদিন 'এ আমি হাঁসে কাঁদে ভাবে কত নানা ছাঁদে' ততদিন মঙ্গলামঙ্গলের বিরোধ ঘটাইও না। একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করিতে ভুলিও না। দ্বৈত জগতে দুঃখ সুখকে খোঁজে—অমঙ্গল মঙ্গলকে চায়—অহিত হিতের জন্য ব্যাকুল। সাধক বুঝিয়াছিলেন,

মা বাসনা বিহগীবেশে, আসে যায় হৃদাকাশে
সুখ দুঃখ দুই পক্ষ করিয়া বিস্তার—

তাই তিনি কাহাকেও উপেক্ষা করেন না, কাহাকেও অনাদর করেন না।

সাধনমার্গে চলিতে আরম্ভ কর—আরও কত সংবাদ পাইবে। সে মার্গে স্তরের পর স্তর—সোপানের পর সোপান সাজান আছে—যত পার চলিয়া যাও সে পথের শেষ পাইবে না। যতই অগ্রসর হইবে ততই নানা স্তর নব নব সোপান আবির্ভূত হইতে থাকিবে। কিন্তু এ পথও যেমন অফুরন্ত মায়ের পাথেয় বিধানও তেমনি অপূর্ব্ব। লীলাময়ী আপন লীলা আপনি সংবরণ না করিলে, আপনাকে আপনি চিনাইয়া না দিলে, কে তাঁহাকে চিনিতে পারে—কে এ পথের অন্ত পায়? জীবকে তিনি ত অনন্তকাল নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছেন :

"ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্
পশ্যন্তি চিন্ময়ী দেবী সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী।"

কিন্তু জীবিত তাঁহাকে দেখে নাই। তিনি দেখা না দিলে দেখিবেই বা কেমন করিয়া? তিনি নিজের ঘোম্‌টা নিজে না খুলিলে খুলিবে কে? একজন মাত্র সক্ষম। তিনি ভূতভাবন ভূতপতি। তাঁহারই হাত দিয়া মা নিজের ঘোমটা নিজেই খোলাইয়া সেই অবগুণ্ঠন অপসারণের প্রণালী তাঁহারই মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। উহাই তন্ত্রের কুলাচার।

"জীবঃ প্রকৃতি তত্ত্বঞ্চ দিককালাকাসমেবচ
ক্ষিত্যপ্তেজো বয়বশ্চ কুলমিত্যভি ধীয়তে।"

জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু—এই সকলের নাম কুল। ইহাকে কুল বলিব কি অকুল বলিব তাহা বুঝিতে পারিনা—তবে একথা নিশ্চিত যে ইহাই মায়ের ঘোম্‌টা খোলা ছবি—ইহারই অভ্যন্তরে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই নিহিত।

"ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ
কুলাচার স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদঃ।"

ব্রহ্মবুদ্ধিতে এই সকলের ভাবনারই নাম কুলাচার।

পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তত্ত্বময়ী কুলেশ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া যেদিন সাধক কুলাচারে সিদ্ধ হন সেদিন তাঁহার জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। সেদিন তাঁহার সুখের হাট এবং দুঃখের মেলা উভয়েরই অবসান ঘটে এবং মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সেই অদ্বৈত তত্ত্বে তাঁর দ্বৈতপ্রপঞ্চলীন হইয়া যায়।

১৩১১ সালে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বঙ্গভাষায় লেখক প্রথম ভাগ"গ্রন্থে চন্দ্রনাথ বসুর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। তা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺সতীনাথ বসু, পিতামহ ৺কাশীনাথ বসু। ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল! পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি নাই।

হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে, আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম, এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতাম। এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম। স্কুল কালেজের ছুটী হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না, ছুটী ফুরাইলে একমাস দেড় মাস পরে

কলিকাতায় আসিতাম—তাও একরকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রামও দেখিলনা, সে গ্রাম্য সুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইল। সে গ্রাম্য-জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।

কৈকালা তখন জনপূর্ণ ছিল। তথায় প্রায় একশত ঘর ব্রাহ্মণ এবং প্রায় চারি শত ঘর তন্তুবায় ছিল। কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিও অনেক ছিল। সকলেই এক রকম স্বচ্ছন্দে ছিল। কারণ ধান চাল সস্তা ছিল এবং স্বাস্থ্য-সুখে কেহ বঞ্চিত ছিল না। কৈকালায় মিহি মোটা বিস্তর বস্ত্র বয়ন হইত—সে বস্ত্রের বড় আদর ছিল, খুব নাম ছিল, খুব কাটতি ছিল। কৈকালায় প্রকৃত ধনাঢ্য তন্তুবায় ছিল। কৈকালা গ্রামে কুড়ি পঁচিশখানা পূজা হইত, কত ঘরে দোল দুর্গোৎসব হইত। কিন্তু কৈকালা আজ ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য—গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন চলিয়া গিয়াছে—গ্রামে গৃহ অতি অল্পই আছে। পথের দুই ধারে কেবল কাঁতড়া পড়িয়া রহিয়াছে। তন্তুবায় দুই দশ জন মাত্র আছে—তাহারা এখনও কাপড় বুনিতেছে, হাবড়ার হাটে তাহাদের কাপড়ের আদর এখনও আছে—কিন্তু দুই দশজন বৈ নয়, তাও ম্যালেরিয়ায় মৃতবৎ। কয়খানা কাপড়ই বা বুনিবে, কয়টা টাকাই বা পাইবে? সমস্ত গ্রামে এখন একখানি মাত্র পূজা হয় (বসুবাড়ীতে)—তাহাতেও ব্রাহ্মণভোজনের সময় কুড়ি প‌ঁচিশটার অধিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। বাগ্দী-দুলে সব মরিয়া গিয়াছে—তারকেশ্বর রেল রাস্তা নির্ম্মাণার্থ অন্য স্থান হইতে আনীত কুলী-মজুর—কোল সাঁওতাল—তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বন্য শূকরাদি হিংস্র জন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোনার কৈকালায় যাই নাই। এত দিনের পর অবসর গ্রহণ করিলাম। আজ সেই সোনার কৈকালায় বসিয়া সেই বাল্যসুখ উপভোগ করিব। কিন্তু তাহা আর হইল না। কি জানি কে শত্রুতা সাধন করিল—আমার সেই সোনার কৈকালা মাটী করিয়া দিল। অথবা বিধাতাই আমাদের প্রতি বিমুখ!

পঞ্চমবর্ষে যথারীতি হাতে খড়ি হইলে পর আমি পাঠশালায় প্রবেশ করি। আমাদের বাড়ীতেই পাঠশালা ছিল। উদয় নামক এক ব্যক্তি আমাদের গুরুমহাশয় ছিলেন। (তাঁহার অসাক্ষাতে) তাঁহাকে আমরা উদো মোশাই বলিতাম। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। সদর বাটীতে পাঠশালা বসিত। সেখান হইতে আমাদের অন্দর বাটী কিছুদূর। মনে আছে, একদিন অপরাহ্নে বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া গুরুমহাশয় একটি গোলপাতার ছাতা মাথায় দিয়া আমাকে কোলে করিয়া অন্দরবাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমার

পিতামহের চারি পুত্রের মধ্যে কেবল কনিষ্ঠ, আমার পিতৃদেব বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লইয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। ইংরেজী শিখাইবার জন্য তিনি আমাকে হেদোর স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমাদের বাসা শিমলার বাজারের প্রায় সম্মুখে। সুতরাং ঐ স্কুলের অত্যন্ত নিকটে ছিল বলিয়াই বোধ হয় তথায় পাঠাইয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের স্কুল, হয় ত আমাকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে, আমার সর্ব্বদা এই ভয় হইত আমাদের মাষ্টার নস্য লইতেন। তাঁহার হাতে একটি নস্য দান থাকিত। আমি মনে করিতাম, উহাতে গোমাংস আছে। কবে জোর করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিবে। আমার স্বর্গীয় পিতামহীর নিকট এই কথা বলিয়াছিলাম। ছয় মাস মাত্র হেদোর স্কুলে রাখিয়া পিতা আমাকে ওরিয়েণ্টল সেমিনরির শাখা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ওরিয়েণ্টল সেমিনরি স্বর্গীয় গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত। তখন বড়ই প্রসিদ্ধ, এখন খর্ব্ব হইয়াও সুন্দরভাবে পরিচালিত। তখন উহার দুই তিনটি শাখা ছিল—একটী কলিকাতায়, উহারই নিকটে, আর একটী ভবানীপুরে, আর একটী বেলঘরিয়ায়। মূল ও শাখা স্কুল কয়টীতে বোধ হয় দেড় হাজার বালক শিক্ষালাভ করিত। মূল স্কুলে ইংরাজী সাহিত্যের বড়ই আদর ছিল। তজ্জন্য উহার যেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল, বোধ হয় কলিকাতায় আর কোন স্কুল বা কলেজের সেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল না। অঙ্ক ও বাঙ্গালায় তত মনোযোগ ছিল না। এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে শাখা স্কুল হইতে মূল স্কুলে গিয়াছিলাম। তাহার কারণ, হেড মাষ্টার মহাশয়কে দুই চারিটা কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি অর্থ জানিতেন না, আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য চড় মারিয়াছিলেন। তখন আমার Pope's Iliad পড়া হইয়া গিয়াছিল। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় (বিবাহবিভ্রাট প্রণেতা আমার স্নেহাস্পদ অমৃতলালের পিতা) আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, আমার ক্লাসের কয়েকটী ছেলে আমাকে তাড়াইবার জন্য প্রতিদিন টেবিল চাপড়াইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম—একটী কথাও কহিতাম না, কৈলাসবাবুকেও কিছু বলিতাম না। গানের গোড়াটা মনে আছে—

"চতুরঙ্গের কিবা ছিরি মরি হায় হায়
পেট মোটা গলা সরু, বেটা যেন বামনের গরু॥"

তাহারা দিন কতক এইরূপ করিয়া আপনারাই পলাইয়া গেল। তখন স্কুলের স্থাপয়িতা গৌরমোহন আঢ্য লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺ হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় স্কুলের অধিকারী ও অধ্যক্ষ জ্যেষ্ঠের কীর্ত্তি রক্ষণে বড়ই যত্নশীল উচ্চ শ্রেণীতে তিনি বড় বড় ইংরাজ ইউরোপীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। প্রসিদ্ধ

কাপ্তান রিচার্ডসন, হার্মান জেফরয়, কাপ্তান নামার, উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, রবার্ট ম্যাকেঞ্জি—এইরূপ লোকে উপরে অধ্যাপকতা করিতেন। আর নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকতার যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, সেরূপ বোধহয় আর কোন স্কুলে কখন হয় নাই। বাঙ্গালী বালকের ইংরাজী উচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ হয় বলিয়া ওরিয়েণ্টল সেমিনরির নিম্নতম শ্রেণীতে একজন ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাহাতে ছোট ছোট ছেলেরা প্রথম হইতেই শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শিক্ষিত এবং সংখ্যায় অধিক হইলেও সুশাসনে থাকিত।

যখন জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ Preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন সাহেব আমাদিগকে দুই একদিন পড়াইয়া ছিলেন। এণ্ট্রান্সের পাঠ্যের মধ্যে Roger's Pleasures of Memory নামক কাব্য ছিল। প্রথম দিন সাহেব Rogers' Goldsmith, Campbell, Akenside, Thomson প্রভৃতি descriptive কাব্য প্রণেতাদিগের দোষগুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তেমন কথা আর কখন শুনি নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কাছে দুই চারিদিনের বেশী পড়া হয় নাই—তিনি বিলাতে চলিয়া গেলেন। দুই দিনেই কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার মতন অধ্যাপক বঙ্গে আর আসেন নাই।

আমাদের একটি ক্লব ছিল—নাম ওরিয়েণ্টল ডিবেটিং ক্লব। কেবল ছাত্রদিগের ক্লব। আমরা আপনারাই পর্য্যায়ক্রমে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম এবং আপনারাই তর্কবিতর্ক করিতাম। বার্ষিক অধিবেশনেও আমরাই প্রবন্ধ পাঠ করিতাম। এখন অনেক লাইব্রেরী ও রিডিং রুম হইয়াছে। তথায় বড় বড় সাহেব ধরিয়া আনিয়া তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করা হয়। সভ্যেরা আপনারা প্রবন্ধ পাঠ, তর্কবিতর্ক কিছুই করেন না। আমাদের সেই ক্লবের পদ্ধতি অবলম্বন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

ইং ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই. অঙ্কে ও বাঙ্গালায় এতই কাঁচা ছিলাম, উত্তীর্ণ হইবার পর স্থির হইল যে, আমাকে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে, পিতৃদেব মাসে দশ টাকা করিয়া বেতন দিয়া আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু বিধাতা একটু অনুকূল হইলেন। Atkinson সাহেব তখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেকটার বা অধ্যক্ষ। তিনি বড় উদারচেতা ছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ একটী ছাত্রকে আট টাকা মুল্যের একটী ছাত্রবৃত্তি দিবেন। হরেকৃষ্ণবাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সাশ্রুলোচনে ঐ কথা বলিলেন। ১৮৬১ সালের প্রারম্ভেই আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

প্রথম বার্ষিকি শ্রেণীতে ৺প্যারীচরণ সরকার আমাদিগকে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতেন। অতি অল্প অধ্যাপককেই তাঁহার ন্যায় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পড়াইতে দেখিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করিয়া তিনি আমাদিগকে ইতিহাসের প্রশ্ন দিতেন, আমরা বাড়ী হইতে উত্তর লিখিয়া লইয়া যাইতাম, তিনি সেই সত্তর আশিখানা উত্তর সাবধানে সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। Carnduff নামক একজন অধ্যাপকও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লেখাইতেন, শুনিতে পাই, ঐরূপ লেখাইবার প্রথা এখন আর নাই। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপক কাউয়েলের নিকট পড়িয়াছিলাম। তেমন অধ্যাপক বুঝি আর হয় না—পাণ্ডিত্য যেমন বহু বিষয়ব্যাপক তেমনই প্রগাঢ়, ছাত্রের প্রতি স্নেহ ও যত্ন বর্ণনাতীত। ১৮৬২ সালে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলাম—প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন রাসবিহারী। যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন ওরিয়েণ্টল ডিবেটিং ক্লবের ন্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজেও আমাদের একটি ক্লব ছিল। ক্লবেও আমরা আপনারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম, আপনারাই তর্কবিতর্ক করিতাম, বাহিরের লোক আনিতাম না। যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমরা Calcutta University Magazine নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামী, যিনি এখন নিজামের রাজ্যে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ, উহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ পত্রে on the importance of the study of histroy নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে Englishman সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—We trust this article is from a native pen, thought we doubt it। আর বলিয়াছিলেন যে উহাতে খুব orginality of thought ছিল। একথা এতদিন কাহাকেও বলি নাই, এখন বলিতে হইল। কাগজখানি পনর মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাহাও কেবল ৺প্যারীচরণ সরকারের অনুগ্রহে হইয়াছিল। তিনি কাগজখানি আপনার প্রেসে ছাপাইয়া দিতেন। আমরা সংসারানভিজ্ঞ—মূল্য আদায়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতাম। ছাপিবার ব্যয় প্রায় চারিশত টাকা দেওয়া হয় নাই, প্যারীবাবু কখনও চাহেন নাই।

১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে বি-এ পরীক্ষা দিয়া আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। রাসবিহারী এবং মৃত অধ্যাপক ব্রকমান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি পরীক্ষায় ব্রকমান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে। কিন্তু ব্রকমান আইন আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন। তুমি কি কাজ করিলে? বঙ্কিমবাবু ঠিক কথাই

বলিয়াছিলেন—আমরা কেবল পরীক্ষা দিতে পারি। ১৮৬৬ সালে এম্-এ এবং ১৮৬৭ সালে বি. এল পরীক্ষা দিয়াছিলাম। শেষোক্ত পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি।

বি. এল. পাস করিয়া সকলে যেমন আদালতে ছোটে, আমিও তেমনই ছুটিয়াছিলাম। চাকরী করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না, তখন মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু হাইকোর্টে গিয়া দেখিলাম, সেখানকার হাওয়া ভাল নয়। মামলা মোকদ্দমা আমার ভালও লাগিত না। শীঘ্রই বুঝিলাম, অনেকে ন্যায় অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বৈরসাধনার্থ অথবা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ নাশ করে। এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হয় এবং সমাজে বিষম অসদ্ভাব এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। মফস্বল হইতে আমার নিকট মোকদ্দমা পাঠাইবার লোকও ছিল না। মোক্তারদিগের খোসামোদ করিতেও পারিতাম না। ওকালতিতে কিছু হইল না দেখিয়া অগত্যা চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল। অধ্যাপকতা করিবার ইচ্ছা হইল। তখন উড্রো সাহেব শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি বড় সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন বিদায় গ্রহণ করণার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—আমি যদি তোমার পিতা হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে এ বিভাগে আসিতে নিষেধ করিতাম। এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না। তেমন করিয়া কথা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারীরা এখন কহেন কিনা জানি না। তিনি পাঁচ সাত দিন পরেই আমাকে কটক কলেজে দুইশত টাকা বেতনের একটী অধ্যাপকতা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, আমার একটী ডিপুটি মেজেস্টরী পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তখন আপনিই বলিলেন—না, অধ্যাপকতা লইও না, ডিপুটী মেজেষ্টরীই লও। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় ডিপুটীগিরি করিতে যাই। ডিপুটীগিরি ভাল চাকরী বলিয়া বোধ হইল না। ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিবামাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে বলিলেন—জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল নাই, কান্তিবাবু আপনাকে চান, যাইবেন কি? আমি যাইলাম। জয়পুরের ন্যায় সুন্দর শহর ভারতবর্ষে আর নাই। জয়পুর মহারাজ জয় সিংহের স্থাপিত। উহার গঠন-প্রণালী বিদ্যাধর নামক একজন বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত। বিদ্যাধরের গলি বলিয়া জয়পুরে এখনও একটি রাজপথ আছে। জয়পুরের দেবালয়ে বাঙ্গালী পুরোহিতের সংখ্যাই অধিক। জয়পুরের রাজকার্য্যে অনেক দিন হইতে বাঙ্গালীর প্রাধান্য। দেখিলাম কান্তিবাবুই জয়পুরের প্রকৃত রাজা। জয়পুরে বিস্তর বাঙ্গালী দেখিলাম। ৺যদুনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটী বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। বালক-বালিকাশুদ্ধ প্রায় দেড়শত বাঙ্গালী ভোজনে বসিয়াছিলাম। জয়পুরে থাকিলে অনেক টাকা করিতে পারিতাম। যেদিন

সেখানে যাই তাহার পরদিনই কান্তিবাবু বলিয়াছিলেন—কলেজের কর্ম্মে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই আপনাকে শাসন বিভাগে আনিব। কিন্তু দেখিলাম, রাজসভার হাওয়া বড় ভাল নয় এবং আপন স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন। সহরটাও দেখিলাম বড় শুষ্ক ও রুক্ষ দর্শন। তিনদিকে তৃণশূন্য পাহাড়, সমতল স্থান তৃণশূন্য, বারিশূন্য, বালুকাময়। আমি বাঙ্গালার ন্যায় বিশাল উদ্যানবিহারী, সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং বঙ্গের বাঙ্গালী, জয়পুরের দৃশ্য আমার ভাল লাগে নাই। তিন মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম—বিধাতাকে বলিতে বলিতে আসিলাম, ঘরেই যেন আমার যৎকিঞ্চিৎ হয়। বিধাতা কৃপা করিলেন। ছুটী ফুরাইবার অগ্রেই বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ খালি হইল। কয়েকজন ঐ পদের প্রার্থী হইলেন। স্যার আল্‌ফ্রেড ক্রফট বলিলেন—চন্দ্রনাথ যদি প্রার্থনা করেন, আর কেহ এ কর্ম্ম পাইবেন না। তাঁহার কাছে আমি পড়ি নাই। তাঁহারা কিন্তু উপাধিধারীদের সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষাবিভাগের পদস্থ সাহেবেরা এখন রাখেন কি! ১৮৭৯ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে আমি ঐ কর্ম্ম পাই। পাইয়া ৭ বৎসর কয়েকমাসে বিস্তর বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাহার আমার সহোদর সদৃশ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অতি অকালে স্বর্গারোহণে করায় ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে আমি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হই। অনুবাদকের কাজ যেমন কঠিন, তেমনই অপ্রীতিকর। পরিমাণে প্রায় অসীম। বড় অনিচ্ছায় এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রহণ করিবার পর ইহাকে ধর্ম্মচর্য্যার তুল্য ভাবিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া বিগত ১লা জানুয়ারীতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি।

গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে বাঙ্গালা শেখা হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম দুই বৎসর যাহার কাছে বাঙ্গালা পড়িয়াছিলাম তিনি বাঙ্গালী বটে, কিন্তু বাঙ্গালা জানিতেন না, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আটক পড়িতে হয় নাই। বাঙ্গালার পরীক্ষা শব্দ-গত না হইয়া এত অর্থ-গত হইত। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। ভালই পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু গোড়া কাঁচা ছিল, তাঁহার অধ্যাপনায় বিশেষ ফল পাই নাই। তিনিও সংস্কৃতে বেশ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত আমাদের পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং উহাতে তত মনোযোগী না হইয়া, পাঠ্য নয় এমন ইংরাজী পুস্তক বহুল পরিমাণে পড়িতাম। ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটাও কতক ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছিল। একদিকে যেমন দেবদেবীতে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত। যখন বি-এ পাস করি নাই তখন ৺গিরিশচন্দ্র

ঘোষের Bengalee কাগজে লিখিতাম। এম্-এ পাস করিয়াই on the life and character of oliver Cromwell নামক একটা প্রবন্ধ পড়িয়া ছাপাইয়াছিলাম। এইরূপ যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। বঙ্গদর্শন পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি; কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গালায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিম-বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীব-বাবুর হাতে বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞানশকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লিখিবার পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকি প্রেস যে বাড়ীতে ছিল বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদক আমার ঋষিতুল্য বন্ধু পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেই বাসায় থাকিতেন। তাঁহার অনুবাদ কার্য্য তখন চলিতেছিল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুই চারিজন তাঁহার নিকট যাইতাম এবং রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সাহিত্য শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। অভিজ্ঞানশকুন্তলের আলোচনাও হইত। শকুন্তলা তত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংবাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্যকোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি তাহা সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।

যখন কলেজে পড়ি, তখন আমার দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল না, আমি সত্যধর্ম্ম খুঁজিতাম। তখন কেশববাবুর ধর্ম্মান্দোলনের ধুম পড়িয়াছিল; অনেক যুবক তাঁহার চেলা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন উদ্যমশীল চেলা পড়িতেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম—কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতাম। কিন্তু তাহাতে Reed, Hamilton, Kant, Victor cousin প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের কথাই অধিক থাকিত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তাহার পর অগস্ত কোমতের দুই একখানি গ্রন্থ পড়ি এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম কোমতের প্রণালীতে আমাদের সমাজ প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। বড় আহ্লাদ হইল, কিন্তু কোমতের ঈশ্বর নাই দেখিয়া তাঁহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। দ্বারকানাথকে বলিলাম। মহামনা মহাপুরুষ বলিলেন—তবে জোরে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাক। আবার সত্যধর্ম্ম খুঁজিতে লাগিলাম। ইংরাজীতে দেখিতাম, ইংরাজের মুখে শুনিতাম, Religion কেবল ঈশ্বর

লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম—তবে ঈশ্বর ছাড়া এত বস্তু ব্যাপার রহিয়াছে ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিম-বাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে বলিয়া বঙ্কিমবাবু চূড়ামণি মহাশয়কে একদিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মকথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন—ধৃ-ধাতু হইতে ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম—অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ধর্ম্মের অন্তর্গত দেখিলাম, বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়াই বিনাশ করে; যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে যখন দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল না ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলাম তখন আমাদের সবই মন্দ মনে হইত। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৮৭৭ সালে Betheme Society নামক সভায় High Education in India নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের জাতিভেদ প্রণালীর নিন্দা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর শাস্ত্রের কথা শুনিয়া এবং সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ প্রণালীর যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়া অক্ষয়চন্দ্রের "নবজীবনে" জাতীয় চরিত্র বর্ণভেদ প্রণালী শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহা পড়িয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন—"আমিও জাতিভেদটাকে অত্যন্ত জঘন্য জিনিস মনে করিতাম, কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত উল্টাইয়া গিয়াছে।" নবজীবনের ঐ প্রবন্ধটী সৎপ্রণীত ত্রিধারা নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রায় সমস্তই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে শকুন্তলাতত্ত্বে, ফুল ও ফলে, ত্রিধারায়, হিন্দুত্বে, সাবিত্রীতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়াছি। কঃ পন্থাঃ শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। হিন্দু সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টী মনুষ্যোচিত, উহাতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি নামক একটী প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম। পরিষৎ তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাটীতে ছিল এবং দ্বিজেন্দ্রবাবু উহার সভাপতি ছিলেন। কি জন্য উহা পরিষৎ পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিতে পারি না। আমি উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছি। সাধু ও অসাধু দুই প্রকার বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বঙ্গের সকল স্থানের সুবিধা ও উন্নতির জন্য এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার একতা বর্দ্ধনার্থ সাধু ভাষায়ই অবস্থানীয়, এই প্রবন্ধে এই মত স্থাপন করিবার চেষ্টা

করিয়াছি। একখানি জাতমাত্র মৃত মাসিক পত্রে ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোথাও এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ দেখি নাই। উক্ত পত্রের প্রতিবাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। অথচ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তখনও যেমন অসাধু ভাবায় ব্যবহার করিতেন এখনও তেমনই করিতেছেন। হিন্দুত্বে হিন্দুর মানসিক বিশেষত্বের এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু বিবাহ প্রণালী, সাকার পূজা প্রভৃতির যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল স্থানে এই সকল মতের প্রতিবাদ দেখিব মনে করিয়াছিলাম সে সকল স্থানে এ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ দেখি নাই। অথচ এই সকল মত গৃহীত হইবার লক্ষণ কোথাও দেখি না। 'বেতালে বহু রহস্য' সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলিতে পারি না—আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

———

পিতা-পুত্র

৺রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর ও শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

আমার ও পিতৃদেবের জীবনী লিখিতে আমি অনেক দিন হইতে অনুরুদ্ধ ছিলাম; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আমাদের সাহিত্য-জীবনের কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল অনুরোধ রক্ষার চেষ্টা করিতেছি।

আপনার জীবনী, আপনি লেখা,—বড়ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ আমি কোন কাজ করিলাম না, কোন কর্ম্ম করিলাম না, আমার আবার জীবনী কি?

যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন Rule of Three খুব সত্বরে কসিতে পারিতাম। Bernard Smith-এর সামুকের (snail) অঙ্ক অনেকে কসিতে পারে নাই, আমি কসিয়াছিলাম— এই সকল কারণে আমাকে তখন Genius বলিত। এ সকল কথা কাগজে, কালি-কলমে বা ছাপাইয়া জগতে প্রচার করা, ভাল কি মন্দ তাহা ত বুঝিতে পারি না।

যৌবনে 'সাধারণীতে' যেরূপে তথা কথিত রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলাম, সেরূপ ভাবে, সেরূপ কথার যদি এখন পুনরাবৃত্তি মাত্র করি, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে শ্রীঘর বাসের বিবরণ আবার ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে। তাহা ত পারিব না; সুতরাং যৌবনের কীর্ত্তির-অকীর্ত্তির পুনরালোচনা চলে না।

প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে আমার জীবন—যমে মানুষে টানা-টানির পালা। কখন যম জিতিতেছে, কখন আমি জিতিতেছি। কলিকাতা, কটক, চুঁচুড়া, ইটোয়া, বৈদ্যনাথের ঘরের কোণে, নিভৃতে, নীরবে, বিনা আড়ম্বরে—এই যে রুষ-জাপান সমর, ইহার বিবরণ তোমাদের পড়িতে ভাল লাগিবে কেন? অন্তত ভাল লাগিবে না, আমি বুঝিয়াছি; সেরূপ বুঝিয়া, আমি লিখিতে যাইব কেন?

অতএব আপনার জীবনী লিখিব না। পিতৃদেবের জীবনীর দুই চারি কথা বলিব, আর তাঁহার আমার জীবনের যে ভাগের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ, তাহাও কিঞ্চিৎ লিখিতে চেষ্টা করিব। আমার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধে, শিক্ষার কথাই বলিব, পরীক্ষার কথা একটু আধটু থাকিবে মাত্র।

একটা কথা গোড়ায় বলিয়া রাখা ভাল। অনেক বয়সে পিতৃদেবের মুখে সে কথাটা শুনিয়াছিলাম। পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদেব ঢাকা হইতে যখন আসেন, তখন মহা আড়ম্বরে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। সেইরূপ একটী বিদায়

সভার মুখপাত্র বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ পিতৃদেবের প্রশংসা করে বলিয়াছিলেন, যে গঙ্গাচরণ বাবু গুরুতর রাজকর্ম্মের ভার লইয়াও বঙ্গ-সাহিত্য সেবা হইতে কখন বিরত থাকেন নাই, প্রত্যুত যত্ন পূর্ব্বকই বঙ্গ-সাহিত্য সেবা করিয়াছেন। এই জন্য সাধারণত বাঙ্গালিরা, বিশেষত ঢাকা-বাসীরা, তাঁহার কাছে ঋণী এবং এক মুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে অক্ষম। বাগ্মীপ্রবর বিশেষ দক্ষতা সহকারে ঐ কথার ব্যাখ্যা করেন এবং সভাস্থ সকলেই করতালি প্রদানে পিতৃদেবের প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। সকল বক্তার সকল কথা শেষ হইলে পর পিতৃদেব উত্তরে বলেন "আপনারা আমাকে ভালবাসেন, সুতরাং প্রশংসা করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ঐ সকল প্রশংসাবাদ আমি ভালবাসার পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। তবে বঙ্গ-সাহিত্য সেবার জন্য আমার যে প্রশংসা হইয়াছে, তাহাতে আমি বিস্মিত। মাতৃসেবা না করিলে অধর্ম্ম আছে, সেবা করিলে যে কিছু বাহাদুরী বা প্রশংসা আছে এ কথা আমি জানি না, ও মানি না।"—ঐ কথাই সর্ব্বাগ্রে সকলের নিকটে আমিও বলিতেছি। মাতৃভাষা সেবার কথা বলিব, কিন্তু বাহাদুরীর জন্য অথবা প্রশংসা প্রয়াসে বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবেন না। এ বয়সে এতটুকু বুঝিতে পারি, যে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষের মত একজন, শত জন, বা সহস্র জন বাঙ্গালা ভাষায় চর্চ্চা করেন না বলিয়া, আমি করি, তুমি কর, তিনি করেন—আমাদের কিছু বাহাদুরী বা গৌরব নাই।

আমাদের অন্তত সাত আট পুরুষের ওলন্দাজি চুঁচুড়ার বাহিরে গঙ্গা ধারে বাস ছিল। আমার ঠাকুর দাদা ইংরাজী নবীশ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার নাম ছিল রামবল্লভ মাষ্টার। কথিত আছে রামবল্লভ মাষ্টার ঘাসের ফুলের পর্য্যন্ত ইংরাজী নাম জানিতেন। পিতার মাতামহালয় খন্যানের নিকট শর্শা। আমার ঠাকুরমা ছেলে বেলা Amateur শিশু কবির দলে কবির গান বাঁধিয়া দিতেন।

ত্রিশ সালের বন্যার বৎসর বন্যার সময় অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে, পিতৃদেবের জন্ম হয়। অনেকেরই এখনও মনে থাকিতে পারে, যে অতি সামান্য কথাতেও পিতৃদেব রসের অবতারণা করিতে পারিতেন। তাঁহার জন্ম সময়ের এই ঘটনা লইয়া তিনি বলিতেন যে "ওহে! তোমরা যদি আমার কেহ জীবনী লিখিতে যাও, তবে তোমাদের আরম্ভ করিবার বড় সুবিধা হইবে। স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারিবে, যে দামোদর নদের ও ভাগীরথী নদীর যুগপৎ ভীষণ প্লাবনে যখন সমগ্র বঙ্গভূমি জলে জলময়, অধিবাসীরা যখন স্বীয় স্বীয় ধন-প্রাণ আবাস ভবন লইয়া মহা ব্যাকুল, তখন সেই কুলপ্লাবিনী সুরধুনীর তটভূমি হইতে অতি নিকটে ক্যাঁকলিয়ালীর একটি কুটীরে একটী সদ্যপ্রসূত কৃষ্ণবর্ণ শিশু তদীয় কৃষ্ণবর্ণা মাতার অঙ্ক শোভিত করিয়া বিকট ক্রন্দন করিতেছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ত্রিশ সালে অর্থাৎ এখন হইতে আশী বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা লেখার চর্চ্চা ছিল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে, ব্যবসাদারের খাতায় আর আত্মীয় স্বজনকে 'বন্ধুবান্ধবকেও নয়' পত্র লেখায়; পড়ার চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল। কেবল পাঠশালে বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিতে বসিয়া, মোসাহেব মুকুযো মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে দশবার জন শ্রোতৃমণ্ডলি মধ্যে, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজী ঠাকুর আকড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলি মধ্যে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, দুর্গা প্রসাদের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপই নিয়ত পঠিত হইত।

এই ১২৩০ সাল ইংরাজী ১৮২৩ সাল। এই সময় হইতে সাধারণের শিক্ষার উপর গবরমেণ্টের নজর পড়িল। কার সাহেব কৃত Review of Public Instruction গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম বিভাগে দেখা যায়;—

"Previous to 1823 comparatively little had been done for the advancement of Native Education. The number of Institutions was very limited, and they attracted very little interest. There was no organized system of superintendence. All matters connected with education were under the general control of the Government. But about this time the subject of Native Education began to receive a greater share of attention. * * * In July 1823, several of the most experienced officers of Government residing in Calcutta were formed into a Committee of Public Instruction.

কলিকাতায় তরঙ্গ উঠিল বটে কিন্তু সে তরঙ্গ চুঁচুড়ায় আসিতে ১২।১৩ বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে পিতার বাল্যজীবনে একটী বিষম সঙ্কট ঘটনা ঘটিয়াছিল, পিতৃদেবের বয়স যখন পাঁচ বৎসর হাতে খড়ি হইয়াছে বা হয় নাই, তখন আমার ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়; ঠাকুরমা সহমৃতা হন। আমাদের নিকটে বটতলার ঘাটে, এই কাণ্ড হয়। সে বটগাছটী এখন আর নাই বলিলেও চলে; এই বৎসর প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই "ক্যাকশীয়ালি ঘাটের বটবৃক্ষ"-কে সম্বোধন করিয়া ১২৯১ সালের ১৬ই বৈশাখের সাধারণীতে পিতৃদেব যে পদ্য লেখেন তাহার কিয়দংশ এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

*　　*　　*　　*　　*

আরো তুমি এই স্থানে, দেখিয়াছ সন্নিধানে, কত সতী লয়ে মৃত পতি।
স্বামীভক্তি অনুবলে, চিতার জলন্তানলে, হাস্যমুখে হইয়াছে সতী॥
তব তব জানা আছে, তনু ত্যজে তব কাছে, পতি শয়ে যে সব রমণী।
তার মাঝে এক সতী, পতিব্রতা গুণবতী, এ দীনের ছিলেন জননী॥
বহুকাল হ'ল গত, বৎসর অর্দ্ধেক শত, তদুপরি আর পাঁচ ছয়।
গতাসু হলেন পিতা, মাতা হন সহমৃতা, শৈশবেতে আমি নিরাশ্রয়॥
এ ঘটনা বহুদিন, হয়েছে কালেতে লীন, পুরাকথা মাঝে প্রবেশিত।
আমি কিন্তু নাহি ভুলি, শ্মশানের সেই চুলী, মমহৃদে আছে জাগরিত॥
সেই কাণ্ড দরশন, করিবারে আগমন, নরনারী হল উপস্থিত।
তীর চর উপকূল, আবরিল নর কুল, ঘাটে তরী কত উপনীত॥
আইল বিধর্ম্মী কত, মুসলমান শত শত, আর কত ফিরিঙ্গী ইংরাজ।
দারোগা মুহুরী সনে, ইষ্ট বুঝি হৃষ্ট মনে, অগ্রসর হয় বর্কন্দাজ॥
জনতার পারাবার, নদী তটে সুবিস্তার, কোলাহলে উথলে কল্লোল।
বহুল বিকচ ছাতা, উত্তাপে রাখিতে মাথা, জনার্ণবে তরঙ্গ হিল্লোল॥
হেথা হয়ে ভক্তিমতী, সাত পাক ফিরি সতী, লয়েছেন চিতায় আসন।
রক্ত চেলী পরিহিতা, সিন্দূরে শোভিছে সীঁতা, মুক্তকেশী অপূর্ব্ব দর্শন॥
গলে দোলে পুষ্পমালা, প্রেতভূমি করি আলা, শব পাশে শোভিছে সুন্দরী।
শ্মশানে শঙ্কর যেন, ঘোর ঘুমে অচেতন, বামে বসে আছেন শঙ্করী॥
নয়ন প্রফুল্ল অতি, ভাতিছে ভক্তির জ্যোতি, মুখপদ্মে হর্ষের উচ্ছ্বাস।
অটল বিশ্বাস মনে, লভিবে পতির সনে, অবিলম্বে স্বর্গে চিরবাস॥
পরে সতী এ জগতে, ঐহিক বান্ধব হতে, একে একে লইয়া বিদায়।
পুত্রে আশীর্ব্বাদ করি, পতি শব বক্ষে ধরি, প্রেমানন্দে শুলেন চিতায়॥
মম হাতে নুড়া জ্বলে, মন্ত্র দ্বারা পূত হলে, মুখদ্বয়ে দিলাম ফেলিয়া।
অনেক স্বজন আসি, দেয় তবে তৃণ রাশি, বাড়ে অগ্নি প্রবল হইয়া॥
পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে, শত শত শিখা লয়ে, ভীমাকারে জ্বলিল অনল।
হরিবোল দেয় লোকে, আমি ভয়ে কিম্বা শোকে, ফেলিলাম নয়নের জল॥

*　　*　　*

এই সহমরণের পর সরকারদের সংসারে রহিলেন একজন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ মদনমোহন সরকার আর তাঁহার শিশু পৌত্র গঙ্গাচরণ। সে বেশ সংসার নয়! কিছু দিন পরে পিতা অবশ্য পাঠশালে যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে পাঠশালার সংস্করণে

মিশনরিরা কোথাও কোথাও মনোযোগী হইয়াছিলেন। একজন আমেরিকান মিশনরি মিষ্টার আদাম (Adam) চুঁচুড়ার পাঠশালা সংস্করণের প্রধান উদ্যোগী হন।

বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যের কল্যাণে বৈদ্যনাথ দেওঘরে এখন অনেকেরই গতিবিধি হইয়াছে। বৈদ্যনাথে পাদরিণী বুড়ী মেমকে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এক খানি ছোট ঠেলা গাড়ীতে বুড়ী মেম আধ শোয়া আধ বসা ভাবে আছেন; দুই জনে সেই গাড়ী টানিতেছে, আর একজন ছাতা ধরিয়া তাঁহার মুখে ছায়া করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতেছে। তিনি (Miss Adam) মিস্ আদাম্। তাঁহারই পিতা মিষ্টার আদাম চুঁচুড়ার পাঠশালার প্রথম সংস্কারক। অথবা বিশুদ্ধ প্রণালী-সঙ্গত পাঠশালার সংস্থাপক। আমাদের বাড়ির নিকটে মনসাতলার কাছে, সেইরূপ একটি পাঠশালা ছিল। তাহাতে পিতা পড়িয়াছিলেন, সেই পাঠশালে পিতার সহাধ্যায়ী যদুনাথ বসুর এই বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। সাধারণ পাঠশালা হইতে এই সকল পাঠশালার প্রভেদ ছিল যে, এখানে যত্ব-ণত্ব বা বর্ণশুদ্ধি শিখিতে হইত এবং ছাপার বই পড়িতে হইত। বাবার বাঙ্গালা শিক্ষার এই সূত্রপাত। যদিও পাঠশালার সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ঐ আদাম সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু এই সকল পাঠশালার প্রণালী গবর্ণমেণ্টের ভাল লাগিল না। রিপোর্টে লেখা হইয়াছে "The plan of Village Schools had been tried at the Chinsurah, Dacca, Bhagalpur, Saugor and in the Ajmear district; but in every instance, the result was unsatisfactory and discouraging." ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা চালান স্থির হইল। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই চুঁচুড়াতে স্কুল ছিল। "১৮১৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় (অর্থাৎ বঙ্গদেশের) ইংরাজি স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতুবশত সেই সাহায্য রহিত হয়।" তাহার পর প্রাতঃস্মরণীয় মহম্মদ মহসিনের বিপুল সম্পত্তির একাংশের সরকার বাহাদুর ট্রষ্টী হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ১৬ শ্রাবণ চুঁচুড়াতে College of Mahammad Mahsin খুলিল। ইহাকেই এখন হুগলী কলেজ বলে, যে দিন খুলিল সেই দিনই পিতা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। শুনিয়াছি, সেদিন,—কলেজ খুলিয়াছে—ছেলেরা পড়িতে যাইতেছে —দেখিবার নিমিত্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তখন ভর্ত্তি হওয়ার কোনরূপ সেলামি ত লাগিতই না, স্কুলের মাহিনাও ছিল না। কাগজ, কলম, কালী, খাতা, পড়িবার সমস্ত পুস্তক, অধ্যক্ষেরা ছাত্রগণকে বিনামূল্যে দিতেন। তখন ছিল শিক্ষাদান, তাহার পর এতকাল চলিল শিক্ষা বিক্রয়, এখন আবার শুনিতেছি শিক্ষার

অতিরিক্ত দাম চড়াইয়া, লাট সাহেব নাকি শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। সস্তায় তিন অবস্থা আর থাকিবে না।

পিতৃদেবকে শিক্ষার জন্য কখন কিছু ব্যয় করিতে হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হইয়াছিল। এখনকার দিন হইলে, সেই অসহায় নির্দ্ধন বালকের লেখাপড়াই হয়ত হইত না।

মদনমোহন মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে, পিতার বিবাহ দিয়া যান। তাঁহাদের সংসারে আমার মাতা, মাতামহী এবং প্রমাতামহী ছিলেন মাত্র। শিশু পিতৃদেব, তাঁহাদের অভিভাবক হইলেন, আর তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশ্রূমাতা অভিভাবিকা রহিলেন। আমরা এখন যে বাড়ীতে কদমতলায় বাস করি, এই বাড়ী তাঁহাদের। আর যে কুটীরে পিতা ভূমিষ্ঠ হন, সেই জায়গাগুলি আমাদের আছে; তাহাতে দুই এক ঘর প্রজা এবং একটী শিবের মন্দির আছে। সে স্থানটী গঙ্গার অতি নিকটে।

১৮০৬ সালে পিতৃদেব স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ছিলেন। ১৮৪৫ সালে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষাতে, বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বোধ করি ৪৬ সালে সিনিয়ার বৃত্তি পান, হুগলী কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা ভালরূপই হইত। পিতৃদেবদিগের সময়েও হইত, আমাদের সময়েও হইয়াছিল। আমাদের সময়ে যে ভালরূপ হইত, তাহার সাক্ষী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মধ্য সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী বঙ্কিম বাবু ছিলেন। প্রথম সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন। পিতৃদেব সেই সময় কলেজে অধ্যয়ন কালেই যে ভালরূপ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন, তাহার ধাতুময় সাক্ষী (Medal) আমাদের বাড়ীতে আছে। তাহার এক পিঠে হুগলী কলেজের ছবি, অন্য পিঠে Gangacharan Sarkar. Bengali Essay. 1845. খোদিত আছে। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী-অভিজ্ঞের বাঙ্গালা ভাষার অনভিজ্ঞতার একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প ছিল। লোকে বলে কোকিলের স্ত্রীলিঙ্গ লিখিতে হইলে, তাঁহারা নাকি লিখিতেন 'মেদীকোকিল'। এ দুর্নাম প্রধানত এ কলেজে হরচন্দ্র ঘোষ ও পিতৃদেব কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়। যে ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার লাঞ্ছনা এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সেই লাঞ্ছনা প্রথমে তিনিই প্রচার করিয়াছিলেন। "রাণী! ও মহারাণী! বাহকগণ, বিশেষত তোমার বাহকগণ, হয় খ্যাত্যাপন্ন ভাঙ্‌তে কুশল কালেজের"। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ সদারলাণ্ড সাহেবের বাঁশবেড়ের রাণীকে লেখা একখানি ইংরাজী পত্রের মোসাবিদা হইতে ঐ কলেজের কেরাণী জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ অতি উজ্জ্বল বাঙ্গালা অনুবাদ করেন, তাৎকালিক পরম মেধাবী ছাত্র, আমার পিতৃদেব গঙ্গাচরণ সরকার তখনই তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলেন এবং পরে তাহা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার অনন্ত গল্পের মধ্যে প্রচার করেন। এই অপূর্ব্ব ইতিহাস সকলে জানেন

না। অতএব লোকহিতার্থ তস্ত পুত্র, অধম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, আমি ইহা লোক-জগতে অত্ত প্রকাশ করিলাম।

ভাষায় রসসঞ্চার হইলে, তখন তাহাকে সাহিত্য বলা যায়, ভাষায় লেখা পড়া সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। সাহিত্যের সর্ব্ব প্রথম অবস্থা গান। গানের সঙ্গে কখন কখন ছড়া থাকে। গান ও ছড়া একত্র আমরা পাঁচালি বলি। বাঙ্গালার আদি গীতিকাব্য সংস্কৃত-প্রধান গীতগোবিন্দ-জয়দেব। মৈথিলি-প্রধান বিদ্যাপতি। খাঁটি বাঙ্গালা-গীতিকাব্য-চণ্ডীদাস। সর্ব্বপ্রধান পাঁচালিকার কৃত্তিবাস; পরে মুকুন্দরাম ও কাশীদাস। শ্রীগৌরাঙ্গের পর হইতেই বাঙ্গালায় এক প্রকার খুচরা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। খুচরা বলিয়া তাহাকে 'কড়চা' বলে। সেইগুলি ছাড়িয়া দিলে, প্রথম গদ্য লেখক, রাজীবলোচন রায়। তিনি আন্দাজি ১৭২৫ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় গদ্য-গ্রন্থকার রামরাম বসু। তিনি প্রতাপ আদিত্যের জীবন চরিত লেখেন। এই দুই গ্রন্থই বিলাতে লণ্ডনে ছাপা হয়। এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই খানির একখানি সমগ্র গ্রন্থও আমরা দেখি নাই। কিছু কিছু অংশ নানাস্থান হইতে দেখিয়াছি মাত্র; তৃতীয় গদ্য গ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয়* তর্কালঙ্কার। ১৭৬২।৬৩ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ; খনের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান। মেদিনীপুরে তখন একভাগ বাঙ্গালা এক ভাগ হিন্দি, এক ভাগ উড়িয়া, সুতরাং মেদিনীপুরে একরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় নাটোর-রাজের সভাপণ্ডিতের নিকট তখনকার অর্দ্ধ বাঙ্গলার রাজধানী নাটোর নগরে, বিদ্যাশিক্ষা করেন। এবং পরে যৌবনে কলিকাতায় বাস করেন। সুতরাং তাঁহার ভাষা একরূপ পঞ্চগব্যময়ী হইবে তাহা আর বিচিত্র নহে। তাহাতে দধি দুগ্ধের সহিত, গোমূত্র, গোময়ের অসদ্ভাব নাই। নাই থাকুক, তথাপি হিন্দু সংস্কার বশে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী গদ্য সাহিত্য অতি পবিত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছি। পবিত্রভাবেই গ্রহণ করিতে পাঠককে অনুরোধ করিতেছি। মৃত্যুঞ্জয় কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে চীফ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সিবিলিয়নদের বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশী ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে, মৃত্যুঞ্জয় সেই কলেজে দেশীয় ভাষা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হইলেন।†

* এখন দেখিতেছি তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও বলে।

† Lord Wellesley, finding the Civil Servants imperfectly acquainted with the language of the country, established the College of Fort William in Calcutta, in the year 1800...Able pundits were retained: and various works in Bengalee

মৃত্যুঞ্জয় "প্রবোধ চন্দ্রিকা" ও "রাজাবলী" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এবং সংস্কৃত হইতে পুরুষপরীক্ষা ও হিন্দি হইতে "বত্রিশ সিংহাসন" অনুবাদ করেন। ১৮৩৫ সালে প্রথম কাউনসিল অফ এডুকেশন বসিল।* পনের জন সভ্যের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও প্রসিদ্ধ রসময় দত্ত দুইজন মাত্র বাঙ্গালী।

বঙ্গবিদ্বেষী মেকলে সাহেব এই সভার সভাপতি। সেই বৎসরেই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হইল। কিন্তু তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ও 'পুরুষ পরীক্ষা' স্কুল কলেজে পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইল। এই দুই গ্রন্থই কলেজে অধ্যয়ন কালে পিতার ও তাঁহার সহাধ্যায়ীদের প্রধান সম্বল ছিল। ঐ প্রবোধ চন্দ্রিকার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি। "ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাঁহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধুলা অঙ্গার পূরিয়া, উপরে এক আধ সের ঘি দিয়া, দেশে দেশে শহরে শহরে অনিয়মিত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়া শুদ্ধ তৌলাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না, বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত, দেবতাদের হোমের উপযুক্ত, আমি এ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না।...বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন, দুই এক সের আজ্য যদি দিতে তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই।...(বিশ্ববঞ্চক) তাদৃশ সর্পিকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল।" পাঠক দেখিবেন হৈয়ঙ্গবীন, আজ্য, হবি, ঘৃতের এই তিনটি প্রতিশব্দ বক্তাদের অবস্থোচিত না হইলেও কেবল ছাত্র শিক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। আর এক স্থানে দেখুন ;—

"উজ্জয়িনীপতি মহারাজ কাশ্মীর তুরঙ্গমী কথার সমস্ত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া কালিদাসকে হস্তে ধরিয়া বেলাবসানে উপবনে চলিলেন। উদ্যানে গিয়া যাতি, যুথী, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা শেফালিকা, পাটল, সেবন্তিকা, নাগকেশরী, পুন্নাগ, সরোজ, কুমুদ, কহ্লার, কেতকী, চম্পক, কনকচম্পক, টগর, গন্ধরাজ, বক, করবীরাদি, পুষ্পমালঞ্চ শোভাদর্শনে ও ভ্রমরগণগুঞ্জিত কোকিলাদির গানেতে ও সুশীতল সুগন্ধি

and other language, were compiled and printed : and thus a new impulse was given to the improvement of the country. The learned Mrityunjoy, a native of Orissa, was appointed chief of the Native Department, and reflected high honour on the institution by his great talents etc. etc. etc.

Marshman's History of Bengal Section XVIII page 252.

* হুগলী কলেজ প্রথম হইতেই এই কৌনসিলের তত্ত্বাবধায়নে রহিল।

The Superintendence of the general Committee, now called the council of Education, was confined to the institutions in Calcutta, including the college at Hoogly and its Branch Schools.

মন্দ মন্দ বায়ু সুখস্পর্শেতে ও শিষ্টালাপামৃত রসধারাতে পরমাপ্যায়িত কালিদাসকে সানন্দচিত্তে প্রতিশ্রুত পারিতোষিক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া স্বস্থানে বিদায় করিয়া স্বয়ং সন্ধ্যাদি নিত্য ক্রিয়া করিতে দেবালয়ে গমন করিলেন।" এখানেও দেখিবেন কতকগুলি নাম শিখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় নবাঙ্কুরিত বঙ্গ গদ্যসাহিত্যের একজন প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে তিনি স্বয়ং ভাষার সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা স্বয়ং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। নানারূপ রচনাভঙ্গি প্রবোধচন্দ্রিকায় বিরাজমানা। এক এক স্থানের রচনা ভঙ্গিতে স্তব্ধ হইতে হয়। "শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন বিসঙ্কট-বদন-ব্যাদন বিকট-দংষ্ট্রা-কড়মড়ি, ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত চট চট শব্দ ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত" বাস্তবিকই যেন পাঠককে হইতে হয়। আবার "তরুণী-স্তন-সুন্দর-ইন্দীবর কৈরব-কোরক সুন্দরী-মুখ-মনোহর আন্দোলিত ফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জল পুষ্করিণী তটস্থলে বট বিটপী ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে" যেন সত্য সত্যই আমরা শীতল সমীরণ সঞ্চারে স্নিগ্ধ হই। মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গগদ্যের একজন আদি গ্রন্থকার বলিয়া সামান্য নহেন, তাঁহার রচনায় আমরা এখনকার শাখা প্রশাখাময়ী বঙ্গভাষার সকল অঙ্গের অঙ্কুর দেখিতে পাই।

অন্যতর পাঠ্য পুস্তক পুরুষ-পরীক্ষা। এখানি বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থের কোন না কোন অংশ প্রতিবর্ষে প্রবেশিকা পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে উহা সর্ব্ব পরিচিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পুস্তক সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

মৃত্যুঞ্জয় যে সময়ে অপোগণ্ড বঙ্গগদ্যের লালন পালন ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্য সত্যই ভাষা পিতৃমাতৃহীনা বালিকার মত অনাদৃতা ধুল্যবলুণ্ঠিতা বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মাণা, সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা। সেই সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত "তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা" বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইলে এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পীঠে করিয়া মানুষ না করিলে, আজি এই সাগর তরঙ্গের তেজধারিণী, অক্ষয় ভূষণে ভূষিতা, হেম-ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম-ভঙ্গিমা-শালিনী অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না।

কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য ঐ দুখানি প্রধান পুস্তক ছিল। তদ্‌ভিন্ন পিতৃদেব সংস্কৃত হিতোপদেশ কালেজেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিতোপদেশের সেই সংস্করণে ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ ছিল। এই গ্রন্থ ১৮৩০ সালে ছাপা হয়। সংস্কৃতভাগ

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়। ইংরাজী অনুবাদক কে তাহা বলিতে পারিনা। ম্যাক্সমূলার বলিতেছেন,—

"The reason why I preferred the text of Lakshmi Narayan Nyalankar, the Bengali editor and translator of this Indian School-book, to any single Ms. of the Hitopadesa, was, as I stated before, of a purely practical nature—I wished there should be, as far as possible, a certain uniformity in the text-b oks used in England and in India."

সেই সময়ে বটতলায় ছাপান ছাড়া বাঙ্গালায় আর কোন পদ্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয় নাই। বটতলার কাশীদাস, কৃত্তিবাস, বত্রিশ-সিংহাসন,—সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত অদ্ভুত রামায়ণ, শিশুরামের কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি সকল পদ্যগ্রন্থই পিতৃদেব পাঠ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র একরূপ অভ্যস্তই ছিল। তখন ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির কিরূপ চর্চ্চা হইত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কালেজের উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

SENIOR CLASSES

LITERATURE

Milton.
Shaksepeare.
Bacon's Essays.
,, Advancement of Learning.
,, Novum Organum.

MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC.

Smith's Moral Sentiments.
Steward's Philosophy of the Mind,
Wheateley's Logic,
Mill's Logic.

HISTORY.

Hume's England.
Mill's India,
Elphinstone's India.
Robertson's Charles V.

Mathematics.

Potter's Mechanies.
Evan's three Sections of Newton.
Hymer's Astronomy.
Halls's Differential and Integral Calculas.

JUNIOR CLASSES.

Literature.

Richardson's Selections from English Poems,
Addison's Essays.
Goldsmith's Essays.

Moral Philosophy and Logic,

Aborcrombies Intellectual Powers.
,, Moral Powers.
Wheateley's Easy Lessons in Resoning.

History.

Russell's Modern Europe.
Tytler's Universal History,

Mathematics.

Euclid, Six Books,
Hind's Algebra.
,, Trignometry.

১৮৪৫ সালে তৎকালিক ইংরাজি কৃতবিদ্যগণের মধ্যে বাঙ্গালা রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া পিতা যে মেডেল পাইলেন, তাহা হইতেই তাঁহার চাকরীর সূত্রপাত হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি সিনীয়র স্কলারসিপ মাসিক ৪০ টাকা পাইতেছিলেন, আর চুঁচুড়াতে এবং কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন। তখন আইনের সকল বিষয়ে অধ্যাপনা হুগলী কলেজে হইত না, কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা কলিকাতায় গিয়া করিতে হইত এবং পরীক্ষা কলিকাতাতেই হইত। এই সময়ে নদীয়ার কালেক্টারির সেরেস্তাদারী পদ শূন্য হইল। কালেক্টার আলেনজোমনি সাহেব মেডেলিষ্ট গঙ্গাচরণকে নিয়োগপত্র দিয়া সে পদে একেবারে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। ১৮৪৬ সালে

রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর কোথায় কত বেতনে কি কর্ম্ম করেন,—তাহার তালিকা

কোন্ অফিসে	কর্ম্ম	মাহিনা	অতিরিক্ত মাহিনা	কার্য্যারম্ভের তারিখ	কত বৎসরের চাকরী	কার্য্যত্যাগের তারিখ	মন্তব্য
নদীয়া জেলার কালেক্টারীতে	সেরেস্তাদার	৭৫৲		২৬শে মে, ১৮৪৬	৩ বৎসর ১৮ দিন	অজ্ঞাত	
ঐ	পেস্কার	৫০৲		অজ্ঞাত		ঐ	
কৃষ্ণনগর কলেজ	শিক্ষক	৪০৲		ঐ		ঐ	
নদীয়ার জজের কোর্ট	হেড কেরাণী	১০০৲		ঐ		১২ জুন ১৮৪৯	
দেওয়ানী	মুন্সেফি (হাঁসখালি) উলা বা বীরনগর রাণাঘাট পাণিঘাটা পূর্ণিয়া জাহানাবাদ ও সাতক্ষীরা	১০০৲		১৩ই জুন, ১৮৪৯	১২ বৎসর ৮ মাস ১১ দিন	২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২	
আলিপুর	সুন্দর বনের বন্দোবস্ত ডেপুটিকালেক্টার	২০০৲		২৪শে ফব্রুয়ারি ১৮৬২	১-৩-৮	৩রা জুন ১৮৬৩	
দেওয়ানী	মুন্সেফ জঙ্গীপুর	১৫০৲		৪ঠা জুন, ১৮৬৩	১-১-১৬	১৯শে জুলাই ১৮৬৪	
ঐ	একটিনী সদর মুন্সেফ ও সদর আমিন; সাহাবাদ, (আরা)	২০০৲	২৫৲	২০শে জুলাই ১৮৬৪	১-১-২৩	২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৫	
ঐ	সদর আমিন ও সদর মুন্সেফ মুর্শিদাবাদ	২৫০৲ পরে ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভ হইতে ৪০০৲		২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৫	৪-৬-১৯	২৮শে মার্চ্চ ১৮৭০	
ঢাকায়	একটিনী প্রধান সদর আমিন	২৫০৲	৭৫৲	২০শে মার্চ্চ ১৮৬৭	৬ মাস		এই সময় হইতে তিনি এই সকল স্থানে একটিনীরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।
কটক	ঐ ছোট আদালতের জজ;	৪০০৲	১৫৫৲	১৪ই অক্টোবর ১৮৬৮	৩ মাস		

ভাগলপুর	ঐ সব জজ ;	৪০০৲	১৫৫৲	৫ই এপ্রেল ১৮৬৯	২ মাস		
চব্বিশপরগণা আলিপুর	ঐ ঐ	৪০০৲	১৫৫৲	২২শে জুন ১৮৭০	৩ মাস		
যশোর	একটিনী ছোট আদালতের জজ	৪০০৲	১৫৫৲	৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৯	৩ মাস		
চট্টগ্রাম, যশোহর ও ঢাকা	সাব জজ ;	৬০০৲ ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৭০ হইতে ; ৭০০৲ ৮ই জুলাই ১৮৭২ হইতে ; ৮০০৲ ৩রা আগষ্ট ১৮৭৪ হইতে ; এবং ১০০৲ ১৩ই অক্টোবর ১৮৭৯ হইতে।		২৯শে মার্চ্চ ১৮৭০	১২-৯-২		এই সময় হইতে তিনি এই সকল স্থানে স্থায়ীভাবে কার্য্য করেন।
					৩৬-৭-৭	৩১শে ডিসেম্বর ১৮৮২ সালে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।	

২৬শে মে এই নিয়োগ হইল। সুতরাং বহুদিন স্কলারসিপ্‌ ভোগ করা, পিতৃদেবের ভাগ্যে হয় নাই। সেই ২৬শে মে ১৮৪৬ সাল হইতে, ১৮৮২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর ৭ মাসের কিছু অধিক কাল সমানে একটানে তিনি সরকারী চাকরী করেন। ৭৫্‌ টাকায় আরম্ভ করেন; শেষের তিন বৎসর হাজার টাকা পাইয়া, চাকরী শেষ করেন। কোথায় কতদিন চাকরী করেন এবং কোন সময় হইতে কত কাল কিরূপ বেতন পান এবং কখন পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি হয়, তাহার একটি ফর্দ্দ আমরা এই স্থানেই যোজনা করিয়া দিলাম। বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চার কথা পরে ক্রমে বলিব।

নিয়োগ আরম্ভ। ১৮৪৬, ২৬ মে।

নদীয়ার কালেক্টারীর সেরেস্তাদার—বেতন		৭৫্‌
” ” পেস্কার	”	৫০্‌
কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষক	”	৪০্‌
” জজ আদালতের হেডক্লার্ক	”	১০০্‌

নিয়োগ শেষ। ১২ জুন, ১৮৪৯।

অর্থাৎ তিন বৎসর আঠার দিন পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে থাকেন ও আমলাগিরি ও শিক্ষকতা করেন। এই কালের মধ্যে একদিনও বিরাম ছিল না। এক নাগাড় চাকরী ছিল। এই সময়ের অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে পিতা যখন ছিলেন তখনকার একটি হাস্যকর ঘটনার কথা এইস্থলেই লিপিবদ্ধ করিলাম। কৃষ্ণনগরে জনকয়েক ভদ্রলোক জুটিয়া আপোষে সর্ত্তি খেলিতেছিলেন, কতকগুলি কাপড় চোপড় ‘মাল’ ছিল। দুইজন দুইটি হাঁড়ি হইতে ‘টিকিট’ তুলিতেছিলেন। কাহারও কাহারও নাম ডাকার পর মাল উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একটি হাঁড়ি হইতে টিকিট একখানি তুলিয়া একজন পড়িলেন ‘গঙ্গাচরণ সরকার’ অন্য হাঁড়ী হইতে আর একজন শাদা কাগজের মোড়া খুলিয়া বলিলেন ‘ফর্শা’। পিতা, মহা আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন “আমার বাপ মায় আমায় আদর করিয়াও কখন ‘ফর্শা’ বলেন নাই। আমি এমন সভামধ্যে ‘ফর্শা’ সাব্যস্ত হইলাম, ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি হইতে পারে?” পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে গেলে পর, ১৮৪৬ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের সময় বা অন্নপ্রাশনের সময় পিতৃদেব বাড়ী আসিতে পারেন নাই। ছুটি পান নাই। এই তিন বৎসরের মধ্যে আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়া ছিলেন। শেষ পরীক্ষায় পাসের ফল, সদর দেওয়ানির ওকালতী বা মুন্‌সেফী। ১২ই জুন, ১৮৪৯ কৃষ্ণনগরের জজ আদালতের হেডক্লার্কের কর্ম্ম শেষ হইল। ১৩ই জুন ১৮৪৯ অর্থাৎ পর দিন হইতেই, মুন্‌সেফী চাকরী আরম্ভ

হইল। মুন্‌সেফ হইলেন ঐ নদে জেলারই-চৌকি হাঁসখালির। কাছারী হাঁসখালিতে হইত না, হইত উলায় বা বীরনগরে। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল, তেমন মহামারী ইদানীং দেখা যায় না। উলা তখন খুব গণ্ডগ্রাম ছিল বটে, কিন্তু প্রত্যহ দুই তিন শত করিয়া লোক মরিলে গ্রামের গৌরব আর কতদিন থাকে? ঐ বৎসর পূজার ছুটির পর, পিতৃদেব কাছারী উঠাইয়া রাণাঘাটে লইয়া আসেন। সেই অবধি এখনও রাণাঘাটে মুন্‌সেফি আছে।

মহামারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উলা অতি সভ্য স্থান ছিল। বহুতর ভদ্র লোক এই স্থানে বাস করিতেন। কায়স্থ পরিবারের সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যাইত, কিন্তু সেই কায়স্থগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন। তখন হইতে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্তি ছিল, তাহার পরে 'অধিকার উক্ত' 'বেদান্ত' 'সৃষ্টি' প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি এখনও জীবিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা বহুতর ছিল। মাঝের পাড়ায়, উত্তর পাড়ায় কতকগুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও ছিলেন। আর বহুতর নবশাখ ও শৌণ্ডিক প্রভৃতি পতিত জাতি ও পটো, বাইতী, চুহুরী প্রভৃতি ইতর জাতি অনেক লোক ছিল। উলার বামনদাস বাবুর তখন প্রবল প্রতাপ। প্রতাপে বাঘে গোরুতে জল খায়, তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয়াবান পুরুষ ছিলেন। বার মাসে তের পার্ব্বণ ও নিত্য নিয়মিত অতিথি-শালাও ছিল; স্নানযাত্রা, রথ, ও জগদ্ধাত্রী পূজায় মহা ধূমধাম হইত। রথের আট দিন দিবা-রাত্রি একদিকে যেমন নাচ, গাওনা, যাত্রা, কবি হইত, অন্যদিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত "দীয়তাং ভুজ্যতাং" শব্দে ভূরি ভোজন চলিত। স্নানযাত্রার সময় সত্যসত্যই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম হইত। তখন রেল হয় নাই, ষ্টীমার চলাচল ছিল না; সেই সময়ে দূরদেশাগত এক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য কত যে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। আমি তখন অতি বালক, এখন জু-বাগানে গিয়া যেমন সিংহ দেখি, উলায় আগত দ্রাবিড়ী, সুরাটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তখন সেইভাবেই দেখিতাম; সেইজন্য বেশ মনেও আছে।

উলায় তখন সঙ্গীতের চর্চ্চা খুব ছিল, প্রসিদ্ধ গান-বিলাস মহাশয়ের পুত্র, হরচন্দ্র তখন বিদ্যমান। দুই তিনজন ভাল মৃদঙ্গী ছিলেন; দীনে ঢুলী ছিল; কয়জন বেশ ভাল সানাইওলা ছিল, নাম মনে পড়িতেছে না। অধিকাংশ ভদ্র লোকই মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন। এখন যেমন দশজন এক সঙ্গে একস্থানে বসিলেই, বৃষ্টি হইল না, কুয়াসায় আম কাটিয়া গেল, ইউনিভারসিটি বিলে সর্ব্বনাশ করিল, বঙ্গচ্ছেদে উত্তমাঙ্গ ছেদ হইল, ছেলে বেটা অবাধ্য, চাকর বেটা কেবল ঘুমায়,—

অকারণ সকারণ—সময়ে অসময়ে—এইরূপ কথারই জল্পনা হইয়া থাকে, তখন সেরূপ কদাচিৎ হইত। তখন দশজন একত্র হইলে, সঙ্গীতের চর্চ্চা হইত, খোস গল্প চলিত; কেহ কেহ বা বড় বড় কেস্‌সা, কাহিনী বলিলে, সকলে শুনিত, সেই গল্পের রস উপভোগ করিত, আনন্দ পাইত, আনন্দ দান করিত। সন্ধ্যার পর পিতৃদেবের বাসায় মহা মজলিস্‌ হইত। মন্ত্রণাগৃহ নহে; দুঃখ-দারিদ্র্য জ্ঞাপনের স্থান নহে; পরনিন্দা, পরকুৎসা প্রসার করিবার কেন্দ্র নহে; দুর্ব্বিসহ রাজনীতি চর্চ্চা করিবার ক্ষেত্র নহে; রাণ্ডির ব্রাণ্ডির প্রমোদভবন নহে; কিন্তু মজলিস্‌, ভোরপুর মজলিস্‌—গম্‌গমে মজলিস্‌। জুলুস্‌ শব্দ হইতে মজলিস্‌। জল্‌সা শব্দে উজ্জ্বলতা। সেই মজলিস্‌ কতই না উজ্জ্বল! তাহাতে আনন্দই কত! সেরূপ হাসির গর্‌রা, সেরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাস—আর ত এখন কোথাও দেখিতে পাই না। ছেলে-পুলেরা কখন দেখিতে পাইবে কিনা তাহাও বলিতে পারি না।

এই শান্ত মজলিসে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষরূপে হইত। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঁচিশ, জীবনচরিত—প্রকাশিত হইল। তিনি "কৃষ্ণনগরের মূলপুস্তক দৃষ্টে" ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ প্রকাশিত করিলেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রকাশিত হইল। এই সকল পুস্তক এবং সেই সময়ের অন্যান্য পুস্তক—ভাল অক্ষরে ছাপায়, ভাল সংস্করণে, যেমন প্রকাশিত হইত, পিতা একখণ্ড ক্রয় করিতেন; আর এই সান্ধ্য সম্মিলনে পঠিত, আলোচিত, আন্দোলিত হইত। সেই সাহিত্যের আন্দোলনে আনন্দের ফুয়ারা উঠিত।

আমার মনে পড়ে যেদিন তারাশঙ্করের কাদম্বরীর প্রথমে পাঠ আরম্ভ হইল। শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে বাল্মীকি সগৌরবে পরশুরামের অবতারণা করিয়াছেন। যৌবনে তাহা পাঠ করিয়াছিলাম, সে গৌরবও বোধ হয় ভুলিতে পারি। প্রৌঢ়ে রসিকদাস কীর্ত্তনিয়া মহাগৌরবে, মহাআড়ম্বরে জয়দেবের 'বদসি' গানের অবতারণা করিয়াছিল, তাহাও হয় ত ভুলিয়া যাইব, কিন্তু বাল্যে সেই যে পিতৃদেব কর্ত্তৃক কাদম্বরীপাঠ, তাহার গৌরব, তাহার মর্য্যাদা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। সেই যে শ্রোতৃবর্গ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তামাকু টানিতে ভুলিয়া গিয়া, হুক্কা হস্তে, বিস্ফারিত নয়নে, একমনে এক ধ্যানে, পিতৃদেবের মুখপানে চাহিয়া আছেন, আর যেন সর্ব্বাঙ্গে কাণ পাতিয়া, সেই কাদম্বরী সুধা পান করিতেছেন, সাহিত্য-সেবার সেরূপ জাঁক-পসার, সেরূপ তন্ময়তা, সেরূপ একাগ্রতা, কখন ভুলিতে পারিব না। মনে পড়িতেছে, "পূর্ব্বকালে শূদ্রক নামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অতি বদান্য এক নরপতি ছিলেন। বিদিশানাম্নী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। যে স্থানে বেত্রবতী নদী, বেগবতী হইয়া ভাগীরথীর উপর উপহাস

করত, ইত্যাদি ইত্যাদি।" বাবার সেই গালভরা আওয়াজ, প্রাণভরা উৎসাহ, আনন্দপূর্ণ চক্ষু, আর শ্রোতাদের সেই ঐকান্তিক আগ্রহ, সকলেই মনে পড়িতেছে। তখনকার সাহিত্য-সেবা যেন দেবতার পূজা। এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনাটমিক্যাল ডিসেক্‌সন্। অস্থিমাংস চর্ম্মের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্য গ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুই ছত্র পড়িতে না পড়িতেই সমালোচনার ছুরি বাহির করিয়া, তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড খণ্ড করি, তাহার পর আবার বোতলে পুরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমি ত সামান্য ডাক্তার, এই করিয়াছি; তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কেমিক্যাল এক্‌জামিনার, রাসায়নিক পরীক্ষক,—তুমি একবার এসিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন, ইহার মধ্যে কি আছে? আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য-সেবা এইরূপ, আর তখনকার সেই কাদম্বরী পাঠ যেন বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের আরতি। সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে, কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য-সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এই সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্যপূজা। এখনকার মত ছুরি কাঁচি বরষা লইয়া সাহিত্য ভেদ, সাহিত্যবেধ, সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ, তখন ছিল না! হায়! আমরা কি সাহিত্য-সেবাই শিখিয়াছি!!!

পিতৃদেব স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া, অধিনায়কতা করিয়া, তাৎকালিক শিক্ষা-বিভাগ পরিচালিত করিয়া উলা গ্রামে তিনটি বাঙ্গালা পাঠশালা ও একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এইজন্য তাঁহাকে সভা করিয়া বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তখন ইংরাজিতে রামগোপাল ঘোষ বড় বক্তা। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে স্কুল স্থাপনের জন্য বা এইরূপ কোন কারণে কেহ যে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এমন কথা শুনি নাই। সেই বক্তৃতার উদ্বোধনভাগের নমুনা দিতেছি।

"অদ্য রজনী কি সুখদায়িনী! যে রজনীতে আমরা বৈষয়িক ব্যাপারের ব্যস্ততা হইতে নিরস্ত হইয়া ক্ষণিককাল সুখে সম্বরণ করণ কারণ এক সাতিশয় সদালোচনায় প্রবৃত্ত-চিত্ত হইয়াছি। যে রজনীতে এই বীরনগরের ভাবী সৌভাগ্যের সমুন্নতি-হেতু অত্রত্য সাধু ও সমৃদ্ধ জনসমাজের সমাগমন হইয়াছে। যে রজনীতে মদীয় বহুদিবসীয় মনোরথ পূর্ণ হওনের বিলক্ষণ সুলক্ষণ সমীক্ষণ করিয়া মন্মানস আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে।"

বিলক্ষণ, সুলক্ষণ, সমীক্ষণ, লিখিতে গিয়া পিতার পৌত্র হাসিলেন। সে কথা ত পোপ সাহেব বলিয়াছিলেন,—

"We think our fathers fools, so wise we grow,

Our wiser sons shall surely think us so."

ভাষা পুরুষে পুরুষে পরিবর্ত্তন হইতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের গন্থে, মৃত্যুঞ্জয়ের স্থানে স্থানে, তারাশঙ্করের সমস্ত, এইরূপ বিলক্ষণ সুলক্ষণ অনুপ্রাসে ভরা। তখন বাঙ্গালা গদ্যের শিশুকাল। তখন পায়ে দিবে চারি গাছা মল,—কোমরে দিবে বোরপাটা, নিমকল,—কাণে দিবে বীরবৌলি,—পিঠে ঝুলিবে ঝাঁপা,—হাতে দিবে বাজুবন্দ, —মাথায় দিবে পুঁটে—বেড়াবে ছুটে ছুটে,—তখন কি অলঙ্কার এড়ান যায়? না বালচাপল্যের নিবৃত্তি হয়? তাহা ত হয় না। হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, মাগধী এখনও অলঙ্কারের ছটা লইয়া বিব্রত। আমরা যে কাটাইয়া উঠিয়াছি, আড়ম্বরশূন্য, অলঙ্কারশূন্য, সহজ, সরল, অথচ সতেজ, সুন্দর গদ্য লিখিতে আমরা যে পারি, সেই ত বাঙ্গালির কৃতিত্ব, সেই ত বাঙ্গালির গৌরব। তাহাই ত বাঙ্গালির মহতী কীর্ত্তি।

এই তিনটি বাঙ্গালা স্কুলে প্রায় ৫০০ ছাত্র হইল। সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্য-সাহিত্যে উত্তীর্ণ এক জন করিয়া ছাত্র প্রধান শিক্ষক, অর্থাৎ হেড্ পণ্ডিত। নিম্নতর শ্রেণীর জন্য এক জন করিয়া গুরুমহাশয় আর এক জন করিয়া জরিপ ও পরিমিতি-অভিজ্ঞ বাঙ্গালা শিখাইবার পণ্ডিত। তখন বাঙ্গালা দেশে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয় নাই, জরিপ জানা দ্বিতীয় পণ্ডিতদের বড়ই অভাব হইল। উলারই একটি ভদ্র লোককে পিতা জরিপ শিখাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দক্ষিণ পাড়ার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ পাড়ার বারইয়ারী পূজার বৃহৎ আট-চালায় ঐ বাঙ্গালা স্কুল হইত। সেই আটচালা আমাদের বাসার অতি নিকটে ছিল। ঐ দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় স্কুলের সময়ের পূর্ব্বে এবং পরে আসিয়া পিতৃদেবের কাছে পাঠ গ্রহণ করিতেন। ছয় মাসে তাঁহার শিক্ষা হইল। ইন্স্পেক্টর প্রথমে তাঁহাকে প্রবেশনরী পদ দিলেন, পরে পরিমিতির পরীক্ষা করিয়া পাকা পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি উলার ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়; তিনি পাখোয়াজে সিদ্ধহস্ত। মিঠে হাত এবং তালে দোরস্ত। তখনকার কালের আর একজন লোক বাঁচিয়া রহিয়াছেন, সেই জন্য এই কথাটা এত দীর্ঘচ্ছন্দে বলিলাম।

ইংরাজি স্কুলে চারি পাঁচজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। হেড মাষ্টার হইলেন পিতার এক জন ছাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিতৃদেব কৃষ্ণনগর-কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এইসকল মাষ্টার-পণ্ডিত-সমাগমে, আমাদের সেই সান্ধ্য সভা আর এক প্রকার জমাট হইল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমাগমে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা হইতে লাগিল। এবং যে দিন হেড মাষ্টার মহাশয় আসিতেন সেদিন সেক্সপীয়র প্রভৃতিরও চর্চ্চা হইত।

সঙ্গীতের চর্চা নিত্যক্রিয়া ছিল। পিতৃদেব ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করিতেন। সভাভঙ্গের পর গুরু শিষ্যে মিলিয়া এই কাণ্ড হইত; রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া যাইত; তৎপূর্ব্বেই আমি অবশ্য শয়নাগারে গমন করিতাম।

এই যে স্কুল-পাঠশালা-প্রতিষ্ঠা ইহাতে পিতৃদেবের কৃতিত্ব ত ছিলই, সরকার বাহাদুরের সাহায্য এবং উৎসাহদান বিলক্ষণ ছিল। সংস্কৃত কলেজে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যক্ষ। তিনি সেই অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের, রক্ষণের ও শাসনের ভার কয়েকটি জেলার মধ্যে পাইয়াছিলেন। হেডপণ্ডিত তিনজনকে তিনি পাঠাইয়া দেন। নদীয়া জেলার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন, পাণ্ডুয়ার নিকট বেলুনের রামলাল মিত্র। তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র। কাজ চালানমত ইংরাজি অবশ্য জানিতেন; কি ইংরাজি, কি বাঙ্গালা, কি পেনে, কি শরে, তিনি মুটকলমে, কলমের উপর তর্জ্জনীর ভর দিয়া লিখিতেন। উড়েরা সকলেই এইরূপ লেখেন; বাঙ্গালা টোলের ছাত্রেরা কখন কখন ঐরূপ লেখেন। সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল স্থাপনার জন্য ভার পাইলেন হজ্‌সন্ প্রাট্। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র। সেই সময় বাঙ্গালাময় স্কুল বসাইবার ধুম পড়িয়া গেল। এখানে স্কুল, সেখানে স্কুল, চারিদিকে স্কুল, বিদ্যাবিতরণের জন্য সরকার বাহাদুরের ব্যগ্রতা ও ব্যয়-বাহুল্য দর্শনে লোকে বিস্মিত হইল, মহাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। এখনকার দিনে হইয়াছে, মাছি পড়িয়াছে জাল গুটাও গুটাও। লেখাপড়া শিখিয়া লোকে বিদ্রোহী হইতেছে, বাচাল হইতেছে; লেখা পড়ার বিস্তার কমানই ভাল। তাই এখনকার দিনে সেই পুরাণ কথাগুলি মনে পড়ে, আর মনে হয়, সেই এক দিন, আর এই এক দিন। যেমন সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বসিল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হজ্‌সন্ প্রাট্ সংবাদপত্রে সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হইলেন। তৎপূর্ব্বে যে সংবাদপত্র ছিল না এমন নহে এবং সংবাদপত্রের যে প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল না তাও নহে। তবে গবর্ণমেণ্টের কথা লোককে বুঝাইবার জন্য একখানি সংবাদপত্রের প্রয়োজন বোধ হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট ওব্রাইনন্ স্মিথকে সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, ওব্রাইনন্ স্মিথ সংবাদপত্র প্রকাশিত করিলেন।

তখন খৃষ্টানির সংবাদপত্র ছিল, জ্ঞানকিরণোদয় প্রভৃতি। ধর্ম্মের জন্য ছিল, এক পক্ষে সমাচারচন্দ্রিকা। উহা দৈনিক। অন্য পক্ষে ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। উহা মাসিক। আর সাধারণ সংবাদ বহন রসভাব সঞ্চালনের জন্য ছিল, এক দিকে প্রভাকর, অন্য দিকে ভাস্কর। তখন আমি চন্দ্রিকা দেখি নাই। পড়িতাম তত্ত্ববোধিনী ও মাসিক প্রভাকর। দৈনিক প্রভাকরে সংবাদ আদি থাকিত আর মফস্বলের বিজ্ঞাপন থাকিত। উহা আমি বড় পড়িতাম না। প্রতি মাসের প্রথম

দিনের প্রভাকরে প্রচুর পদ্য থাকিত। তাহাই পাড়তাম, নাড়িতাম-চাড়িতাম, মুখস্ত করিতাম। প্রতি বৎসরের ১লা বৈশাখের প্রভাকর অবয়বে ছয় ভাগের কলিকাতা গেজেটের মত পুরু। সম্বৎসরের প্রধান ঘটনাবলী, রং বিরং পদ্যে, ঈশ্বর গুপ্তের সেই সরল সতেজ লেখনীতে প্রকাশিত হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৪৬ সালে অগ্রহায়ণ মাসে আমার জন্ম হয়। ১৮৫৬ সালের আশ্বিন মাসে উলা ছাড়িয়া আসি। তখন আমার বয়স পুরা দশ বৎসর হয় নাই। ইতিমধ্যে তিনবারকার বার্ষিক প্রভাকর আমি পড়িয়াছিলাম; অর্থাৎ সপ্তম বর্ষে আমি প্রভাকর পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্ত করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে অন্নদামঙ্গল, তিন খণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরবীয়োপাখ্যান ও সেক্সপীয়র হইতে অপূর্ব্বোপাখ্যান পাল বর্জ্জিনিয়া প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। Honi soi qui maly pense.

এই নয় বৎসর মধ্যে তিনজন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরকে উলায় দেখিয়াছিলাম। একজনকার নাম করিয়াছি—বেলুড়ের রামলাল মিত্র; দ্বিতীয়—কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণনগরের ব্রজ বাবু বলিয়া বিখ্যাত এবং পরে কৃষ্ণনগরে স্বয়ং স্কুল স্থাপনা করেন। তৃতীয় ব্যক্তি গরিফার চন্দ্রশেখর গুপ্ত; বিখ্যাত বি. এল. গুপ্তের পিতা। ইহার পত্নী অর্থাৎ বি. এল. গুপ্তের মাতা সুন্দর সাধুভাষায় বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। আমি তাঁহার লেখা পত্র তৎকালে দেখিয়াছিলাম; একটু বেশী সাধুভাষা তাহাতে ছিল,—"পদবীতে পদার্পণা" প্রভৃতি বেতালপঁচিশী পদ সেই পত্রে ছিল। তাহা থাকুক, কিন্তু লেখা অতি প্রাঞ্জল, সুন্দর ও সরল। পিতা সেই পত্র আদর্শরূপে আমার মাতাকে দেখাইয়াছিলেন, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। কলিকাতার খবর, তখন ত জানিতামই না, এখনও ভাল জানি না। তখনকার কালে আমাদের গঙ্গার দু ধারের পল্লীর মধ্যে বেহারী বাবুর মাতার মত কেহ যে লিখিতে পারিতেন, এমন বোধহয় না। ১৮৫৬ সালে মার্চ্চ মাসে চন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয় উলার বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিতে যান। অবশ্য আমাদের বাসাতেই ছিলেন। আমি কোন স্কুলে পড়িতাম না, গুপ্ত মহাশয় আমাকে পৃথক পরীক্ষা করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিত "জীবনচরিত" পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পারিতোষিক দেন। সে বইখানি আমাদের বাড়িতে আজিও আছে। এখানি তৃতীয় বারের ছাপা। প্রথম বারে ১৭৭১ শকে ভাদ্র মাসে ছাপা হয়। দ্বিতীয় বারে ১৭৭৩ শকে চৈত্র মাসে, আর তৃতীয় বারের এই সংস্করণ ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসে ছাপা হয়। প্রাইজ পাইয়া অবশ্য আমি জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলাম।

ফোকাল ডিস্‌টানস্‌ পদার্থটা কি, কাহাকে বলে, তাহা অবশ্য তখন কিছুই বুঝি

নাই, কিন্তু বাঙ্গালা শিখিয়াছিলাম, "আধিপ্রয়ণিক ব্যবধি।" পঞ্চপাদিক মানে বুঝিয়াছিলাম, যাহার পরিমাণ পাঁচ ফুট। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বহু পরে শুনিয়াছি, যে সময়ে জীবনচরিত রচিত হয়, সে সময়ে কৃষ্ণবন্দ্যোর বা রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জীর বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য স্থিরীকরণ বিষয়ে একাধিপত্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবনচরিত, তিনি নাকি ভাষা-দুষ্ট বলিয়া দূরীকৃত করেন। এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানারূপ চেষ্টা করিয়া তবে জীবনচরিতকে পাঠ্যপুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে সফলকাম হন।

গরিফার চন্দ্রশেখর বাবুর কথা পড়াতে গরিফার একজন তাৎকলিক গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহার গ্রন্থের কথা মনে পড়িল। ১৮৫২ সালে গরিফার বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায় ব্যাকরণদর্পণ নামে একখানি পদ্য ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। আমি মুখে মুখে সন্ধি করিতে শিখিয়াছিলাম; আর এই ব্যাকরণদর্পণ পড়িয়াছিলাম ও অনেক স্থানই মুখস্ত করিয়াছিলাম, ব্যাকরণদর্পণের ছন্দের লক্ষণগুলি বেশ সুন্দর।

চারি চারি বর্ণ সারি তিন বারি রয়,
কহি শেষ, অবশেষ দুই শেষ হয়।
সারি সারি মিল ধারি বর্ণ চারি পাবে,
সর্ব্ব শুদ্ধ বর্ণ চৌদ্দ ইথে লব্ধ হবে।
চতুঃসপ্ত বর্ণে দশাদ্যো বিহারি,
ভুজঙ্গ প্রয়াতে হবে হ্রস্ব চারি।

নন্দকুমার রায় কৃত আর একখানি পুস্তক সেই সময়ে পাঠ করিয়াছিলাম। সেখানি অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের বঙ্গানুবাদ। সংস্কৃত যেখানে শ্লোক আছে, বঙ্গানুবাদে সেই সেই স্থলে পয়ার বা ত্রিপদী ছিল। লেখা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত। সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ এইখানি বোধ করি, সর্ব্বপ্রথম হইবে। আমি তখন নাটকের কায়দা, কারচুপি সে সকল কিছুই জানিতাম না। পিতা বুঝাইয়া দিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। ভাষা ছাড়া আর কিছু যে কেভাবে বুঝিতে হয়, তাহা আমি বুঝিতাম না; তবে ভাষা বুঝার পরে আমার সেই বালক-হৃদয়ে যে কিছু রসগ্রহ হইত না, এমন কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। কৃষ্ণবন্দ্যোর ভাষাও ত ভাষা; তাহা পড়িতে একেবারেই ভাল লাগিত না; আর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, ভারতচন্দ্র, নন্দকুমার ইহাদের সে ভাষাই বা পড়িতে ভাল লাগিত কেন? অক্ষয় কুমারের কথা সকল—অতি গভীর, লেখা-প্রগাঢ়, ভাব-গম্ভীর, তবু সে ভাল লাগিত, অথচ কৃষ্ণবন্দ্যোর রাজোপাখ্যান কেবল গল্প বই ত নয়, তাহা ভাল লাগিত না। কেন? কাজেই বলিতে হইতেছে, আমি বাল্যজীবনে যে কেবল ভাষাই শিখিতেছিলাম এমন নহে,

না বুঝিয়া না শুঝিয়া, একটু একটু সাহিত্যও শিখিতেছিলাম। রস-রচনা কাহাকে বলে তখন না বুঝি, কিন্তু রসের স্বাদ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছিলাম। প্রভাকরের পদ্য উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য না হইলেও সহজ সরল সরস রচনা বটে। নন্দকুমারের শকুন্তলার অনুবাদ খুব সহজ না হইলেও সরল সরস রচনা।

আমার জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে—১২৫৩ সালে, আমার জন্ম হয়, ১২৫১ সালে, —মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ-কৌস্তভের" প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রচারিত করেন। আমার জন্মের দুই বৎসর পরে ১২৫৫ সালে তৃতীয় সংখ্যার কায়স্থ-কৌস্তভ প্রকাশিত হয়। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তৃতীয় পৃষ্ঠায় নারায়ণের পদতলস্থ "একবিংশতি চিহ্নের চিত্র বিচিত্র রূপ প্রকটিত" ছিল। আমি অতি শিশুকালে সেই সকল অপূর্ব্ব চিত্র বিচিত্র পাইয়া মনের সহিত কায়স্থ-কৌস্তভ লইয়া খেলা করিতাম। সে পুস্তকখানি এখনও আমার আছে; সে তৃতীয় পৃষ্ঠার ছবিগুলিও আছে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ পরিষ্কার চিত্র খোদিত হইত, আমার সে বইখানি না দেখিলে, আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। যাউক সে কথা, আসল কথা কায়স্থ ক্ষত্রিয় এই কথাটা মাতৃদুগ্ধের সহিত আমার উদরস্থ হইয়াছে। তখন এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, আঁদুলের রাজারা, এই বিষয়ে নাকি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বিল্বপুষ্করিণীর পীতাম্বর তর্কভূষণ, শোভাবাজারের সভাপণ্ডিত ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কোন্নগরের তারাচরণ তর্কবাগীশ, সোনামুখীর বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার, ভট্টপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি, সংস্কৃত কলেজের জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি এতদ্দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে মত প্রদান করেন। আমি অতি বালককালে এইসকল কথা গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম। কায়স্থ-কৌস্তভ প্রকাশের ৬০ বৎসর পরে, এখনও সেই কথা সমানে চলিতেছে। এখনকার কায়স্থসভায় আমি কয়দিন যাতায়াত করিয়াছিলাম। আমার বোধ হইতেছে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কথাটা যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য হইয়াছে, যাগযজ্ঞাদি করিলে সেই ব্রাত্যত্ব খণ্ডিত হইতে পারে। আমি বুঝিতে পারি না যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর অন্তর একথাটা এরূপ করিয়া আলোড়ন করার ফল কি? যদি হিন্দু বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর, যদি জাতি বলিয়া কোন সত্য পদার্থ আছে মানিতে পার, তবে এ কথার আন্দোলনে অর্থ আছে, নতুবা "তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে"।

তখন পদ্যে যেমন প্রভাকরের প্রসার, গদ্যে তেমনই তত্ত্ববোধিনীর গৌরব। ১৮৪৩ সাল হইতে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী আমাদের বাটীতে ছিল। এক দিকে অক্ষয় কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর

রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্য দিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চকচকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,—এই গৌরব এই আদর দেখিয়া বালকহৃদয়ে একরূপ বুঝিয়াছিলাম, যে সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেলনা জিনিষ নয়। অক্ষয় কুমার হইতে একদিকে যেরূপ মুখস্ত করিয়াছিলাম—"ঘন বিজন কানন বা তরুশূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধুগর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রখর রশ্মিপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, তরুণ যৌবন বা পরিপক্ব প্রবীণকাল, সুশীতলসমীরসঞ্চালিত প্রভাত সময় বা বিহঙ্গকোলাহলকলিত শ্রান্তিহর সায়ংকাল, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরকে সাক্ষী স্বরূপ দেখিয়া, ভক্তিমানের চিত্ত ভক্তিভরে দ্রবীভূত হয়। অন্য দিকে সেইরূপ,—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥

ইত্যাদি এবং "বিবিজান চলে জান লবেজান্ করে" ইত্যাদি মুখস্ত করিয়াছিলাম। তাহার ফল এই হইয়াছে, সহজ বাঙ্গালা আমি এখনও ফেলনা জিনিষ মনে করি না।

যে সাহায্যপ্রাপ্ত সংবাদপত্রের কথা বলিতেছিলাম তাহা এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ। এখনও সেই সাহায্য চলিতেছে, কিন্তু সে আকার নাই, সে প্রকার নাই। এখনকার দিনের মত নয়, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে ছাপা প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। ওরাইনন্ স্মিথ স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, কালিদাস মৈত্র সহ-সম্পাদক। তাঁহার দুই তিনজন আত্মীয় উলায় থাকিতেন, তাঁহারা হর্ষে গৌরবে, তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—সকলে একটু ঠাণ্ডা হইলে আমি চুপি চুপি তাহা হইতে যাদব-মাধবের কথোপকথন পাঠ করিতে লাগিলাম। গেজেট কথাটা আমি তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। বাঙ্গালা গেজেট দেখিয়াও ছিলাম। এডুকেশন কথাটা তৎপূর্ব্বে আমার কাণে উঠে নাই। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কথাটা কি?" বাবা বলিলেন "ওটা ইংরাজি কথা—অর্থ 'শিক্ষা'। আমি বলিলাম "তবে শিক্ষা গেজেট বলিল না কেন?" পিতা একটু হাস্য করিলেন। বোধ হয় শৈশবে আমার সমালোচনার প্রবৃত্তি দেখিয়া, তিনি হয়ত একটু আহ্লাদিত অথচ বিচলিত হইতেছিলেন। আমি পঞ্চাশ বৎসর কথাটা শুনিতেছি, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের মুখপত্রের নাম এডুকেশন গেজেট এ বিড়ম্বনা কণ্টক এখনও প্রাণে খচ্ করিয়া উঠে।

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষা বিস্তারের সহায় এবং বাঙ্গালা পাঠ্য-পুস্তকের প্রণেতা। কিন্তু আমার বর্ণপরিচয় 'বর্ণ পরিচয়ে' হয় নাই। আমরা প্রথমে স্কুলবুক সোসাইটির বর্ণমালা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ছিল 'জল পড়ে, ছাতা ধর'। মদনমোহনের শিশুশিক্ষা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ছিল 'কাল কাক ভাল নাক'। 'পাখী সব করে রব'। 'কটু বাক্য কহা অনুচিত'। 'বেণী বড় দুরন্ত বালক'। 'ধাম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার'। আমরা দশজনে এখন কতরকম বাঙ্গালা লিখিতেছি। কেহ ঝাড়-ঝঙ্কার দিতেছি; কেহ ফুলে-ফলে শোভিত করিতেছি; কেহ পেঁচের পর পেঁচ লাগাইয়া ভাবার কায়দা বিন্যাসে গোলকধাঁধা করিতেছি। কিন্তু মদনমোহনের সেই সুন্দর, সতেজ, সরল, সহজ, মিঠা-কড়া, মোলায়েম, জলের মত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ভাষা লিখিতে পারি কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পড়ি নাই বটে; সেই সময়ে পড়িয়াছিলাম, তাঁহার বেতাল-পঁচিশ। আমি মনে করিতেছি, উহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। বেতাল-পঁচিশ হইতেও নানা স্থানে মুখস্থ করিয়াছিলাম,—"যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র দশাননের বংশ ধ্বংস করণাভিপ্রায়ে মহাকায় মহাবল কপিবল-সাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণোবোপরি কীর্ত্তি হেতু সেতু সংঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভ প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক ভূরুহ উত্থিত হইল, তদুপরি এক সকল-লোক ললামভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চার্ব্বঙ্গী বীণাবাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন।"

দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ুর-চূড়া, টেরি-কাটা কার্ত্তিক স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহা দেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহা প্রতিমার উপাসক। অনর্থক পিতৃ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য, পিতৃদেবকে মধ্যস্থানে অধিষ্ঠিত করিতেছি, এমন কেহ মনে করিবেন না। বাঙ্গালা লেখাপড়ায় আমার প্রবৃত্তি, পন্থানুসরণ, শিক্ষায় সাহায্য, ভ্রমে সংশোধন, প্রধানত তাঁহা হইতেই। তবে অন্য পঞ্চ দেবতার উপাসনা অতি শৈশবেও যেমন করিয়াছি, এখনও তেমনি করিতেছি। তারাশঙ্করে ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুর তাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখন নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয় কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না,

কাহাকে বলে প্রসাদ গুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ। এখনও যে বেশ জানি সে কথা বলিয়া বুড়া বয়সে অধর্ম্ম সঞ্চয় নাই করিলাম।

আর প্রাণে লাগিত না কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা। অক্ষয় কুমার, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি সকলের পূর্ব্বে বাঙ্গালার লেখকরূপে অবতীর্ণ হন, রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সে হইল আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বে; তাহার পর আমাদের এল. এ., বি. এ পরীক্ষার বাঙ্গালায় পরীক্ষক তিনিই ছিলেন। তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা বহুকাল পুনঃপুনঃ এণ্ট্রান্সের কোর্স ছিল, কিন্তু সেই যে ছেলেবেলা কৃষ্ণবন্দী বাঙ্গালা প্রাণে লাগে নাই, ভালবাসি নাই, সেইরূপ কখন উহা ভালবাসিতে পারি নাই। এখন বুঝিয়াছি কৃষ্ণবন্দ্যোর বাঙ্গলায় প্রাণ নাই বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পণ্ডিতি বাঙ্গালা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি (ষ্টাইল) না আছে রস, না আছে আবেগ। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে সকল গদ্যলেখকের অগ্রে, কৃষ্ণমোহন ইংরাজিতে বাঙ্গালায়, কোথাও ইংরাজির অনুবাদ বাঙ্গালায়, কোথাও বাঙ্গালার অনুবাদ ইংরাজিতে, কোথাও ইংরাজি বাঙ্গালা দুই সংস্কর্তের অনুবাদে,—এইভাবে দ্বিভাষিক গ্রন্থ সংখ্যাদি ক্রমে, ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করেন। তাহার বাঙ্গালা নাম বিদ্যাকল্পদ্রুম, ইংরাজি নাম Encyclopædia Bengalensis, শৈশবে আমি তাহার তৃতীয় খণ্ড পড়িয়াছিলাম। সেই খণ্ড মাত্রই আমাদের বাড়ীতে ছিল, তাহাতে ছিল Arnoll হইতে রোমের ইতিহাসের কিয়দ্ অংশ, ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকটা অনুবাদ। আর রাজদূত বলিয়া একটি গল্পচ্ছলে ধর্ম্মকথা। আমি অবশ্য কেবল বাঙ্গালা ভাগই পড়িতাম। জিওমেট্রির বাঙ্গালাও পড়ি নাই, সে হিজিবিজি ক, খ, গ আমার ভাল লাগিত না।

থাক এখন আমার কথা। পিতার সাহিত্য-সেবার আর একটি অঙ্গ বলি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কবির গান প্রৌঢ়াবস্থা পাইয়াছে। হরু, নিলু প্রভৃতি ঠাকুরেরা,—চিন্তে, ভোলা প্রভৃতি ময়রারা—বলাইচাঁদ, উদয়চাঁদ, কৃষ্ণদাস, প্রভৃতি আমাদের নিকটস্থ বৈরাগী কবিওয়ালারা—সকলেই প্রায় অস্তগত। একদিকে চিন্তামণি, অন্যদিকে পরাণচন্দ্র, বাদ-বিবাদ করিয়া কোনরূপে বাঙ্গালার আসর রক্ষা করিতেছিলেন। যাত্রার গানে বদন তখন ওস্তাদ হইয়াছেন; গোবিন্দ অধিকারীর তখন খুব জাঁক-পসার; গোপাল উড়ের তখন মৃত্যু হইয়াছে, প্রসিদ্ধ নৃত্যকারী কেশে ধোবা সেই দল তখন জাঁকে-জমকে রক্ষা করিতেছে। আর তখন জাঁকপসার পাঁচালীর। গুরু-দুঃখ, গঙ্গাধর তখন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কথার ছটায় শব্দের ঘটায় দাশরথি তখন বাঙ্গালা আচ্ছন্ন করিয়াছেন; আর আমাদের নিকটে চুঁচুড়ার গাওনার জোরে, সুর-তালের বলে, সন্ন্যাসী তখন দাশরথির সমকক্ষতা করিতেছেন।

এই সন্ন্যাসীর দলে একজন তবলা-বাদ্যকার ছিলেন ঠাকুরদাস সরকার, আমাদের অতি নিকট প্রতিবাসী। উলায়-থাকা সময়ের মধ্যে, এই ঠাকুরদাসের অনুরোধে, পিতা তিন চারি পালা পাঁচালীর গান তাঁহাকে রচনা করিয়া দেন। ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীর দল হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া, সেই রচনার বলে, পৃথক দল করিয়াছিলেন। এক পালা শিবের বিবাহ; দ্বিতীয় পালা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ; তৃতীয় পালা বিরহ; চতুর্থ পালা আগমনী। আগমনীর ছড়া মনে পড়ে না, গান বলিতে পারি। পাঁচালীর একটু নমুনা দিতেছি।—

শিব-বিবাহের উপক্রমণিকা

"ভবানীর লীলা খেলা ভাবনা-অতীত।
যে ভাব ভাবিয়া ভব আপনি মোহিত॥
দেখ দক্ষালয়ে দেহ করি পরিহার।
হিমাচলে লীলা ছলে কুমারী-আকার॥
মহীয়সী মায়া তাঁর অপরূপ গণি।
মেনকারে মা বলেন জগতজননী॥
গিরিরাণী কন্যা হেরে আনন্দ অন্তরে।
উমা নাম দেন তাঁর অসীম আদরে॥
পৌরজনগণ সব পুলকে পূর্ণিত।
আনন্দে অচলালয় সদা আমোদিত॥
বাড়িছেন শৈলবালা সম শশিকলা।
দিন দিন গিরিপুরী করেন উজ্জ্বলা॥"

ঐ পালার একটি গানেরও নমুনা দিতেছি

"(আজি) গিরিবাসে জান হর সাজি বর,
আনন্দ অপার, পরিহিত বাঘাম্বর,
শিরে শোভে শশধর, উথলিয়া গঙ্গাজল,
ঝরিছে ঝর ঝর।
অমর সকলে হইয়া মিলিত,
অশেষ আমোদে কত আমোদিত,
বরযাত্র জান সবে বরের সহিত
যাহার বাহন যেই তাহাতে করি ভর।
ধাধুম কেটেতাক্, ধাধুম কেটেতাক্. বাজনা বাজিছে,

তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ
ভূতগণ নাচিছে।
বম্ বম্ গালবাদ্য সকলে করিছে,
কোলাহলে কুতূহলে বলিছে হর হর ॥"

তখন বৈঠকি মজলিসে চুপির দেওয়ান মহাশয়ের, মুর্শিদাবাদের কালী ভট্টাচার্য্যের, নদীয়ার রাজা শিবচন্দ্রের, আর বাঙ্গলায় বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত রামপ্রসাদ নীলকমলের শ্যামাবিষয়িণী গীতি প্রায়ই গীত হইত। পিতার রচিত কতকগুলি শ্যামাবিষয়ের গান বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করিয়াছি, যে পিতৃ-কৃত একটি শ্যামাবিষয়িণী গীতি, রামপ্রসাদের গানের মধ্যে, অবশ্য রামপ্রসাদের বলিয়াই ছাপা হইয়াছে। গানটি এই—

কেরে কাল কামিনী।
বাস-পরিহারিণী।
চরণে তরুণ অরুণ-নিকর, নখর নিভাতি নিন্দি নিশাকর,
উরু তরু-রম্ভা নাভী মনোহর, নৃকর কটিতে কিঙ্কিণী।
পীযূষ-পূরিত পীন পয়োধর, পানে পুলকিত সুরাসুর নর,
করে শোভে অসি মুণ্ডাভয় বর, কিবা নর-মুণ্ডমালিনী।
তড়িৎ জিনি হাস্য সুচারু বদনে, খঞ্জন-গঞ্জন যুগল নয়নে,
শিশু-শব সব শোভিত শ্রবণে, কিবা আধশশী-ভালিনী।
হেরে কাল কান্তি এলো কুন্তলে, কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে,
বামা গঙ্গাধর হৃদি হ্রদজলে, শোভে যেন নীল-নলিনী ॥

পিতার বালককালে গঙ্গাধর নাম ছিল; আমাদের বাড়ীর পাটাতেও ছিল। বৃদ্ধদিগকে গঙ্গাধর বলিতে আমি শুনিয়াছি। স্কুলে গঙ্গাচরণ লেখান হয়—সুতরাং চাকরিতে, কাজেই সর্ব্বত্র, তিনি গঙ্গাচরণ বলিয়াই পরিচিত। গানের ভণিতায় 'গঙ্গাধর' দিলে রস হয়, অনেক সময়ে শ্লেষে রস বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য পিতৃকৃত সমস্ত ভণিতাযুক্ত গানে, গঙ্গাধর ভণিতাই আছে।

অনেকগুলি কৃষ্ণবিষয়ক গানও ছিল। পুঁথি বাড়িয়া যায় বলিয়া নমুনা দিলাম না, তবে একটি কৃষ্ণবিষয়ক গান আমি গোবিন্দ অধিকারীকে আসরে গাহিতে শুনিয়াছি, সেটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(সুর—ভুবন ভুলালে আজ ভুবনমোহিনী)
ভুবন ভুলালে হরি লীলার ছলেতে।
সুরাসুর নর-নাগ না পায় ভেবে মনেতে ॥

চক্রপাণি নীরদ তনু, কভু হাতে শর ধনু,
কভু ব্রজে বাজাও বেণু, চরাও ধেনু গোঠেতে ॥
যারে প্রভু ধর পায়, কাঙ্গালিনী কর তায়,
কাঙ্গালিনী তব কৃপায়, বসে সিংহাসনেতে ॥

বৈঠকি গানে তখন টপ্পা গানেরও জাঁকজমক খুব। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু টপ্পার রাজা। একদিকে শ্রীধর কথকের, অন্যদিকে ছাতুবাবুর টপ্পারও চলতি সে সময় খুব ছিল। পিতৃদেব কতকগুলি উৎকৃষ্ট টপ্পা গীত রচনা করেন। অনেকগুলি সে সময়ে খুব চলিত ছিল। দুই একটি এখনও চলিত আছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ সুলেখক আমাদের স্বগ্রামবাসী, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর গান করিয়া থাকেন।

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল-কাওয়ালি।

রমণি তোমার গুণে সুখময় এ সংসার,
জগতমোহিনী তুমি জগতের অলঙ্কার।
তুমি যদি এ মহীতে বিধুমুখে না হাসিতে
শশিশূন্য নিশিসম হত সব অন্ধকার ॥
তুমি ধনি যেই নরে নাহি হের প্রেমভরে,
নরপতি হয় যদি সংসারে সন্ন্যাস তার।

গারা ভৈরবী-মধ্যমান।

না হয়ে পুরুষ যদি রমণী হইতে,
প্রেম যে কেমন ধন তবে প্রাণ জানিতে।
প্রাণ-প্রেম পরস্পর পুরুষে তা স্বতন্তর,
নারীর জীবন কিন্তু কেবল তার প্রেমেতে।
দেখহ পুরুষ যত থাকে নানা কাজে রত,
ধন. মান, আর কত, অভিলাষ করে চিতে!
রমণী নহে তেমন, প্রেমে মাত্র তার মন,
সে ধনে বঞ্চিত হলে, জানে কেবল কাঁদিতে ॥

তখন যাহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত বলিত, সেরূপ গানও কয়েকটি পিতৃদেব রচনা করেন। দুইটি নমুনা-স্বরূপ দিতেছি—প্রথমটি সন্দেহ দূরীকরণার্থ; যথা—

ভাবিতে তাঁহারে মন কেনরে সংশয়?
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার সদা দেয় পরিচয় ॥

দিবসেতে দিবাকর, রজনীতে নিশাকর,
আর যত তারাগণ ভ্রমে আর এই কয়,
"এক সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান,
আমা সবার নির্ম্মাণ সেই প্রভু হতে হয়"।
যদি বল, তারা সবে, ভ্রমে সতত নীরবে,
কেমনে সঙ্গীত তবে তাঁরি গুণ কয় ?
কিন্তু রে অবোধ মন কর জ্ঞান কর্ণার্পণ,
সে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শুনিবে নিশ্চয়।
ভাবিতে তাঁহারে মন নাহিক সংশয়,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সদা দেয় পরিচয়॥

দ্বিতীয় গানটি ভক্তিভরে,—

আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য বাক্যমনো পথাতীত,
ভাবিলে আনন্দ-সিন্ধু হয় মনে উচ্ছ্বসিত,
এই দেখি প্রভাকরে ভুবন উজ্জ্বল করে,
ক্ষণেক বিলম্ব পরে সব তম আচ্ছাদিত।
কভু প্রভু অকস্মাৎ হয় ঝঞ্ঝাবজ্রপাত,
কভু মন্দ মন্দ বাত সৃষ্টি করে আমোদিত।
এইরূপ তবাদেশে কাল প্রদেশ বিশেষে,
প্রকৃতি বিবিধ-বেশে হয় প্রকাশিত।
তুমি প্রভু মূলাধার যা কর তা চমৎকার,
তব মহিমা অপার, তব কার্য্যে পরিচিত।
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য বাক্যমনো পথাতীত,
ভাবিলে আনন্দ সিন্ধু হয় মনে উচ্ছ্বসিত॥

ব্রহ্মসঙ্গীতের কথায় সেই সময়কার ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিতে হইতেছে। আর পিতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পর্কের কথাও বলিতে হইতেছে। পিতা তত্ত্ববোধিনী সভায় নিয়মিত চাঁদা দিতেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন, পাঠ করিতেন, আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মপুস্তক আমাদের বাড়ীতে ছিল। প্রথম সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল; আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" ছিল। হিন্দু ব্যবহারে, ব্রাহ্ম ব্যবহারে যে কিছু পার্থক্য আছে, এরূপ কথা শৈশবে আমি জানিতাম না। পিতার ব্যবহারেও কিছু বুঝিতাম না। পত্র কিম্বা কোন কিছু লিখিবার পূর্ব্বে, আমি তখন যত লোক জানিতাম,

সকলেই লিখিতেন—"শ্রীশ্রীদুর্গা" বা 'শ্রীশ্রীহরি'। কেবল পিতা লিখিতেন—'শ্রীশো জয়তি।' ইহা যে কেবল পত্রের শিরোভাগে লিখিতেন এমন নহে, সকালে কোন কিছু লিখিবার পূর্ব্বে এক খণ্ড শাদা কাগজে দুই পঙ্‌ক্তিতে লিখিতেন শ্রীশো-জয়তি। আমি অতি বালককালেই, সাধারণ হইতে এই বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম ; কখন জিজ্ঞাসা করি নাই। পিতার সুহৃদ্‌বর্গ মধ্যে কখন কখন কোন কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ কথা ধরিলে, পিতা বলিতেন, 'শ্রীশঃ কি কোন দেবতারই নাম নহে ?' ও কথা ঐরূপেই শেষ হইত। উলায় আমাদের বাসা বাড়া। তবু সেখানে প্রতিমা গঠন করিয়া সরস্বতী পূজা হইত। এক শ্রীপঞ্চমীতে, সেইস্থানে আমার হাতে খড়ি হয়, বেশ মনে আছে। আমাদের বাসার অতি নিকটেই মুনসেফি কাছারী ঘর, মেটে আটচালা, খড়িটি করা। সেই কাছারীর খড়িটি করা দাওয়ার চারিদিকের মেঝেয় আমি হাতে খড়ির পরদিন, খড়ি দিয়া বড় বড় ক খ লিখিয়া ঘুরিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। উলায় সরস্বতী পূজা হইত, দেশে হইত কার্ত্তিক পূজা। পরে, দুর্গোৎসব হইত। সে ত পরের কথা। এখন কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত পিতার সম্পর্ক দেখাইবার জন্য এই কথা পাড়িলাম। তখন ধর্ম্মের টানে না হৌক, তত্ত্ববোধিনীর ভাষার মায়ায় অনেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। অক্ষয় কুমার,—বিদ্যাসাগর,—বাঙ্গলার দুটা বাঘা ভাল্‌কো লেখক, তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রত্নতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা এই সকলের নিয়মিত আলোচনা হইত। স্বদেশ-হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী সকলেই তত্ত্ববোধিনীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। আর যদিও প্রথমে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে পৌত্তলিকতার বিরোধ প্রকাশিত হইত না। তখন হিন্দুধর্ম্মের ব্রণ বা বিস্ফোটকরূপে একরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠে নাই। মধ্যে সেইরূপ হইয়াছিল বটে, এখন বোধ হইতেছে সে ভাব আর নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতি খৃষ্টানীর মত। সপ্তাহে, সপ্তাহে, স্থান বিশেষে সমবেত হইয়া আচার্য্যের অধিনায়কতায় সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি, মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্য স্মরণ করাই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা। তাহাতে হিন্দুর বিরক্তি বোধ করিবার কিছু ছিল না, কখন করেও নাই। অনাচারের আড়ম্বরে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ; সেটা কলিকাতাতেই বেশী, মফস্বলে সে তরঙ্গ প্রায় যায় নাই। কৃষ্ণনগরে যৎকিঞ্চিৎ গিয়াছিল বটে ; হুগলী, বর্দ্ধমানে কিছুমাত্র ছিল না। অনাচারের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। অনাচারকে ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিতে হইবে, এমন বিড়ম্বনাবুদ্ধি তখনকার কালে আমাদের পরিচিত কাহারও মধ্যে ছিল না। দীর্ঘশিখা শোভিত—, ত্রিপুণ্ড্রকধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে, অথবা তুলসী-ত্রিকণ্ঠি-গলভূষণ

গোস্বামী প্রভুকে লইয়া পিতৃদেব তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতেন; সকলেই আগ্রহে শ্রবণ করিতেন; এবং লিখিত কথার ভক্তিপূর্ব্বক আলোচনা করিতেন। তবে রাজা রামমোহন রায় অনাচারী ছিলেন, বিলাতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, ব্রহ্মবাদ যাহার তাহার জন্য নহে, কলিকাতার ব্রাহ্মণগণ জাতি মানেন না, আচার বিচার কিছু মানেন না, এ সকল কথাও সময়ে সময়ে হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বামনদাস বাবুর ক্রিয়াশীলতায় বীরনগর গ্রাম সনাতন ধর্ম্মের এক প্রকার কেন্দ্রভূমি ছিল, কিন্তু পিতৃদেবের স্বভাবগুণে সেই কেন্দ্রভূমিতে তত্ত্ববোধিনীর প্রতিপত্তি প্রচারের ত্রুটি হয় নাই।

তত্ত্ববোধিনী দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ একটু সম্বন্ধ ছিল। তত্ত্ববোধিনীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই লিখতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ব্রাহ্ম লেখক বলা যাইতে পারে না; অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিতেই হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই সাধু বাঙ্গালার লেখক; উঁহাদের দুইজন হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের গৌরব, সে বাঙ্গালা সাধুবাঙ্গালা। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে লেখনী চালনা করেন, পন্থা প্রদর্শন করেন,—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য পড়িতাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রচলিত বাঙ্গালা অবহেলার সামগ্রী নহে। তাহার পর সেই সময়েই যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের "মাসিক পত্র" পড়িতে পাইলাম, তখনই বুঝিলাম, সে সহজ সরল চলিত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা দেশের কথা, বাঙ্গালীর ঘরের কথা, বাঙ্গালীর সদাচার অনাচারের কথা, হাসি তামাসার কথা, লিখিলেও সুপাঠ্য গ্রন্থ হয়। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানের কথা পড়িতাম; সকল কথা বুঝিতে পারিতাম না। বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঁচিশে পূর্ব্বকালের কথা পড়িতাম। "পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে এক নরপতি ছিলেন।" "বর্দ্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক নরপতি ছিলেন" এইরূপ সকলই সেকালের কথা,—ছিলেন আর করিয়াছিলেন। কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরে এই কালের, এই বাঙ্গালির প্রাত্যহিক জীবনের কথা, ঘরকন্নার কথা, সমাজের কথা, সহজ কথায় দেখিতে পাইলাম। সেই শিশুজীবনে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগরের গাম্ভীর্য্যে, রচনাচ্ছটায়, ভাবের ঘটায় ভুলিয়া ছিলাম। টেকচাঁদের বিনা আড়ম্বর সরলতায়ও সেইরূপ বিমুগ্ধ হইলাম। গদ্যের গঙ্গাযমুনাস্রোত, আর ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যের সরস্বতী আমার বাল্যজীবনের প্রয়াগস্থলে সমানে বহিতে লাগিল। আমি সেই মহা সঙ্গমতীর্থে মহানন্দের সহিত হাসিতেহাসিতে কৃতার্থতা লাভ করিলাম।

ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য খৃষ্টানদের বাঙ্গালা মাসিকপত্র ছিল। কলিকাতার ধর্ম্মসভার মাসিকপত্র ছিল। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের চর্চ্চা হইত। কিন্তু সামাজিক কথা লইয়া মাসিকপত্রে আন্দোলন প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম করেন।

"মাসিকপত্রে" খণ্ডশ প্রকাশিত হইত,—"আলালের ঘরের দুলাল" "মদ খাওয়া বড় দায়" "জাত থাকার কি উপায়" এবং "রামারঞ্জিকা"। পরে এই তিনখানি পৃথক পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলালে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র আছে। ভাল মন্দ দুই আছে। মদ খাওয়া প্রবন্ধে, মদের দোষ নানাভাবে, গল্পের ডালপালা দিয়া বুঝান হইয়াছে। রামারঞ্জিকার হরিহর পদ্মাবতী দম্পতি মধ্যে আপনাদের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে। এতৎপূর্ব্বে কাদম্বরীকার তারাশঙ্কর স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার পান। তাহাতে সেকালে হিন্দুমহিলাগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, ইহাই দেখান হয় এবং একালেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত ইহাও বলা হয়। রামারঞ্জিকাতে মিত্র মহাশয় সেই কথারই বিশদরূপে এবং বিস্তারিতভাবে সমর্থন করেন। আমি উভয় গ্রন্থই সমাদরের সহিত পড়িয়াছিলাম। আমার মাতৃদেব লেখাপড়া জানিতেন ; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা লইয়া এ ত গণ্ডগোল কেন ? সেটা বড় বুঝিতে পারি নাই। মনে মনে ভাবিতাম বেটাছেলে যেমন লেখাপড়া শিখিবে, মেয়েরাও ত সেইরূপ লেখাপড়া শিখিবে, তবে আবার ইতরবিশেষ কেন ?

বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটী যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেও যে অনুপ্রাস আসে, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আলালের ঘরের দুলালের আরম্ভ "বৈদ্যবাটির বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন"। এ ত টেনে বুনে অনুপ্রাস নয় ; শব্দের ঘটাছটায় মিলন নয় ; সহজ কথা সহজে বলিতে গিয়া অনুপ্রাস হইয়াছে।

টেকচাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম বটে কিন্তু কেহ বলিয়া না দিলেও তাঁহার গ্রাম্য দোষ—তখন নাম টাম না জানিলেও—একটা দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল ! শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই,—ওগো মরমেতে মরে রই,—টক্—টক্—পটাস্—পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে, টিটকারি দিতেছে ও শালার গরু চলতে পারে না বলে, লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।" এই লেখা আমার আপনা হইতেই ভাল লাগে নাই। তাহার পর যখন পিতৃদেবের সম্মুখে ঐ অংশ পাঠ করিলাম, তিনি শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। সেই একরূপ সমালোচনা। আমি বুঝিলাম এরূপ লেখা প্রশংসনীয় নহে।

এইরূপ হাস্যে ও গাম্ভীর্য্যে আমার শিক্ষা লাভ। বালককালে কর্ত্তব্যের কঠোরতায় বা শিক্ষকের তাড়নার ভয়ে ভয়ে দায়গ্রস্ত হইয়া আমাকে শিক্ষা লাভ করিতে হয় নাই। সেই আমার পরম সৌভাগ্য, এ সৌভাগ্য অনেকের অদৃষ্টে হয় না। এ সৌভাগ্যের সংযোজক পিতৃদেব। স্বদেশে বিদেশে বহুতর শিক্ষকের কাছে নানারূপ

শিক্ষা লাভ করিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকে সিদ্ধকাম শিক্ষক আছেন, আপনিও দিনকতক সখের শিক্ষকতা করিয়াছি, আর পাঁচটি পুত্র কন্যা থাকাতে সর্ব্বদাই শিক্ষকতা করিতে হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই পিতৃদেবের মত শিক্ষক আমি আর দেখিলাম না। পুত্র পিতাকে সার্টিফিকেট দিতেছে, সে সার্টিফিকেটের মূল্য বড় কম, তাহা বুঝি। কিন্তু তাঁহার জীবনীর দশ কথা লিখিতে বসিয়াও যদি এই কথাটা না লিখি, তাহা হইলে মহা অধর্ম্ম হয়, মনে করি। তাঁহার গুণের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হইল না বলিয়া অধর্ম্ম নহে, এই কথাটা ছাড়িয়া দিলে জীবনী লেখার যে প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই বিফল হইয়া যায়। একটি জীবনের ঘটনা হইতে দশটী জীবন আংশিক গঠিত হইতে পারে। আজি কালি শিক্ষকতা দুর্লভ সামগ্রী হইয়াছে। পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি বালকগণের স্বাভাবিক শিক্ষক। তাঁহারা অনেক সময়েই আপনাদের 'কার্য্য' লইয়া ব্যস্ত থাকেন। পুত্রের শিক্ষা দানরূপ অকার্য্যে কাজেই তাঁহারা মনোযোগ দিতে পারেন না। স্কুলের শিক্ষকেরা ডাইরেক্টার বা প্রিন্‌সিপল কি বলেন, কি করেন, কি ভাবে কোন্ কার্য্য করিতে বলেন, সেই চিন্তাতেই আকুল; ছাত্রগণ কোন কথা প্রকৃত প্রস্তাবে শিখিতেছে কিনা, তাহা অনুধাবন করিবার সময় তাঁহাদের নাই, প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না। কাজেই ছেলেপিলের শিক্ষা এখন একটা বিশেষ বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। পিতার বিচার আচার, আমোদ প্রমোদ, শিক্ষা পরীক্ষা প্রভৃতি শত কার্য্য থাকিলেও, আমাকে শিক্ষাদান তাঁহার সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কাছারির সময় ছয় ঘণ্টা ছাড়া, বাকি আঠার ঘণ্টা, আমি নিয়তই তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। একত্রে স্নান করিতাম, একত্রে আহার করিতাম, একত্রে শয়ন করিতাম, তাঁহার সেই সন্ধ্যাকালের সরগরম মজলিসের আমি বিনীত অথচ নিয়ত শিশু সভ্য ছিলাম। কখন বলেন নাই যে, "অক্ষয় তুমি ওঘরে গিয়া পড়গে।" গান গল্প হাসি মস্করা, শিশু বলিয়া সমানে ভোগী হইতে পারিতাম না, কিন্তু ভাগী হইতাম। তোমরা বলিবে, ইহাতে শিক্ষার কি হইল? আমি বলি, তুমি সবজজ বাহাদুর বা ডেপুটি মহাশয় অথবা উকীল প্রবর, তুমি দিন কত তোমার একটি ছেলেকে এইরূপ সহবত করিয়া রাখ দেখি, দেখিবে, যে সৎশিক্ষা এখন তুমি অসাধ্য মনে করিতেছ, উহা সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

একজন প্রবীণ আত্মীয় যদি একটি সুকুমার-মতি শিশুকে নিয়ত নিজের সঙ্গে রাখেন এবং সে কি করিতেছে না করিতেছে, তৎপ্রতি অনেক সময় দৃষ্টি রাখেন, তবে সেই বালকের সাধ্য কি যে, সে সেই প্রবীণের প্রদর্শিত পন্থা হইতে অল্পমাত্র বিচলিত হইবে। তাহার উপর, যদি সেই প্রবীণের মনে কোনপ্রকার ছাঁচ থাকে, তবে সেই বালকের তরল মন সেই প্রবীণের ছাঁচে কাজে কাজেই ঢালাই হইবে। একজনকার

ছাঁদে আর একজনকে ঢালাই করাই—প্রকৃত গুরুমুখী এবং গুরুমুখী শিক্ষাই শিক্ষা। বালকের শিক্ষা অনুকরণ ; গুরু ভাল হইলে, সেই শিক্ষা যত গুরুমুখী হয়, ততই প্রবলা ও উজ্জ্বলা হয়। অতএব প্রথম কথা শিক্ষা গুরুমুখী হওয়া চাই এবং সেজন্য গুরুর সাহচর্য্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সাহচর্য্য সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় বলিয়া শাসন সামান্যত বাঞ্ছনীয় নহে। সে কালে শাস্ত্র যখন সজীব ছিল, তখন সমস্ত শাসনই শাস্ত্রে ছিল। পিতামাতার শাসন, রাজার শাসন, প্রভুর শাসন, শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল না। কোথাও পিতা, কোথাও প্রভু, কোথাও রাজা—শাস্ত্রের শাসন মাত্র, পুত্রের প্রতি, ভৃত্যের প্রতি, প্রজার প্রতি পরিচালনা করিতেন। সুতরাং তখন ছিল শাসন—কর্ত্তব্যকর্ম্মের একটি অঙ্গ। এখন হইয়াছে অনেক স্থলে অনিষ্ট আশঙ্কায় ক্রোধের পরিচয়। আমার প্রতি সাহচর্য্যের শাসন ছাড়া অন্যরূপ শাসন প্রায়ই ছিল না ; তবে পিতার অপ্রীতি বা ক্রোধকে আমি বড়ই ভয় করিতাম। নিয়ত সাহচর্য্যে প্রীতি জন্মায় বা বর্দ্ধিত হয়। আর সম্পর্ক গৌরবজনিত একটি ভয়ভয়ভাব সেই প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেইজন্য পিতামাতা গুরুজনের কাছ হইতে, সাহচর্য্য থাকিলেই, শিক্ষা অতি সহজেই হয়। ক্রীত শিক্ষক বা বেতনভোগী স্কুল মাষ্টারের কাছে সেরূপ হইবার সম্ভাবন নাই। আমাদের এখনকার কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিষ্কর্ম্মা পিতা পিতৃব্য যদিও আপনারা বালককে শিক্ষা দিতে স্বচ্ছন্দে পারেন, তথাপি তাহা না দিয়া একজন প্রাইবেট টিউটার হস্তে শিশুকে সমর্পণ করেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোকের একটী ভাল চাকরী হইলে, বিদেশে তাঁহার বাসায় আর দশজন আত্মীয় অনাত্মীয় ভদ্রসন্তান থাকিতেন। তাঁহাদের থাকার উদ্দেশ্য কাজ কর্ম্মের উমেদারী। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা আপনা আপনি পাকাদি ক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইতেন, অপরেরা হাট বাজারের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি করিতেন। তখন ভাল চাকর, অল্প বেতনে যথেষ্ট পাওয়া যাইত। পাচক ব্রাহ্মণ অল্প বা অধিক বেতনে, একেবারেই পাওয়া যাইত না। কৃষ্ণনগরের বা বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীতে বেতনভুক্ পাচক ব্রাহ্মণ ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না বা বাঙ্গালার কোন বড় মানুষের বাড়ীতে বেতনভুক্ পাচক ছিল না, তাহাও বলিতেছি না, তবে সাধারণত বড় বড় উকীল, মোক্তার বা হাকিমের বাসায় যেরূপ ঘটিত, তাহাই বলিতেছি। আসল কথা, ভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান বেতন লইয়া পাচকতা করা অত্যন্ত হীনবৃত্তি মনে করিতেন। সুতরাং সে বৃত্তি সহজেই গ্রহণ করিতেন না। আমাদের বাসায় যখন আমার মাতা ও অন্যান্য মেয়েছেলেরা থাকিতেন, তখন আমি ও পিতা আমরা অন্তঃপুরে পরিবার মধ্যে পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতাম। যখন তাঁহারা না

থাকিতেন, তখন বহির্বাটিতে ঐ উমেদার গোষ্ঠীগণের পাচিত অন্ন আমরা সমানে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতাম। উমেদারগণের মধ্যে আহার বেলোয়াঁ গ্রামবাসী দীননাথ বসু আমার সম্পর্কে ঠাকুরদাদা ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে পিতার সমক্ষে, পৃথক্ আসনে বসিয়া, আমাকে কাছে লইয়া কসামাজা শিখাইতেন। পিতার দৃষ্টি আমাদের উপরে থাকিত; আমাদের মধ্যে সকল কথা তিনি শুনিতে পাইতেন ও শুনিতেন। সেই সময়ে তিনি দশজনের সঙ্গে নানা কথায় এবং নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও আমাদের নাতি ঠাকুরদাদাকে কখন নজরছাড়া, মনছাড়া করিতেন না। ইহাও একরূপ প্রাইবেট টিউসন; কিন্তু দোতালা বৈঠকখানায় বাবু মহাশয়, আর দালানের পাশে নীচের ঘরে স্যাঁতা মেজেয়, সেগুণের টেবিলের দুই পার্শ্বে ছাত্র এবং 'সার',—সেই একরূপ প্রাইবেট টিউসন।

পিতা শয়নে-ভোজনে আমাকে সঙ্গী করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ সব সময়ে আমি ছিলাম তাঁহার সঙ্গী, আমার খেলার সময়, তিনি আমার সঙ্গী হইতেন। প্রত্যহ বৈকালে, আমার সমবয়স্ক স্কুলের ছেলেরা আসিয়া জুটিত, আমরা হাতে তৈয়ারি কাঠের ব্যাট ও সেলাই করা ন্যাকড়ার বল লইয়া ব্যাটম্বল খেলিতাম। পিতা কাছারী হইতে বাসায় গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া, জল খাইয়া, আমাদের খেলায় যোগদান করিতেন। কখন ব্যাট দিয়া বল মারিতেন, কখন বোলারের কার্য্য করিতেন; অন্য খাটাখাটুনী কখন খাটিতেন না। তাঁহার মত গুরুজনের পক্ষে সেরূপ হওয়াই, স্বাভাবিক বলিয়া আমরা বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

এক একদিন সান্ধ্য মজলিস—আমাকে লইয়াই হইত। ছেলেবুড়া আমরা সকলে মিলিয়া, পরস্পর পরস্পরকে হিঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিতাম। কিছুকাল পরে দাঁড়াইয়া গেল যে, আমি একলা অভিমন্যুবৎ এক পক্ষ, আর মহামহা সপ্তরথী সকলেই আমার বিপক্ষ। কিন্তু অভিমন্যুর মত সকল সময় আমার পরাজয় হইত না; আমি এক একদিন লবকুশের গৌরব রক্ষা করিতাম। আমার পেটে সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা প্রহেলিকা গজ গজ করিত। ইংরাজী তখন শিখি নাই বলিলেই হয়, সুতরাং ইংরাজী হিঁয়ালীর ধার ধারিতাম না। কিন্তু

১। এক বর্গ সমুদ্ভূতশ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদঃ।
অনুলোম বিলোমেন সদেব পাতঃ বঃ সদা॥

২। আয় ব্রাদার আজব দিদম্ চারঙ্গী জানোয়ার।
শের পঞ্জ, চসম্ আহু, ফীল্ গর্দ্দন্, বাঙ্খর।

৩। প্রথম অক্ষর নিলাম না, শেষের অক্ষর সেই,
নিরাকার নির্মাত্র ভেদ মাত্র এই;

মধ্যের অক্ষর কহি শুন রায়,
পাপীলোকে বলিলে স্বর্গে তরি যায়॥

৪। হরি হায়, গুণ করি হায়, নও লাথ মতি জড়ি হায়।
বাবুজিকা বাগ্‌মে দোশ লা উড়ুকে থড়ি হায়॥

প্রভৃতি সংস্কৃত, পারসী, বাঙ্গালা, হিন্দি বহুতর প্রহেলিকা আমার কণ্ঠস্থ ছিল; ক্রমে এমন হইল যে, আমাকে আর কেহ হেঁয়ালীতে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। নয় দশ বৎসরের একজন বালক, প্রকাণ্ড প্রহেলিকা-বাজ, বিদ্যা দিগ্‌গজ হইয়া উঠিয়াছে। সান্ধ্য মজলিসে এক এক দিন আমাকে লইয়া শুভঙ্করীর চর্চ্চা হইত। ক্রমে স্ফূর্ত্তির সহিত চালনার গুণে, আমি শুভঙ্করীতেও কীর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিলাম।

আমাদের মুনসেফি কাছারীর একজন উকীল ছিলেন—গুপ্তিপাড়ার নিকট আয়দার রামচন্দ্র দত্ত। তিনি দীর্ঘাকার, বলবান, তেজস্বী পুরুষ। বাঙ্গালায় দলিল-দরখাস্ত আদি নাকি অতি সারগর্ভ ভাষায় সংক্ষেপে লিখিতে পারিতেন। একথা পিতৃদেবের মুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছিলাম বলিয়া বলিতেছি। সেরূপ ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। তাঁহার হাতের বাঙ্গালা লেখা অতি পরিষ্কার ছিল। তিনি এক ইঞ্চি, সওয়া ইঞ্চি পরিমিত অক্ষরে আমাকে বাঙ্গালা কপি লিখিয়া দিতেন, আমি বড় বড় অক্ষরে গোটা গোটা করিয়া ছাপার ছাঁদে লিখিতাম। কি লিখিতাম, তাহা মনে আছে। লিখিতাম—"ঘোর মোহানন্ধকার-হর ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলাকর শ্রীগুরুদেব দেবাদি-দেব শ্রীচরণ সরসীরুহ রাজেষু।" এই গোটা গোটা লেখাতেও খেলা করিতাম। চাল চোঁয়াইয়া জলে ফেলিয়া, চোঁয়ানি জল তৈয়ার করিতাম। শাদা কাগজে, সেই ঈষৎ রক্তিম জলে, ঐ ঘোর মোহানন্ধকার লিখিতাম। কাগজটি বেশ শুকাইলে, সমগ্র কাগজটির উপর কালীর ভুষা দিয়া, হাতে করিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া, সমগ্র কাগজটা ঘোর চক্‌চকে কাল করিয়া ফেলিতাম। তাহার পর একটা বড় পীঁড়ের উপর সেই কাগজটা রাখিয়া, জলের ছাট মারা হইত। যে স্থানটা চোয়ানী জলের লেখন, সেই স্থানটা শাদা বাহির হইয়া পড়িত; বাকি জমিটা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ থাকিত। সেই কালর ভিতরে শাদা লেখা, আমার একটা খেলা।

আমার খেলার পরিচয় ঐরূপ, ব্যায়ামের পরিচয় ব্যাটম্‌বল। আর খেলা, ব্যায়াম ও আমোদের জন্য পিতা আমাদের বাড়ীর উঠানে একটি ছোট খাট ফুলের বাগান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি সেখানে অল্প-স্বল্প খোঁড়াখুঁড়ি করিতাম, ঘাস নিড়াইতাম; চাকরেরা কূপ হইতে জল তুলিয়া দিলে, সেই জল লইয়া ফুলের গাছে দিতাম। বাগানে প্রজাপতির সঙ্গে খেলা করিতাম, কখন কখন চুপ করিয়া দশবাহু

চণ্ডীর সবুজ লীলা প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম, কখন বা মল্লিকার মালা করিয়া আমাদের বৈঠকখানায় রাখিয়া আসিতাম।

উলায় থাকিবার সময়ে, আমি ইংরাজী অতি অল্পই পড়িয়াছিলাম, কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছিলাম বুঝিয়া-সুঝিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পড়িয়াছিলাম, ফার্ষ্ট নম্বর ও সেকেণ্ড নম্বর স্পেলিং, ফার্ষ্ট নম্বর রিডারের বার আনা, সেকেণ্ড নম্বর রিডারের অর্দ্ধেক। ইংরাজী ঐ পর্যন্ত, অঙ্ক বিষয়ে বাঙ্গালায় শিখিয়াছিলাম সমস্ত শুভঙ্করী ও ইংরাজী মতে সামান্যও দশমিক ভগ্নাংশ। বাঙ্গালায় পিয়ারসনের ভূগোল আর ইয়েটস্ পদার্থবিদ্যা; বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।

আমার শিক্ষা বিষয়ে পিতৃদেব কি রকম উপকরণ উপস্থাপিত করেন ও কি রকম প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহার কতক পরিচয় দেওয়া হইল। পদ্ধতির মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, আমি খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদ যথেষ্ট করিতাম, কিন্তু সকলই পিতার সমক্ষে, তাঁহার নজরের উপর। উপকরণ সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, ভাল ছাপার ভাল কাগজে যে সকল গদ্য, পদ্য পুস্তক সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্তই দেখিতে পড়িতে ঘাঁটিতে আমি পাইতাম; বটতলার ছাপার একখানিও পুস্তক আমার সম্মুখে কখন আসে নাই। আমি দেখিতে বা পড়িতে পাই নাই। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, একদিকে যেমন কুৎসিত পুস্তক একখানিও আমি পড়ি নাই, সেইরূপ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ হইতে আমি বঞ্চিত ছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় অন্নদা-মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের এবং 'সু' 'কু' আমার সকলই উদরস্থ ছিল।

আমার লেখাপড়া শিক্ষার প্রকরণ ও উপকরণের কথা বলিলাম। আমার আচার-ব্যবহার শিক্ষার প্রধান উপকরণ—পিতা স্বয়ং। এই সকল শিক্ষা—চরিত্র গঠন—যেমন দৃষ্টান্তে হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। পিতৃদেবে বিলাস, বাবুয়ানা, দম্ভ, দর্প—এ সকল কিছুই ছিল না। শাদা সিধা ডাল ভাত তরকারী, চলন-সই কাপড়, চাদর, জামা, জুতা—এই সকলই তাঁহার নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী ছিল। ভাল খাওয়া হইত, অতিথি অভ্যাগত আসিলে। ভাল পরা পরিতাম, পূজা পার্ব্বণে। নিত্য ব্যবহারে সকলই শাদা-সিধা। এই যে শাদা-সিধা কাপড়-চাদর ইহার মধ্যে বিলাতীর সংস্রব ছিল না। তা যে একটা ধর্ম্ম, বা কর্ত্তব্য, বা দেশহিতৈষীতা, তা বলিয়া নয়, আপনা-আপনিই, তাহাই আমাদের অভ্যাস ছিল। বিলাতী কাপড়ের জামা ছিল,—কিন্তু সেটা যে একটা দূষণীয় পদার্থ, তাহা কখন ভাবি নাই, ভাবিতে কেহ বলেন নাই। আমাদের এখানে, চুঁচুড়া, ফরাস ডাঙ্গায়, দেশী কাপড়-চাদরের অভাব ছিল না। থাকিতাম উলায়, শান্তিপুর অতি নিকটে, সেখানেও দেশী কাপড়-চাদর বিস্তর, কাজেই

আমরা দেশী বস্ত্রই ব্যবহার করিতাম। যে বৎসর পিতা সিনিয়র স্কলরশিপ পরীক্ষা দিয়া শান্তিপুরে প্রথম বেড়াইতে যান, সেই বৎসর শান্তিপুর হইতে তিন লক্ষ টাকার থান রপ্তানি হইয়াছিল। এখন পালা উল্টাইয়া গিয়াছে। তাঁতিতে থান বুনিতে ভুলিয়াছে, দেশ হিতৈষীতার দোহাই দিয়া এখন ছেলে-পিলেকে দেশী কাপড় ব্যবহার করাইতে হয়। আমাদের এরূপ বিচিত্র শিক্ষা হয় নাই।

পিতাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম; পিতাহি পরমং তপঃ—এ সকল জানিতাম না। শাস্ত্র জানিলে. তবে পিতৃভক্তি হয়—এ বিড়ম্বনাতেও কখন পড়ি নাই। পিতা—সরল, সংযমী, সদালাপী, মিতাচারী ছিলেন, আমি বালক হইলেও তাঁহারই মত স্বভাব পাইয়াছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে পিতৃজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমার সৎশিক্ষা। তাঁহার গুরুতর রাজকার্য্য তিনি নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার জীবনের এই ভাগের বর্ণনায় আমার শিক্ষার কথায় বেশী বলিতে হইল। তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবায় তাঁহার অনুরাগও বুঝিতে পারা গেল।

এহ স্থলে আর একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে, আদালতে বাঙ্গালা, এক বিকুৎসিত ব্যাপার ছিল। এক পৃষ্ঠা দরখাস্তে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকিত। "এতাবতা" "বিধায়" ইত্যাদি শব্দ দিয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ লাগাইয়া বাঙ্গলা ভাষার এবারৎ বা ষ্টাইল একটি বিষম গোলকধাঁধাঁ করিয়া তোলা হইত। বাঙ্গালা লেখার জন্য ষত্ব ণত্ব জ্ঞান থাকা আবশ্যক ছিল না। এঞয় আকার (া) দিয়া হঞা (হইয়া) ওয়ে আকার দিয়া হওা (হওয়া) সর্ব্বদাই থাকিত। লেখকেরা কেহ বিশুদ্ধ বানানের ধার ধারিত না। ব্যাকরণ কাহাকে বলে জানিত না। গেরর উপর গেরু দিয়া, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ দিয়া, জটিল-কুটিল দুর্ব্বোধ একটা কারখানা করিতে পারিলেই, লেখক বড় মুন্সি হইতেন। লেখক-দিগের বুদ্ধি ছিল না এমন নহে; কিন্তু ঘোর-ফের করিয়া যে যত ভাষা অস্পষ্ট করিতে পারিত, তাহার মুন্সিয়ানা বুদ্ধির ততই প্রশংসা হইত। তাহার পর নির্ব্বুদ্ধিতাও যথেষ্ট ছিল। একজন উচ্চ কর্ম্মচারী তাহার উপরিস্থ আর একজন উচ্চতর কর্ম্মচারীকে লিখিলেন—"পুলিশ সাহেবের আশায় দস্যুরা পলায়ন করিল। বড় সাহেব বাহাদুর অভিধান দেখিয়া জানিলেন যে 'আশা' অর্থে ইচ্ছা; অতএব বুঝিলেন, পুলিশ সাহেবের ইচ্ছাক্রমে ডাকাতরা পলাইয়াছে। সুতরাং পুলিশ সাহেব সাসপেণ্ড হইলেন, মহাতুমুল হইয়া উঠিল। লেখা উচিত ছিল, "পুলিশ সাহেব আসাতে, তাহা না লিখিয়া "পুলিশ সাহেবের আশায়" লেখাতেই এত গণ্ডগোল হইল।

এরূপ সর্ব্বদাই হইত। এই সকল বিড়ম্বনা দূরীকরণার্থ পিতা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ

হইয়াছিলেন। আহেলে মামলা, মুহুরি আমলা, উকীল মোক্তার সকলেরই কার্য্যে তাঁহাদের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদের ভাষা সংশোধন করিয়া দিতেন ; আর ভবিষ্যতে সেরূপ না হয়, তাহার জন্য সৎ-উপদেশ প্রদান করিতেন। আমার শিক্ষা-তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। যাহাদের লেখার প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা সহজে সরলভাবে লিখিতে পারে, তাহার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা শিক্ষাদান, তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি চারিটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। কাছারী তাঁহার স্থাপিত নহে বটে, কিন্তু সেটি পঞ্চম স্কুল। সেখানে ষত্ব, ণত্ব ব্যাকরণ কিছু শিখাইতেন না বটে, কিন্তু লেখার রীতি, কায়দা ও লেখার মধ্যেও যে একটা কার্য্যকরণ সম্বন্ধ আছে, সেই ভাবটা—সর্ব্বদাই বুঝাইয়া দিতেন। আর কোন বিষয়েই সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হওয়া পিতৃদেব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না, তবে সাধারণত, যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয়, এবং চলিত লেখা-পড়ায় যাহাতে অধিকতর বিশুদ্ধি, সারল্য, প্রাঞ্জলতা এবং বুদ্ধি বিচার থাকে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই স্থলেই তিনি সংস্কারক। যখন যে জেলায় গিয়াছেন, সেই খানেই যাহাতে ভাষার সংস্কার হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। যে ভাষায় তিনি সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা অবিকল সাক্ষীর কথা হইলেও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত। সাধারণ লোক কখন বাঙ্গালা বলিতে ভুলে না। আমাদের সহর-অঞ্চলে কখন কখন বলে বটে "ঠাকুর মহাশয় চলে গেল, তার জুতজোড়াটা পড়ে রইলেন" কিন্তু তখন তাহারা আমাদের অনুকরণ করিতে যায়, অর্থাৎ সাধুভাষা বলিতে যায়, গিয়া ভুল করে।

তাঁহার সাক্ষীর জবানবন্দি অতি পরিষ্কার বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালা। সমস্ত হুকুম নিজে লিখিয়া দিতেন, সাধারণত মোকর্দ্দমার রায় বাঙ্গালাতেই লিখিতেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গালা হইলেও বিশেষ প্রগাঢ় হইত। তাঁহার সেই আদর্শ বাঙ্গালা লেখার সংক্রামকতা ছিল ; এই সকল কথা—তাঁহার মুনসেফি অবস্থার কথা বলিতেছি। তিনি যখন সদর আলা হইলেন, তখন বাঙ্গালায় বিশ বৎসর বিশুদ্ধ বাঙ্গালার চর্চ্চা হইয়াছে ; ঢাকায় একজন এম, এ কে পিতৃদেব কিছুদিনের জন্য সব জজের সেরেস্তাদরী পদে নিযুক্ত করেন। তখন আর বাঙ্গালায় ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা দেশে শিকড় গড়িয়াছে। ছাত্রবৃত্তি পাশ শত শত যুবক রাজকীয় কর্ম্মাগারে নানা কর্ম্ম করিতেছেন। উলা, পানিআটা, জাহানাবাদ, সাতক্ষীরা, এই সকল স্থানে পিতৃদেবকে বাঙ্গলা ভাষার সংস্কারের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই সংস্কার কার্য্যের প্রধান অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র উলা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আবাস ভূমি। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সকলেই লেখা পড়া

শিখিতেন। হাতের লেখা গোটা গোটা পরিষ্কার উজ্জ্বল ছিল। বালকেরা আগ্রহ-সহকারে স্কুলে ষত্ব ণত্ব ব্যাকরণ শিখিতে লাগিল। যুবক উমেদার-গোষ্ঠী, কাছারীতে আসিল, বাঙ্গলা লেখার এবারৎ দোরস্ত করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উকীল রামচন্দ্র দত্ত বাঙ্গলা এবারতে খুব মজবুত ছিলেন, তিনিও খুব আগ্রহ সহকারে এবিষয়ে পিতৃদেবের সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম হাকিমের মনোরঞ্জন-কারী বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিতে তাঁহাকে বিদ্রুপ করিত। কিছু দিন পরে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিল; এবং এই কার্য্যের জন্য সকলেই পিতৃদেবকে ও রামচন্দ্র দত্তকে মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

আমার শিক্ষার জন্য পিতৃদেব কিরূপ প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন ও কিরূপ উপকরণ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আমার কীর্ত্তির একটু পরিচয় দিতে ক্ষতি কি? যে সকল পুস্তক পড়িতাম, সে সকল পুস্তকের মধ্যে যে সকল দুরূহ শব্দ থাকিত, সেইগুলি একখানি খাতায় একদিকে লিখিতাম ও শব্দার্থ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তাহার পার্শ্বে লিখিতাম। কখন কখন পিতৃদেব স্বহস্তেও পার্শ্বে অর্থ লিখিয়া দিতেন। এমনি করিয়া অনেকগুলি খাতা হইয়াছিল। বালক কালের মন,—বৃদ্ধাবস্থার স্মৃতি ও মন দিয়া বিশ্লেষণ করা বড় কঠিন। সেই খাতাগুলি অভিধানরূপে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। এই ইচ্ছার মধ্যে কতটা ছেলেমি ছিল, আর কতটা দুরাকাঙ্ক্ষার বীজ ছিল ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা একরূপ অসাধ্য। আমাদের বাড়িতে 'শব্দাম্বুধি' অভিধান ছিল। আমি কাজে কাজেই, 'শব্দসাগর' সঙ্কলন করিতে সঙ্কল্প করিলাম, সঙ্কল্প মত কার্য্য হইল। অভিধানের পরিচয়-পৃষ্ঠা এইরূপ—

"শব্দসাগর[১৯]

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রণীত।

সংবৎ ১৯১৩

শকাব্দা ১৭৭৮

সাল ১২৬৩

খ্রীষ্টীয় শাক ১৮৫৬

এই গ্রন্থে নানাবিধ পুস্তক হইতে দুরূহ শব্দ সঙ্কলন পূর্ব্বক তদর্থ তৎপৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কর্ত্তৃক প্রণীত' লিখিতেন, আমিও লিখিয়াছি। কেহ সংবৎ,

কেহ শকাব্দা, কেহ সাল, কেহ খৃষ্টাব্দ দিতেন, আমি সবকটাই দিয়াছি। আর গ্রন্থের পরিচয় সর্ব্বশেষে দিয়াছি। তবে "এই গ্রন্থ" শব্দের কারক কিরূপে মিটিল, তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই গোল আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, সেই ভূমিকা পৃষ্ঠায় অবিকল প্রতিরূপ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

এখানে দেখিবেন কর্ত্তৃবাচ্যে আরম্ভ হইয়া ভাববাচ্যে বাক্য শেষ হইয়াছে। আমার নামের পূর্ব্বে অধীন শব্দটীও লক্ষ্যের বিষয়। অক্ষয় শব্দের মোড়া 'অ'টি লক্ষ্যের বিষয়। মোড়া 'অ' দেবনাগর 'অ' তখন একটু আধটু চলিত। 'ক্ষ' পরে আছে, 'ক্ষ' টি দেবনাগর করিয়া দিলে, লেখাটি খুব ঘোরাল-ফেরাল হয়, এই জন্য রামচন্দ্র দত্ত আমাকে ঐরূপ লিখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শব্দসাগরের শকুন্তলা ভাগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

নান্দী	...	নাটকের প্রথমে আশীর্ব্বাদ-সূচক
	...	বাক্য।
সূত্রধার	...	প্রধান নট।
নেপথ্য	...	সাজঘর।
আর্য্যা	...	শ্রেষ্ঠা স্ত্রী।
আর্য্যপুত্র	...	স্বামী।
অভিনয়	...	ভাব প্রকাশ করা।
প্রস্তাবনা	...	আরম্ভ, ভূমিকা।
অপবার্য্য	...	ফিরিয়া।
বিষ্কম্ভক	...	প্রথমে পূর্ব্ব কথার স্মরণ করিয়া দিয়া যে বিষয়ের অভিনয় হইবে তাহার ভাবি কথার অংশকে যাহা সূচনা করিয়া দেয়। ইত্যাদি—।

অধিক নমুনা দেবার প্রয়োজন নাই।

শুনিয়াছি নাকি, হাতের লেখায় মানব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মানব চরিত্রে বৈচিত্র আছে বলিয়াই, হাতের লেখায় বৈচিত্র আছে। যে ছোট ছোট গুজিবুজি লেখে, তাহার চিত্তও নাকি সঙ্কুচিত এবং জটিলতাময়। যে বড় বড় করিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে গোটা গোটা লেখে, জোরাল টানে কলম টানে, তাহার নাকি উদার হৃদয় এবং বিশাল সাহস। নেপোলিয়ন খুব তেজ কলমে গোটা গোটা অক্ষরে নাম সহি করিতেন। ওয়াটারলুতে বিষম বিপর্য্যস্ত হইয়া, তাঁহার দস্তখতের টান নাকি নিস্তেজ হইয়াছিল। শেষের এন এর শেষ টান নাকি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। জানিনা, এ সকল

কথা কতদূর সত্য। আমার দশম বৎসরের জীবনের হিজিবিজির অবিকল প্রতিরূপ দিলাম। চরিত্রের পরিচয় এখন আপনারা বুঝিয়া লউন।

এই যে ভূমিকার তারিখ, শকাব্দা ১৭৭৮, ২৮শে আশ্বিন, আমার উলা জীবনের এই শেষ সময়। ইহার পর বেশীদিন আমরা আর উলায় ছিলাম না। আমি ত আর যাই নাই। যে রামচন্দ্র দত্ত আমাকে হস্তাক্ষর শিক্ষা দিয়াছিলেন, একদিন হঠাৎ শুনিলাম তিনি অকস্মাৎ মহাপীড়িত। শুনিয়া চাপরাসির সঙ্গে বৈকালে দেখিতে গেলাম। উলার প্রায় দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় বাজারের সংলগ্ন একটি ছোট একতালা কুঠারিতে—তিনি বাস করিতেন। তখন পূজার পূর্ব্বে উলার চারিদিকে জলে জলময়। চারিদিকের মাঠ ছাপাইয়া গ্রামে কানায় কানায় জল উঠিয়াছে। দত্তজার সেই কুঠরিটি দেখিলাম অত্যন্ত সেঁতা। সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে, একদিকে চৌকীর উপর সদাশয় দত্ত মহাশয় অসাড় পড়িয়া আছেন ; চিত হইয়া পড়িয়া আছেন হস্তপাদাদি নাড়িতেছেন না। আমাকে চিনিতে পারিলেন—তুটি চারিটি কথায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, চাপরাসি আমাকে লইয়া চলিয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্ব্বগামিনী ছায়ার সঙ্গে, সেই আমার প্রথম পরিচয়। উদাস প্রাণে নয়, ভরা প্রাণে আমি বাসায় আসিলাম! সে রাত্রি পড়িতে শুনিতে পারিলাম না। পরদিন প্রত্যূষে শুনিলাম, দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিন দিনের জ্বরে দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তখন কাছারীর ছুটি হয় নাই। পিতা ছুটির অপেক্ষায় তুই চারি দিন রহিলেন। আমি, মাতা ও পরিবারের আর আর সকলে চলিয়া আসিলাম। উলায় তখন বিষম মহামারী আরম্ভ হইয়াছে। আট লক্ষ লোক পূর্ণ কলিকাতায় কোন দিন তুইশত লোকের মৃত্যু হইলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয় ; আর দশ হাজার অধিবাসীর বাসস্থান উলায়, প্রত্যহ তুই শত লোক নীরবে মরিতে লাগিল। পূজার পর পিতা রাণাঘাটে কাছারী উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এখনও সেই রাণাঘাটে আছে।

এই যে আমরা উলায় ছিলাম, ইহা ক্রমাগতভাবে বা এক লাগাড়ে নহে। ৺শারদীয়া পূজার ছুটি হইলে, পিতার সহিত বাড়ী আসিতাম, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় পিতৃদেব চলিয়া যাইতেন, আমরা অর্থাৎ মাতা, আমি প্রভৃতি কার্ত্তিক পূজা করিয়া, অগ্রহায়ণে নবান্ন সারিয়া, পৌষে পিঠা পার্ব্বণ খাইয়া, মাঘ মাসে উলায় যাইতাম। হেমন্ত ও শীত আমাদের চুঁচুড়ায় কাটিত। চুঁচুড়ার বাস, আমার সহরে বাস হইত। উলায় বাস আমার পল্লীবাস ছিল। চুঁচুড়ায় গঙ্গা দেখিতাম, কলেজ দেখিতাম, লাল গোরা পিল পিল করিতেছে, এমন বারিক দেখিতাম ; পালেদের বাড়ীর পার্শ্বে হোটেলের পূতিগন্ধের ঘ্রাণ লইয়া নাকে কাপড় চাপা দিতাম। তুর্গাপ্রসন্ন কাকা প্রভৃতি পাড়ার বর্ষীয়ান বালকেরা, আমার সঙ্গী হইয়া আমার সহরে-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন

করাইয়া দিতেন। দুইবার অগ্রহায়ণ, পৌষ, তাহা হইলেই হইল চারি মাস। আমি পাড়ার প্রেমচাঁদ মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়াছিলাম। পৌষপার্ব্বণ পালার ভিতর পড়িত, দুই বারই গুরুমহাশয়কে চাল, ডাল, নারিকেল, গুড়, তিল, তিলের ছাই, রাঙ্গা আলু, গোল আলু প্রভৃতি পৌষের সিধা দিতে হইয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে। সিধার সঙ্গে এক এক বোঝা সুঁদরী কাঠও দিতাম। শাস্ত্রমত তামাক চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দেওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। বাড়ীর মধ্যে তামাক-খেকো পুরুষ-সাধু চাকর। সে প্রত্যহ ১০ কড়ার তামাক পাইত, তাহা হইতে চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দেওয়া বড়ই কঠিন ও নিষ্ঠুর কার্য্য হইত। এই সকল বুঝিয়া সুঝিয়াই বোধ করি ঐরূপ কার্য্যে গুরুমহাশয় আমাকে ব্রতী করেন নাই।

এবার যখন উলা হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখনত আমি দিগ্‌গজ পণ্ডিত। পাঠশালার সমবয়সী ছেলেদের, বানানে ঠকাইয়া দিই, মানেতে ঠকাইয়া দিই। তবে দুই একজন তিলি-জাতীয় ছাত্রের হাতের লেখা আমাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। পূজার পর পিতৃদেব রাণাঘাটে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্তির একরূপ সমাধান হইল। কুসংসর্গে নষ্ট না হইয়া যাই, এরূপ শিক্ষা তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যা কথা কহিবে না। এরূপ করিয়া তিনি আমাকে কখন শিক্ষা দেন নাই। শিক্ষা হয় দৃষ্টান্তে, কেবল উপদেশে নহে। তিনি আমাকে যে বিচিত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার গুণে আমি কুসংসর্গ প্রুফ হইয়াছিলাম। কুসংসর্গে আমাকে নষ্ট করিতে পারিত না। এই শিক্ষার কথা বহুদিন পরে, পিতার মুখে শুনিয়া এবং বুঝিয়া, আমি সাধারণীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এবং পরে, 'আলোচনা' পুস্তকে সেই প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। দুই পঙক্তি তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "মনুষ্যজীবনের প্রথম শিক্ষা—অহঙ্কার, আত্মগৌরব, আপনার উপর শ্রদ্ধা, আপনার উপর বিশ্বাস। কুসংসর্গে লোক মন্দ হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহার মনে নিয়মিত অহঙ্কার নাই, সেই উচ্ছিন্ন যায়।" পিতা হৃদয়ের মধ্যে এই আত্ম-গৌরবের অঙ্কুর প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই চারি দিকে অনাচার অত্যাচারের বিষম দৃষ্টান্ত থাকিতেও, আমি দশ বৎসরের বালক, সেই সময় হইতে সমস্ত কিশোর কাল, অনড় অচল ছিলাম।

পূজার কিছুকাল পরেই কলেজের পরীক্ষার সময়। আমি একেবারে গ্রীষ্মের ছুটীর পর, যেদিন সিপাহীরা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ১৮৫৭ সালের ২রা জুন, সেই দিন আমি হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডারের ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম।

পর দশ বৎসরে, কিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট কলে, ঘৃষ্ট ও পিষ্ট হইয়া একটী

অদ্ভুত ম্যালেরিয়া-পূর্ণ কৃষ্ণের জীবভাবে ১৮৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, সে সকল কথা কিছু বলিব না। তবে এই দশ বৎসর কালের মধ্যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের কি শিক্ষা পাইলাম, তাহা বলা কর্ত্তব্য মনে করি।

তখন বাঙ্গালায় সঙ্গীত বলিয়া একটা জীবন্ত জিনিস ছিল। কবির গান নিস্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাত্রা পাঁচালী খুব আসর জমকাইয়া বসিয়াছিল। আমাদের পাড়াতেই পাঁচালীর দল ছিল। আর চুঁচুড়া ফরেসডাঙ্গায় যাত্রা, পাঁচালীর আড়ৎ ছিল। তাহা ছাড়া পথে ঘাটে সর্ব্বদাই লোকে গান গাহিতে গাহিতে যাইত ; রাত্রিতে ত বটেই। পড়িবার সময় ছাড়া, অন্য সময়ে, চারিদিক চাহিয়া দেখা ও সকল কথা কাণ খাড়া করিয়া শুনা, আমার অভ্যাস হইয়াছিল। বহুতর বাঙ্গালা গান আমার মুখস্ত হইয়াছিল। রাত্রি জাগরণ করিয়া যাত্রা শুনা,—বৎসরে দুই দিনও শুনিতাম না। এমনি দিবা ও সান্ধ্য গানে, আমার মগজ ভরপুর ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হুগলি কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যবস্থা হইতে উপকার লাভ করিবার আমার ক্ষমতা হইয়াছিল। আমি উপকৃতও হইয়াছিলাম। আমরা পড়িতাম 'সুখবোধ ব্যাকরণ।' এই ব্যাকরণের কথা, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, একটী প্রত্ন-তত্ত্ব-প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শত শত বালক ঐ ব্যাকরণ যে কণ্ঠস্থ করিত, তাহা বোধ হয় ত্রিবেদী কখন শুনেন নাই। ত্রিবেদী-গ্রন্থকারের নাম লিখিয়াছেন—শ্রীভগবান্ চন্দ্র সেন। ঠিক কথা, কিন্তু ১৮৫৭ সাল হইতে মুদ্রিত পুস্তকে 'শ্রীভগবৎচন্দ্র বিশারদ-প্রণীত' বলিয়া ছাপা হইয়াছে। এই ভগবানচন্দ্র সেন বা ভগবৎচন্দ্র বিশারদের কাছে, আমরা এনট্রান্স ক্লাসে ১৮৬২ সালে পড়িয়াছিলাম। আর তাঁহার ব্যাকরণ সমস্ত কিশোর জীবনে অভ্যাস করিয়াছিলাম। সুখবোধ হইতে যে কৃৎ, তদ্ধিত, ও স্ত্রীত্ব পড়িয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালা লেখায় হঠাৎ ব্যাকরণে ঠকিতে হয় না। হুগলী কলেজের নীচের ক্লাসে কয়েকজন ভাল ভাল পণ্ডিত ছিলেন। এখনকার প্রসিদ্ধ বিপিনবিহারী গুপ্তের পিতা ৺গোবিন্দ গুপ্ত তন্মধ্যে একজন। স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই, তাঁহার হস্তে পড়িলাম। তিনি বড় সৎ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার কাছে আমি বিশেষরূপে ঋণী। সেইরূপ হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছেও ঋণী। ভগবৎচন্দ্রের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাঁহার উপর ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি। ইঁহার নিকট আমি মুগ্ধবোধ শিক্ষা করিতাম। তিনি অগ্রে হেড পণ্ডিত ছিলেন, পরে প্রফেসর হন। পিতৃদেবও তাঁহার নিকট কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা দুই পুরুষে, তাঁহার নিকট ও প্রসিদ্ধ প্রফেসর ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী। সংস্কৃত বাঙ্গালার জন্য আর আমি ছাত্র জীবনে শেষ ঋণী—৺গোপালচন্দ্র গুপ্তের নিকট ও শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট। সকলেই জানেন, তিনি এখন কলিকাতা

মিউনিসিপালিটীর বাইস চেয়ারম্যান। কৃষ্ণবন্দ্যোর 'ষড়দর্শন সংবাদ' আমাদের বি. এ-র অন্যতম পাঠ্য ছিল। তাঁহার পদমূলে বসিয়াই সংস্কৃত দর্শনে যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করি।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া দেখিলাম, সুবোধিনী নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারসিয়র পরীক্ষা পাস করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায় সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুলস্ক্যাপ আকারের কাগজ। দুই স্তম্ভে। যাঁহারা সাধারণী দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সে সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ।

সুবোধিনীতে ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্রশ্রেণী অনেকেই পদ্য লিখিতেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়কে এবং মাদ্রালের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বোধ হয় কেহ কেহ এখনও স্মরণ রাখিতে পারেন। অভয়চন্দ্র পাঁড়েকে বোধ হয়, সকলেই ভুলিয়াছেন। তিনি সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিতের মামাত কি পিস্তুত ভাই ছিলেন। আর আমাদের তিন ক্লাস উপরে হুগলি কলেজের ছাত্র ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেটি সিপাহী সমরের সময়। পাঁড়েজী পদ্য লিখিতেছেন ;—

"জয় ব্রিটিশের জয়   জয় ব্রিটিশের জয়
যতেক বিদ্রোহিদল,   যাক্ সব রসাতল,
প্রবল ব্রিটিশ বল,   হউক অক্ষয়,
বল হউক অক্ষয়।
জয় ব্রিটিশের জয়,   জয় ব্রিটিশের জয়।"

স্কুলের প্রথমাবস্থায়, সংবাদপত্রের মধ্যে, এই সুবোধিনী আমার প্রধান সম্বল ছিল। এডুকেশন গেজেট বা প্রভাকর আর দেখিতে বা পড়িতে পাইতাম না। এ অঞ্চলে কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভূয়ো প্রচলন ছিল। ঐ সকল পুস্তক এবং বটতলায় প্রকাশিত রজনীকান্ত, জীবনতারা প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কাশীদাস কৃত্তিবাসের অনেক স্থলই মুখস্থ করিয়াছিলাম। এটি পড়িবে, উটি পড়িবে না, আমার মাথার উপর এমন কেহ বলিবার ছিলেন না, আমিও ভাল-মন্দ সমস্তই গলাধঃকরণ করিতাম। তখন একরূপ মুসলমানী বাঙ্গলা সাহিত্য, জীবন্ত ছিল। কাজি সফিউদ্দীন নামে কোন মুসলমান সেই সকল বটতলা হইতে প্রকাশ করিতেন। চাহার-দরবেশ, গোলে-বকোয়ালি, ইসপ্-জেলেখাঁ, হাতেম-তাই প্রভৃতি সেই সকল মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থও গলাধঃকরণ করিতে আমি ছাড়ি নাই।

স্কুলে পড়িবার সময়েই, বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং সংকীর্ত্তনের দিকে আমার মন আকৃষ্ট

হয়। তবে তৎপূর্ব্বে যে উলায় থাকিবার সময়েও ঐ টানের কিছু অঙ্কুর জন্মে নাই, এমন কথা নহে। উলায় দেওয়ান মুখুয্যে মহাশয়দের নগর-সংকীর্ত্তন খুব ভক্তিপূর্ব্বক শুনিতাম। পিতৃদেব দুই একটী নগর-সংকীর্ত্তনের গান বাঁধিয়াছিলেন; তাহাও মনে আছে। আর উলায় থাকিলেও, ৺দুর্গাপূজার সময় প্রতি বৎসরই বাড়ীতে থাকিতাম; বিজয়া-দশমীর পরদিন হইতে একমাস কাল আমাদের বাড়ীতে নিয়ম সংকীর্ত্তন হইত। সেই অবধি এখনও হইয়া থাকে। আমাদের জন্মের পূর্ব্বে, আমাদের পল্লীতে, বাঞ্ছারাম কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। তাহার সংকীর্ত্তন গানে মোহিত হওয়াতে, বাগনাপাড়ার বলরাম বিগ্রহের নাকি হস্ত-স্থিত শিঙ্গা খসিয়া পড়িয়াছিল। সেই বাঞ্ছারামের দৌহিত্র গুরুদাস বাওয়াজি আমাদের বাড়ীতে নিয়ম-সংকীর্ত্তন করিতেন। আমাদের বৈঠকখানায় তাঁহাকে বেশ করিয়া বসাইয়া, পিতা তাঁহার গান শ্রবণ করিতেন। আমি এক মনে হাঁ করিয়া শুনিতাম। আর যেদিন গোষ্ঠ-গান হইত, সেদিন বড়ই আনন্দিত হইতাম। এখন গুরুদাস-বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। চুঁচুড়ায় থাকিবার কালে, বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে আর একরূপ শিক্ষা হইতে লাগিল। আমাদের পাড়ার সদ্‌গোপবংশীয় নিয়োগীরা সদ্ গৃহস্থ। সে সময়ে বর্ষীয়ান্ কর্ত্তা জগমোহন নিয়োগী মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্ণে দুই পাঁচজন প্রতিবেশী লইয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ নিজে করিতেন, কখন বা শুনিতেন। তিনি আমায় বড় ভালবাসিতেন। আমরা নিয়োগীদের বাড়ীতে সর্ব্বদা ইংরাজী পড়া-শুনা করিতাম। চরিতামৃত-পাঠের সময় খেলা-ধুলা ইংরাজি বা অন্যকথা ছাড়িয়া জগমোহন ঠাকুরদাদার পার্শ্বে বসিয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পান করিতাম। মাঝে মাঝে জগমোহন দাদা বলিতেন, "মদন কাকার প্রপৌত্র, না হবে কেন? আকরে টান যে।"

পাড়ার চন্দ্রশেখর বৈদিক, পাটনা হইতে কি কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পাঁচ হাত জোয়ান, কবাটের মত বক্ষ, লাল চেহারা; যদি পান, প্রত্যহ একটা গোটা পাঁঠা খাইতে পারেন; কিন্তু প্রত্যহই অপরাহ্ণে পাঠ করেন;—কাশীরামদাসের মহাভারত। লাল লক্ষ্ণৌ ছিটের তুলা-ভরা জামা বন্ধক আঁটিয়া গায়ে দিয়া, রামরক্ষিতের দালানে বসিয়া, চন্দ্রশেখর বৈদিক মহাভারত পাঠ করিতেন। নিজে মহা পাঁঠা-খোর; কিন্তু নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠী মালা, পাড়ার বৈষ্ণব প্রতিবেশীরা সকলেই আগ্রহ-সহকারে সেই মহাভারত শ্রবণ করিতেন। আর তর্ক-বিতর্ক হইত—বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় কথা লইয়া। যিনি যে দিক দিয়াই বলুন, ভগবানের নির্লিপ্তবাদ সকলেই স্বীকার করিয়া লইতেন। ও কথায় তর্ক চলে না সকলেই এইরূপ ভাবে কথা কহিতেন। আমিও সেই বালক কাল হইতে ঐ কথা মানিয়া লইয়াছি। এবং নির্লিপ্তবাদে বিশ্বাস ক্রমে দ্রঢ়ীভূত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের

কথা নানারূপ জল্পনা হইত। আমি কিন্তু তৎকালে বা তাহার বহুপর পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কিছুই বুঝি নাই। এখনও যে বেশ করিয়া বুঝিয়াছি, সে স্পর্দ্ধা করিতেছি না।

আমার শিক্ষার কথা বলিতে হইলে, সেই সময়ের সমাজের কথা বলা একান্ত আবশ্যক। যখন যাঁহার কাছে, যেটুকু শিখিয়া থাকি, পিতা যেরূপেই আমার চরিত্র গঠন করিয়া থাকুন, সে সময়ের সমাজের কথা না জানিলে, না বুঝিলে সেই সময়ের কাহারও শিক্ষার ভিত্তি বুঝা যায় না। মনুষ্য অদৃষ্ট হইতে কি পায়, না পায়, ঠিক বলিতে পারা যায় না। অভিজাত হইতে কতকগুলি জিনিস পায়; নিকটস্থ আত্মীয় পিতা মাতা ভাই ভগিনী হইতে লালন-পালনে কতকগুলি সঞ্চয় করে। গুরু মহাশয় প্রভৃতির তাড়নায় অনেকে শিক্ষা করে। দীক্ষা গুরুর কৃপায়, কেহ কিছু পায়, কেহ পায় না। এ সকল বিশেষ প্রাপ্তির কথা—কিন্তু সমাজ হইতেই সাধারণত সকলেই শিক্ষা করে। সমাজ—মনুষ্যের উপর নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে, গুরুগিরি করিয়া থাকে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আমার কি কাহারও শিক্ষার কথা বুঝিতে হইলে, আমাদের বাল্যকালে, এই বঙ্গসমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বুঝা একান্ত আবশ্যক।

আবশ্যক বটে, কিন্তু বুঝা বড় কঠিন। এখন মনে হয় যে, সমাজের মূলভিত্তি বুঝি বদলাইয়া গিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে জাপানের বাহ্য পরিবর্ত্তনে জগৎ যেরূপ চমৎকৃত হইয়াছে, আমাদের বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলে, সেইরূপই বিস্ময় বোধ হইবে। কিন্তু আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা বড় কঠিন; সেইজন্য কাহারও বড় বিস্ময় হয় নাই। আমাদিগকে নাকি, সেই সমাজে শিক্ষা পাইয়া, এই সমাজে পরীক্ষা দিতে হইতেছে, কাজেই এই আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন, আমাদিগের, বিশেষ আমার, বিলক্ষণ লক্ষ্য হইয়াছে।

তখন বঙ্গসমাজের মূলে ছিল—সন্তোষ; এখন এই সমাজের মূলে দাঁড়াইয়াছে—অসন্তোষ, একেবারে চিতেন মোহাড়া উল্টাইয়া গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—সমাজও বুঝিয়াছিল, সন্তোষ সকল সুখের মূল। অর্থাৎ সুখ হয় সন্তোষ হইতে। য়ুরোপ বলে, কাজেই অনেকে তাহা কার্য্যে মানিয়া লইয়াছে—সন্তোষ হইতে আলস্য হয়, আলস্য সকল দুঃখের মূল। ইহার ফলে এই হইয়াছে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় শুধু গড়ে ঢেঁকীতে পাদ দিবেন, তবু চাষে মন দিবেন না।

পণ্ডিত, অপণ্ডিত, জ্ঞানী, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, চাষা-ভূষা সকল শ্রেণীর পনের আনা লোক থাকিত—আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট; অবস্থার উন্নতির চেষ্টা

করিত না ? করিত বৈ কি। যাহার উন্নতি করিবার উপায় থাকিত, সেই করিত। আকাশে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিতে যাইত না, শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া, ব্যবসায়ের ধূমধাম করিত না। দরিদ্র ? ভদ্র সন্তানের মধ্যে এখন অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল ; কিন্তু লক্ষীছাড়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। ভদ্র-শ্রেণীর মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়। 'লক্ষীছাড়া' 'ছোট লোক' প্রায় একই পর্য্যায়ের গালি ছিল।

আমাদের পাড়ার পঞ্চু চাটুয্যে মহাশয় অতি দুঃখী ছিলেন। তাঁহাকে দীন দুঃখী না বলিয়া, দিন-দুঃখী বলিলে বোধ করি ঠিক হয়, কেননা তিনি প্রতিদিনই দুঃখী। চাটুয্যে মহাশয়ের ঘরে কিছু নাই, সকাল করে সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া আটহাতী কাপড়খানির কোঁচাটি বাম হাতে ধরিয়া, ডান হাতে তুড়ী দিতে দিতে, নিজের পদস্থ চটির তালে গুনগুন করিয়া গান করিতেছেন, ও একটু প্রকাশ্য পথে পাদ-চারণা করিতেছেন। সেই চটি কত দিনের কেহ বলিতে পারিত না ; শুকর সময় চাটুয্যে মহাশয়ের পদানত, বর্ষাকালে চালের বাতায়,—শীর্ষস্থানীয়। তবে একপার্শ্বে বটে। তখন লোকে ভিজা জুতা পায়ে দিবার সানিটেশন পর্ব্ব পাঠ করে নাই। চাটুয্যে মহাশয়ের সেই চটচট্ পাদ-চারণাতেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার গৃহ অদ্য তণ্ডুল-কণা-শূন্য। তখন সমজদার লোক ছিল, দরদের দরদী ছিল ; উহারই মধ্যে একজন চাটুয্যে মহাশয়কে গোপনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি দুয়ানি বা দুই সের তণ্ডুল দিল। চাটুয্যে মহাশয় হাসিবেন, কি আশীর্ব্বাদ করিবেন, স্থির করিতে পারিতেন না। শেষে বাম হাতে চাল বা পয়সা সামলাইয়া, সেই তুড়ী দিবার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া মৌন আশীর্ব্বাদ করিয়া হাস্যমুখে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। আহারের পর অশীতিপর বৃদ্ধ তাদের সঙ্গে গান গাহিতেছেন, হাস্য করিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন— কাল যে আবার কি খাইবেন, খাওয়াইবেন, সে ভাবনা কখন নাই।

আমরা সেই সন্তোষের সমাজে, সেই সুখের সমাজে, সেই আনন্দের সমাজে, সন্তোষেই গড়া-পিটা হইয়াছিলাম। তখন সেই সন্তোষ থাকাতে, সমাজে কতই না স্ফূর্ত্তি, কতই উৎসাহ, গান বাজনা, খেলা-ধূলা, কুস্তি করতপ,—কতই না ছিল! কাজেই আমরা বুঝিয়াছিলাম—সুখই জগতের নিয়ম, দুঃখ ব্যভিচার মাত্র। সুখের চোখে সকলই সুন্দর দেখায়। অতি বাল্যকালে, ঘোর ঝঞ্ঝার সহিত বজ্র স্ফোট হইলে, বুক ধড় ধড় করিত, কিন্তু সেই বুকের ভিতর তবু একরূপ আনন্দ উপভোগ করিতাম। পিতার নিকট শুনিতাম,—গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র তারকা সকলই মহাশৃঙ্খলায় আবদ্ধ ও নিয়োজিত—আকাশের সৌন্দর্য্য বুঝিতাম, শৃঙ্খলা মানিয়া লইতাম। পিতা দেখাইতেন, দুঃখের অপেক্ষা সুখ অনেক গুণে বেশী। বুঝিয়াছিলাম জগৎ সুন্দর,

সুশৃঙ্খল ; পরে বুঝিলাম—ভগবান মঙ্গলময়। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ। আমার বাল্য কৈশোরের শিক্ষা ঐ বীজ পর্য্যন্ত।

স্কুল কলেজে পড়িবার সময় আমি আগ্রহ সহকারে সকল বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করিতাম, চর্চ্চা করিতাম। সে সকলের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। তবে সাত আট জন গ্রন্থকারের নাম এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে কিরূপ ফল পাইয়াছিলাম, তাহা বলা আবশ্যক।

প্রথমেই বলিব,—রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিবিধার্থসংগ্রহের বিষয়। আমি প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা হইতে, তিন চারি বৎসরের বিবিধার্থসংগ্রহ পাইয়াছিলাম। অত্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক সেই সকল পাঠ করিতাম। বিচিত্র জুড়িদার পাইয়াছিলাম—বৃদ্ধ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ; তিনি পিতা অপেক্ষা বয়সে বিস্তর বড় ছিলেন। সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মে রত থাকিতেন আর অবকাশ পাইলেই পাঠ করিতেন—বিবিধার্থসংগ্রহ। পূজার সময় পিতা আসিলে, আমরা দুই অপূর্ব্ব জুড়িদারে সেই পাঠের পরিচয় প্রদান করিতাম। পিতা আমাদিগকে লইয়া নানা কৌতুক করিতেন। বিবধার্থ সংগ্রহ হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম বহুতর। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায়, সাহিত্যশিক্ষার কোন সুবিধা পাই নাই ; বলিতে কি, ভাষা শিক্ষারও নহে।

এই সময়ে মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল। তখনও কলিকাতায় নাটক অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন ; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল।—"অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে ?" গ্রন্থকার রামনারায়ণের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, তাঁহার নান্দী, নাপতে বৌ-এর পরিচয় ও তিনরূপ ফলারের লক্ষণ প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ফলার এখনও ভুলি নাই।

তখন পুস্তকের ফেরিওলারা আমাদের এবং অঞ্চলের নগর পল্লীর গলিতে গলিতে সমস্ত দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, চরিতামৃত, প্রেম-বিলাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ, হিন্দু মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতারা, কামিনীকুমার প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রয় করিত। বটতল ছাড়া অন্যত্র ছাপা দুই একখানি গ্রন্থও হকারদের কাছে মিলিত। ফেরিওলাদের সঙ্গে আমার বড় পোট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করিতাম। তাহারা আমায় কিছু বলিত না, আমি যে একজন বাঁধা খরিদ্দার। এমন খরিদ্দার চটাইবে কেন ? একদিন নাড়িতে নাড়িতে

একখানি এড়াটে চটি বই পাইলাম। গ্রন্থকারের নাম নাই, কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। দুইখানি শাদা কাগজের মলাট দুই দিকে, মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ; নাম "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ।" বহু পরে জানিয়াছি এখানি রামকমল ভট্টাচার্য্যের লেখা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়,—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরলতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ-বর্ষ-বয়স্কা এক ফরাসি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি স্বরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তল এরূপ স্বচ্ছ যে, মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবা-জন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোনদিন একটি হাঙ্গর, কোনদিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, কোনদিন মছলী বন্দরে মাস্তুলের বন, কোনদিন সাফা উর্ম্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দ্রাজ নগরের প্রাসাদাগ্র—এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।"

অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম বটে, 'কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' ভাষার বিশেষত্ব বোধ করি দেখাইতে পারিলাম না। বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা।

কাদম্বরীতে কঠোর সংস্কৃত দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু "এলা-লতা-লিপ্তিত চূত ও তাম্বূল-বল্লী-পরিণদ্ধ সুপারি" এরূপ ঢং দেখি নাই।

বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। হউক বা না হউক, এই ভাষার বিশেষত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি?

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। গ্রন্থের সার কথা এই যে কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা লইয়া থাকিলে, আমি হেন করিব, আমি তেন করিব, ইংরেজ তাড়াইব, ভারতের উদ্ধার করিব, এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা সব হৃদয়ে পুষিলে, মানুষের স্বস্তি থাকে না, সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না। তাহাকে কিসে যেন হুটপাট করিয়া তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার পর ঘা খাইয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া, যখন মানুষ শান্তির অন্বেষণ করে, তখন দৈবক্রমেই হউক, আর যে রূপেই হউক, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলে, তাহার শান্তি হয়। আসল কথা সুখ দৌড়-ঝাঁপে নহে, রাজনীতিতে নহে, ভারত-উদ্ধারে নহে, সুখ পারিবারিক শান্তিতে। একথা বাঙ্গলার অতি প্রাচীন কথা। বাঙ্গলার মজ্জাগত কথা। বাঙ্গালি কিছুকাল পূর্ব্বে এই কথা বুঝিত বলিয়া, বাঙ্গালি পারিবারিক অধিষ্ঠানের যেরূপ সুশ্রীকতা, সম্পূর্ণতা,—সম্পাদন করিয়াছিল, এমন কেহ কখন পারে নাই। অতি সামান্য আয়ে বাঙ্গালি দেবতা-অতিথির সেবা করিয়া, গৃহপ্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখিয়া, দেহে স্বাস্থ্য মনে স্ফূর্ত্তি পরিপোষণ করিয়া, কিছুকাল পূর্ব্বে অতি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছে। এইটিই বাঙ্গালির গৌরব ছিল। উন্নতি উন্নতি উন্নতি করিয়া দারুণ দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষায় সেই গৌরব চূর্ণ করিতে বসিয়াছে। বালককালে অবশ্য এ সকল কথা বুঝি নাই, ভাবি নাই, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের উপদেশ হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছিল। আমি বিচিত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটি গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে, জটা-ঘটাসম্বটিত—এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটি ছোটখাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা।

এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশূর, মালব উলটপালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালকমনে বড়ই আনন্দ হইল। সমসাময়িক ঘটনার যতই বিবরণ পাঠ করিব, ততই এইরূপ আরও মিল দেখিতে পাইব, এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইল। এখন বুঝিয়াছি, গল্পের মিল ত দূরে থাকুক, দুইজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার যদি একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিখিতে বসেন, দুইজনে নিশ্চয়ই বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে, কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ হিস্‌টরি হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু না জানাই ভাল ছিল, কেননা না জানাতেই মহা আনন্দভোগ করিয়াছিলাম।

পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তক আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোমপেঁচার নক্সা। আলালের ঘরের দুলালেও অনেক স্থানে নক্সা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্সা তেমন ফুটন্ত হয় নাই। তেপায়া উচ্চ টুলের উপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দু পয়সা দাও, দু চক্ষু দিয়া দেখ, বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপে কলিকাতার নানাবিধ নক্সা তুলিয়া পেঁচা দেখাইতে লাগিল ও ফুলো গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল, 'ইয়ে রাজবাড়ী কি নক্সা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজার কি গাজন, বড় তামাসা হ্যায়, ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়।' আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী। ভাল কথা,—তোমরা কৃতিসন্তান, তোমরা ত নানারূপে মাতৃভাষার সেবা করিতেছ, ভাষার নক্সা লিখিতে, ছবি আঁকিতে, ফটো তুলিতে চেষ্টা কর না কেন? পার না? না অবজ্ঞা কর? না, পার না বলিয়া, অবজ্ঞা দেখাও?

আমরা যখন চারি দিকের সন্ধান রাখিতে সমর্থ, তখন চুঁচুড়ায় নর্ম্মাল স্কুল বসিয়াছে। ভূদেব বাবু নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছেন। সপরিবার চুঁচুড়ায় ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেছেন, শিক্ষাদান করিতেছেন, পুস্তক প্রচার করিতেছেন। তাঁহার হাবড়ার হেড মাষ্টারির কথা আমরা জানি না। তাঁহার পুরাবৃত্তসার তখন পড়ি নাই, তাঁহার প্রথম পুস্তক পাঠ করিলাম, ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়। সফল স্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয়ক বিনিময়। এই দুই গ্রন্থও রোমান্স অফ হিস্‌টরি হইতে লিখিত।

কয়েক পংক্তিতে স্ফুটরূপে স্বভাব বর্ণন করিয়া, নানারূপ স্বভাবজ শব্দের পরিচয় দিয়া, ভূদেববাবু উপসংহার করিতেছেন, "যেন জগৎ যন্ত্রের মধুর লয়-সঙ্গতি হইতেছে।" লেখাটুকু কঠোরে মধুর, এই নূতন রসের আস্বাদ পাইয়া একরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিলাম। বাংলার সাহিত্য-চর্চ্চায় ভূদেববাবু হইতে বিশেষ কোন শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, এমন কথা নাই বলিলাম। সমাজ-তত্ত্বে তিনি সকল লেখকের শীর্ষ-স্থানীয়। যৌবনে আমরা অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।

বোধ করি বিবিধার্থসংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বালক কালে আমি মাইকেল কিছুই পড়ি নাই। একটু বড় হইলে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষরে উপহাস করিতাম। তাঁহার লেখায় ভাবে, অবহেলা করিতাম। তাঁহার প্রতি এক প্রকার মুখস্থ বিদ্বেষ দেখাইতাম। আসল কথা মধুসূদনকে লইয়া তখন দুইটা পক্ষ হইয়াছিল। এক পক্ষ বলিত, মাইকেলের মত অমন হয় নাই, হবে না। আর এক পক্ষ বলিত, উহা কেবল ছাই ভস্ম। উহাতে না আছে ছন্দ, না আছে মিল, ব্যাকরণে দুষ্ট, অলঙ্কারে দুষ্ট। বালক কালে এই বিতর্ক শুনিতাম। মনে মনে বিদ্বেষী পক্ষের দিকে একটু টান ছিল। তাহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, যখন আমি সায়েন্স্‌সা বিদ্যা-দিগ্‌গজ বলিয়া পরিচিত হইলাম, তখন সেই বিদ্বেষী পক্ষের অধিনায়কতা, জানি না কেমন করিয়া, আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ইহার বাহাদুরী এই, দুই-দশ ছত্র ব্যতীত তখন আমি মাইকেল ভাল করিয়া পড়ি নাই। তবে তুখোড় ছেলে কিনা, মাইকেলের পক্ষে কেহ কিছু বলিলে, আমি বিপক্ষে একটা না একটা জবাব দিতে পারতাম। মাইকেলকে ভেঙ্গচাইয়া, অমিত্রাক্ষর পদ্য লিখিতাম। কিন্তু তখন বাস্তবিক জানিতাম না,—অমিত্রাক্ষর কাহাকে বলে। স্তরের শেষের দিকে মিল না থাকিলেই, অমিত্রাক্ষর বুঝিতাম। বাস্তবিক মিলে গরমিলে অমিত্রাক্ষর নহে। সাধারণত পয়ারে ২৮ অক্ষরে ভাব শেষ হয়। অমিত্রাক্ষরে সে নিয়ম নাই। মাইকেল অধিকাংশ সময় শ্লোকটা ২৮ অক্ষরে শেষ না করিয়া, ৪০, ৪৪, ৫০, ৫২ অক্ষরে ভাব শেষ করিয়াছেন।

বিধাতার নির্ব্বন্ধে, বি. এ পরীক্ষার জন্য, বাঙ্গালার পদ্যাংশে মাইকেলের মেঘনাদের শেষভাগ স্থিরীকৃত হইল। সংস্কৃতাধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্তের সহিত, আমার নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কিশোর-স্বভাব-সুলভ, অতিশয় উক্তিতে আমি বলিলাম যে, মাইকেলের সমস্তই চুরি, তাঁহার নিজের একটুও নয়। আর একথা মাইকেল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেননা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "গাঁথিব নূতন মালা" অর্থাৎ আমি টীকা করিতেছি,—ফুলগুলি তোমাদের পাঁচজনের,—গাঁথনি খালি

আমার। তখন যে স্থানটা পড়া হইতেছিল, সে স্থানে ছিল "অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈথিলী"। অধ্যাপক বলিলেন—"দেখ দেখি, কেমন সুন্দর নূতন উপমা?" আমি বলিলাম 'ও ত চাহার দরবেশে আছে। "আঁধারিঘরয়ে এক দিয়া না দিয়া।"

এল. এ পরীক্ষা দিয়া আমি পিতার কাছে আরায় এক মাস কাল ছিলাম। পিতার কাচারীর সেরেস্তাদারকে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা পড়াইতাম, তিনি আমাকে উর্দ্দু অক্ষরে চাহার-দরবেশ পড়াইতেন। সেই টাট্‌কা বিদ্যা লইয়া, এখন এই সাহিত্য সংগ্রামে মাইকেলের বিরুদ্ধে চাহার-দরবেশ-রূপ শর-সংযোগ করিলাম। অধ্যাপক ও সতীর্থেরা হাসিতে লাগিলেন। এমন নিত্যই হইত। কোনদিন বা আমি তারাশঙ্করের বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য লইয়া স্তম্ভ সাজাইয়া, মিত্রাক্ষরের মতন করিয়া দেখাইতাম। তাহাতেও হাস্য কৌতুক হইত। দুই বৎসরের মধ্যে পরীক্ষার জন্য আমি মেঘনাদবধ পুস্তক কিনিলাম না। এইরূপে বহু-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এখন আমি, সেরূপ বিদ্বেষী নহি। মাইকেলের ছন্দ, কবিবর হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সরল সতেজ, মোলায়েম, সহজ এবং সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি।

পঠদ্দশায় মাইকেলের মেঘনাদ বিদ্বেষ দেখাইবার জন্য পুস্তক কিনি নাই বটে, কিন্তু মাইকেলের নাটক প্রহসন সমস্তই পড়িয়াছিলাম। নাটকের ভাষায় বিশেষ কিছু শিখিবার না থাকিলেও, সেই ভাষা সহজ সুমধুর বাঙ্গালা বটে; আর প্রহসনের ভাষা, Just appropriate, যাহার মুখে যেমন দেওয়া উচিত, তাহার মুখে ঠিক তেমনি দেওয়া আছে। একথা তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই বিষয়ের জন্য মাইকেলকে শ্রদ্ধা করিতাম। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই দীনবন্ধুবাবু প্রকাশিত করিলেন,—"সধবার একাদশী" ও "বিয়ে পাগলা বুড়"। শেষোক্ত দুই গ্রন্থ উপরোক্ত দুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টক্কর দিয়া লেখা বটে। অনুকরণ অনেক সময় হীনবল হইলেও, সধবার একাদশী নামডাকে 'একেই কি বলে সভ্যতাকে' ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সেও নিমে দত্তের গুণে। নিমে দত্ত আবার মধু দত্ত। সুতরাং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যদি দীনবন্ধু কোন স্থানে ছাপাইয়া থাকেন, সেও মধুসূদন দত্তের কৃপায়। অন্যত্র মধুসূদন একজন গ্রন্থকার; সধবার একাদশীতে মধু দত্ত বা নিমে দত্ত একজন পাত্র বা Dramatis Personæ. কলিকাতার নর্দ্দমায় পড়িয়া পাহারাওলার লণ্ঠন দেখিয়া নিমচাঁদ Milton আওড়াইয়া বলিতেছে—

"Hail holy light! the offspring of Heaven first-born. Of the eternal co-eternal beam" ইত্যাদি—শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল চরিত্রের

ঐতিহাসিক ঘটনা। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়। That's moral courage. (বুকে হাত দিয়া) আমি সেই moral courage এর ছেলে বাবা!" ইত্যাদি অনেক কথাই মাইকেলের।

প্রহসনের কথায় প্রহসনের তীব্র সমালোচনার পরে, সমালোচকের দুর্দ্দশার গল্প মনে পড়িল। হুগলী কলেজ হইতে বি. এ দিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতাম, তখন রেবরেণ্ড লালবেহারি দে ক্রাইডে রিবিউ নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদিত করিতেন। বিলাতের স্যাটারডে রিবিউতে সাময়িক সাহিত্যের যেমন তীব্র সমালোচনা থাকে, অথবা সেই সময়ে থাকিত, ক্রাইডে রিবিউতেও দে মহাশয় সেইরূপ তীব্র সমালোচনার চেষ্টা করিতেন। সধবার একাদশীর সমালোচনা করিলেন—"If this trash ever be put on the stage, we can not recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons." দীনবন্ধুবাবুর অবশ্য তেলে বেগুনে হইল। জ্বলিয়া উঠিল; শিখা দেখা দিল—"জামাই বারিকের" তোতারাম ভাটে। তোতারাম ভাট অর্থ তোতা বা টিয়া পাখীর মত মুখস্থ করিয়া যে ভাটের মত বলিতে পারে। রেবরেণ্ড লালবেহারী দে ইংরাজীতে সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে তোতারাম ভাট নাম দিয়া দীনবন্ধুবাবু গায়ের জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদিন পরে এ সকল কথা বলিবার প্রয়োজন কি? একটু প্রয়োজন আছে। দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের অবসরে, ভূমিকায় বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "তোতারাম ভাট—দীনবন্ধুর কলঙ্ক।" কেন কলঙ্ক? কিরূপে হইল? সেই কথারই টীকা টিপ্পনী করিলাম। তোতারাম ভাটের সমালোচনটা, মুখস্থ ছিল বলিয়াই গোড়াগুড়ি বলিতে সাহসী হইলাম।

দীনবন্ধুবাবুর প্রহসনের পরিচয় বি. এ পাস করিয়া পাইলাম বটে, কিন্তু আমার এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬১ সালে প্রসিদ্ধ লং সাহেবের মকদ্দমা হয়। সেই সময়ে নীলদর্পণ নাটক ও নাটককার দীনবন্ধুবাবুর নাম বাঙ্গলায় টি টি হইয়াছিল। আমরা তখন নাটক পড়িতে পাই নাই; কিন্তু নাটক যে একটা বড় গুরুতর জিনিষ, নাটকের লেখাতে লোকের মান অপমান হয়, সাহেবরা পর্য্যন্ত রাগিয়া উঠেন—এরূপ কতকগুলি কথা, আমরা অনেকে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়াছিলাম।

ইদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের পঠদ্দশার শেষভাগে পরিচয় হয়। তখন আমরা বাঙ্গালার ভঙ্গি বুঝিতে পারি, ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারি, কোন্‌টা পথ, কোন্‌টা অপথ, কোন্‌টা কুপথ, একটু একটু

চিনতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা পাইয়া আমার মনে পড়ে, আমি প্রথম দিনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম। প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের অবসরে ভূমিকায় যে কথা বঙ্কিমচন্দ্র জগৎকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—স্পর্দ্ধা করিতেছি মনে করিবেন না, সত্য কথা বলিতেছি, সেই কথা তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও বয়স্কা কুলীনকন্যার মত যেন কেমন কেমন বোধ হইত। শীঘ্র ভিন্ন গোত্রা হউক, আপনার ঘর আপনি করিতে শিখুক, আপনার পথ আপনি দেখুক, এই প্রকার ইচ্ছা হইত। যখন টেকচাঁদ ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গালাকে বর সাজাইয়া সভাতে উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া বোধ হইল। বঙ্কিমবাবু যখন স্বয়ং বরবেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকেই উপযুক্ত সৎপাত্র বলিয়া বোধ হইল। পাত্র মিলিল দেখিয়া, সেই আহ্লাদেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। পরে দেখা গিয়াছে, আমাদের সেই আহ্লাদ বালকের আহ্লাদ হয় নাই। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতারিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার নানারূপ সেবা করিয়াছেন, বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং এক ভাষার গুণে বাঙ্গালীকে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজী ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতার কালেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত—কাব্যগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র "কপালকুণ্ডলা" লিখিলেই, কপালকুণ্ডলাকার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা যৌবনের সেই ভাবোদ্বেগ অবস্থায়, সংসার প্রবেশের সেই প্রথম উদ্যমে, এই অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালির লেখায় পাইয়া, একেবারে চরিতার্থ হইলাম। প্রেসিডেন্সি কালেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। কিন্তু এই গৌরব। একটা কিন্তু পড়িল। এখন যেখানে সিটি কালেজ, তাহার পশ্চিম ধারের তেতালা বাড়ী হইতে অর্থাৎ, আপনার বাসাবাড়ী হইতে, আর্দ্দালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর, সুশ্রী-গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশে পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমা জ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেষ্টারী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন "আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন, মহাশয়!" কৃষ্ণকমল বলিলেন, "আচ্ছা"। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদিঘির ধার দিয়া, ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহার সহিত তখন বঙ্কিমবাবুর আলাপ হয় নাই। সেইটুকুই যা, কিছু কিন্তু। থাকুক 'কিন্তু', তখন বুঝিয়াছিলাম, এখনও বুঝিতেছি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

আমরা বাঙ্গালা লেখা-পড়া সাঙ্গ হইল। অর্থাৎ কালেজের শিক্ষাও শেষ, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাও শেষ—একত্রই হইল। আমার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার কথা বলিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। আমিও নিজের কথা নিজে বলিবার অধর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

এখন পিতৃদেবের জীবনীর কথা বলা যাইতেছে। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে রাজনীতি সংঘটিত কোন কথা বলা ত চলে না। সুতরাং ছাড়িয়া ছুড়িয়া, কথা এড়াইয়া লিখিতে হইতেছে।

উলা হইতে চৌকি উঠাইয়া লইয়া, রাণাঘাটে গিয়া পিতৃদেব সেখানে অতি অল্পকালই ছিলেন। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ "অপদস্থ" হইয়া পাণিঘাটায় যাইতে হয়। পাণিঘাটা নদীয়া জেলার দেবগ্রামের নিকট। তখন সেখানে চৌকি ছিল, এখন নাই। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনের কারণ প্রকৃত-প্রস্তাবে রাজনীতি। তখন নীলকর বিষধরে বাঙ্গালা জর্জ্জরিত। ইডেন, হর্শেল, গ্রাণ্ট, তখনও নীলকরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন নাই। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ-পরগণা, যশোহর জেলার অনেক স্থলেই তখন নীলকর সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহাদের দৌলত দৎপৎ দেখে কে? এই নীলকরের একজনের সঙ্গে, পিতৃদেবের দুই একটি কি কথা হয়। নীলকর আপনাকে অপমানিত মনে করেন। অতি অল্পকাল পরেই পিতৃদেব বদলি হইলেন। রাণাঘাট হইতে পাণিঘাটা, পাণিঘাটা হইতে পূর্ণিয়ার সদর। সেখানে তখন উর্দ্দু চলিত ছিল। তাঁহার পার্শী পড়ার ফল দেখিল। পূর্ণিয়া হইতে, জাহানাবাদ। জাহানাবাদে তিনি ইংরাজী স্কুল স্থাপনা করেন। সে স্কুল এখনও আছে। আর ১৮৬১ সালে প্রসিদ্ধ হিন্দু-হিতৈষী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, একটি শোকসভা আহ্বান করিয়া, তদীয় স্মরণার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটি সুন্দর সুললিত বক্তৃতা বাঙ্গালায় করেন। বহুদিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত, তাঁহার আবার এই সংস্পর্শ।

ইংরজি ৫৭ হইতে ৬১ এই চারি বৎসরে, আমাদের পিতা-পুত্রে কেবল দুর্গোৎসব

ও মহরমের সময় মিলন হইতে। ৬১ সাল হইতে হয় শীতের ছুটিতে, না হয় গ্রীষ্মের ছুটিতে, আমি পিতার কাছে যাইতাম ও থাকিতাম। এইরূপে এক বৎসর আমি শীতের ছুটিতে জাহানাবাদে, আর এক বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে, আবার পর বৎসর শীতের ছুটিতে কলিকাতায়, তাহার পর বৎসর ৬৩ সালে শীতের ছুটিতে জজিপুরে, ৬৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আরায়, ৬৬ সালে মুর্শিদাবাদে পিতার নিকট গিয়াছিলাম। ৬৮ সালে আমার শিক্ষা সাঙ্গ হইল। আমি পিতার নিকট বহরমপুরে ওকালতি করিতে গেলাম। ১৮৭০ সালে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পিতা বহরমপুরে সদর মুন্সেফ থাকেন, অথচ প্রায়ই এ টিনী প্রধান সদর আমিনীতে, অথবা একটিনী ছোট আদালতের জজিয়তিতে, ঢাকা, কটক, ভাগলপুর, চব্বিশ-পরগণা (আলিপুর) এবং যশোহর এই সকল স্থানে দুই মাস ছয় মাস যাইয়া কাটাইয়া আসেন। দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় এক বৎসর কাল, পিতাপুত্র, আমরা একত্র ছিলাম।

তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের 'ইতিহাস লেখক' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্রবাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন আর আমি যাবার কিছুকাল পরেই,—পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চ্চার মহেন্দ্রযোগ বলিতে হইবে। আমি মহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।

আমি বহরমপুরে এরূপে যাইবার কিছু পূর্ব্বেই, অর্থাৎ ওকালতি করিতে যাইবার কিছু পূর্ব্বেই পঠদ্দশায় একবার এক মাস মাত্র বহরমপুরে গিয়াছিলাম। সে কথা ধরিতেছি না। আমি বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই জজ কাছারির সেরেস্তাদার মহাশয়ের ঘরে একটি নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সভ্যেরা একটু সকাল সকাল গিয়া সভা বসাইতেন, জজ সাহেব আসিলেই, সভা-ভঙ্গ হইত। সাধারণত দিনে অর্দ্ধঘণ্টা জীবন। কোন কোন দিন কাজের ভিড় থাকিলে, সে জীবনটুকুও হইত না। এই সভায় বিক্রমাদিত্য ছিলেন—জজ সাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগ। সে ঘরটি তাঁহারই ঘর। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্যামাচরণ ভট্ট—বেতাল ভট্ট। বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন (জাতিতে বৈদ্য সুতরাং)—ধন্বন্তরি। বহরমপুরের সরকারী উকীল দীননাথ

গাঙ্গুলীক্ষপণক। বোধ করি তিনি একটু রাগী ছিলেন মনে করিয়া, তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইবে। স্বনাম-প্রসিদ্ধ গুরুদাসবাবু তখন বহরমপুরের আইনাধ্যাপক ছিলেন; অবশ্য ওকালতিও করিতেন। তিনি ছিলেন—বররুচি। আর পিতৃদেব —কালিদাস। ভোরপুর আসরে যখন নবরত্ন সভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন, তখন আমি ওকালতি করিতে গেলাম। কোন বেকানুসি ছিল না যে আমি প্রবেশ করিতে পারি, অথচ নবরত্ন সভা আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে উৎসুক হইলেন। আমাকে উৎকট বিকট সম্মানের পদ প্রদত্ত হইল। আমি হইলাম—রাক্ষস। আমি সমস্যা দিতাম, নবরত্ন পূরণ করিতেন। নবরত্ন-অধিষ্ঠিত নব বিক্রমাদিত্যের সভায়, আমি একখানি অপোজিসন চেয়ার পাইলাম। প্রাচীন পুরাণ প্রথামত অনেক সময়েই, রাক্ষসের আক্রমণ হইতে কালিদাসই সভার সম্মান রক্ষা করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি কালেজে পঠদ্দশার সময় হইতেই, কতক মনের সহিত, কতক মজা দেখিবার জন্য, মাইকেলের বিদ্বেষী ছিলাম। এক-একদিন মেঘনাদের দুই দশ পংক্তি লইয়া নবরত্নকে ব্যাখ্যা করিতে দিতাম। মনের ভাবটা এই যে, অনেক স্থলে মেঘনাদ বধ কাব্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। কেবল "ললিত-লবঙ্গ-লতা", কথাতেই পরিপূর্ণ।—

> "উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
> পদ্মপর্ণে সুপ্তদেব পদ্মযোনি যেন,
> উন্মীলি নয়ন-পদ্ম-সুপ্রসন্ন ভাবে,
> চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
> কুসুম-কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পদ্মপর্ণ শব্দের অর্থ কি? হেমবাবু টীকা করিয়াছেন, পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। সেটা কি জিনিস—পদ্মের গাছের পাতা, না পদ্মের ফুলের পাপড়ি? যদি গাছের পাতা হয়, তা হইলে উপমা বুঝা যায় না। কেন না পদ্মপত্র হরিৎ-বর্ণ। উদয় অচল হরিৎ-বর্ণ নহে। আর যদি পদ্মপর্ণ মানে পদ্মের পাপড়ি হয়—সেই বা কি হইল। পদ্মের পাপড়িতে পদ্মযোনি-সুপ্ত কেন? যদি বা কখন থাকেন, তবে উদয়াচলের সহিত সাদৃশ্য কি? থাক্। ব্রহ্মার নয়নপদ্মের উন্মীলনের মত, আদিত্যের উদয়। তবে ব্রহ্মা কি একচক্ষু? আর সুপ্ত পদ্মযোনিই বা নয়ন-পদ্ম উন্মীলন করেন কিরূপে? সুপ্তির পর, হইতে পারে বটে। আর ঘুম ভাঙ্গিয়াই বা সুপ্রসন্ন ভাবে মহীর পানে চান কেন? কোন পৌরাণিকী কাহিনী আছে কি? যদি না থাকে, তবে কি বুঝিব? আর মহীর বা এত উল্লাসে হাসি কেন? যদি বল প্রভাত হইয়াছে বলিয়া, তাহা হইলে ত সব গোলমাল হইল। সাধ্য-সম হইল। উপমান উপমেয়

পাল্টাপাল্টি হইয়া গেল। এইরূপ নবরত্নের সহিত ঘোরতর রাক্ষস-সুলভা রাক্ষসী বিতণ্ডা করিতাম।

মাইকেলকে লইয়া ঘোরতর বিতণ্ডাই হইত। কোনপক্ষে জয় পরাজয় স্থির হইত না। আমি প্রকাশ্যত মাইকেল-বিদ্বেষী বটে, কিন্তু মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি কালে, কাব্যের রসভঙ্গ করিবার জন্য, আমি কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতাম না। এ কথা সকলেই বলিতেন। এবং আবৃত্তিতে ছন্দ ও রস সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হয়, এ কথা বলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিতেন। বররুচি প্রধান আলঙ্কারিক। তিনি একদিন বলিলেন যে, মাইকেলের অনুপ্রাস বড়ই মিষ্ট। আমি বলিলাম, কি বলিতেছেন বুঝাইয়া দিউন; তিনি বলিলেন যেমন—"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।" আমি বলিবাম এইরূপ মিষ্ট অনুপ্রাস স্বচ্ছন্দে মুখে মুখে করা যাইতে পারে।' তিনি বলিলেন, "একটা করুন।" আমি বলিলাম "কান্‌চেন-রাঘব-বাপ্পা গাম্‌ছা আন্‌চে কেটা?" কেবল বিতণ্ডা নহে, এরূপ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ সর্ব্বদাই হইত।

একদিন বররুচি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এমন কি পদার্থ আছে, যাহা থাকা ভাল, কিন্তু পাওয়া মন্দ?" কালিদাস শুনিয়াই উত্তর করিলেন,—"কৃষ্ণ"। কৃষ্ণ থাকা ভাল, কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তি মন্দ। উত্তর ঝটিতি বলাতে, এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি কথা থাকাতে সকলেই হাস্য করিলেন, কিন্তু সদুত্তর হয় নাই বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিলেন। বররুচি অবশ্য বলিলেন, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর হয় নাই। পরদিন অশ্বযানে কাছারি আসিতে আসিতে, কালিদাস, বররুচির বাসভবনের নিকট অশ্বযান থামাইয়া, এই কবিতাটি তাঁহাকে শকট হইতে বলিয়া আসিলেন;—

"প্রহেলিকা অর্থ তব শুন হে রসিক,
নর হতে নারী তাহা ধরয়ে অধিক;
বিশেষ কি কব আর বুঝে দেখ ভাই?
কল্য না বলিতে পারি পাইয়াছি তাই॥"

তাহার পর সভায় আসিয়া কালিদাস বলিলেন "বররুচির প্রহেলিকার সদর্থ আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি। বলিয়া আবার কবিতাটি আওড়াইলেন। বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"এ যে বড় দায় হইল—প্রহেলিকার অর্থ প্রহেলিকায়, এরূপ কতবার চলিবে?"

একদিন রাক্ষস মহাদম্ভে নবরত্ন সভা আক্রমণ করিলেন। প্রহেলিকায় কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

"বার দিন, মাস তিন, থাকে থাকে থাকে,
আপনার পরিচয় দেয় যাকে তা'কে,

আপনি নির্ব্বাক থাকি দেয় পরিচয়,
দিন দিন নব মূর্ত্তি ধারণ করয় ;
সকলের হিত করে নিজ পরিচয়ে
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় অনেক বিষয়ে ;
নবরত্ন-সভা মধ্যে বার মাস রয়,
না বুঝিয়া নবরত্ন হন পরাজয়।"

কত রকম কদর্থ, সদর্থ, টানাবোনা অর্থ, গোলমেলে অর্থ, এক এক রত্ন, এক এক সময়ে, প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস শির-সঞ্চালন করিয়া হুঙ্কার দেন মাত্র। এক দিন গেল, দুই দিন যায়, ক্রমে সভা হেট-তুণ্ড হইতে লাগিলেন। সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে আনন্দ নাই, যেন সত্য সত্যই বিক্রমাদিত্যের সভা কোন রাক্ষসী আক্রমণ করিয়াছে। না পারিলে রাজ্যে প্রজা নষ্ট করিবে, হয়ত রাজাকেই কত কষ্ট দিবে। এমন যে রাক্ষসের মন, তাহাও টলিল। হৃদয় গলিল। নবরত্ন-সভাগৃহের প্রাচীর সংলগ্ন ধাতুময় ক্ষুদ্র যন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া এবং সকলের লক্ষ্য সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া, রাক্ষস নবরত্ন-সভার সম্মান রক্ষা করিলেন। সভাস্থ সকলে আরকিমিডিসের মত, Ureka, Ureka "প্রাপ্তোস্মি প্রাপ্তোস্মি" করিয়া উঠিলেন, আবার আনন্দের স্রোত বহিয়া উঠিল।

পূর্ব্বে রামগতি ন্যায়রত্ন ও লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়-দ্বয়ের নাম করিয়াছি। তাঁহারা ছাড়া আর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তৎকালে বহরমপুরে ছিলেন। তিনি ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্রের পৌত্র—উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। তিনি নৈয়ায়িক অথচ বিশেষ কাব্য রসজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কাছে আমি কালিদাসের শকুন্তলা পড়িয়াছিলাম। সে গুরুদত্ত পুঁথিখানি এখনও আছে। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি উত্তরপাড়ায় আব্দার করিয়াছিলেন,—"বিচারের ফলে বিদায়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে।" সে কথা কেহ শুনিল না। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন। সরকারী চাকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এখন উমাচরণ ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখরের মত—ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন।

তিনি তৎকালে বহরমপুরে সদরালার সেরেস্তাদার ছিলেন। সেরেস্তা ছাড়িয়া উঠিবার তাঁহার অবকাশ হইত না। রাক্ষসাধমকে নবরত্নের নিত্য-লীলার নিত্যবিবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে পেশ করিতে হইত। তিনিও এক-একদিন সভায় সমস্যা প্রেরণ করিতেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও ক্বচিৎ সভায় সমস্যা দিতেন। তাঁহার একটি সমস্যা মনে পড়িতেছে।

"একাকী দাঁড়ায়ে সতী, ভারতী-রূপিণী
যত থাকে, তত যায়, যামিনী শোভিনী।"

নবরত্ন সভা বসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমীপে ইহা পেশ করিলাম। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, হয়ত কত ন্যায়শাস্ত্র আলোড়িয়া, কত কাব্য-কলাপ মনে মনে আওড়াইয়া, শেষে সমাধা করিলেন,—"রজনীগন্ধা ফুলের ভঁাটা।" মিলাইয়া দিতেছেন, বলিতেছেন,—"রজনীগন্ধা ত যামিনী শোভিনী বটেই, শ্বেতবর্ণা বলিয়া ভারতী-রূপিণী, আর যত অধিক দিন থাকে, তত ফুল খসিয়া খসিয়া যায়।" আমরা প্রহেলিকার অর্থ শুনিয়া তাঁহার লক্ষ্য-শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। পরে নবরত্ন প্রকৃত অর্থ ভাঙ্গিয়া দিলেন—জলন্ত বাতি।

তাৎকালিক আমোদ-প্রমোদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এই সকল ফষ্টি-নষ্টি সংগ্রহ করিয়া, বহুদিন পরে প্রকাশ করিতেছি।

আমার বহরমপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে, বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যান। তিনি এরূপ সভায় কখন মিশিতেন না। কেন তাহার আভাস, প্রেসিডেন্সি কলেজে, তাঁহার যাওয়া আসার পরিচয়ে একটু দিয়াছি। এখন আর একটু বলিতে হইতেছে। তাৎকালিক বঙ্কিম-চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া, তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা। বঙ্কিমবাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। গোলাপের কেবল পাপড়ির রং দেখিবে, মিঠা মিঠা সৌরভ দেখিবে, চল চল রূপ দেখিবে; গোলাপের বৃন্তে যে কাঁটা আছে, তাহা কি দেখিতে নাই? গোলাপে কাঁটা আছে বলিয়া, কি গোলাপের মর্য্যাদা কম?

"দেবের দুর্লভ নিধি, বিরলে বসিয়া বিধি
সমাদরে সৃজন করেছে।
নরের নিষ্ঠুর করে পাছে লণ্ড ভণ্ড করে
এই ভয়ে কণ্টকে ঘিরেছে।"

এই রূপ বর্ণনা করিয়া পিতৃদেব ঋতুবর্ণনে গোলাপের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিম সম্বন্ধেও যদি তাই হয়? যদি সামাজিকদের হাতে "লণ্ড ভণ্ড" হইবার ভয়ে, বঙ্কিমকে কেহ অহঙ্কারের আলোক আবরণ দিয়া, ঘিরিয়া রাখিয়া থাকেন?

অত কথা বুঝি আর না বুঝি, এই বুঝি যে, বঙ্কিমকে অহঙ্কারী বলিলে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা হয় না। কোন সত্য কথাতে, কাহারও হানি করা হয় না; বিশেষ বঙ্কিম অহঙ্কারী ছিলেন বলিয়া, তিনি দাম্ভিক ছিলেন, এমন কথা বলিতেছি না। পিতৃদেব ও আমার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় কাহিনী গোড়া হইতেই বলা ভাল।

৭০,৭১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজ দাদা সঞ্জীবচন্দ্র, তখন জাহানাবাদে সব রেজিষ্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব

হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটি বাড়ী ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম; জল তুলাইয়া রাখিলাম; একটি ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে শুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ সহকারে, এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে, আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্র, বি-এল্ পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন; বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিন খানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিন জনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিস পত্র, চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়া দিলাম, গাড়িতে তুলিয়া দিলাম; হায়রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে, এখনও বুক ফাটে। এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না; অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা কটাক্ষ হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতেছিলেন, আমি ফিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন "বঙ্কিম গেল হে?" আমি বলিলাম "হাঁ"। "তোমার সহিত দু'দিনে একটিও কথা হয় নাই?" আমি বলিলাম "কথা কি, আমি যে একটা জীব, এই বাসায় থাকি, সে খবর হয়ত, তাঁহাতে এখনও পৌছে নাই।" পিতা বলিলেন "তাই বটে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহার হাঁসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল; পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারীর ফেরতা পিতা-পুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা-অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু "আসুন" বলিয়া পিতাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে, ব্রাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল; বঙ্কিমবাবুর আদেশমত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিন জনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম।

বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে,—

"কাদা মাখা সার হ'ল মোর, মাছ ধরা হল না।"

এই রূপে দিন যায়। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪।৫ দিনের ছুটি হইল। বঙ্কিমবাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ি আসিব। নলহাটিতে আসিয়া দুইজনে দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টা কাল, নলহাটিতে বিশ্রাম বা কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ী আসিবে, নয়ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাসের বিশ্রাম-ঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় ত, ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে, বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন। এ কথা, সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল—রহস্যকার রেনল্ডের কথা। তখন দুইজনে অসি-ধারে রেনল্ডের মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক, দুইজনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্ব্বণের সেই রসগ্রহে, দুইজনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল', দিন দিন, সেই সহৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়, আমি ছোট; তিনি বয়সে বড়, জাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর "বন্ধুবৎসলতার" পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন? আমাদের এই নব বন্ধুতার অচিরাৎ একরূপ পরিণতি হইয়াছিল। দুই দিকে তাহার দুইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। সেই কথার একটু সবিস্তার পরিচয় এক্ষণে দিব। পাঠক, আবার বলি, আমার আত্মম্ভরিতা আবার মার্জ্জনা করিবেন।

বহু পরে বঙ্কিমচন্দ্র "লুপ্ত-রত্নোদ্ধারে"র ভূমিকায় বলিতেছেন,—"উহাতেই (আলালের ঘরের দুলাল হইতেই) প্রথম এ বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গলা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়। * * * বাঙ্গলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত

নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে, বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের স্বল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা লিখিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সম্যক্ প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষার "লম্ফ-ত্যাগ" "নিদ্রা-গমন" প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থ কুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিয়াছিলেন। আর কায়স্থ-কুলাধম আমি, ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভঙ্গি লইয়া বঙ্কিম বাবুর সহিত বিচার বিতর্ক করিয়াছি। মৃচ্ছকটিকা নাটকে দেখিবেন, প্রাড়্‌বিবাকের পার্শ্বোপবিষ্ট কায়স্থ প্রাকৃতে কথা কহিতেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ হউন, দীনবন্ধু হউন, প্যারীচাঁদ হউন, আর রাজেন্দ্রলালই হউন,—আমাদের প্রাকৃতের দিকে একটু টান আছে। আমরা বুঝি ধর্ম্মকার্য্যে, প্রত্নতত্ত্বে, ছটা-ছন্দ বিভূষিত কবিতায়, সেই কবিতার লালিত্যে ও মাধুর্য্যে, সংস্কৃতের প্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের গুরুজন ; কিন্তু গুরুজন লইয়া ত সংসার হয় না। প্রধানত পুত্র-কলত্র, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব, এই সকল লইয়াই সংসার। এ সকল ত সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত। তা' বলিয়া কেবল বিষয় কার্য্যের জন্য প্রাকৃত বা বাঙ্গালার প্রয়োজন এমন নহে। জীবন্ত কাব্যের বাঙ্গালাই জান অর্থাৎ প্রাণ।

যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায়, তাহা বাঙ্গালির পক্ষে বাঙ্গালাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায়, সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার বিতর্ক অনেকদিন চলিল। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে "গরু ঠেঙ্গাইতে" লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়রূপ ভাষার সমাবেশ হইল। তখন বিষবৃক্ষ হাতের লেখায়,—ছাপান হয় নাই।

মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা-প্রচারের সূচনা হইতেই "বঙ্গদর্শন" প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কত দিন, কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খৃষ্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশক রূপে, বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন।

লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।

" " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

" " জগদীশনাথ রায়।

" " তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

" " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

" " রামদাস সেন।

এবং " অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আর সকলে নামজাদা, আমিই কেবল নাম-হীন. অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গলা—নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি "উদ্দীপনা" প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুসি। আমি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চুপি চুপি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দেখাইলাম। 'ভোগ্য' 'ভোজ্য' এই দু'টা কথায়, আমি একটা কি গোল করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ ভুলই করিয়াছিলাম। তিনি সেটি সংশোধন করিয়া দেন। ব্রজমাধব প্রথম সংখ্যায়, আমার সেই প্রবন্ধের টিকি কাটিয়া বাহির করিলেন। প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না। বঙ্কিমবাবু এপলজি করিলেন বটে, আমি কিন্তু মনে মনে চটিয়া লাল। ওদিকে পিতাকে বঙ্গদর্শন পাঠান হয় নাই। তিনি চটিয়া আমাকে লিখিলেন—"Why does not my friend Bankim Chandra send his Banga-darsan to me? I am able to understand it and can afford to pay for it."

ঐ ক্ষুদ্র কথা কয়টিতে পিতার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং বন্ধুর সামান্য অবহেলায় "রাগ" বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য বঙ্গদর্শন তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল, এবং তিনি পাঠ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

১৮৭০ সালের ২৯শে মার্চ, পিতা পাকা সবজজ হন। পাকা পদ পাইয়া প্রথমে চট্টগ্রামে গমন করেন। সেই সময়ে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা হয়। বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, সেটির উল্লেখ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি। সাহিত্য কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া অর্থাৎ রস লইয়া, নাড়া চাড়া করে। সাহিত্যের এলেকা ছাড়া আরও অনেক গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয় আছে। সেইরূপ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনার কথা বলিতেছি। ১২৯৩ সালের শ্রাবণের "নবজীবনে" যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভবিষ্যতের ছোটখাট ঘটনা আমি কতবার স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহা বলিতেই পারি না। সাঙ্গোপাঙ্গ একটি গুরুতর ঘটনা আমি একবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আমি একরাত্রি বহরমপুরে থাকিতে হঠাৎ * স্বপ্নে দেখি যে, পূজাপাদ পিতৃদেব যেন চট্টগ্রামে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন, আর আমি তাঁহাকে কলিকাতায় রাত্রিকালে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। আলোয় জাহাজ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, খালাসীরা কল্ কল্ করিতেছে, নীচে গঙ্গা কুল কুল করিতেছে, আর উপরে বায়ু ঝরঝর করিয়া বহিতেছে।

* হঠাৎ বলিবার ভাব এই যে, যে বিষয় স্বপ্ন দেখি, সে বিষয়ে জাগ্রত অবস্থায়, কোন তোলা পাড়া করি নাই।

স্বপ্নের কথা দুই এক জনকে বলিয়াছিলাম। ইহার কয়মাস পরে, ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইল। তেমনই আলো, তেমনই গঙ্গা; আমার বোধ হইল, সেই রেঙ্গুন নামা জাহাজই আমি স্বপ্নে দেখিয়া ছিলাম। স্বপ্ন মিথ্যা আমি কখনই বলিতে পারি না।

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর দুর্গোৎসবের পর, মাতাঠাকুরাণীর বায়ু রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম। বহরমপুরে আর গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম। ৮০ সালের বৈশাখ হইতে বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিমবাবুদিগের বাড়ী কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সঞ্জীববাবু কাঁটাল পাড়াতেই প্রেস স্থাপিত করিলেন। ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক অর্থাৎ আমি বাড়ী বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে, 'সাধারণী' প্রকাশিত হইল। আর সেই মাস হইতে, আমি 'বঙ্গদর্শনের' প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম। 'সাধারণী'ও 'বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে' কাঁটাল-পাড়ায় ছাপা হইতে লাগিল। ৮১ সালের শ্রাবণ মাসে, আমি চুঁচুড়ার কদমতলায়, আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন, আমাদের আর একটি বাড়ীতে, 'সাধারণী যন্ত্রালয়' স্থাপনা করিয়া সাধারণী প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঐ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতার "ঋতুবর্ণন" প্রকাশিত হইল। ঋতুবর্ণনের উৎসর্গপত্র অতি বিচিত্র বলিয়া এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রাণোপম প্রিয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র !

তুমি জান, আমাকে রাজকার্য্য-নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিরল-বান্ধব স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল; সেই সেই স্থানে অবকাশ কাল কথঞ্চিৎ সুখে যাপন করণার্থ, পদ্য রচনা করিতে চেষ্টা করিতাম, সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ এই "ঋতুবর্ণন" অভিহিত গ্রন্থখানি হইয়াছে। গ্রন্থখানি সামান্য, এজন্য কোন বড় লোককে উৎসর্গ না করিয়া, ইহা তোমাকেই অর্পণ করিলাম। তুমি সন্তান, পিতৃদত্ত সম্পত্তি ভাল হউক, বা ভাল না হউক, তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেই হইবে।

অগ্রহায়ণ ১২৮১ } শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার।

৮২ সালের বৈশাখে বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শনে' 'ঋতুবর্ণনে'র সমালোচনা করিলেন। বলিলেন ঋতুবর্ণন রিয়ালিস্‌টিক্। বৃত্রসংহার আইডিয়ালিস্‌টিক্। তাঁহার কথা তিনিই বলুন না কেন ?

"সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত বর্ণনা-কাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে—এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। তাঁহারা

প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লয়েন। যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই,—যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্ম-চিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি-প্রাকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি-প্রাকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। * * * আমরা দুইজন বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেমবাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া, কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোক চিত্র, ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য্য, উভয়েই সুকবি। কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটি উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণবাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ, উৎকৃষ্ট রূপে আত্মকার্য্য সম্পন্ন করে, যথা,—

"ঘনতম ঘোর ঘটা ক্রমে ঘোরতর।
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, অতি ভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।"

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত, তাহার কিছুরই অভাব নাই; তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দ্দকও নাই। পরে হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখ,—

"কিম্বা গিরিশৃঙ্গ রাজি, মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণ-প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি, শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥

নিমেষে নিমেষে ভঙ্গ, দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ি ঘোর রাব ॥
বেগে দীপ্ত গিরি-কায়, বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছাড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত ভাব ॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতা-প্রাপ্ত :--

"কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটা করি, লহরে লহরে ॥"

* * * বাঙ্গালির সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধন-পটু। বর্ণন-কাব্য-প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণ বাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণস্বরূপ 'প্রভাত বর্ণন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলক-জনক আলোক ভূষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে উষা উপনী ·,—
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিরাশ তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।
মোহিনী মাধুরী করি দরশন
প্রণয়-প্রয়াসে আপনি তপন,
আদরেতে কর করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে ;
অপরূপ রুচি মানস-রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে।

———

সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল,
প্রফুল্ল-আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে,
নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে,
কাচ-সম স্বচ্ছ সরসীর কোলে,
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

রীয়ালিস্টিক আইডিয়ালিস্টিক বলিয়া বিভেদ করা মন্দ নয়। বুঝাইবার পক্ষে ভালই বটে। কিন্তু "ঋতু বর্ণনে" গৃহদাহ বর্ণনায় এই যে,—

ধেনুপাল আস খায়, উর্দ্ধ মুখে চাহিছে,
দগ্ধ কায় শারিকায় মৃত্যুগীত গাহিছে।

এই যে কবিতা, ইহা রিয়ালিস্টিক? না আইডিয়ালিস্টিক? আমি মনে করি দুই-এর মিশাল এবং তাহাই ভাল। "ঋতু বর্ণনে" সেরূপ পদ্যের অভাব নাই। যেমন নিদাঘ নিশীথের বর্ণন,—

"হাসি হাসি স্রোতস্বতী, করি ধীরি ধীরি গতি,
নিজ নাথ সিন্ধু পানে ধায়।
প্রতিবিম্ব তারকার, যেন কত হীরা হার,
তটিনীর অঙ্গে শোভা পায়॥
লতিকারে কোলে লয়ে, নিতান্ত নীরব হয়ে,
স্থিরভাবে আছে তরুচয়।
প্রিয়তমা নিদ্রা যায়, পাছে বিঘ্ন হয় তায়,
নাহি নড়ে কথা নাহি কয়॥"

মধুর তান, বেণুর গান,—কিরূপ শুনুন,—

"তখন বিপিনে হরি, বিম্বাধরে বেণু ধরি,
ধরিলেন গোপী-গুণ গীত।
চতুর্দিকে সুধাবর্ষে, প্রাণীকুল পিয়ে হর্ষে,
চরাচর হয় চমকিত॥
প্রভাতীয় কলরব, না করে বিহঙ্গ সব,
আছে তারা শাখায় সুস্থির।

দিন-পতি-দুহিতার, না হয় কল্লোল আর,
শান্তভাব গতি অতি ধীর॥
মলয়ার সমীরণ, করি রব আকর্ণন,
বৃন্দাবন না পারে তাজিতে।
হইয়া প্রফুল্ল আস্ত, ফুলরাজি করে হাস্ত,
ধরা কোলে বেণুর ধ্বনিতে॥
ঋষিগণ যেতে স্নানে, মোহিত হইল গানে,
পথে আর পদ নাহি চলে।
শুনি তান তরু-দল, কত প্রেম অশ্রুজল,
ফেলিতেছে শিশিরের ছলে॥
ব্রজ-গোপ-বালা যত, নিকেতনে নিদ্রাগত,
বাঁশীরব শ্রবণে পশিল।
শুনি মাত্র চমকিত, হয় সবে জাগরিত,
নীলোৎপল নয়ন খুলিল॥

আমি সমালোচনা করিতেছি না; পিতাকে পুত্রের প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পিতা ত নিজেই বলিয়াছেন, "পিতৃদত্ত সম্পত্তি ভাল হউক, বা না হউক, আমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেই হইবে।" আমি কেবল বঙ্কিম-বাবুর কথায় একটা কথা তুলিতেছিলাম; স্বভাব বর্ণনায় যে, অতি-প্রাকৃত থাকে না এমন নহে; বরং প্রকৃতের সহিত অতি অতি-প্রাকৃত মিশিয়া ঘুঁসিয়া লুকাইয়া চুংইয়া থাকিলে, কাব্য অতি সুন্দর হয়।

পিতা যখন যশোহরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়; সাধারণী প্রকাশিত হয়; আর ঋতুবর্ণন প্রথমার্দ্ধ অমৃতবাজার যন্ত্রে, শেষার্দ্ধ সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে, আরও দুই চারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখযোগ্য; —দীনবন্ধুবাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয়। বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্ত্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিমবাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving Scene প্রলাপ-দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুকরা টাকরা পরিবর্ত্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধুবাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়া, বলিয়াছিলেন যে, "এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের

ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।" এই অভিনয় রঙ্গে ৭।৮টি গান ছিল; দুই একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীববাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

পিলু, যৎ।

"আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখি জল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা ভরে—তরু মরে কে করে বিহিত তার?"

বোধ করি, ১৮৭২ সালের গুডফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্য্যগণ, কাঁটালপাড়া হইতে সঞ্জীববাবু প্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শূরবীর রথীগণ শ্রোতা। বঙ্কিমবাবু গুডফ্রাইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।

খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটরে "কীর্ত্তন" প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম।—

"কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুণু ঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই।"

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধুলা লইয়া, মহা আনন্দে মহা আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন "যেমনটা শ্রোতা ছেলাম, তেমনটাই ভাথলাম।" সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া:

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।

কোথা গো নবক্ললতা, কোথা গো উর্ব্বশী কোথা,

*　　　*　　　*

ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝম্‌ঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সেদিনের আসর-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রস্‌পিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাথ মামা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন; তিনি আমাদের অভিনয় সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শক্তিও বেশ ছিল; এখনও আছে।

পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পৌছন পত্রের সঙ্গে গান আসিল। পিতা গাড়ীতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তান—

"আজি কি সুখের উদয়!
লীলার সঙ্গে ললিতের আজ দিলাম পরিণয়॥
দুখ-তম তিরহিল, সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়।
যদি সব সভা-জন, এই সুখে সুখী হন,
বুঝিব সফল শ্রম, সফল আশায়॥

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাত্‌ করিয়াছিলাম।

পিতা যশোহরে থাকার সময়, যশোহর স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন—প্রসিদ্ধ নাম। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়। তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য-সেবায় নিতান্ত অনুরক্ত এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সংগ্রহে একজন প্রথম পথপ্রদর্শক। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমার অনুরাগ-স্মৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক উদ্ধৃত একটি মাত্র পাঠে সেই অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর বহরমপুরে সদর মুনসেফির অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় পরিষ্কার হাতের লেখায়, গোটা গোটা কাল কাল অক্ষরে একখানি 'পদকল্পতরু' আমাকে পাঠ করিতে দেন। সেইখানি নিয়ত নাড়িয়া চাড়িয়া, দুরূহ পদের ক্রমাগত অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া আমি সেই অনুরাগ পোষণ করিতেছিলাম। জগবন্ধুবাবু কর্ত্তৃক পিতার নাম সম্বলিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" পাইয়া আমি মহা আনন্দিত হইলাম। সেই আনন্দফলস্বরূপ শ্রীযুক্ত (জজ) সারদা চরণ মিত্র মহোদয়ের সঙ্গে আমা কর্ত্তৃক প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ। অমৃত বাজারের হেমন্ত-

কুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সহিত পিতার যশোহরেই আলাপ হয় এবং তাঁহারাই ঋতুবর্ণনের প্রথমার্দ্ধ তাঁহাদের স্বীয় যন্ত্রে ছাপাইয়া দেন।

বঙ্গসাহিত্যের কথাই আমি প্রধানত লিখিতেছি, পিতার সহিত সেই সাহিত্যের সম্পর্কের কথাই প্রধানত বলিতেছি। কিন্তু আর একটা কথা পরিস্ফুট করিয়া না বলিলে, পিতার জীবনী নিতান্ত অসম্পূর্ণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের সহিত রাজনৈতিক ঘটনার কথা বলিতে পারিব না, আর তাঁহার বিচার নীতির ও বিচার দক্ষতার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিব না বলিয়া, আপাততঃ লিখিব না, কিন্তু এ সকল ছাড়া আরও দুই একটা কথা বলা আবশ্যক ; কেবল সাহিত্যের কথাই বলা প্রচুর নহে। খুলনা, বহরমপুর, যশোহর, ঢাকা—সর্ব্বত্রই বহুতর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহিত পিতার পরিচয় হয় ; এমন কি ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাঁহাদিগের সহিত, নানা বিষয়ে ঘোরতর তর্ক করিতেন, কোন বিষয়ে ইংরাজি মতটা কি তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন ; কিন্তু সর্ব্বদাই চেষ্টা থাকিত যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাহাতে লোভী, লালায়িত না থাকিয়া, বৈরাগ্যবলে পূর্ব্বমত সমাজের উন্নত পদবীতে অধিরোহণ করেন। শাস্ত্রচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, দেশে যাহাতে বহুতর বিস্তৃতি লাভ করে, সে পক্ষেও তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল। অনুস্বার, বিসর্গ দিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেই যে শাস্ত্র বলিয়া নত-মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে, এমনটা না হয়। বিচার হউক, বিতণ্ডা হউক, কিন্তু যে যতটুকু শাস্ত্র মানিতে পার, শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে পার, সে ততটুকু মান, বিশ্বাস কর,—ইহাই তাঁহার মত ছিল। 'করকায কাঠিন্য ভ্রম' এই কথা লইয়া তিনি নৈয়ায়িকগণকে বিষম উপহাস করিতেন। বলিতেন পদার্থ-বিদ্যা ওরূপে পরিচালনা করিতে নাই। কতকগুলি সূত্র আগে ধরিয়া লইয়া তাহার পর পদার্থের বিচার করা চলে না। সে বিপরীত বুদ্ধি। আগে পদার্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ভুরি ভুরি পরীক্ষার দ্বারা পরামর্শ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ; কোনটা ব্যাপক, কোনটা ব্যাপ্ত, তাহা বুঝিতে হইবে, তাহার পর সূত্র স্থির হইবে। ইহাই অন্বীক্ষণ এবং তাহাই প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র।

নৈয়ায়িকগণ প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন না বলিয়া, তিনি মহাদুঃখ প্রকাশ করিতেন। এইজন্য অনেকদিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে, একজন সৎ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া চুঁচুড়াতে একটি চতুষ্পাঠী করেন। যশোহরে জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপণ্ডিত না হইলেও, সদাচারী ও সৎ-বুদ্ধিশালী। কথা স্থির হইল যে, তিনি চুঁচুড়ায় আসিয়া চতুষ্পাঠী করিবেন। তিনি এ দেশে আসিলেনও বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে তিনি আমাদের ওপারে গরীফা গ্রামে চতুষ্পাঠী করিলেন ; সে চতুষ্পাঠী এখনও সেইখানে আছে।

পিতার প্রবাল ইচ্ছা ছিল জানিয়া, এবং নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে আমি একটি চতুষ্পাঠী করিয়াছি।

এখন ব্রাহ্মণ-রক্ষার্থ, ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষার্থ, চারিদিকে চেষ্টা হইতেছে, চতুষ্পাঠী বসিতেছে। মহাত্মা ভূদেববাবু কর্ত্তৃক বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার চতুষ্পাঠীতে বিশ্বনাথ বৃত্তিদান, গোপালচন্দ্র বসু মল্লিক কর্ত্তৃক বেদান্ত প্রচার উদ্দেশে দান, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীকে প্রচলিত ব্যবহার শাস্ত্র শিক্ষাদান জন্য, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের দান – এ সকলই ব্রাহ্মণের গৌরব-রক্ষার্থ কীর্ত্তি। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই বুঝিবেন না, কিসে তাঁহার গৌরব। ব্রাহ্মণ চেত্তী শ্রেষ্ঠী কাক্রা মারবারীর মত ধন-ধন করিয়া ব্যগ্র। ব্রাহ্মণের গৌরব লোভ-হীনতায়, অল্পে সন্তুষ্টিতে। 'অসন্তুষ্ট দ্বিজ নষ্টং' হন তোমরাই ত বলিয়াছিলে? আর তোমরাই বা সে কথা ভুলিলে কেন। জীবন যাবৎ ঐ কথা বলিয়া পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আমারও আর কোথাও যাইবার দিন আগত প্রায়,—যদি একজনও ঋষি-বৃত্তি নির্লোভ ব্রাহ্মণ দেখিয়া যাইতে পারিতাম,—তবে জীবন-সার্থক বোধ করিতাম। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে "সাধারণী"তে এই কথা লিখিয়াছি। ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে "নবজীবনে" পুনরুক্তি করিয়াছি, দশ বৎসর চতুষ্পাঠী করিয়াছি; এখনও ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতেছি। ব্রাহ্মণের কি চক্ষু ফুটিবে না!

সাহিত্য সেবা উপলক্ষে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, নবজীবনে যে কথার পরিচালনা করিয়াছিলাম, এখনও সাহিত্য-সেবার ইতিহাস গ্রন্থন প্রসঙ্গে, সেই কথা পরিচালনা, করিতে দিন। সেই সমাচার নবজীবন হইতে উদ্ধৃত করিতে দিন। আমার দোষ মার্জ্জন করিবেন; আমি আমার মজ্জার কথা বলিতেছি;—

ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার কাজ সহজ হইবে। এই বিষয়ে, অগস্তকোমতের মত অতি বিচিত্র। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে; তবে তজ্জন্য বিষয় বাসনা, এবং ঐহিক প্রভুত্ব লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাঁহার সবিস্তার মত, সানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* * * Positivism must first regenerate the polytheists of India, then of China, lastly those of Japan.

Although it will act simultaneously on the three, whether through the direct agency of the West or indirectly through the Mussulman, it is impossibie to doubt that *the theocracy which has suffered the least from time will be the most open to the regenerative process.* Besides

my lectures on this subjeet, I must refer to the preceding volume for explanations inconsistent with the limits of my present sketch, to show the latent pre-disposition of the Brahmins favor of the faith which will restore their moral nature and their mental organisation. ... ... Positivism will deliver it (the theocratic caste i. e. the Brahmins) from the oppression of the temporal power, to which it has been subjected for twenty centuries, an oppression which it bows to, more and more without ever losing its consciousness of its spiritual and the superiarity and the hope of seeing it definitively re-established. Such a restoration, it is a true, demands its complete renunciation of command and even of property, but the systematic guardians of human order will not be slow to accept conditions, in name of their social mission and of their individual dignity.

Positivism offers, them, the regenerate Brahmins the reorganisation of Brahminical body, but it offers them besides and nothing else does, gratification of the noble wish they have cherished to free their country from all foreign dominion. Appealling in fitting terms to the English nation, it will peacably remove a yoke which under whatever veil of illusion, justly inspires more antipathy than that of the Mussalmen,......the great object of instituting that doctrine (the positive faith) being to enable the Brahmins who have become posivists to modify their theocratic milien.

Extract from Positive Polity Vol. IV Page 447.

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম প্রথমে ভারতের, পরে চীনের, সর্ব্বশেষে জাপানের দেবোপাসকগণকে পুনর্জ্জীবিত করিবে।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ঐ তিন জাতির উপরে একই সময়ে শক্তি চালনা করিবে বটে ; তা সাক্ষাৎভাবে য়ুরোপীয়দিগের দ্বারাই করুক, অথবা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের দিয়াই করুক, কিন্তু, যে জাতি কালবলে সকল অপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাই (ব্রাহ্মণেরাই) বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের নবজীবনী শক্তিতে শীঘ্র সঞ্চালিত হইবে। এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমার অন্যান্য বক্তৃতা এবং এই গ্রন্থের পূর্ব্ব খণ্ড দেখিতে বলি ; এই ক্ষুদ্র বিবরণে সকল কথা বিবৃত করা আয়ত্তি সাধ্য নহে ; ঐ সকল দেখিলে,

বুঝা যাইবে, যে, যে ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব সামাজিক গৌরব দেয়, অথচ তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন করে, সে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে ব্রাহ্মণদের গূঢ় প্রবৃত্তি আছে।

বিগত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজ-শক্তির অধীন হইয়া আছেন ; এই রাজশক্তির অত্যাচারের হস্ত হইতে বিজ্ঞানধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগকে উদ্ধার করিবে। ব্রাহ্মণেরা রাজশক্তির অত্যাচারের নিকট দিন দিন অধিকতর নত হইয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে আধ্যাত্মিকতায় অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বলিয়া জানেন,—সে জ্ঞান তাঁহারা এক দিনের তরেও হারান নাই ; আর সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রেষ্ঠতা পুনঃ সংস্থাপনের আশাও এক দিনের তরে ত্যাগ করেন নাই। আপনাদের গৌরব পুনঃ স্থাপনের জন্য ঐহিক বিষয়ের প্রভুত্ব ও বিত্তাদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা,—ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক ; নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণেরা তাহা করিবেন। যাঁহারা এতকাল ধরিয়া ধারাবাহিক ক্রমে মানব সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব রক্ষার জন্য, এবং তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্যসাধন জন্য, ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় পুনর্গঠনের সুবিধা নবজীবন-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে বিজ্ঞানধর্ম্ম প্রদান করে ; আর সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার যে-আশা তাঁহারা এতদিন ধরিয়া পোষণ করিয়াছেন, সেই আশা ফলবতী করিবার সুযোগও বিজ্ঞান ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে প্রদান করে,—সে সুযোগ আর কিছুতেই দেয় না। ইংরাজ জাতির নিকট কথোপকথন ভাবে আত্ম-বেদন জানাইয়া ইহারা বিনা রক্তপাতে ইংরাজের প্রভুত্ব হইতে আপনাদিগকে উন্মোচন করিবেন। ইংরাজের প্রভুত্ব যতই কেন কুহু কুহুকে ঢাকা ঘেরা থাকুক না, মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা বাস্তবিক অধিকতর অসন্তোষের নিদানীভূত।···বিজ্ঞান-ধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যই এই যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ মতাবলম্বী হইবেন, তাঁহারা এতদ্দ্বারা সহজে যাজক সম্প্রদায়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।”

বিজ্ঞান-ধর্ম্মের বলে, ব্রাহ্মণ জাতির পুনরুত্থানের কথা,—সহজেই মনে করা যাইতে পারে, কোম্‌তের নিজ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগের পরিচয় মাত্র। অথচ বিষয়-বৈভব-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, ব্রাহ্মণ জাতি আবার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এ কথাটিতে বড় আশা হয়, বড় আনন্দ হয়। কিন্তু য়ুরোপের সুদূর প্রান্ত হইতে, কঠোর বৈজ্ঞানিক কোম্‌ৎ ভারতের বিকৃত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাদের কথা, তাঁহারা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সহস্র স্থানে স্পষ্ট দেখিয়াও সেই কথা বুঝিতে পারেন না,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই আক্ষেপের

বিষয়। যখন তোমার বিষয়-বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিতে, তখন তুমি ঊর্দ্ধ হস্তে, কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া, সমগ্র সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছ, আর আজি তুমি বৈষয়িক বৈভবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য দ্বারে দ্বারে জোড় হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। জানি না, কতদিনে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে!

ব্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি স্থিতির ভাবনা না ভাবিয়া, স্বজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মজীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব লাভ করেন, এবং ভারতে সত্য সত্যই নবজীবন হয়। জানি না, ব্রাহ্মণের চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে। এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

যশোহরের পর পিতা ঢাকায় যান। ইংরাজী ৭৬ সাল হইতে ৮২ সাল পর্য্যন্ত কয় বৎসর ঢাকাতেই থাকেন। ঢাকায়, কথঞ্চিৎরূপে তাঁহার উচ্চপদের গৌরবে, কিন্তু প্রধানত তাঁহার গুণ-গৌরবে, তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় হয়েন। তিনি নিরভিমান থাকিয়া সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতে পারিতেন, নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ কথা বলিতে পারিতেন, চরিত্রে নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, সকলের সম্মান ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিতেন; তাহার উপর পদগৌরব ত ছিলই; সুতরাং তিনি সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছিলেন; ঢাকায় হিন্দু ব্রাহ্মে একটু ফুটস্ত অফুটস্ত ঘর্ষণ ছিল। এক দিকে হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ছিল। অন্যদিকে স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিলেন। পিতা অবশ্য হিন্দু, 'হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী' সভার সভ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন ব্রাহ্ম কখন তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন নাই, অবজ্ঞা করাত দূরে থাকুক। ঢাকায় মুসলমানের অর্থ আছে, কাজেই সামর্থ্য আছে, কীর্ত্তিও আছে; কিন্তু পিতৃদেবের নায়কতায় এই শক্তিসম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্মিলন সভা করিয়া, যাহাতে উভয় জাতি মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য যত্ন করিতেন। সেই সভারও পিতা অধিনায়ক ছিলেন। উকীল সম্প্রদায় মধ্যে মনোমালিন্য এবং দলাদলি ছিল। পিতা ঢাকা ছাড়িলে, মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া এই মনোমালিন্য অতি কুৎসিত আকারে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যতদিন পিতা ঢাকায় ছিলেন, এই মনোমালিন্য থাকিলেও, কাজে বা কথায় তাহা ফুটিতে পারিত না। হয়ত কোন এক রবিবারে, পিতা পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়া একজন নেতা উকীলের বাসায় গিয়া তামাক খাইলেন। তাহার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্য পক্ষের নেতা উকীলের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; নিয়ত-দ্বন্দ্ব-পরায়ণা লক্ষ্মী সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের মত, সেই দুইজন কলহকারী উকীলকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানা গল্প-গুজবের পর, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

এমন করিয়া একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সপ্তাহে সপ্তাহে খাটিলে মনোমালিন্য ফুটে কিরূপে বল ?

তৎকালে, ঢাকায় দুই এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর একটু আধটু অনাচার অত্যাচারের দিকে, ভিতরে ভিতরে টান ছিল। পিতা সন্ধ্যা হইতে না হইতেই, আপন বাসায় তাঁহাদিগকে আনাইয়া রাখিয়া, নানাবিধ গল্প-গুজবে অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা উঠিয়া যাইবার ফুরসুৎ পাইতেন না। এদিক ওদিক টান থাকিলেও, পিতার চরিত্রের টানে, প্রাণের টানে, আর তাঁহার মন-প্রাণমজান মিষ্ট কথার টানে, বাহিরের টান আর বল করিতে পারিত না। এই একরূপ সংশোধিনী সভা।

পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন, তখন সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই পিতার কাছে আসিতেন। সাহিত্য, অসাহিত্য, অনেক বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বান্ধবের প্রসারে কালীপ্রসন্ন বাবুর কীর্ত্তি প্রসারিত হইল। তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন। ঢাকায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের চর্চ্চাও জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ১২৮৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢাকায় হিন্দু ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায়, পিতা হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বড় বড় অক্ষরে ৩২ পৃষ্ঠায় সেই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে, সাধারণী যন্ত্রে আমরা ছাপিয়াছিলাম। বক্তৃতার প্রধান কথা এই যে, হিন্দু ধর্ম্মই হিন্দু জাতির জাতিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য জাতি যে কালমধ্যে মহাকালের কবলে বিলীন হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম তাহার পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত আপনার পক্ষ বিস্তার করিয়া হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতেছে। এই ধর্ম্ম কেবল জনসাধারণের ধর্ম্ম নহে, পরম পণ্ডিতগণ, পরম জ্ঞানিগণ এবং সাধুগণ এই ধর্ম্মের পূজা করিয়া আসিয়াছেন। খৃষ্টানদিগের বাইবেল, অথবা মুসলমানদিগের কোরাণের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম কেবল একখানি পুস্তকের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা প্রভৃতি—সমস্ত গ্রন্থসমষ্টি এই ধর্ম্মের ধর্ম্মপুস্তক। ইহা এক প্রকার অধিকারীর ধর্ম্ম নহে। কিন্তু সবল দুর্ব্বল—সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর ধর্ম্ম। ইহা যেমন প্রশস্ত, তেমনই উন্নত। ইহা যেমন ভক্তির আসন পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনই যুক্তির উপর অধিকার লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডে বহুরূপা প্রকৃতির পূজা। হিন্দুসমাজ একটি বিরাট ধর্ম্মমন্দির। ইহাতে অহরহ ধর্ম্মের যাগ প্রভূতভাবে হইতেছে। প্রতিদিন উষাকাল হইতে যামিনী যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত, প্রতিক্ষণেই হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মগুণে হিন্দুদিগের ভক্তি-তরঙ্গ কেবল ঊর্দ্ধে উচ্ছুসিত হয় নাই, ইহা সমাজে, সংসারেও প্লাবিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম নিরীহ

অথচ উদার ধর্ম্ম, অন্য কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করে না। আপনার বিস্তার করিবার জন্য, কখন নর-শোণিতে হস্ত ধৌত করে না। কর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের বল এবং মহিমা।

ঐ ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ পর মাসেই ঢাকার কলেজ ভবনে পিতা বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানিও বড় বড় অক্ষরে ৭৪ পৃষ্ঠায় সাধারণী যন্ত্রে ছাপিয়াছিল। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পর্য্যন্ত অধিকাংশ লেখকের লেখার ভঙ্গির সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি বিশদরূপে আছে। ইহার শেষ ভাগের দুই দশ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দিতেছি।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন-চরিতের পর, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জন্‌সোনিয়ান্ ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্য-ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিকক্ষণ থাকে না। এই জন্য কাদম্বরীর ভাষা যদিও বঙ্গসাহিত্যের কিছু শোভা সম্পাদন করিয়াছে, কিন্তু অনুকৃত হইতে পারে নাই। * * * ইহার কিছুদিন পরে সাহিত্য সংসারে আর একজন আশ্চর্য্য লেখক প্রবেশ করিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নামিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অতি চমৎকার। এই লেখা কেবল শ্রুতি মোহকর নহে, কেবল মধু পরিপূর্ণ নহে, ইহাতে তাড়িত্তেজ প্রভূত ভাবে বহিতেছে, ইহা ভাব-বৈভবেও অতি ঐশ্বর্য্যশালী। বঙ্কিমবাবু কেবল বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন. কিন্তু ইংরাজী বিদ্যাতেও অতি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার নিজের কল্পনাশক্তিও অতি বলবতী। অতএব তিনি যেমন এক দিক হইতে সংস্কৃত-সাহিত্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইতে যত্ন করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিক হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যেমন মাধুরীময়ী, তেমনি শক্তি-সম্পন্না ও ভাব-পরিপূর্ণা। তিনি বঙ্গভাষায় একরূপ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যে দিন বঙ্কিমবাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিলেন, সেই দিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল; উন্নতির স্রোত তর-তর বেগে ছুটিতে লাগিল; নদীর জল ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দ রসে গলিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু হইতেই বঙ্গবাসীগণ "সক" করিয়া বাঙ্গলা বই পড়িতে শিখিয়াছে।"

এই সময়ে ঢাকায় পিতার চারি পোয়া প্রতিষ্ঠা হইল। তিনি আদালতে পদস্থ প্রভু, আর সর্ব্বত্রই মধ্যস্থ বন্ধু। তিনি ঢাকায় থাকিবার সময় মধ্যে, আমি তিনবার

তথায় গিয়াছিলাম। শেষ বার তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর। তিনি সকাল হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত, সমানে বাসায় বসিয়া রায় লিখিতেন। নির্জ্জনে, একাকী; কোন আমলাও নিকটে থাকিত না। নিজেই পাতা উলটাইতেছেন, একমনে কাগজ দেখিতেছেন, এখানকার কথার সহিত সেখানকার কথার তুলনা করিতেছেন, একটা খসড়া কাগজে নোট লইতেছেন, আর রায় লিখিতেছেন। একজন আরদালি নীচেকার দেউড়িতে বসিয়া থাকিত মাত্র। বসিয়া থাকিতই বা বলি কেন? সে প্রায়ই নিদ্রা-সুখ ভোগ করিত। সে সময়ে পিতার নিকটে কেহই আসিতে চাহিত না। সুতরাং নিবারণ করিবার জন্য তাহাকেও জাগিয়া থাকিতে হইত না। ভিখারী ফকির আসিত, তাহাদিগকে বাসার চাকরে মুষ্টি দিয়া বিদায় দিত; আরদালির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। কচিৎ কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত আগন্তুক গাড়ী-ঘুড়ি করিয়া আসিলে, চাপরাসি চমকিয়া উঠিয়া, বাম হাতে পাগড়ি পরিতে পরিতে, ডান হাতে চোক্ মুছিতে মুছিতে পিতার কাছে এত্তালা বা কার্ড দিত। পিতা আগন্তুককে সসম্ভ্রমে আনাইয়া লইয়া সসম্ভ্রমেই ১০।১৫ মিনিটে বিদায় দিতেন। হয়ত সেই সময়ে একবার তামাক দিতে বলিতেন। এটা হইল নৈমিত্তিক তামাক। নিত্য তামাক ছিল, সকাল বেলায় রায় লিখিবার পরে একবার, অর্থাৎ ৬॥টা ৭টার মধ্যে একবার, আর ১০॥টার পর একবার। তাহার পর স্নান আহার, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও তামাকু সেবন। তাহার পর কাছারী গমন। কাছারীর ছয় ঘণ্টা কালমধ্যে কখন জলপান, টিফিন বা তামাকু খাইতেন না। শৌচ প্রস্রাব করিবার জন্য উঠিতেন না। এ কেবল ঢাকায় বলিয়া নয়, ৩৬ বৎসর চাকরীর মধ্যে পারতপক্ষে কোথাও করিতেন না। পারতপক্ষে বলিবার তাৎপর্য্য আছে। মুনসেফি করিবার কালে জাহানাবাদে একবার, আর সদর আমিনি করিবার কালে, আরায় বা সাহাবাদে আর একবার, গ্রীষ্মকালে, হাঁপানি কাশীতে, তাঁহাকে বড়ই ভুগিতে হইয়াছিল। জাহানাবাদ তখন অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। মাটি খট্‌খটে, জল অতি পরিষ্কার, বায়ু শুষ্ক এবং দুর্গন্ধহীন। আরা ত চিরকালই স্বাস্থ্যভূমি। এখনও সেইরূপ আছে। অথচ এই সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে হাঁপানি রোগের বড়ই প্রাবল্য হয়। পিতার তাহাই হইয়াছিল। তিনি উঠিয়া নামিয়া, কোনরূপ যানারোহণেও কাছারী যাইতে পারিতেন না। জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া, নিজের বাসাতেই, তাকিয়া বুকে দিয়া, কাছারীর কার্য্য করিতেন। চট্টগ্রাম অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান। ম্যালেরিয়া জ্বর লাগিয়াই আছে। চট্টগ্রাম গিয়া পিতার হাঁপানি চৌদ্দআনা কমিয়া যায়। ছিল না বলিলেই হইল। কচিৎ কখন একটু আধটু দেখা দিত। তাহাতে কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না। যশোহর, ঢাকাতে সে বালাই প্রায় দেখা দেয় নাই।

পিতা ঢাকাতে শীতকালে ৫টার পর, গ্রীষ্মকালে ৬টার পর বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। তাহার পর মজলিস্। ঘোরতর মজলিস্। তবে আরম্ভে উলার মজলিস্ হইতে ঢাকা প্রভৃতি স্থানের মজলিসের প্রভেদ এই যে, মুনসেফি অবস্থায় উলা প্রভৃতি পল্লীগ্রামে, প্রধানত পল্লীস্থ ভদ্র লোক লইয়াই মজলিস্। আর সবজজ পদে সদরে থাকিতে হয়, সুতরাং ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থলে, পদস্থ, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া মজলিস্। ঢাকার মজলিসে প্রায় থাকিতেন সব্‌জজ নফরচন্দ্র ভট্ট, এন্‌জিনিয়ার রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকীল ত্রৈলোক্যনাথ বসু। তিনি আজিও ঢাকায় আছেন। আর একজন সবজজ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সান্ধ্য সমিতিতে অবশ্য নানা সৎকথারই আলোচনা হইত; কিন্তু কোন একটি বিষয়ে গম্ভীর রূপে আলোচনা হইবার পূর্ব্বে, সেই দিবসের ঢাকার ঘটনাবলীর বিজ্ঞাপনও আলোচনা হইত। তাহার পর ক্ষণ-মাহাত্ম্য অনুসারে কোন দিন সমাজতত্ত্ব, কোন দিন সাহিত্য, কোন দিন ধর্ম্মতত্ত্ব সরস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা আলোড়ন হইত। পরনিন্দা যে একেবারে হইত না, এমন কথা বলি না; অথবা পরনিন্দা পিতা ত্যাজ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মজলিসে পরনিন্দা উঠিতেই পারিত না, এমন কথাও বলি না। পরনিন্দা আরম্ভ হইলে, বাবা অল্পের মধ্যে কথাটা কি শুনিয়া লইয়া, একবার বেশ করিয়া শুনিয়া লইয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, একটু প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে "যাক ও কথা" বলিয়া সহাস্য বদনে, আর একটি কথার অবতারণা করিতেন; ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কি ভাবে কেমন করিয়া হইবে, তাহার পরামর্শ আঁটিবার মন্ত্রণা-গৃহ এই মজলিস্। আবার ঢাকায় কলের জল বসাইতে হইলে, কি রূপে বন্দোবস্ত করিতে হইবে, মিউনিসিপ্যালিটিকে অন্তত কত টাকা দিতে হইবে, নবাব সাহেবকে কিরূপে হাত করিতে হইবে—এ সকল পরামর্শেরও সেই কেন্দ্রস্থল। অর্দ্ধবঙ্গ তোলপাড় করিয়া রমাবাই ঢাকায় গিয়া উপস্থিত, কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে, ঢাকায় কোন্ পণ্ডিত বেশ সংস্কৃত কথা কহিতে পারেন—এ সকল যেমন সেই সান্ধ্য সমিতির ভাবনা, আর বসাক মহাশয় স্কুলপাঠ্য পাটীগণিত প্রণয়ন করিয়াছেন; তিনি ঢাকার ইন্সপেক্টর অফিসে প্রধান কর্ম্মচারী, ঢাকা সার্কলে তাঁহার বই ত চলিবেই। এ সকল কথারই পরামর্শ সেই সান্ধ্য-সমিতিতে হইতেছে; আর পরামর্শ-দাতাগণের শীর্ষস্থলে সব-জজ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ই আছেন।

বিচার কার্য্যে পিতার বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং বিপুল সুনামও ছিল। তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হওয়ার পর, ৮০ সালের ২৬শে আগষ্ট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অতিরিক্ত-

এক বৎসর কাল কর্ম্ম করিবার অনুমতি দিলেন। বাবাকে প্রার্থনা করিতে হয় নাই। সেই এক বৎসরের যখন ১০ মাস পূর্ণ হইল, তখন গুজব উঠিল যে, গঙ্গাচরণবাবুকে গবরমেণ্ট আর অতিরিক্ত সময় দান করিবেন না। ঢাকার অধিবাসীদের তখন যেন চমক ভাঙ্গিল, তবে ত আমরা গঙ্গাচরণবাবুকে হারাইব! সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া, মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকদিগের সমীপে সময় প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলেন। আমি যে কথাটা উপরে বলিতেছিলাম, সেই কথাটা অতি সংক্ষেপে দরখাস্তে লেখা ছিল।

"That as an instance of his power of endurance and patience, your Memorialists do not deem it out of place to inform your Lordships, that even at this age, Babu Gunga Charan Sircar, is never seen to adjourn the court, to take a short respite, but is observed to be always at his work and engaged in the discharge of his duties till dusk."

এই প্রার্থনার ফল হইয়াছিল। গবরমেণ্ট আর দেড় বৎসর কাল সময় দেন। পিতা ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় পান। তাহার পর ঢাকার সকল সম্প্রদায় সাড়ম্বরে পিতাকে বিদায় দেন। সেই বিদায় গ্রহণের জন্য পিতাকে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসেও ঢাকায় থাকিতে হইয়াছিল। দেশীয় বিদেশীয় সকল কর্ম্মচারী নিজ কর্ম্ম হইতে অবসর পাওয়ার পর, সেরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, এমন কথা আমি জানি না। এক কলিকাতার রিপন বিদায় উৎসব ছাড়া, আর বোধ করি, কটকের র‍্যাবেন্স বিদায়ের কথা ছাড়া, আর কোথাও যে এরূপ হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। একমাস কাল ধরিয়া সমগ্র ঢাকা-নগরী সমুদ্র সাগরের মত কল্লোলের রোল তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলিবার পূর্ব্বে, পিতার মনে বিশ্বাস কিরূপ ছিল, এবং সাধারণত নিষ্ঠা, আস্থা, বিশ্বাস কি পদার্থ—সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

কর্ম্মে নিষ্ঠা, আপ্তবাক্যে আস্থা থাকিলে মনে বিশ্বাস হয়, অথবা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। আমাদিগের আস্থা ও নিষ্ঠা কমিতেছে বলিয়া, আমাদের বিশ্বাসও কমিতেছে। কর্ম্ম তখনও লোক করিত, এখনও লোক করে; কিন্তু তখন যেমন প্রাণের সহিত, জিদের সহিত, নিষ্ঠার সহিত, লোক কর্ম্মে লাগিয়া থাকিত, এখন আর সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। যেন আলগা আলগা, শিথিল ভাবে, অনেককে কর্ম্মে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। কর্ম্ম না করিলে নয়, তাই করিতেছি, এইরূপ কথা সকলেরই

মুখে। কাজেই বোধ হয়, এইরূপ ভাবও সকলেরই মনে। কর্ম্মে জিদ না থাকায়, তেজ করিয়া কর্ম্ম না করায়, না কর্ম্মীর স্ফূর্ত্তি থাকে, না কর্ম্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমি ভাল কর্ম্ম বা মন্দ কর্ম্মের কথা বলিতেছি না। ভাল মন্দ দুইরূপ কর্ম্মেই আমাদিগের মধ্যে এখন প্রবৃত্তির তেজ না থাকারই কথা বলিতেছি। তাহার পর আপ্তবাক্যে আস্থা। তখনও লোক করিত, এখনও লোকে করে। তবে তখন হইতে এখনকার প্রভেদ এই যে, তখন লোক আপ্তবাক্যকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এখন আমার মতের সহিত কোন এক বাক্যের মিল আছে, সেই জন্য সেই বাক্যটিকে আমার মতের সমর্থনার্থ প্রয়োগ করা হয়। একটা স্থূল উদাহরণ দিতেছি। ধরুন যেন, ঋষিবাক্য আছে যে, একাদশীতে অন্নাহার নিষেধ; সোজাসুজি সেটি আপ্তবাক্য মনে করিয়া নিষেধ মানিলেই চলে। তাহা না করিয়া, অনেকে বলেন যে, একাদশীর সময় হইতেই রসের সঞ্চার হয়, সেই জন্য একাদশীতে লঘু আহার করা, বা উপবাস দেওয়া ভাল। অর্থাৎ এই মত যেন বিজ্ঞানবলে স্থির করিয়াছি, ঋষিবাক্যে সমর্থন পাইয়াছি মাত্র। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, একাদশীতে লঘু আহার, আর ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশীতেই বা নয় কেন? তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা কোন হেতুবাদ দিতে পারেন না। বাস্তবিক একাদশীতে লঙ্ঘন প্রভৃতি বাক্যে শাস্ত্রের শাসন বা শাব্দ প্রমাণ ব্যতীত অন্য হেতু কিছু নাই। শাব্দ প্রমাণে বা আপ্তবাক্যে আস্থা না থাকায়, আমরা অনর্থক বৈজ্ঞানিক হেতুবাদের অনুসন্ধান করি মাত্র।

আপ্তবাক্যে আস্থা না থাকিলে কি সংসারের, কি ধর্ম্মের কোন কার্য্য হয় না। তবে সংস্কৃত করিয়া একটা শ্লোক বলিলেই তাহা ঋষিবাক্য বলিয়া তাহাতে আস্থা করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এক বেদ ভিন্ন, সর্ব্বত্রই বিচার চলে। বেদ অপ্রচলিত পদার্থ। মাক্ষমূলার বা রমেশ দত্ত ছাপিলে বেদ হয় না। পরম্পরা মন্ত্র শুদ্ধি থাকিলে বেদ বলিয়া একরূপ উজ্জ্বল জ্ঞান থাকিত। সেই জ্ঞান থাকিলে, বুদ্ধি বৃত্তি স্বতঃ বিকাশিতা হইত। এ সব কথা এখন পুরাণ কাহিনী হইয়াছে। এ সকল কথায় আস্থা কর, বা না কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। বেদই অপ্রচলিত, তা বেদনিন্দুক শব্দের অর্থ কি হইবে? কিন্তু তা' বলিয়া আপ্তবাক্য নাই, এমন কথা বলা যায় না। বেদের পরেই মনুর প্রমাণ। সেই মনুর কতকগুলি কথা, আমরা ভৃগুসংহিতায় ও নারদসংহিতায় দেখিতে পাই। কোন্‌টি আপ্ত, কোন্‌টি আপ্ত নহে, ইহার বিচার হউক। কিন্তু আপ্ত বলিয়া স্থির হইলে, তাহাতে আস্থা না করিয়া কিরূপে থাকা যায়; মনের অবস্থা অনুসারে আস্থার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। চিত্ত পরিষ্কার থাকিলে, তাহাতে যেন একরূপ আঠার মত পদার্থ থাকে, যাহাতে লাগাও, তাহাতেই লাগিয়া যায়।

ভাসা-ভাসি থাকে না, আঁটা-আঁটি হয়। শুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধি হইতেই আস্থা হইয়া থাকে। এই বুদ্ধি আমাদের দিন দিন কমিয়া যাইতেছে; কাজেই আস্থাও কমিতেছে।

দেখিতে পাওয়া যায়, এখনকার দিনে, 'অন্ধ' বিশ্বাসে অনেকেরই মহাভয় হয়। কিন্তু কতটুকু অন্ধ-বিশ্বাস, আর কতটুকু চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস—তাহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? আমাদের দেশের মহা মহা দার্শনিক, এমন কি, এই সকল বিষয়ে 'মিল কোমৎ' হইতেও অধিকতর দার্শনিক ঋষিগণ, তপস্বিগণ, ব্যাখ্যাকারগণ নাস্তিকের নানা তর্ক খণ্ডন করিয়া, পরকালের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছেন। সেই সকল দেখিব না, পড়িব না, বুঝিবার চেষ্টা করিব না, আর না পড়িয়া, না শুনিয়া, বলেন যে, পরকালের বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস মাত্র। এ সকল অতি অসার কথা; কিন্তু আমরা দিন দিন এই অসারতার কূপে মগ্ন হইতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতার মাতৃদেবী, শিশু পিতাকে রাখিয়া পতির পাদ বক্ষে ধারণ করিয়া অনুমৃতা হন। আগুনখাকির বিশ্বাস, আগুনের মত জলন্তই ছিল, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র বিধিতে বাধ্য হইয়া, মৃত ঠাকুরদাদাকে লইয়া, ঠাকুরমাকে জাহ্নবী তটে বটতলায় তিনদিন বাস করিতে হয়। সুতরাং লোকে বুঝাইবার, পড়াইবার, অথবা উত্ত্যক্ত করিবার, সময় সুযোগ প্রচুর পাইয়াছিল। সকলে বলিল "তুমি এই কাঁচা বয়সে পুড়িয়া মরিতে পারিবে না!" নিকটে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, ঠাকুরমা জলন্ত শিখায় অঙ্গুলি ধরিয়া রহিলেন। লোকে স্তব্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিল; তাঁহার সহিত বিতর্ক ছাড়িয়া দিল। বলিল "এমন দুধের ছেলেটিকে ফেলিয়া যাইতে তোমার মমতা হইতেছে না?" ঠাকুরমার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল; দূরে জলন্ত কটাক্ষক্ষেপ করিলেন, যেন গঙ্গাপারে কিছু দেখিতে পাইতেছেন। বলিলেন,—"তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার এই ছেলে, রাজা হইবে, মহাযশস্বী হইবে, মহাসুখী হইবে।" বাবা এই সকল কথা বলিতেন, আর বিশ্বাসে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইত। তাঁহার মাতৃস্বসাকে সম্বোধন করিয়া একদিন আমাদের সমক্ষে বলিলেন "তা মাসি, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ত হইয়াছে, আমিও রাজাই হইয়াছি। আর তিনি দেখিলেন না বলিয়াই বা আমি দুঃখ করিব কেন? তিনি অবশ্য দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন ত।" ঠাকুরমার আগুন খাওয়ার মত জলন্ত বিশ্বাস না থাকুক, পিতা বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, পরকালে বিশ্বাস করিতেন। পূজা পার্ব্বণে বিশ্বাসের সহিত কত আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাহা গৃহস্বামীর বর্ণনায় নিজেই চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন; সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সে চিত্র আপনাদের সমক্ষে ধরিয়াছি।

মহাবিপন্ন হইয়া, একমনে কাতর প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকিলে, ভগবান অভয় দান

করিয়া থাকেন। পিতা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনে তিনি দুইবার এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একবারকার কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আর একবারকার তাঁহার বলিবার সুযোগ হয় নাই, অথবা আমার শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

একবারকার কথা কি তাহা বলিতেছি। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের কিছুকাল পূর্ব্বে, ঢাকায় তুমুল মোকদ্দমা বাধিল। ঢাকার তাৎকালিক নবাব গণি মিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার কতিপয় জ্ঞাতিবর্গ বহুতর টাকার দাবিতে একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমার বিবরণ আমি দিব না; দিবার প্রয়োজনও নাই। আসল কথা এই যে, বাদীর পক্ষ হীনবল, দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী। বাদী প্রতিবাদীর আর্জি জবাবের ভঙ্গি দেখিয়া, পিতা মনে মনে বুঝিলেন যে, বাদীগণ অর্থহীন সুতরাং বিপন্নও বটে। কিন্তু ন্যায়বিচারে, সুবিচারে, সম্ভবত তাহাদিগকে হারিতে হইবে। এই ধারণা মনে উদয় হওয়ায়, তিনি আপনাকে মহা বিপন্ন মনে করিলেন। বিপদ এই যে, লোকে ত সুবিচার, অবিচার দেখিবে না, লোকে লক্ষ মুখে ব্যক্ত করিবে যে, গঙ্গাচরণবাবু যাইবার সময় বেশ খাইবার মাছ করিয়া গেলেন। এক লক্ষ হউক, দুই লক্ষ হউক, নিশ্চয় তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বাদীগণের মনোরথ ব্যর্থ হইবার যতই সম্ভাবনা হইতে লাগিল, ততই তিনি আপনাকে বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। শেষে এক দিন নিশীথে নিভৃতে, শুদ্ধমনে, যুক্ত-করে বিপদভঞ্জন ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। হঠাৎ অবসাদের অন্ধকারের মধ্যে, যেন সুস্নিগ্ধ আলো উদ্ভাসিত হইল। সুমধুর অভয়বাণী যেন তাঁহার কর্ণে ঘোষিত হইল। আনন্দে হৃদয় পরিপূরিত হইল। এতক্ষণ নিদ্রা হয় নাই, নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরদিন প্রাতে শরীর-মন যেন সরল, সহজ। ভার যেন চলিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ঢাকায় টেলিগ্রাফ পৌঁছিল, ছোটলাট হঠাৎ ঢাকা পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন। পিতা তখনই মনে করিলেন "ইঁহাকে দিয়াই আমার বিপদ কাটাইতে হইবে।"

যথাসময়ে ছোটলাট আসিলেন। কমিশনর, জজের পর, পিতা তাঁহার সহিত কোটাসে একাকী দেখা করিলেন। তিনি আদরে পিতাকে তাঁহার কামরায় বসাইলেন। একথা সে কথার পর বলিলেন "আপনি যেন আমাকে কিছু বলিবেন বলিবেন মনে হইতেছে।" পিতা উত্তরে বলিলেন "বলা কহা আর কি? নবাব বাড়ির মোকদ্দমা আপনাকে মিটাইয়া দিয়া যাইতেই হইবে।" ছোটলাট বলিলেন 'নিশ্চয়,' হইলও তাই। বিপদবারণ বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। ছোটলাট তিন দিন থাকিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

যত কাল পদস্থ ছিলেন, পিতা সকল স্থানেই সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন,

সকলের সহিত বসা-দাঁড়া করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ. কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি কোন সদ্জাতির ভবনেও কখন ভোজন বা ফলাহার করেন নাই। এরূপ করিয়া লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে, গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন বিধি-বিধানে নিষেধ ছিল। সাহেবেরা অবশ্য মাকড় মারিলে ধোকড় হয়; তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সপত্নীক সকল বাড়ীতে গিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য-পেয় সেবা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে কথা বলেই বা কে,—আর ধরেই বা কে? কিন্তু সাহেবেরা মানুন আর নাই মানুন, ওগুলা নিষিদ্ধ। বাঙ্গালিরা সকলেই যে এই নিষেধ মানিয়া থাকেন তাহাও নহে, তবে পিতা অতিরিক্ত মাত্রায় এই নিষেধ বিধি প্রতিপালন করিতেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা ডাব খাওয়াও যেন গ্লানিকর মনে করিতেন। দুই এক স্থলে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ব্যভিচার ছিল। শুনিয়াছি তিনি কটকে থাকার কালে পুরীর রাজা তাঁহাকে, চোপদার প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া, বৃহৎ রূপার থালে, গুটি আষ্টেক পটল পাঠাইয়া দেন। পটল তখন কটকে বারমাসই দুর্লভ ছিল। বাবা প্রত্যাখ্যান না করিয়া রাজদূতকে দুই মুদ্রা পারিতোষিক দেন, এবং পটল কয়টি গ্রহণ করেন, পরে সেবনও করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে, নবাবের বৎসরে দুইবার ভেট; জ্যৈষ্ঠে আমের, আর শীতে মেওয়ার, সকল কর্ম্মচারীই গ্রহণ করিতেন। পিতাও গ্রহণ করিতেন। প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় মনে করিতেন। আর মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভোজ, তাঁহার বাড়ীতে নয়, তাঁহার পুরোহিতের বাড়ীতে, উকীল আমলা দলবলের সঙ্গে পিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর মফস্বল তদারক করিতে গিয়া, রাত্রি যাপনার্থ কচিৎ কোন ব্রাহ্মণের বাটিতে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। আর একস্থানে মুসলমানের সিধা লইয়া, নিজ ব্রাহ্মণের পাকে আহার করিয়া, দুই দিনের পর দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঢাকাবাসী এইবার তাঁহাদের সাধের সব-জজকে অবসরপ্রাপ্ত পাইয়া, বিশুদ্ধ গঙ্গাচরণবাবু রূপে পাইয়া, শৃঙ্খল-বিমুক্ত বন্ধুভাবে পাইয়া ভোজে নাচে, উৎসবে মাতিয়া উঠিল। আমি ও আমার বন্ধু, হুগলী নর্ম্মালের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগ্রামের পূর্ব্বে রণ-রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমার কায়স্থের উদর. দিন দিন পর্য্যায়-ক্রমে সে ভোজের ভার সহিতে পারিল না। আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার বন্ধু ব্রাহ্মণ; তাহাতে চিরদিনই ফলাহার-পটু; তবু পলায়-দায়ে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তবে রণে ভঙ্গ দিলেন না। পিতা কিন্তু অক্ষুণ্ণ অটুট। সকল জায়গায় সমানে যাইতেছেন, আহার করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, থিয়েটার দেখিতেছেন। একবারও অবসাদ বোধ করিতেছেন না। কে বলিবে বৃদ্ধ, কার্য্য হইতে অবসর লইতেছেন। যেন যুবা পুরুষের কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রথম উদ্যম। থিয়েটারে মেঘনাদ বধ হইয়াছে. প্রমীলা সহগামিনী হইবেন। রাবণ প্যাঁচ দিয়া চলিয়া গেলেন। জল

প্রাণীটি নাই ; প্রমীলা বেচারা আপনার চিতা আপনি ফুৎকার দিয়া জ্বালাইতেছে। আমি পিতার পশ্চাতে ছিলাম, এই বিসদৃশ বিড়ম্বনা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, ইহাদের কি আর কেহ নাই নাকি ? ভৃত্য পরিচারক সব কোথায় গেল ?" পিতা শুনিতে পাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন,—"রাম কি আর কিছু রেখেছে গা, রাক্ষস-পুরী শূন্য করিয়াছে।" এরূপ কথা সর্ব্বদাই শুনিতাম।

ঢাকার জনসাধারণ সভা ১২৮৮ সালের ৪ঠা মাঘ স্বর্ণ-চিত্র-বেষ্টিত পার্চমেণ্ট পত্রে পিতাকে অভিনন্দন দিয়া, মহতী সমিতি মধ্যে তাঁহাকে বিদায় দান করিল। ঢাকা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন,—You have no business to be here Babu. We bid farewell to your father, you have no locus standi আমি বলিলাম সাহেব তোমার ঐটি ভুল You say, farewell, farwell, I say "welcome father." I oppose you ! Have not I a locus not standiz সাহেব নীরব হইয়া হাসিতে লাগিলেন। বাসায় গিয়া রাখাল বাবুর মুখে এই গল্প শুনিয়া, পিতা আনন্দে অশ্রুপাত করিলেন।

বাস্তবিক আমি পিতাকে Welcome করিয়া আনিতে অর্থাৎ আদরে আগু বাড়াইয়া আনিতে গিয়াছিলাম বটে! সেই মাঘ মাসের মাঝামাঝি আমরা বাটীতে ফিরিলাম। বন্ধনমুক্ত পিতাকে পাইয়া আমাদের গ্রাম-শুদ্ধ লোকের আনন্দই না কত! পিতা বাড়ীতে আসিয়াই গয়াগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই যে ৩৬।৩৭ বৎসর চাকরী, ইহার মধ্যে পিতা নিজের পীড়ার জন্য একমাস কাল, আর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশনের উৎসবের জন্য ১৮ দিনমাত্র, ছুটি লইয়াছিলেন। ৺দুর্গাপূজার ছুটিতে প্রতি বৎসরই বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেইটাই প্রিবিলেজ ছুটির মত গণ্য হইত। নিকটে থাকিলে বড়দিন, মহরম ও গুডফ্রাইডের সময়েও বাড়ীতে থাকিতেন। অন্যথা মহালয়া হইতে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত, বাড়ীতে অবস্থানকাল মাত্র। যখন আরায় ছিলেন, তখন ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন ; যখন কটকে ছিলেন তখন ৺পুরীধামে গিয়াছিলেন ; আর আলিপুরে থাকার কালে অবশ্য ৺কালিঘাটে গিয়াছিলেন ; ইহা ছাড়া, অন্য কোন তীর্থ করেন নাই। তাহার জন্য বিশেষ ব্যগ্র বা ক্ষুণ্ণ ছিলেন না। এবার বাটীতে আসিয়াই, যেন গয়া-গমনের জন্য একটু ব্যগ্র ব্যগ্র বোধ হইল। বাড়ীর চাকর ত সঙ্গে গেলই, তবে একজন বিশ্বাসী—ভাল ব্রাহ্মণ পাইতে একটু বিলম্ব হইল। তাহাতেই তাঁহার ব্যগ্রতা আমরা বুঝিতে পারিলাম। কেন ব্যগ্র, তাহাও জানিতে পারিলাম। তাঁহার পিতামহ, মাতামহ, তাহাই বা বলি কেন —সে কালে সকল হিন্দুই আশা করিতেন, মনে মনে দাবি করিতেন, যে পুত্র পৌত্রগণ কৃতী হইলে যেন গয়ায় পিণ্ডদান করে। পিতার পিতামহ, মাতামহ, ঐরূপ আশার

কথা হয় ত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন ; তখন রেল ছিল না, পথ ছিল না, পথে ভীষণ দস্যুভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় অতিশয় ছিল, তবু তাঁহারা এরূপ আশা করিয়াছিলেন ; এখন রেল হইয়াছে, পথ-ঘাট সুগম হইয়াছে, পিতা ত কৃতী বটেনই, সুতরাং রাজকার্য্য হইতে অবসরান্তে তাঁহাদের দাবির কথা স্মরণ করিয়া পিতা গমনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

চাকর, ব্রাহ্মণ, আর পিতার পিসতাত ভাই—আমার প্রসন্ন কাকাকে সঙ্গে লইয়া বাবা গয়া গমন করিলেন। ভাবটা এই যে, নিজের পিতৃপুরুষ ও মাতামহ বংশের যেরূপ পিণ্ডদান হইবে, পিসার পিতৃপুরুষদিগেরও সেইরূপ পিণ্ডদান হইবে। তাঁহারা কয়দিন গিয়া ৺বৈদ্যনাথে থাকেন। তাহার পর গয়া করিয়া আসিয়া আবার বৈদ্যনাথে ছিলেন। জরের তাড়নায়, ৺বৈদ্যনাথের কৃপায় বৈদ্যনাথধাম তৎপূর্ব্ব হইতেই আমার একরূপ (Second domicile) দ্বিতীয় নিবাস হইয়াছে। পিতার কিন্তু সেই একবার বা দুইবার যাওয়া। তাঁহাকে হাতে পাইয়া পাণ্ডা মহাশয়েরা খুব আদর আবদার করিলেন। আমাদের বাড়ীতে আড়ম্বরে তাঁহাদের সপাক পক্বান্ন ভোজ হইল। আর আমাদের খাস পাণ্ডা অক্ষয়কুমার পট্টবস্ত্র, শাল উত্তরীয় প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে পিতা ফিরিয়া আসিলেন। আমি জীবনী লিখিতেছি না, মাস মাস বা বৎসর বৎসর পর পর ঘটনার উল্লেখ করিব না, তবে এই সকল বিষয়ে উঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা কিরূপ ছিল, সেই কথাই বুঝাইবার জন্যই গয়া গমনের কথা বলিলাম। আসল কথা, অন্য তীর্থাদির জন্য তিনি ব্যগ্র না থাকিলেও গয়া গমনের জন্য ব্যগ্র হন। অন্যান্য তীর্থ প্রধানত আপনার জন্য, গয়া তীর্থ প্রধানতঃ পিতৃপুরুষদিগের জন্য। দেবতায় তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতার শেষভাগ দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। সেই বক্তৃতার শেষ দিকে যে দুর্গোৎসবের বর্ণনা আছে, তাহা কেবল প্রথম পুরুষে, তাঁহারই স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। "এই সময়ে গললগ্নীকৃতবাসা কৃতী (যিনি প্রকৃত হিন্দু) প্রতিমার সম্মুখে, অথচ কিঞ্চিৎ পার্শ্বে' দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে দেখিতেছেন এবং ভাবিতেছেন। এই ভাবিতেছেন যে, পরমা প্রকৃতি, আদ্যা শক্তি তাঁহার আলয়ে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। গৃহস্বামী এই ভাবিতেছেন এবং তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দ-তরঙ্গ যুগপৎ উদ্বেলিত হইয়া নয়নযুগল দিয়া দর-দরিত ধারায় পড়িতেছে। গৃহস্বামী পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার ভবনে আত্মীয় বন্ধু, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী এবং দীনদুঃখীগণ প্রভৃতি বহুল ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল ; গৃহস্বামী ভাবিলেন যে, অদ্য আমার ভবনে আনন্দময়ী আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই এত আনন্দ। তাঁহার নয়ন দিয়া আবার আনন্দধারা বহিতে লাগিল। এই আনন্দ অতি বিমল আনন্দ, ইহা ভক্তির আনন্দ, ইহা স্বর্গীয় আনন্দ।

এই শোক-তাপ-সন্তপ্ত সংসারে এরূপ আনন্দ যে লাভ করিতে পারে, সে ধন্য এবং তাঁহার জীবন সার্থক।" আবার বলি, এই চিত্র পিতার নিজকৃত স্বরূপ-চিত্র ; তিনি ভক্তির আনন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

পিতা আমাদিগের মত পোলিটিক্যাল কখন হন নাই। রাজনীতির খিচুড়ি করিয়া, দুহাতে ছড়াইয়া, কাককে বককে খাওয়াইতে তিনি কখন অভ্যাস করেন নাই। চাকুরি করিতে করিতে তিনি যে রাজনীতির চক্র-ব্যূহ মধ্যে পড়িয়াছিলেন, সে কথার পরিচয় পূর্ব্বেও দিই নাই, এখনও দিব না। তিনি পোলিটিক্যাল ছিলেন না, সুতরাং সাধারণীতে লিখিতে ভালবাসিতেন না। গবর্ণমেণ্ট এ সকল কাজে নিতান্ত নারাজ, রাজ কর্মচারীদিগের পক্ষে সংবাদপত্রে লেখা একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। কাজেই সাধারণীতে লিখিতে আমি তাঁহাকে কখন অনুরোধও করি নাই। কৈকশীয়ালির বটবৃক্ষের বর্ণনার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, সেইরূপ পদ্য কচিৎ কখন লিখিতেন এবং সাধারণীতে প্রকাশিত হইত। আর ঋতুবর্ণনের নিদাঘ ভাগের অনেক অংশ সাধারণীতে ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছিল ; আর বর্ষার কয়েকটি বর্ণনা প্রকাশিত হয়, তাহা অদ্যাপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। গদ্য প্রবন্ধ সাধারণীতে অতি অল্পই লেখেন। ১২৮১ সালের ১ই জৈষ্ঠ সাধারণীতে প্রকাশিত "সাক্ষী" নামক প্রবন্ধটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অবশ্য সমালোচনা করিব না।

সাক্ষী।

(বিচারকার্য্য সাধনার্থ সাক্ষীর সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কোন ব্যবহার মীমাংসা করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে উভয় পক্ষের বিবৃত ভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সমূহের বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে বিচারপতি সম্যক্ অনভিজ্ঞ থাকায়, কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা কিছুই নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। তখন সাক্ষীর বাক্যই তাঁহার প্রধান উপায়। তিনি তদ্দারা অন্ধকারে আলোক লাভ করেন ; আপনার পথ দেখিতে পান, এবং জটিল জাল ছেদন করিয়া সত্যের উদ্ধার করিতে পারেন! যাঁহার বাক্যের দ্বারা ঈদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাকে আদর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং ভগবান মনুও তদীয় সংহিতায় সাক্ষীকে সম্মান করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা ইংরাজ রাজ-প্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে সাক্ষীদিগকে আদর বা সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাদের বিশেষ অবমাননা ও সময়ে সময়ে নিপীড়ন করা হয়। এই সকল ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন তাহারা কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে এবং

তজ্জন্যই তাহাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইতেছে। দণ্ডার্দ্ধই হউক, কিম্বা প্রহরদ্বয়ই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে কাঠগড়া বেষ্টিত একটি সংকীর্ণ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থা কেবল ক্লেশকর নহে, অধিকন্তু ভদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব অপমান-জনক। যদি বলেন যে বিচারালয়ের সম্ভ্রম-রক্ষার্থ দণ্ডায়মান অবস্থায় সাক্ষ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কেবল এরূপ কাল্পনিক সম্ভ্রমের জন্য কাহাকেও কষ্ট প্রদান করা কোন প্রকারেই উচিত নহে।) বিশেষত যে স্থানে কার্ত্তিক বাগ্দী ও খোয়াজ নিকারী দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, সেই স্থানে সেই অবস্থাতে ফুলের মুখুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান হরলাল মুখোপাধ্যায়কে কিম্বা বিশাল ভূসম্পত্তিশালী যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে সাক্ষ্য দিতে হইলে, তিনি যে আপনাকে হতমান বোধ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এবং এই অপমান ভয়েই সম্ভ্রান্ত সাক্ষীরা বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়েন। সত্য বটে, বিচারপতির সম্মুখে সকলেই সমান, কিন্তু তজ্জন্য যে সর্ব্বপ্রকার সাক্ষীকেই একই আসনে দণ্ডায়মান না করিলে, বিচারে দোষ স্পর্শ হইবে একথা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষত কার্য্যত রাজাজ্ঞার দ্বারা এ বিষয়ে ইতরবিশেষ দেখা যাইতেছে। অনেকানেক ধনাঢ্য ভূস্বামীগণ সাক্ষ্য প্রদানার্থ বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এবং সচরাচর দেখা যায় যে, যদি কোন ইউরোপীয়কে সাক্ষ্য দিতে হয়, তবে তিনি প্রায়ই বিচারপতির পার্শ্বে সমাসীন হইয়া থাকেন। অতএব বিচারালয়ের সম্ভ্রমরক্ষার্থ ভদ্র অভদ্র সকল সাক্ষীকেই এক কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে এ তর্ক নিতান্ত দুর্ব্বল; এরূপ প্রথা অবলম্বনে কোন উপকার নাই, বরং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে মানসিক ও দৈহিক কষ্ট দেওয়া হয় ও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের সাক্ষ্যলাভের পথ অবরোধ করাও হয়। কিন্তু কেবল ইহাই নহে, সাক্ষীদিগের আরও দুর্গতি আছে। যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাক্ষী আহূত হন, তাঁহার পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসাবাদ হইলে পর, পক্ষান্তরের উকীল তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। আদালতের ভাষায় এই প্রশ্নের নাম জেরার সওয়াল, এবং তাহা কখন কখন এতদ্রূপ জটিল ও সুদীর্ঘ হইয়া উঠে যে, সে জেরার জের মিটান অতি সুকঠিন। প্রমাণ বিষয়িণী-ব্যবস্থাবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, এক প্রশ্নের দ্বারা অনেক প্রকৃত বিষয়ের আবিষ্কার হইতে পারে, অতএব ইহা প্রয়োজনীয়। আমরাও বলি যে, যদি জেরার সওয়াল বিশুদ্ধ প্রণালীতে করা হয়, তবে অনেক গুপ্ত বিষয় প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু উকীল মহাশয়েরা তদুদ্দেশে প্রতিপ্রশ্ন করেন না। সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী করাই তাঁহাদের প্রতিপ্রশ্নের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে প্রায়ই কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। জেরার সওয়ালকালে উকীলদিগের সকোপ নয়নে দৃষ্টিপাত, ও পরুষবাক্য প্রয়োগ এবং সময়ে

সময়ে বিচারপতির ভয়ঙ্কর তাড়না, সাক্ষীকে এরূপ সভয় ও ব্যতিব্যস্ত করে যে, সে একেবারে হতচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুখে যাহা আইসে সে তাহাই বলিতে থাকে। ইহাতে সত্যের আবিষ্কার না হইয়া বরং সত্য, তিমির-জালে অধিকতর আচ্ছন্ন হয়। বিশেষত বিচারপতি কর্তৃকই হউক, কিম্বা উকীল কর্তৃকই হউক, সাক্ষীকে তাড়না করা কোন প্রকারেই বৈধ ও সাধু-সম্মত নহে। স্বীকার করি যে, এরূপ ঘৃষণীয় কার্য্যে কোন কোন উকীলের প্রবৃত্তি জন্মে না, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা যে কুপ্রথার বর্ণনা করিলাম, তাহা অধিকাংশ উকীলেরাই করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা সাধারণ প্রথা হইয়া উঠিয়াছে এবং তদ্দ্বারা কুফলও ফলিতেছে। এই প্রথা যাহাতে দূরীকৃত হয়, এবং সাক্ষীদিগের অবস্থানুসারে মর্য্যাদা রক্ষা পায়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ।

ঠিক এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮২ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ "সীতা-বিলাপ" (দণ্ডকারণ্যে) সাধারণীতে প্রকাশিত হয়। সেটি পদ্য। তাহার তিনটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

'যে দিন বলিলে দিতে পরীক্ষা অনলে,
করিলে ঘোষণা এই শুনিল সকলে,—
যদি এই পরীক্ষায়, সীতা মম মুক্তি পায়
জানিব কলঙ্কহীনা জনক নন্দিনী।
আজীবন সিংহাসনে করিব সঙ্গিনী॥'

বিশ্বাস করিয়া সেই ঘোষিত বচনে,
বিশ্বাস করিয়া আর মম আচরণে,
পশিলাম হুতাশনে, প্রফুল্ল পবিত্র মনে,
বাহির হইনু পুনঃ দেখিল ত্রিলোকে
বিমল সুবর্ণ যথা বিমল আলোকে॥

কিন্তু অয়ি নাথ, একি সর্ব্বনাশ!
কোথা সিংহাসন, কোথা বনবাস!
উঠি অকস্মাৎ, ঘন ঘূর্ণবাত,
জীবন কানন ছিন্ন ভিন্ন করি,
নাশিল সমূলে আশার বল্লরী।"

ঢাকা ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ১২৮৯ সালের ১৮ই বৈশাখ সাধারণীতে পিতৃকৃত

"যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ" প্রকাশিত হয়। ইহার বহু পরে তৎকালের দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু "মহাপ্রস্থান" নাম দিয়া স্কুলপাঠ্য "কবিতা প্রসঙ্গ" গ্রন্থের প্রথমেই একটি কবিতা প্রকাশিত করেন ; সেটি অতি সুন্দর ; অনেক স্থলে পিতার স্বর্গারোহণ হইতে সুন্দর। তবে যোগীনবাবু বলিতেছেন, যুধিষ্ঠির—

"শোকচ্ছায়ে" বিমলিন, নরপতি আভাহীন,
মেঘাবৃত যেন দিবাকর,
অন্তরে চিন্তার ভার, কষ্টের নাহিক পার
ধীরে ধীরে হন অগ্রসর।

আর পিতা বলিতেছেন—

প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হৃদয়-দর্পণ।
বিমল আভায় করে সভে প্রদর্শন,—
কুচিন্তা, কুটিল দ্বেষ, শোক-তাপ পাপলেশ,
পারে নাই করিবারে কভু অধিকার।"
সত্যব্রত পুণ্য-পূত অন্তর তাঁহার।

এই দুই চিত্রের বিভিন্নতা যেন কেমন কেমন লাগে। আর পিতার যুধিষ্ঠির কুকুর সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"নারিব কদাচ এই আশ্রিত ত্যজিতে"

যোগীনবাবুর যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"প্রতি জীবে ভগবান করিছেন অধিষ্ঠান
শ্বান বলি ত্যজিব কেমনে ?"

সমালোচনা আমার সেকালে রোগ বলিয়া এই কথাগুলা বাহির হইয়া পড়িল। নতুবা যোগীন বাবুর মহাপ্রস্থান কবিতা সুন্দর, অতি সুন্দর। সে সৌন্দর্য্যে হস্তার্পণ করিতে অতি নৃশংসও পারে না। পিতা স্বর্গারোহণের বহু পরে মহাপ্রস্থান লেখা, সুতরাং এইরূপ বিভেদ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগীনবাবু করিয়া থাকেন, তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় বৈকি। সমগ্র স্বর্গারোহণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

দুঃসহ দীধিতি দীপ্ত দিবা গত-প্রায়
বৈকালিক মাধুরিতে মহী শোভা পায় ;
ফুটিছে কুসুম-চয় সুমৃদু সমীর বয়,

ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলে দিনমণি ;
শান্তির কোমল কোলে অর্পিয়া অবনী ।

সান্ধ্য সৌর হৈম দ্যুতি হিমাদ্রি উপরে,
তরল লাবণ্যে খেলে শিখরে শিখরে
তুষার মুকুটে সাজি,   স্তরে স্তরে শৃঙ্গরাজি,
কনক কিরণে মরি কিবা সুশোভিত,
স্বর্গের সোপানাবলী সুবর্ণ নির্ম্মিত ।

তার মাঝে হের এক তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি,
চূড়া যার পরশিছে অমর নগরী,
অপূর্ব্ব-পুরুষ-বর,   দেব যক্ষ কিবা নর.
একাকী দণ্ডায়মান কেহ নাহি আর,
এক সারমেয় মাত্র সঙ্গেতে তাঁহার ।

দীর্ঘাকৃতি, সৌম্য-মূর্ত্তি বয়সে প্রবীণ,
অঙ্গের উজ্জ্বল আভা ঈষৎ মলিন ।
শুক্লবাস পরিহিত,   শুক্ল কেশ বিলম্বিত,
শুক্ল শ্মশ্রু সুধাংশুর শিখা-সম ভাসে,
অমল অনিলে দুলি সুনীল আকাশে ।

প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হৃদয়-দর্পণ—
বিমল আভায় করে সভে প্রদর্শন ।
কুচিন্তা কুটিল দ্বেষ.   শোক-তাপ পাপ-লেশ.
পারে নাই করিবারে কভু অধিকার ;
সত্য-ব্রত পুণ্য-পূত অন্তর তাঁহার ।

ললাট প্রশস্ত অতি, অতি সুলক্ষণ,
তদুপরি ছিল বুঝি মুকুট ভূষণ ;
ওষ্ঠাধর বিম্ব হেন,   ঈষৎ কাঁপিছে যেন,

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে অনন্ত গগনে,
হেরিছেন ঊর্দ্ধদৃষ্টি আয়ত নয়নে।

হেনকালে ধ্বনি এক হইল আকাশে,
সুগভীর তার স্বরে এই কথা ভাসে —
পাণ্ডবেন্দ্র যুধিষ্ঠির, সত্যব্রত ধর্ম্মবীর,
স্বর্গলাভে যদি থাকে, কামনা তোমার,
অবিলম্বে সারমেয় কর পরিহার।

ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানী তুমি, ধর্ম্ম-অবতার,
কুক্কুরে লয়েছ সঙ্গে কেমন বিচার!
যার স্পর্শে পুণ্য-ক্ষয়, অশুচি হইতে হয়,
কেমনে আসিবে বল হেন পশু লয়ে।
পরম পবিত্র ধাম অমর আলয়ে॥"

হইল আকাশে এই ধ্বনি নিনাদিত,
টলাতে নারিল কিন্তু ভূপতির চিত;
অচলে অচল সম, স্থিরভাব নিরুপম,
অকম্পিত স্বরে কন অপূর্ব্ব বচন,
অন্তরীক্ষ হতে শুনে যত দেবগণ।

"শিরোধার্য্য দৈববাণী কিন্তু কদাচন,
নারিব করিতে আমি কুক্কুরে বর্জ্জন।
বনিতা পাঞ্চালী সতী, ভ্রাতা চারি মহামতি,
লয়ে সঙ্গে মহাপথে করি আগমন,
সভে স্বর্গে আরোহিব করিয়া মনন।

নিয়তি-নিয়ম কিন্তু কে লঙ্ঘিতে পারে?
একে একে সবে তারা ত্যজেছে আমারে;
কোথায় দ্রুপদ সুতা ধর্ম্ম পত্নী গুণ-যুতা,

কোথায় নকুল আর সহদেব বীর!
কোথা ভীম মহাবল, কোথা পার্থবীর!

মৃত্যু-বশে অন্য পথে গিয়াছে সকলে,
ফেলিয়া আমায় এই দুর্গম অচলে।
কেহ নাহি ছিল আর চতুর্দ্দিক শূন্যাকার!
উঠিলাম তবু শৈলে ধৈর্য্য ধরি মনে
কিছুদূরে মিল হয় সারমেয় সনে।

নাহিক রক্ষক আর, নাহিক দোসর,
মম সম একা ভ্রমে শিখর উপর।
আমারে দেখিতে পেয়ে, সত্বর আইল ধেয়ে,
পরস্পর মধ্যে ক্রমে সানুভূতি হয়,
সে হইল সঙ্গী, আমি দিলাম আশ্রয়।

পবিত্র কি অপবিত্র হউক যেমন,
আমি তারে নাহি পারি ছাড়িতে কখন;
যেখানে করিব গতি, তাহারে লইব তথি,
এই সত্যে আপনারে করেছি বন্ধন,
নারিব নারিব তাহা করিতে লঙ্ঘন।

হতে হয় হব, স্বর্গ-সম্ভোগে বঞ্চিত।
কিম্বা এই গিরি-পৃষ্ঠে তুষার গলিত॥
দেবগণ-সন্নিধানে দুর্লভ অমৃত পানে,
বিড়ম্বিত হতে হয়, তাও আমি হব,
ত্রিদেশের কোপানল শির পাতি লব।

সখা মম নারায়ণ দয়ার আধার,
ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্ধ করুন গোলোকের দ্বার;
অন্তিমে নরক-গামী হতে হয় হব আমি,

তথাপি নারিব নিজ বচন খণ্ডিতে,
নারিব কদাচ এই আশ্রিত ত্যজিতে।"

এত যদি বলিলেন নৃপ চূড়ামণি,
আকাশে ঘোষিত হয় ধন্য ধন্য ধ্বনি।
খুলিল স্বর্গের দ্বার জ্যোতি অতি চমৎকার,
ধরায় ধরায় পড়ি কিবা মনোহর,
ঢল ঢল গলা হেমে ভাসে চরাচর।

সে দ্বার শোভিছে কিবা দিব্যাঙ্গনা দলে,
কক্ষে স্বর্ণ-কুম্ভ-পূর্ণ মন্দাকিনী জলে।
লুটিয়া নন্দনবন পারিজাত অগণন,
শত শত সুরবালা আনি সমাদরে,
হর্ষে বর্ষে নৃপতির মস্তক উপরে।

কত দেব দেবী কত কিন্নর কিন্নরী,
সুমধুর বীণা-যন্ত্র যত্নে করে ধরি
আরম্ভিল সুললিত অপূর্ব্ব মোহন গীত,
পবন হিল্লোলে গীত অনন্ত আকাশে,
ব্যাপিল, শুনিল বিশ্ব অসীম উল্লাসে।

গীত

রাগিণী জয়-জয়ন্তী, তাল একতালা।
জয় যুধিষ্ঠির পুণ্য-পরায়ণ,
জয় ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের নন্দন,
জয় বিপদার্ত্ত বিপদভঞ্জন,
জয় সুর নর মানস-রঞ্জন;
জয় সত্যনিষ্ঠ জয় মহাভাগ,
অনুপম তব সত্য অনুরাগ,
করেছ ধরায় কত পরিত্যাগ,
বিনা ক্ষোভে ভূপ সত্যের কারণ।

ধন্য ধন্য তুমি ধন্য পুণ্যবান,
তব পুণ্যে বাধ্য বিভু ভগবান,
সুরগণ যাচে পেতে তব স্থান,
সুরলোকোপরি তোমার আসন।
নিত্যধামে তব পুণ্য পুরস্কার,
অক্ষয় আনন্দ ভুঞ্জ অনিবার,
বিমুক্ত হয়েছে ত্রিদিবের দ্বার,—
এস এস ত্বরা এস হে রাজন ॥
গগনে দুন্দুভি ধ্বনি হইল তখন,
নামিল ভূধরোপরি বিচিত্র স্যন্দন;
আরোহিয়া তদুপরি নরশ্রেষ্ঠ নৃপবর,
সশরীরে পশিলেন ত্রিদশ আলয়,
চতুর্দ্দিকে নিনাদিল শব্দ জয় জয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতি বাল্যকাল হইতে পিতা আমাকে নিয়ত সাথের সাথী করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আমার যৌবনে, সেরূপ সাহচর্য্যের সুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু পুত্রং মিত্র বদাচরেৎ যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে আমাদের পিতা পুত্রের মধ্যে হইয়াছিল। কেবল মিত্র বলিয়া নয়, বন্ধু বলিয়া নয়, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাকে সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষতা প্রদান করিতেন। হঠাৎ এক দিনে নহে, আমাকে তাঁহার সমকক্ষ করিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে—তিনি আমার অতি বালককাল হইতেই আয়োজন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি যখন যৌবনের প্রারম্ভে মিল, কোম্‌ত, স্পেনসার প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণের মতবাদে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিলাম, তখন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে, তিনি আমাকে সমরে আহ্বান করিলেন। মিলের মায়াবাদ (Permanent possibility of sensation) লইয়া, কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, হারবার্ট স্পেনসারের সমাজ তত্ত্ব লইয়া, আমরা পিতাপুত্রে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতাম। মিল, কোম্‌তের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন; হারবার্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্বের সময়ে, জিজ্ঞাসুর মত পূর্ব্বপক্ষ করিয়া, ঠিক যেন শিক্ষা করিতে বসিতেন।

মধুসূদনকে লইয়া নবরত্নের সহিত আমার কলহের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজী বাঙ্গালার আর কোন কবির কবিত্ব লইয়া পিতাপুত্রে আমাদের বিবাদ ছিল

না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির রস আমরা পিতাপুত্রে লোফালুফি করিয়া উপভোগ করিতাম। সেক্‌সপিয়ারের নাটকের রস তাঁহার পাদমূলে বসিয়াই উপভোগ করিয়াছি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেকলে, কাপ্তেন রিচার্ডসন্‌কে বলিয়াছিলেন, যে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত ভুলিতে পারিব, কিন্তু তুমি যে এই সেক্‌সপিয়ারের আবৃত্তি করিলে, এ আবৃত্তি কখন ভুলিতে পারিব না। রিচার্ডসন্ যখন বিলাত চলিয়া যান, তখন তদীয় ছাত্রেরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে আপনি চলিয়া গেলেন এখন কাহার কাছে আমরা সেক্‌সপিয়ারের পাঠ শিক্ষা করিব? রিচার্ডসন্ বলিয়াছিলেন "অধ্যাপক উইলিয়ম মাষ্টারস্ রহিলেন। তাঁহার কাছে সেক্‌সপিয়ার শুনিও।" আমি সেই উইলিয়ম মাষ্টার্‌সের ছাত্র। পিতা রিচার্ডসনের ছাত্র। আমার মনে হয় রিচার্ডসন সাহেব, উইলিয়ম মাষ্টারস্ সাহেবের নাম না করিয়া, যদি পিতার নাম করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত। গুরু-নিন্দার বাহাদুরীর জন্য বা পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য, এমন কথা বলিতেছি, কেহ মনে করিবেন না। যে স্থলে রস-গভীর, ভাষা-প্রগাঢ়, আবেগ-পরিপূর্ণ,—সেই সকল স্থলের সেক্‌সপিয়র পাঠ পিতা যেমন করিতে পারিতেন, এমন আর কাহাকেও শুনি নাই। লিউইসের লাইসিউম্ থিয়েটারের রঙ্গস্থলেও নহে। তবে সেখানে হ্যামলেটের স্বগত উক্তির To be or not to be প্রভৃতির যেরূপ বিকাশ দেখিয়াছিলাম, সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। বিনিসের রাজ সভায় ওথেলোর উক্তি Her father loved me, oft invited me প্রভৃতি পিতা অতি আশ্চর্য্যরূপ আবৃত্তি করিতেন। Father, loved, oft প্রভৃতি গালভরা কথা, কেন সেক্‌সপিয়র সংযোজনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আবৃত্তিতেই প্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কথোপকথনে রস-বিস্তারে পিতার মত দ্বিতীয় লোক আমি দেখি নাই। অনেকেই বলেন, তাঁহারাও দেখেন নাই। অজ্ঞ, বিজ্ঞ, হিন্দু, ব্রাহ্ম, যুবা বৃদ্ধ, লইয়া একটা ভরপুর মজলিসে তিনি একাই এক-শ হইয়া গল্পের ছটায়, হাসির ঘটা তুলিয়া দিগ্‌বিজয়ী রূপে বিরাজ করিতেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র বেশ কথোপকথন পটু ছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সময়, তাঁহার আপন কথাই পাঁচকাহন বলিয়া অনেকের মনে হইত এবং সেই জন্য অনেকে বিরক্তি প্রকাশও করিতেন। আর একজন মজলিসি মানুষ ছিলেন মুখর্জীস্ মেকাজিন্ ও রেইস এণ্ড রায়তের সম্পাদক-প্রসিদ্ধ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অনেক সময়েই তিনি অহিফেনে মসগুল-মগজ হইয়া থাকিতেন। কথা চিবাইয়া চিবাইয়া বাহির হইত। মুখুয্যে মহাশয়ের নায়কতার মজলিস্ যেন একটু একটু ফরাসডাঙ্গার আড্ডার মত মনে হইত। মদের মজলিসের বক্তাদের সঙ্গে তুলনাই করিব না। কেবল এই স্থলে পিতার বাক্

রচনায়, হাস্যরসোদ্দীপক রচনার একটু পরিচয় দিব। সেই লেখার ইতিহাস বুঝাইবার জন্য তাঁহার গুণ-পুত্রের গুণের পরিচয়ও একটু দিতে হইল।

সাধারণীতে "চেনাচুর" নাম দিয়া, পাঠককে বালক সাজাইয়া মুঠা মুঠা বিদ্রূপ বর্ষণ করিতাম। "সাধারণীর চেনাচুর" একটা উপমার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে,—সাধারণীর চেনাচুরের উল্লেখ থাকিত। "কিষণ দাস্ কি চেনা,—তের রূপেয়া, চার আনা—বড় লোক লেতেহে, বড় লোক খাতেহে" ইত্যাদি কথা তখন লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। চেনাচুর ছেলেরাই খায়; সাধারণীর চেনাচুর বুড়ারাও ফোক্‌লা দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন; এ দিকে কেশববাবুর সম্প্রদায়ের দুই চারি জন লেখক, বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়া বড়ই নাচাইতে আরম্ভ করিলেন। পিতা ধর্ম্মের বিকৃত ভাব লক্ষ্য করিয়া সাধারণীতে এক 'ধরমচাঁদকি চেনাচুর' লিখিলেন। ইহাতে শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম,—এই সকল ধর্ম্মের বিকৃত ভাবের উপর তীব্র কটাক্ষ আছে। এরূপ বিদ্রূপে কোন প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়ে কিছু মাত্র আঘাত লাগিবে না। এই বিশ্বাসে তখন পিতৃদেব উহা ছাপাইয়াছিলেন, এখনও আমি সেই বিশ্বাসেই সেই পদ্য পুনঃ প্রকাশিত করিলাম।

ধরম-চাঁদকি চেনাচুর।
মজামে ভোর পুর।
হর্‌তরেকে চেনা মেরা হর্ তরেসে তৈয়ারি।
দেখ্‌লে খা লে চুনি চুনি গুণ বিচারি॥
য্যায়সা লেজ্জৎ, ত্যায়সা গুণ, কিয়া কহোঁ তারিফ।
খানেসে দফা হোয়ে দুনিয়াকি তক্‌লিফ॥
গুঙ্গী হোগা গাইয়া, আওর বহরা পা গা কাণ।
লেংড়া যাগা কুঁদ কর্কে হোকে আগুয়ান।
দেল খুব খোস্ রহেগা, বুঢ্যা হোগা জোয়ান॥
অন্ধেকা আঁখো হোগা, বন্ধেকা সন্তান।
দৌড় দৌড়কে আও সব্ আও রে বাঙ্গালি।
পসন্দ কর্‌লে মেরা চীজ, মেইনে উতারা ডালী॥
পহেলা নম্বরমে দেখ তন্ত্রশাহী চেনা;
আগর চে হুয়া হ্যায় থোড়াসা পুরানা।
তৌভি হ্যায় খুব তাজা. আওর তেজী,
ভক্তিসে যো খাওয়ে এস্‌কো, শক্তি ওসপর রাজী।

পূরব সে লে আয়া হোঁ সেকে মন্ত্র ছিটা।
যন্ত্রমে বানায়া হুয়া, হুয়া বহুৎ মিঠা॥
শূদ্র ভদ্র বিপ্র বৈশ্ হোকে এক সাত,
খুব খুসি কর্‌লে ভাই! থাকে সারে রাত;
লেও মজা আনন্দমে হোকে মাতোয়ারা;
দুনিয়াকা দুখ ভোগ মৌকুফ হোগে তেরা॥

দোসরা নম্বরমে হ্যায় গোবাচাঁদকি চেনা,
রূপেয়া রূপেয়া সের আওর চার চার আনা;
প্রভুনে তৈয়ার কিয়া, কিয়া মোলাম দানা!
সবকে ওয়াস্তে মজুত হ্যায় নেহি কিসিকো মানা
নেহি এসমে ময়লা যোগ নেহি কুছ জঞ্জাল।
প্রেম রস্‌সে বনি হুই, বড়াহি রসাল।
যেত্না খাগা, হোগা আওর লালচ তুহার।
আখের লে কর্ কফ্‌নি টুক্রী ছোড়েগা সংসার।
নাচেগা দোবাহু মেলি, বাজায়গে মৃদং।
পঙ্গৎ কি সঙ্গৎ সাথ হোগা সাধু ঢং॥

তেস্‌রা রকম্‌কা হ্যায় আউল চাঁদকি চেনা।
ঘোষপাড়াকা বাজারমে ইস্কা লেনা দেনা।
আচ্ছা মসলা সাত হুয়া, সাফা তস্‌লামে ভাজা।
বড়ি মজাদার চীজ,—চেনা কর্ত্তাভজা॥
খানেসে খুসিমে হোগা মেজাজ্ ভোরপুর।
কিস্‌মৎ কি খুবিসে দুখ যাগা দূর।
বাড়েগা কর্দ্দানি, হোগা জাহের কেরামৎ।
দর্দী-দেল হোগা তেরা কেত্নী আওরৎ॥
ভজন্ ভোজন্ বট্না গানা হোগা এক সাত।
বড়ী আরাম্‌সে দিন যাগা সচ্চি মেরা বাত॥

চৌঠা নবেম্বরমে হ্যায় রায়জীকা চেনা,
আগর সব্ না লে সকো লেও থোড়া নমুনা।

সহর কল্‌কত্তামে হুয়াএক্কা পয়দা,
বহুৎ খোস্‌বদার চীজ বহুৎ এক্কা কয়দা।
এক দম আঁখো মুদকে লেও এক্কা রস।
ভুক্, পিয়াসা সব যাগা হপ্তা রোজ বস্।
সুরতভি আচ্ছি হোগী চেক্নেগা চেহারা,
নজর কা রৌসনীসে ভাগে গা আন্ধিয়ারা।
খরচ কা কম্‌তী হোগী রহোগে ফিটু ফাট্
সংসার কা সুখ পাগা, না পাগা ঝঞ্ঝাট।
আপনাকো পালো, আওর কর জরুকো পিয়ার।
দরকার নেহি আওর কিসিসে রাখনা সরোকার।

আখের মে দেখ ভাই সেন্‌জীকা চেনা,
তাকত নেহি হ্যায় মেরা, তারিফ এক্কা কহনা।
নয়া তৌরসে ভজা হুয়া, হ্যায় খুব টাট্‌কা।
সব্ চেনাসে মজাদার হ্যায়, নেহি এস্‌মে খট্‌কা।
পয়সা পয়সা এক এক মোড়কী কিম্মৎ।
খা দেখ, মেলেগা হর্ রকম্ কি লেজ্জৎ।
জবানকা জোর হোগা, হোগা মিঠা বুলি।
কেত্না আদমী লেগা তেরা দো পাঁওকি ধুলি।
আজব তরেকা কাম করেগা নাম হোয়া জাহের।
নেহি রহেগা ডর, নেহি সরম্‌কা খাতের।
মেজাজ ফলাও হোগা ফেরেগা আহোয়াল।
হর্ ওয়াক্ত দেখেগা হর্ তরেকা খেয়াল।

তু দেখেগা কেত্না সাধু, কেত্না অবতার।
নাচ রংমে তেরা সামনে করেগা বিহার।
মুসা নাচে, য়িসা নাচে, শ্যাক্য সিংকা সাত,
নাচে লুথর, পাকড় লেকে নানকজীকা হাত।
জনক নাচে, জন্থুয়া নাচে, নাচে গঙ্গাধর,
মক্কা ছোড়কে মোহিত হোকে নাচে পগম্বর।
জন নাচে, লুক নাচে, নাচে সেইন্ট পাল,

পিটর নাচে, কুঞ্জী বাজে, মেথু দেওয়ে তাল।
গৌর নাচে ধিয়া ধিয়া, গিয়ে আঁসু ধার,
চস্‌মা চোক্‌মে দেকে নাচে, সেন অবতার।

দেখো গে এইসি তরে খেয়াল তাজা তাজা,
কাহাঁ তেরা ভাং, আওর কাহাঁ তেরা গাঁজা॥

আমাদের পিতাপুত্রে মধ্যে সমবয়স্ক সহচরের মত বিশুদ্ধ রসাভাষেরও অভাব ছিল না। এক দিনের একটা গল্প বলি। তখন আমি বহরমপুরে ওকালতি করি। বঙ্কিমবাবুও বহরমপুরে থাকেন। পিতা বহরমপুর একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল পূজার সময় বাড়ীতে দেখা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিমবাবুতে আমাতে দীনবন্ধুবাবুর লীলাবতী নাটক কাটাকুটি করিয়াছিলাম। কিন্তু এই গল্পের একটু পূর্ব্বপীঠিকা আছে। সেটুকু আগে বলিতে হইতেছে। সেই সময়ে বহরমপুরে আমাদের সব জজ ছিলেন রাইট সাহেব নামক একজন শ্বেতকায় ফিরিঙ্গি। তিনি একরূপ কিস্তূতকিস্তবিমূতি রূপ পদার্থ ছিলেন। একটি মোকদ্দমার দাবি ডিক্রি দিলেন। উকীল আমলারা এজলাস হইতে চলিয়া গেল, বিশ মিনিট পরে তাঁহাদিগকে আবার ডাকাইলেন, পেস্‌কারকে বলিলেন "পার্ব্বতি পুরা হুকুম লিখা যয়।" উকীলদিগকে বলিলেন "আপনারা শুনুন" "পার্ব্বতি লিখ।" টেবিলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন "দাবি-ভার ডিক্রি।" এই গল্প পিতার সমক্ষে আমি টাট্‌কা টাট্‌কি করিয়াছি। সেদিন তখন আমাদের বাহিরের বৈঠক খানার মজলিসে লীলাবতী সংশোধনের সমালোচনা চলিতেছিল। দৃশ্য বরাহনগর, সেই স্থলের একজন স্ত্রীলোকের উক্তিতে দীনবন্ধুবাবু লিখিয়াছিলেন "গ্যাদারী"। আমি কাটিয়া করিয়াছিলাম "ঠ্যাকারী"। পিতা বলিলেন "গ্যাদারী, ঠ্যাকারী দুই হয়; তুমি গ্যাদারী কাটিয়া ঠ্যাকারী করিলে কেন?" আমি বলিলাম "আমাদের এতদঞ্চলে গ্যাদারী স্ত্রীলোক বলে না, ঠ্যাকারী বলিয়া থাকে।" পিতা বলিলেন, "তুমি আমার চেয়ে বেশী জানিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম "আপনি বহুকাল বিদেশে থাকেন, নদে জেলায় বহুকাল ছিলেন, সেখানে গ্যাদারীই বলে, সেই জন্যই আপনার এরূপ ভ্রম হইতেছে" (পাঠক লক্ষ্য করিবেন আমি পিতার সহিত কিরূপ সম-কক্ষভাবে তর্ক বিতর্ক করিতাম। পিতা বলিলেন "তবে ইহার মীমাংসা হয় কিরূপে? তোমার মা ত আমার সঙ্গে বিদেশে প্রায়ই যান না। তিনি যদি বলেন গ্যাদারী ঠ্যাকারী দুই হয়, তবে তুমি ত হারিবে?" আমি বলিলাম "অবশ্য হারিব।" (সহৃদয় পাঠক আবার লক্ষ্য করিবেন, আমাদের পিতা-

পুত্রের সাহিত্য বিবাদে, সালিসির ব্যবস্থা কিরূপ) বৈঠকখানায় একঘর ভদ্রলোক হাস্যবদনে উৎফুল্ল নয়নে উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমরা পিতাপুত্রে উঠিয়া অন্দরে মহাবিচারক মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোক অহঙ্কারী হইলে তাহাকে কি বলে?" আমার মাথা খাইতে, মা একেবারে বলিয়া ফেলিলেন "ঠ্যাকারীও বলে, গ্যাদারীও বলে।" আমরা হাসিতে হাসিতে বহির্বাটীতে আসিলাম। সকলে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল? কি হইল?" পিতা সটানে মজলিসের মাঝখানে গিয়া রাইট সাহেবের অনুকরণে মেজেতে এক প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করিয়া, বলিলেন "দাবি ভোর ডিক্রি। গৃহিণী বলিলেন ঠ্যাকারী গ্যাদারী দুই হয়।" হাস্যের তরঙ্গ উঠিল, হাসির ফোয়ারা ছুটিল। এখনও আমার হাসি আসে, হাসির সঙ্গে একটু কান্নাও পায়; পিতা নাই বলিয়া নয়, পিতা কাহারও চিরদিন থাকেন না। কিন্তু এরূপ রসামোদ বাঙ্গালা হইতে, যে লোপ পাইতে চলিল, সত্য সত্যই তাহাতে কান্না আসে।

সার বার্ণিস পীকক তখন হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্। তিনি বিজ্ঞ বিদ্বান, প্রবীণ, কিন্তু অনেকগুলি ফুলবেঞ্চের বিচারে তিনি একলা একদিকের মত দিলেন, আর অন্যদিকে অন্য সকল জজে জুটিয়া বিপরীত মত দিলেন। আমাদের সংসার ধর্ম্মের গৃহস্থালির কথায়, তখন আমরা পাঁচ জন জজ ছিলাম। আমি, আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিধবা পিসতুত দিদি, মাতাঠাকুরাণী ও পিতৃদেব। এমন সময়ে সময়ে হইত যে তত্ত্বতাবাস প্রভৃতি আহার ব্যবহারাদি, কোন গৃহস্থালি কথায় মাতা ভগিনী আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী, আমরা চারিজনে একমত হইলাম, কিন্তু পিতা আমাদের মতে মত দিলেন না। আমাদের বুদ্ধি-সাধ্য-মত তাঁহাকে বুঝাইলেও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না, ক্ষুব্ধ হইতেন না, ক্ষুণ্ণ হইতেন না; হাসিতে হাসিতে বলিতেন "আমরা বাঙ্গলার বিচারক সার বার্ণিস্‌পীককের জাতি; তাহার অনুকরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমি এ বাড়ীর চীফজাষ্টিস্, তোমাদের সকলের হইতে আমার মত বিভেদ হওয়াই ঠিক, আর তোমাদের মতানুসারে কার্য্য হওয়াও ঠিক! তোমরা এককাট্টা এবং অধিকাংশও বটে।" কাজেই পিতা কর্ত্তা হইয়া, অকর্ত্তা হইয়া থাকিতেন, আমরা কোন কোন স্থলে কর্ত্তৃত্য করিতাম।

পিতা যখন রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া বসিলেন, তখন সাধারণী চৌ-চাপটে চলিতেছিল। তখন গ্রাহকের সংখ্যা লইয়া কাগজের সম্মান হইত না।—কোন খবরের কাগজের খবর যদি গবর্ণমেণ্ট রাখিতেন, অভাব অভিযোগ প্রকাশিত হইলে, যদি সেই অভাব পূরণ করিতেন, অভিযোগে কর্ণপাত করিতেন, বা কখন কোন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যগ্রতা দেখাইতেন,—তাহা হইলে, সেই

সংবাদ পত্রের সম্মান হইত। অর্থাৎ রাজার আদরে সর্ব্বসাধারণের কাছে সম্মান পাওয়া যাইত। আর তখন সাহিত্যের একরূপ সমাদর ছিল ; এখন তাহা দেখিতে পাই না। সেদিন বঙ্গ-দর্শনে যে "বঙ্গ-মঙ্গল" প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ শ্লেষ-ব্যঙ্গ-পূর্ণ কবিতা বা পঞ্চানন্দি কবিতা, সেই সময়ে যদি সাধারণীতে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গে একটা টিটি পড়িয়া যাইত। এখনত সেরূপ কিছু হইল না। বঙ্গ-মঙ্গলের কেহ খবরই লইল না। বিদ্রূপাত্মকে পদ্যের দশা এইরূপ ; গভীর, গম্ভীর ভাবপূর্ণ গদ্যের কেহ সংবাদই রাখেন না। ১০।১৫ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে, এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। কেন হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনা এখানে করিব না। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না ফুটোন্মুখ বঙ্গসাহিত্যের যথা সম্ভব সম্মান ছিল। সরস রচনার সমাদর ছিল। সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাঁহাই ! সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই। সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আব্দার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট ছোট আব্দারে কর্ণপাত করিতেন ; বড় আব্দার করিলে এখন মুখ বাঁকান, ভৎসনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণপাত করিতেন বলিয়া, সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্য-সেবা-পরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালি বাবু সক্ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য,—সাধারণীর জন্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্গদর্শন, আর দেড় বৎসর পরে ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক সাধারণী প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে রাজনীতির সহিত সাহিত্যের সেবা, কি আর কোন সংবাদ পত্রে হইত না ? হইত বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিতেন, লাট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া পদ্য। কিন্তু সাধারণী প্রকাশের সময় সেরূপ কিছু ছিল না ! ছিল মহামহিমান্বিত সোম প্রকাশ। তাহাতে থাকিত—(বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রেতাত্মা ক্ষমা করিবেন।) তাহাতে থাকিত—"যদি রাজস্ব সচিবের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দেশীয় জনগণের উপচীয়মান গুণাবলী অপচিত হইতে থাকে"—এই সাহিত্য রচনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বর্গের আদরের সামগ্রী হইলেও, ইংরাজী কৃতবিদ্যগণ ইহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, সাধারণ জনগণ উহার ত্রিসীমাতেই অগ্রসর হইতে পারিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বর গুপ্তের পদ, 'আলালের ঘরের দুলাল,' 'হুতোম পেঁচার নক্সা' প্রভৃতি অতি শিশুকালে পাঠ করিয়া, শিখিয়াছিলাম যে সহজ বাঙ্গালা উপেক্ষার পদার্থ নহে। আর সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালায় যে, অধিকতর গাম্ভীর্য্য হয় তাহাও ভুলি নাই। অতি

শিশুকাল হইতেই তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতাম স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই সুবোধিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সুবোধিনীতে গদ্যে পদ্যে রীতিমত সাহিত্যের সেবা থাকিত। সেই সুবোধিনীর আকার প্রকার লইয়াই সাধারণী প্রকাশিত হয়। পিতা চুঁচুড়ায় যখন আসেন, তখন সাধারণী চৌ-চাপটে চলিতেছিল। আমাদের বাড়ীতে ঢুকিতে দরজার বামদিকের ঘরে, সাধারণী অফিস্ ঘর। আর দক্ষিণদিকের ঘরে সঙ্গীতের আড্ডা। হারমোনিওম্ বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রোত্থিত স্বর সহ সঙ্গীত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যোল ঘণ্টা চলিতেছে। পিতা আমাদের আফিস ঘরেই প্রায় বসিতেন; কচিৎ কখন সঙ্গীত সমাজেও যাইতেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমাদের বাহির বাড়ীর সঙ্গীতে, সাহিত্যে, সম্বাদ পত্রে, গানে গল্পে, সমস্ত দিনই ভোরপুর। পিতা অবসর গ্রহণ করিয়া আসিলে কৃষ্ণ যাত্রার মাঝখানে মধ্য রাত্রিতে গোবিন্দ অধিকারী আসিলে, যেরূপ হইত —সেইরূপ হইলে পালা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, গান জমাট হইল।

এ সৌভাগ্য কিন্তু অধিক দিন আমার সহিল না। জ্বরে জ্বরে বিষম জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম। কিশোর কাল হইতেই, এনট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতেই, ৬৯ সালের কার্ত্তিক মাস হইতেই, এই বিষম ম্যালেরিয়া আমাকে আশ্রয় লইয়াছে। যৌবনের মধ্যে একবার মাত্র ৫ বৎসর কাল ইহার দেখা পাই নাই। সেই কালটি সাধারণীর প্রথম ৫ বৎসর। তাহার পর আবার ভোগানি আরম্ভ হইয়াছে; এখন সাধারণীর দশ বৎসর হইয়াছে। জ্বরের জ্বালায় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। কম্পোজিটর, প্রেসম্যান, পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি সকলেই জ্বরে পড়িয়া কাগজ ত আর সময়ে বাহির হয় না। এক সপ্তাহ নহে, দুই সপ্তাহ নহে; আশ্বিন, কার্ত্তিক ক্রমাগতই এইরূপ হয়, পরের পয়সা ঘরে লইয়া, এরূপ করিলে চলিবে কেন? কাজেই আমাকে তোড়-জোড় সমস্ত লইয়া কলিকাতায় যাইতে হইল। দেখ বিড়ম্বনা! এত কাল চুঁচুড়ায় রহিলাম, আর পিতা যেই দেশে আসিলেন, কোথায় তাঁহার চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চাতক-প্রাণ শীতল করিব, সাক্ষাতে তাঁহার সেবা করিয়া, তদীয় সমক্ষে তদীয় আরাধ্য বঙ্গভাষার সেবাপূজা করিয়া,—আপনাকে চরিতার্থ করিব, না কিসের কর্ত্তব্য জ্ঞানে, আমাকে এমন দিনে কলিকাতায় যাইতে হইল। হায় রে! কর্ত্তব্যজ্ঞান! তোমার ছায়া লইয়াই রহিলাম, কিন্তু কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কর্ত্তব্য কি তাহাই বুঝি না, তবে কর্ত্তব্য সম্পাদন কিরূপে হইবে!

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠে সাধারণী কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া গেলাম। তৎপূর্ব্বেই কলিকাতায় একটা বাসা লইয়া আমাকে বসিতে লইয়াছিল। তখন যুবার্টের প্রদর্শনীর বড় জাঁক। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া অগ্নিমূল্য হইয়াছে। আমাকে খিতাইয়া

জিরাইয়া, খুঁজিয়া পাতিয়া, বাড়ী দেখিতে হইতে ছিল। বামুনের গোরুর মতন ভাল পল্লীতে ভাল বাড়ী হইবে, অথচ ভাড়াটা অগ্নিমূল্য না হয়।

সেই সময়ে কলিকাতায় কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট-রূপে বঙ্কিমবাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে বর্দ্ধমান বিজয় করিয়া, কলিকাতায় শিবির স্থাপন কতিছেন। বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সঙ্গত হয়। থাকেন চন্দ্রনাথ বসু দাদা মহাশয়, এখন পরলোকগত তখন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সরকারী অনুবাদক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুরের দুই মহাত্মা,—কবিবর হেমচন্দ্র এবং কোমৎ শিষ্য যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ,—বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, কেশববাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন, পরে কটক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসতের ডেপুটি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বর্দ্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি। বঙ্কিমবাবুত অবশ্যই থাকিতেন। কলিকাতায় বাসা করার পর প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ত বটেই, অন্য অন্য সময়েও সেইখানে যাইতাম। চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্য সেবার সভায় ধর্ম্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবর্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে, তিনি বিজ্ঞানের দোহাই, জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্তই উল্টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্ম্মই সকলের আশ্রয়, ধর্ম্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। নবজীবনের সূচনাতেই লিখিলাম "যে বিশাল মহান স্তর সমাজ তত্ত্বাদির আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত, অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং ক্ষয় সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া, —সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু—তাহা না বুঝিয়া, সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে না হউক, কিন্তু অংশত সকল তত্ত্বের সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,—কোন তথ্যের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালী দেখিতে দেখিতে অন্তর স্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন যে, সেই মূলীভূত সারস্তম্ভের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ না স্থিতিবাদ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান আশ্রয়-স্তরের নাম—ধর্ম্ম।"

নব-জীবন প্রকাশিত হইয়া। বঙ্গের মহামহারথীগণ প্রায় সকলেই লিখিতে লাগিলেন। আমি সম্পাদক, কাজেই আমার জাঁক পসার খুবই হইল। পিতা

অবশ্য চুঁচুড়াতেই রহিলেন। পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদে আমি কিন্তু মর্ম্মে পীড়িত। কি আনন্দেই পিতাকে ঢাকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম, আর কি নিরানন্দে তাঁহাকে চুঁচুড়ায় রাখিয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় জরের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছিলাম ; নিয়মিতরূপে সাধারণী প্রকাশ করিতে কোন মতেই পারিতাম না ; ভূয়ো কর্ত্তব্যের দায়ে সাধারণী উঠাইয়া, কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় বসিয়া বঙ্কিম-সঙ্গতে হাওয়ার সুর বুঝিয়া নবজীবন প্রকাশিত করিলাম। সাধু সন্দর্শন, সুহৃৎ-সঙ্গম যথেষ্ট হইত ; কিন্তু পিতার সহিত বিচ্ছেদে আমি মর্ম্মাহত থাকিতাম ; মধ্যে মধ্যে পত্নীকে ও পুত্রকন্যাকে কলিকাতায় আনিতে হইত ; দুই একটি সন্তান তাঁহারই কাছে চুঁচুড়ায় রাখিতাম ; আপনি কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া মাঝে মাঝে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতাম ; তিনি মাসের মধ্যে দুই একদিন আসিয়া আমাদিগকে দেখা দিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহাতে আমার মনের সাধ মিটিত না। জগৎ এক দিকে, আর বাবা আর এক দিকে থাকিলে, আমার মনের তুল-দাঁড়াতে বাবার দিকেই ঝোঁক ছিল।

পিতা কিন্তু মহা আনন্দিত, আমার গৌরবে মহাসুখী। থাকি না কেন আমি পৃথক—থাকি না কেন দূরে—আমার গৌরব বাড়িয়াছে তাহাতেই তিনি মহা আনন্দিত। নবজীবনের প্রথম মাসে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তাঁহার রচিত চারি ছত্রের গানটি (ভোর হইল, জাগত জাগিল ইত্যাদি) আমি মহা ধৃষ্টতা করিয়া বিশ ছত্র করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলাম—তাহাতেও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে, তাহা হইতে পৃথক হইয়া, আমিও মনে ধিক্কার দিতেছিলাম। কাজেই ভাল মন্দ কোন কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না। তাঁহার সঙ্গে সমান ভাবে কত তর্ক করিতাম, কিন্তু কেমন তিনি রাশভারি লোক ছিলেন,—যতই তাঁহাকে ভালবাসি ও ভক্তি করি, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় তাঁহাকে যাবজ্জীবন সমানে। তিনি এখন অন্তধামে তবু এখনও তাঁহাকে পূর্ব্বমতই ভয় করি।

নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। তাহাতে ছিল আমার লিখিত 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম'। পাঠ করিয়া পিতার মনে আনন্দ আর ধরে না। যাহাকে পান, তাহাকেই ধরিয়া নবজীবন পড়িতে বলেন। কলিকাতায় আসিলেন, কলিকাতায়ও আনন্দ ছড়াইয়া গেলেন। ৺পূজার সময় উলার কৃষ্ণবেহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তিনি পেন্সন-প্রাপ্ত মুন্সেফ, সরল বৈষ্ণব, পিতার পরমবন্ধু। সমস্ত প্রবন্ধটি পিতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি আমাকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাদের আনন্দে পিতৃ-বিচ্ছেদের ভারটা আমার মন হইতে খানিক কমিয়া গেল।

ক্রমে সহিয়াও গেল। পিতাও আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। মাসে একবার কলিকাতায় আসিতেন। আমিও মাসে দুইবার বাড়ী যাইতাম। আরও সহিয়া গেল,—কলিকাতায় পিতার লীলা খেলা দেখিয়া। সাবিত্রী লাইব্রেরিতে আমি বক্তা—তিনি পাঁচজনের মধ্যে আমার একজন রক্ষা-কর্ত্তা। চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা হইবে, মির্জাপুরে কালিদাস সিংহের গলিতে। অঘোরনাথ কুমারকে সঙ্গে লইয়া পিতাপুত্রে পিছনদিকে আড়ালে চুপি চুপি রহিয়াছি। ও রিয়েণ্টাল সেমিনারির বাটীতে চন্দ্রনাথ দাদা মহাশয় হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিলেন, বাল্য বিবাহের কথা উঠিল ; পিতা তাঁহার বাল্য বিবাহের ফল বলিয়া অধমকে দেখাইয়া দিলেন ; আমার একটি পুত্র এককীলে একটি বাক্স ভাঙ্গিয়াছিল, সে কথাও বলিলেন,—মহাহাস্য কৌতুক হইল। শোভাবাজারে, অক্ষয়কুমারের স্মরণ সভায় পিতৃদেব সভাপতিত্ব করিলেন। পঞ্চাশী পরব—জুবিলির সময়, দলেবলে চুঁচুড়া হইতে আসিলেন, সকলে মিলিয়া আলিপুরে গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ষ্টোর আফিসে বসিয়া বাজী পোড়ান দেখিলাম। নবজীবনের প্রথম বৎসরেই আমরা রীপণকে লইয়া কত বাড়াবাড়ি করিয়াছিলাম। পিতা প্রথম দিন অপরাহ্নে যে রূপ সিয়ালদহ ষ্টেশনে রীপণ অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, শেষের দিন সেই রূপ সাতপুকুরিয়ার বাগানে গভীর নিশীথ পর্য্যন্ত উৎসবে উৎফুল্ল! কলিকাতায় কংগ্রেসের কন্‌ফরেনস বসিয়াছে। আমিও সকল ভালবাসি না, যাই না। প্রথম দিন আমাদের আহারের পর পিতা বলিলেন 'অক্ষয় যাবে না হে ?' আমি বলিলাম 'বলেন ত যাই।' উত্তর 'তবে এসো'। আমি অমনই তাঁহার সঙ্গে সেইখানে গেলাম। সেখানে, পোলিস কিরূপ অনর্থক হুমকি দেখাইয়া আমার একটি পুত্র ও তাহার সমবয়সীদের ক্লাব ভাঙ্গাইয়া দেয়, সে গল্প বলিলেন। সকলেই বিস্মিত হইল। পিতার পরিপক্ক বয়সের এই সকল অপূর্ব্ব লীলাখেলায় আমি মহা আনন্দিত থাকিতাম। তাঁহার স্ফূর্ত্তিতে, আমার স্ফূর্ত্তি হইত। পিতার যৌবনের বন্ধু ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ রামতনু লাহিড়ী মহাশয় : তাঁহার মত সরল লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। পিতা তাঁহাকে শ্যামাচরণ (বিশ্বাস) দে মহাশয়দের বাড়ীতে লইয়া গিয়া কত কৌতুক রহস্যই না করিতেন। আমি সঙ্গে থাকিতে পারিতাম না, রিপোর্ট পাইতাম ; শুনিয়াই আমার না কত আনন্দ হইত!

বাড়ীতে, চুঁচুড়ায় যখন থাকিতেন, অধিকাংশ কাল বাড়ীতেই থাকিতেন ; তখন আমার ছেলে মেয়েদের, ও আরও দুই একটি ছেলে মেয়ে লইয়া, এক রসের পাঠশালা বসাইয়া, সকাল, সন্ধ্যাবেলা, সেই পাঠশালার গুরু-গিরি করিতেন। তাহারা সমস্ত দিনই হাসিতেছে, আর প্রতি দশ মিনিটে কিছু না কিছু শিখিতেছে। বৈঠকখানার বড় দেওয়ালে একখানা ভারতের মানচিত্র খোলা টাঙ্গান আছে। আমার তিন

বৎসরের শিশু পুত্রটি 'লঙ্কা' দেখাইয়া, নাম ভুলিয়া গিয়া বলিতেছে 'ঝাল'। তাহা অপেক্ষা যাহারা বড়, তাহারা আরেবিয়ান নাইটের বা সেক্সপীয়রের গল্প, ঠাকুরদাদার মুখে শুনিতেছে; কখন বিস্ময়ে স্তব্ধ, কভু করুণায় বর্ষণোন্মুখ, কখন বা আহ্লাদে হাসিয়া উঠিতেছে। আমি শিখিয়াছিলাম—অনুকরণে। ইহারা শিখিতেছিল—হাসিতে খুসিতে। একজন বৃদ্ধ দুইটি নাতিকে কাঁধে লইয়া, একটিকে পীঠে লইয়া যাইতেছিল। দেখিয়া, একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি?" বৃদ্ধ উত্তর করিল,—"ভাই, বুঝ না—আসলের চেয়ে সুদের মায়া বেশী।" পিতা আমার সমক্ষে এই গল্পটি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"ঠিক বলেছে।"

পিতা, নবজীবনে "দুর্গোৎসব" দুইটি "আগমনী" একটি পদ্য,—সাধারণীতেও শরৎ বর্ণনার দুই একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন। "ব্রিটনিয়া সমীপে ইণ্ডিয়া" নামে একটি পদ্য খণ্ডশ নবজীবনে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা শেষ হয় নাই।—সেই দারুণ কথা এইবার অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে।

সেই কথা একদিন দেওঘরে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অতি নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছিলাম। বলিতেছিলাম, "কেবল দুইটি বিষয় ছাড়া, পিতার আর কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভয় ছিল না। অন্ধকার, ভূত, সাপ, বাঘ, ইংরেজ, চোর, ডাকাত"—এইটুকু মাত্র আমার যাই বলা হইয়াছে, রাজনারায়ণবাবু শুইয়াছিলেন, অমনই ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, বলিতেছেন—"বাহবা! beautiul! beautiul!—সাপ, বাঘ, ইংরেজ, চোর, ডাকা,—beautiful!" আমি প্রথমে তাঁহার এত প্রশংসাবাদের মর্ম্ম-স্পর্শ করিতে পারি নাই—পরে বুঝিলাম, রাজনারায়ণবাবু মহা রাজনৈতিক, ঐ যে ইংরাজকে সাপ, বাঘ, চোর, ডাকাতের মাঝে ফেলিয়া এক তালিকা (category) মধ্যে পুরিয়াছি,—তাহাতেই তাঁহার মহা আনন্দ হইয়াছে।

বাস্তবিক দুইটি বিষয় ছাড়া আর কিছুতেই পিতার মনে ভয়ের কিছু মাত্র উদ্রেক হইত না। আমরা উলায় ভূতের বাড়ী, অথচ বেশ দোতালা দক্ষিণ-খোলা সস্তা পাইয়া, ভাড়া করিয়াছিলাম। গৃহস্বামীর অতি বৃদ্ধা মাতাকে সেই বাড়ীতে ভূতে মারিয়াছিল; কিন্তু রাত্রিকালে একটু আধটু শব্দ করা ছাড়া, ভূত আমাদের কখন কিছু বলে নাই। সে বাড়ী সাপের সঙ্গে আমাদের ভাগ বাটরায় ছিল। নীচের তিনটা ঘর আমরা কদ্রুপুত্রদের ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; তাহারা কিন্তু নিদাঘ পূর্ণিমার রাত্রিতে আমার ছোট ফুল বাগানটিতে (trespass) অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক আমার কেলো-ভুলো কুকুর দুটার সঙ্গে-রঙ্গরস করিত।

বাঘ,—বাঘ একটা ভয়ের কারণ বটে। পিতা কিন্তু বাঘকেও ভয় করিতেন না। পিতা দেওয়ানি কর্ম্মচারী ছিলেন। মুন্সেফীতে প্রথমে বেতন ছিল মাসে ১০০৲ টাকা।

যে রাজনৈতিক ভ্রমে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটু অপদস্থ করিয়া পানিঘাটায় পাঠান, সেই ভ্রম দূর হইলে ১০০্ টাকার কর্ম্মচারীকে ২০০্ টাকা দিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ সেই সময়ে সুন্দর বনের বন্দোবস্তের কার্য্যে বড় বিশৃঙ্খলা হইতেছিল ; গবর্ণমেণ্ট পিতাকে দেওয়ানি শ্রেণীতে রাখিয়া, ডেপুটি কালেক্টরি দেন। তালিকায় দেখিবেন ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬২ হইতে ৩রা জুন, ১৮৬৩ পর্য্যন্ত এক বৎসর তিন মাস আট দিন, সুন্দর বনের বন্দোবস্তের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। কাজ অত্যন্ত জরুরি, কাজেই পিতাকে অনেক রাত্রি নিবিড় বনমধ্যেই পাল্‌কিতে বাস করিতে হইত। এইখানেই বঙ্কিমবাবুর বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্যগণ নিতান্ত রাজভক্ত প্রজার মত, দস্তর মোতাবেক সরকারি ডেপুটি কালেক্টরের সঙ্গে গভীর নিশীথে মুলাকাত করিতে আসিতেন। শিবিকার দ্বার বন্ধ দেখিয়া হাকিম সরকারের ফুরসুৎ নেহি বুঝিয়া পঞ্জার চিহ্ন ভিজা ভূমিতে রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। বাবা এই গল্প করিতে করিতে বলিতেন,—"যদি পাল্‌কীর বাড় টানিয়া একবার উকী মারিয়া বলিত, 'হাকীম হালুম !' তাহা হইলেই মুস্কিল হইত আর কি ?" অর্থাৎ তিনি মুস্কিল মানিতেন না ! জানিতেন "যাহা মুস্কীল, তাঁহা আসান।"

দুইটা পদার্থে বাবার ভয় ছিল। বজ্রপাতে ও ওলাউঠায়। বজ্রপাতে ভয় বৈজ্ঞানিক, Scientific, বজ্রে ভয় নয় ভয় Electricity-তে। একটু মেঘ ডাকিল ত অমনই চাকরদিগকে বলিলেন,—"ওরে ঘটী গাডু সব ঘরে রাখ।" জানালায় একটিও লোহার গরাদে দেন নাই। আমি উকীল হইয়া আমার নূতন শয়ন কক্ষে লোহার গরাদে দিয়াছিলাম। ৺পূজার সময় বাড়ী আসিয়া, ঐ সকল দেখিয়াই পিতা আমাকে মহা ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"তোমাদের মত নাস্তিক আর কখন জগতে হয় নাই ; যারা বিজ্ঞান মানে না, তাহাদের মত নাস্তিক আর কোথাও আছে না কি ?" আমি বলিলাম, হুগলি কলেজের সামনের তেতলা বাটীতে বড় লোহার শীখ আছে, তাহার বিপরীত দিকের খিলানে বজ্র পড়াতে বাড়ীটা নষ্ট হইয়াছে। আরও লোহার রেল গরাদে চারিদিকে ছিল, কোথাও পড়ে নাই বা বাধা পায় নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।" পিতার রাগ তখনই পড়িল, ভয় কিন্তু তেমনই রহিল।

ওলাউঠায়ও তাঁহার অত্যন্ত ভয় ছিল। এবার Scientific নয়, Nervous প্রাণের ভিতরের ভয়। পিতার মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে ওলাউঠার দেবতার গল্প হইতেছিল। একজন বহু সাধনায় বর পাইল যে, দেবতারা ছদ্মবেশে মর্ত্ত্যে আসিলে, সে চিনিতে পারিবে। একদিন রাত্রিকালে, সে দেখিল যে ওলাউঠার দেবতা তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন। সে মহা অনুনয় বিনয়ে, তাঁহাকে বলিল,

আমাদের গ্রামে আসিবেন না। তিনি বলিলেন—'তিন জনের নিয়তি আছে; আমাকে অবশ্য গ্রামে যাইতে হইবে।' সেই তিন জনকে লইয়া, আমি সাত দিন পরে এই সময়ে চলিয়া যাইব। সে ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিল। সাতদিনে কিন্তু গ্রাম উজাড় হইল; চারিদিকে হাহাকার; শবের সৎকার হয় না। সাত দিন পরে যখন দেবতা গ্রাম হইতে যাইতেছেন, তখন সেই ব্যক্তি ধরিয়া বলিল, দেবতারাও মিথ্যা কথা কহেন? দেবতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের ভিতরে গেলেন। একজনকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি ঐ ব্যক্তি কে? সে বলিল উনি দেখিতেছি ভয়ের দেবতা" "উনিই তোমাদের গ্রাম নষ্ট করিয়াছেন।" পিতা গল্প শুনিয়া বলিলেন বালককালে এই গল্পটি শুনিলে ভাল হইত।"

১২৯৫ সালের দুর্গোৎসব আসিল। ঐ সালের আশ্বিনের নবজীবনের প্রথম প্রবন্ধ পিতার রচিত 'দুর্গোৎসব' পদ্য। দুর্গোৎসবের সময়ে পিতার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিত। চিরদিন বিদেশে থাকিতেন, এই সময়ে মাত্র বাড়ী আসিতেন। স্বয়ং পৌরাণিক ধর্মের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কাজেই আনন্দে প্রাণ নৃত্য করিত। আমাদের বাড়ীতে ৺পূজায় সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য হইত। ঠাকুর গঠনে, চিত্রে, সাজ সজ্জায় দেশীয় শিল্প উৎসাহ পাইত। ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ, ভদ্র, দরিদ্র ভোজনে আমরা যশ পাইতাম, আশীর্ব্বাদ পাইতাম। ভাল যাত্রা গান কীর্ত্তনে, উৎসব উছলিয়া উঠিত। কাজেই পূজার সময় আমাদের আনন্দের দিন। পিতা 'দুর্গোৎসব' পদ্যে এই আনন্দ বর্ণন করিতেছেন;—

* * * *

তমোঘন ঘোর নিশা যেন পোহাইল!
সৌভাগ্য আকাশে রবি গৌরবে উদিল।
অতি অপরূপ শোভা,
জগজন মনোলোভা;
সাজিল অখিল কিবা কনক কিরণে।
ভারত জাগিল যেন নবীন জীবনে॥

* * * *

দাসত্ব দুর্গতি কারো মনে নাহি আর।
হাস্য লাস্যে শোভিতেছে শ্রীমুখ সবার॥
কিবা ধনী কিবা দীন,
গৃহী কিবা উদাসীন,

বাল বৃদ্ধ নর নারী সবে পুলকিত,
বিশ্ব-ব্যাপী মহোৎসবে সকলে মিলিত।

* * * *

অর্থ-দান বস্ত্র-দান করে কতজন।
কত জন করে কত ভক্ষ্য বিতরণ॥
যেমন বিবিধ দান,
সেই রূপ নৃত্য গান,
তুষিতেছে মোহিতেছে মানস সবার।
মহাদিন মহোৎসব আনন্দ অপার॥

* * * *

এস এস বঙ্গবাসী মিলিয়া সকলে,
জগত জননী পূজি, পূজ কুতুহলে।
দাঁড়ায়ে মায়ের পাশে,
গললগ্নী কৃত বাসে,
পুষ্পাঞ্জলি পাদপদ্মে, দেহ অবিলম্বে,
উচ্চৈস্বরে বল 'জয় জয় জগদম্বে'॥

আমাদের বৈষ্ণবী পূজা, বলিদান হয় না; আখ কুমড়াও নয়। কিন্তু প্রতিদিন পূজার পর—আমরা ঢাকের বাদ্য থামাইয়া—"জয় জগদম্বে, জয় জগদম্বে, জগদম্বে—মা আ" বলিয়া সকলে শতকণ্ঠে মহাধ্বনি করিয়া উঠিতাম। আমরা থামিলেই, ঢাকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিত; ছেলেরা সকলে নৃত্য করিত; আমার কোন একটি ছেলেকে কোলে করিয়া পিতাও কখন কখন নৃত্য করিতেন; পায়ের নৃত্য নহে,—ছেলে নাচাইতে নাচাইতে, বুকের নৃত্য, বাহুর নৃত্য;—পা ছাড়া আর সর্ব্বশরীরের নৃত্য।

পঁচানব্বই সালের পূজার মহোৎসবহ—নাচা কুঁদা আমাদের, হইয়া গেল। আমি কলিকাতায় গেলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ আছি। ইংরাজিতে কয় পংক্তি লেখা পিতার একখানি কার্ড পাইলাম। "৺শ্যামাপূজার সময় তুমি বাড়ী আসিবে, এখানে বড় ওলাউঠা হইতেছে।" তাঁহার হৃদয়ে ওলাউঠার ভাব-গতি জানিতাম। আমি বাড়ী আসিলাম। আসিয়া দেখি পিতার মুখ আধখানা হইয়াছে। আমাদের কদমতলা পল্লী ও কৈকশিয়ালী ওলাউঠায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশিনী একটি দুঃখিনী মুমূর্ষ অবস্থায়। সেবা পায় নাই, চিকিৎসা হয় নাই। নিজে তাহার ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া দিয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সেই দিনই বুড়া

গেল, সে রক্ষা পাইল। পিতা এই সংবাদে মহা উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার আনন্দে, আমরাও আনন্দ হইল।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন চিরকালই পায়স হয়। সেবারও হইল। মধ্যাহ্নে আহার একটু গুরুতর হইল। অপরাহ্নে পিতার মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর। বড় রায় লিখিবার সময় পূর্ব্বে যেরূপ গম্ভীর হইত, সেইরূপ গম্ভীর। সন্ধ্যার পর বলিলেন, আজি রাত্রিতে আমি কিছু খাইব না।" কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—"পেট কেমন ঘুট্ ঘুট্ করিতেছে।" রাত্রিতে শয়ন করিলেন। তাঁহার ঘরের দ্বারে আসিয়া কাণ পাতিয়া শুনিলাম, পিতার যেমন নাক ডাকিত, সেইরূপ ডাকিতেছে—তিনি সচ্ছন্দে ঘুমাইতেছেন। রাত্রিতে দুই তিনবার এইরূপ শুনিলাম—বুঝিলাম সচ্ছন্দে সুপ্তি। ভোরে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। উঠিয়া শুনিলাম পিতা পীড়িত—মল অপাক,—তবে বেশী হয় নাই; প্রস্রাব হইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ আসিলেন। ৯।১০ টার সময় একবার বমি হইল। বলিলেন "রোগের নাম করণ খুব সঙ্গত—ওলাউঠা—এতক্ষণ ওলা ছিল, এইবার উঠা হইল।" নানা ঔষধ চলিল; সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে বুঝিলাম, ঔষধ বৃথা হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে কোম্পানির কাগজগুলি পিতা আমার নামে সই করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ডাক্তার বাবু বলেন "সেকি মহাশয়! ও সকল কথা ভাবেন কেন?" বলিয়া নিষেধ করেন। সেটা মঙ্গলবার। সেই রাত্রিতে আমাদের কদমতলার ত্রিপথে সকলে মিলিয়া ৺রক্ষাকালীপূজা করিয়াছিলেন। তাহার পুরোহিত আসিয়া—অর্দ্ধরাত্রিতে পিতাকে দেবীর চরণামৃত সেবন করাইয়া গেলেন। কালরাত্রি কিন্তু কাটিল না। ১২৯৫ সাল ২২শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর, তখন চতুর্থী পড়িয়াছে—পিতা নিজ যোগ্য ধামে গমন করিলেন!

পিতার কথা লিখিবার জন্য এই প্রবন্ধ; পিতার জীবন শেষ হইল তবু কিন্তু আমি গোটা দুই চারি কথা আরও বলিব; পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে সকল ঘাটের পার্শ্বেই শব-দাহ হইত। মিউনিসিপালিটি সে প্রথা বন্ধ করিয়াছে।—নির্দ্দিষ্ট শবদাহের ঘাট স্থির করিয়া দিয়াছে। কৈঁকশিয়ালির বটতলার ঘাটের পার্শ্বে পিতার পিতা-মাতা সহমরণ লাভ করেন। পিতার ঠাকুর দাদারও সেই ঘাটে দাহন হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল, সেই ঘাটেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি হয়। আমাকে একথা বলেন নাই। আমি কাণা ঘুষায় কথাটা জানিতাম। মিউনিসিপাল কমিসনর মহোদয়েরা উপস্থিত থাকিয়া সেই ঘাটেই শবদাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রচণ্ড পোলিসও দেখিল—কিন্তু ভ্রূকুটি করিল না।

সময়ে সময়ে পুত্রের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য পিতাকে করিতে হয়। এই কথা লইয়া

ভাবিতাম 'আমাদের শাস্ত্র কি কঠিন, কি কঠোর, কি নৃশংস!' আজি পিতাকে স্নান করাইয়া নব যুগ্ম বস্ত্র পরাইয়া, কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র দিয়া চিতায় উঠান হইয়াছে, আমি দক্ষিণ হস্তে বট জটা ধরিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া সেই নৃশংস শাস্ত্রের কথা ভাবিতেছি; মনে করিতেছি, আজি আমার যদি এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য না থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ভূশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। উঠিতেও পারিতাম না, কেহ উঠাইতেও পারিত না। আজি শাস্ত্রই ত আমাকে উঠাইয়াছে, দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে, কর্ত্তব্যে ব্যস্ত করিতেছে; তবে শাস্ত্র নৃশংস কেন? শাস্ত্র মানিলে,—শাস্ত্র মহদুপকারী।

সমস্ত ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য হইয়া গেল। বাড়ী আসিলাম। মাতা সালঙ্কারা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ তাঁহার কাছে যাইতে পারে নাই। তাঁহার অলঙ্কারগুলি স্বহস্তে খুলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে'? উত্তর "বাবাকে দাহ করিয়া আসিলাম, আমার গলায় এই কাচা।" তাহার পর, তাঁহাকে স্নান করাইলাম, যথা যোগ্য বস্ত্র পরাইলাম; কিন্তু ক্রমেই আমার চক্ষে সমস্ত কুঝটিকাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কুয়াসা অথচ ফাকা কুয়াসা—সমস্তই যেন ফাকা আছে অথচ নাই। আমার কোন চিন্তাও নাই, ভাবনাও নাই। যেন আমি বলিয়াই একটা বোধ নাই। পত্নী ছেলে পিলেদের লইয়া ঘরের মধ্যে থাকেন, আমি একাকী বারান্দায় কম্বল-শয্যায় শয়ন করি। দ্বিতীয় রাত্রি এক ঘুমের পর চিন্তা আসিল। ভাবিতে লাগিলাম 'দেখা যা'ক আমার বয়সী বা আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, আমাদের এখানে, এমন কয় জনের পিতা বর্ত্তমান আছেন।' দুই ঘণ্টা মনে মনে খতিয়ান করার পর দেখিলাম, একজনের মাত্র আছেন—অন্নদা মুখোপাধ্যায়ের। ক্ষণেক চিন্তাহীন অবস্থায় আবার রহিলাম—আপনা আপনি কখন শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল, চিন্তার সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ভাবিলাম তবে আমি 'ভাগ্যহীন' কিসে? সেই একরূপ মুখ-পোড়ার সান্ত্বনা পাইলাম। চতুর্থ রাত্রিতে পত্র পড়িবার প্রয়োজন হইল। দেখি যে চোখে ভাল দেখিতে পাই নাই। এচোখ ওচোখ বুঝিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, বাম-চক্ষু ক্ষীণ দৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে বুঝিলাম বাম হস্তের ও বাম পদেরও কম-জোর। সেই হইতে 'পক্ষাঘাত' আমাকে পাড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ষোল বৎসরে আমি ব্যবস্থা লইয়া ১৪ বার চতুর্ম্মুখ খাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে তালপাতার আগুণের সেকের সঙ্গে, কুব্জপ্রসারিণী তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সর্ব্বত্রই হা হুতাশের ধ্বনি, 'এমন লোকও হঠাৎ মারা যায় গা!' যেন তিনি দুই চারি মাস ভুগিয়া লীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহার বা সমাজের কিছু না কিছু লাভ ছিল। পিতা 'চুঁচুড়া হিতৈষিণী' সভার সভাপতি ছিলেন।

অন্যতর সভ্য রাধাজীবন রায় (হায় রাধাজীবনই বা কোথায় ?) নববিভাকর সাধারণীতে শোক-পত্র প্রকাশিত করিলেন ; দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

এক দিন পর বলি, ভাবি নাই মনে,
জনকের মত তাঁরে, করিতাম জ্ঞান—
পুত্রসম ভাবিতেন, তিনি সর্ব্বজনে,
হৃদে তাঁর ছিল চিন্তা—মোর কল্যান !

'আমারে বাসেন ভাল সবার উপর,'
পরস্পর সবাকার আছিল ধারণা ;
হেন লোক আছে কোথা ভবের ভিতর,
এগুণ স্মরণে আরো, হতেছে যাতনা।

সর্ব্বইত্রই হা হতাশ ! আমি কোথাও গিয়া একটু স্বস্তি পাই না। সকলকার হা হতাশে আমিও সান্ত্বনা পাই না, আমার হৃদয়ের হুতাশ আরও জ্বলিয়া উঠে। স্থির করিলাম কলিকাতায় যাওয়া ভাল ; সেখানে কত ভাল লোক আছেন। আর লৌকতা রাখিতে ত হবেই।

একটি ভৃত্য সঙ্গে ভাগীরথীর পুলের উপর দিয়া নৈহাটী যাইতেছি। কয়খানা মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে, আমি আর আমার সেই ভৃত্য। আর জন প্রাণী নাই। গাড়ীতে উঠিয়া একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। গাড়ী যখন মধ্য গঙ্গার উপরে,—কুল-প্লবনী কুল্ কুল্ করিয়া সরিয়া পড়িতেছেন, গঙ্গার শীতল বায়ু বেশ আমার গাত্রে সর সর করিয়া লাগিতেছে, তখন ঠাহর হইল, আমি গুন্ গুন্ করিয়া নিধু বাবুর বিরহ-গীতি গান করিতেছি।—

আয় রে ! বিচ্ছেদ রাখি তোরে,
যতনে, হৃদি মাঝারে।

ঠাহর হওয়ার পর, পোড়া-মুখে একটু হাসি আসিল—পিতৃশোক বিরহ গান ! মন্দ নয় ! তখন কেহ ছিল না, এখন তোমরা আমরা সম্মুখে রহিয়াছ,—এই হাসিতে হাসিবে, না কাঁদিবে ?

কলিকাতার বাসায় গিয়া রহিলাম। প্রত্যহ একখানা গাড়ী করিয়া গঙ্গা-স্নান তর্পণ করিয়া আসি, আর দুই চারি বাড়ী লৌকতা সারিয়া আসি। কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই চুঁচুড়ার মত হা-হুতাশ।

খিদিরপুর গেলাম। হেমবাবুর কাছে সারিয়া, যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। সঙ্গে সেই চাকর, আর ঢাকার শেষ যাত্রার সেই সঙ্গী—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভায়াও আছেন। আমি আগে আগে, উঁহারা দুজন আমার পিছনে। বৈঠকখানার দ্বার দিয়া আমি যেমন প্রবেশ করিয়াছি—যোগেন্দ্র দাদা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া সহাস্য মুখে, দুই হাত একটু তুলিয়া, যেন আমাকে আলিঙ্গন করিবেন এই ভাবে অগ্রসর হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—'অক্ষয় ভায়া এলে, এসো! এসো! হিন্দু পেট্রিয়টে গঙ্গাচরণবাবুর মৃত্যু সংবাদ পড়িয়া আহ্লাদ আর রাখিতে পারি না—(আমি হতভম্ব) আরে ভাই আমরা ত কেহ মৌরসি পাট্টা লইয়া আসি নাই—তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান—তোমাকে রাখিয়া যে তিনি চলিয়া গেলেন, ইহার অপেক্ষা আহ্লাদ আর আছে নাকি?" এই অপূর্ব্ব কথাগুলি কাণে, মনে, প্রবেশ করিতে লাগিল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র জীব হইতে লাগিলাম। আমার দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছে মনে হইল; শরীরের ভার কমিয়া গেল; সমস্ত কুজ্ঝটিকা সরিয়া গেল; আমি আবার যেন মানুষ হইলাম। যোগেন্দ্র দাদা আমাকে আলিঙ্গন করিলেন; আমি চোখের জল পুঁছিতে পুঁছিতে তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিলাম। তাহার পর কত গল্প হইল। চলিয়া আসিবার সময়, পূর্ণচন্দ্রে আমাতে বলাবলি করিতে লাগিলাম—যোগেন্দ্র ঘোষ একটা সত্যিকার মানুষ বটেন।

সেই যে ডাক্তারবাবু কোম্পানির কাগজে পিতাকে সই করিতে নিষেধ করেন, কেমন করিয়া জানি না, সেই কথা কলিকাতায় রাষ্ট্র হইয়াছে; সকলেই ডাক্তার বাবুর নিন্দা করেন। বলেন, তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতে তোমার কতকগুলা টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় যাইবে।" একজন মাত্র উল্টা কথা বলিলেন,—ডাক্তার দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন, "সেইরূপ করার পর, পিতার মৃত্যু হইলে, আপনি চিরকালই মনে করিতে, ডাক্তারবাবু সই করাতে সম্মতি দেওয়াতেই পিতা জীবনে হতাশ হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সই করিলে এই শেল আপনাকে বহুকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিতে হইত। ডাক্তারবাবু যে সই করিতে দেন নাই, তাহাতেই তিনি আপনার মহোপকারী বন্ধু।" কথাটায় আমার চক্ষু ফুটিল। এমন দুর্দ্দৈবে অনেককেই পড়িতে হয়, দীননাথ সান্ন্যালের কথা কয়টি তাঁহাদের শুনিয়া রাখা ভাল বলিয়া, এই স্থানেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

সমাপ্ত

আত্মচরিত

শিবনাথ শাস্ত্রী

পূর্বপুরুষগণ

গ্রাম মজিলপুর। কলিকাতা শহরের প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। ইহাতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরই অধিক বাস। ভদ্রলোকদিগের বাসস্থান হইতে দূরে গ্রামের পার্শ্বে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি প্রভৃতির বাস আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় অধিক নয়, গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের কার্য নির্বাহের উপযুক্ত। গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না, অনুমান করি এক কালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল* এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোর্তুগিজেরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আসিয়াছিল কিনা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন বাংলা কাব্যে ও পোর্তুগিজদের যাত্রাবিবরণে, 'ময়দা নামক' একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়, এই মজিলপুরের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে, 'ময়দা' নামে এক গ্রাম এখনো বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, পোর্তুগিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শন স্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত। এইরূপে গ্রামখানি যে বহুকালের নয় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা। এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদশার সময় যখন রাজা মানসিং যশোর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামক এক জন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক সপরিবারে যশোর বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়া ঐ চড়ার উপরিস্থিত গ্রাম সুন্দরবনের ভিতরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত ও কুলগুরু শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহারই প্রদত্ত এক সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্বপুরুষ। এই শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা কে, এবং কোথা

*এখনো মজিলপুর ও জয়নগর এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে 'গঙ্গার বাদা' বলে এবং এখনো আমাদের গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণীর জল পবিত্র গঙ্গাজল বলিয়া গণ্য হয়।-গ্রন্থকারের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

চন্দ্রকেতু দত্তের পরিবারগণ এখনো আছেন। তাঁহারা মজিলপুরের দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকারের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানি না। যশোর হইতে আসিয়াছিলেন বলিলে মনে হইতে পারে তিনি পূর্বদেশের লোক, কিন্তু তাহা নহে। আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ হইতে বৈদিক নামের উৎপত্তি। তদ্ভিন্ন উদ্গাতা উপাধিটিও বৈদিক সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। বৈদিক ঋত্বিকগণের মধ্যে হোতা পোতা অধ্বর্যু ও উদ্গাতার উল্লেখ দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও বৈদিক শব্দ এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত দেখা যায়। যাঁহারা ধর্মের যজন-যাজন লইয়া থাকেন তাঁহারা বৈদিক, আর যাঁহারা বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হন তাঁহার 'লৌকিক'। তদ্ব্যতীত এখনো সে সকল প্রদেশে অনেক স্থানে বৈদিক প্রণালীতে হোমাদি ক্রিয়াকাণ্ডের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। তদ্ভিন্ন এরূপ বহু বহু ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা বেদগান, বেদমন্ত্রপাঠ ও হোমাদিরূপ বৈদিক কার্যের অনুষ্ঠানাদিকে জীবনের প্রধান কার্য করিয়া রহিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে গোদাবরী-তীরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—
এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম,
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।"

অতএব মনে হয় যে, হয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা, না হয় তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। আমাদের বংশে এরূপ প্রবাদ আছে যে ইঁহার পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতে এখনও 'ওতা' নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এই 'ওতা' শব্দ হোতা কি উদ্গাতার অপভ্রংশ কি না বলিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা হইতে আমি নবম পুরুষ পরে।

পিতা বংশের প্রথম রাজকর্মচারী। এই বংশের ব্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রামের মধ্যভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। এই বাৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আবহমান কাল কেবল যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন কর্মে রত থাকিয়া গৌরবান্বিত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন। যত দূর স্মরণ হয় এই বংশে আমার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাগ্রে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে পণ্ডিতীকর্ম লইয়া সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে আমার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ রাজসেবা করেন নাই।

প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে আমার স্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক সময়ে এই গ্রামে ১০।১২

খানি টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় রামজয় স্থায়ালঙ্কার মহাশয়ের একখানি। ইনি একশত তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহাকে আমি ১০।১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত দেখিয়াছি। আমার বাল্যজীবনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইঁহার কথা বলিতে হইবে।

পিতামহী লক্ষ্মীদেবী। আমার পিতামহ মহাশয় স্বগ্রামেই কাশ্বায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কাশ্বায়ন বংশীয়গণ বড় অহংকৃত ও তেজস্বী মানুষ ছিলেন। আমার পিতামহীঠাকুরাণী লক্ষ্মীদেবী সেই বংশের কন্যা। তিনিও অতিশয় তেজস্বিনী নারী ছিলেন। আমাদের গৃহে এরূপ প্রবাদ আছে যে তাঁহার ঘরে একবার চোর ঢুকিয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে কণ্ঠাভরণ হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তিনি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া এরূপ বলের সহিত চোরের হাত ধরিলেন যে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অনেক টানাটানির পর চোর কোনো মতে নিষ্কৃতি পাইল।

আর একটি গল্প ইহা অপেক্ষাও অধিক সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। সেটি এই। সেকালে আমাদের গ্রামে শীতকালে মধ্যে মধ্যে বাঘ দেখা দিত। গ্রামটি সুন্দরবনের মধ্যেই বলিলে হয়। কয়েক ক্রোশের মধ্যে আকাট জঙ্গল ছিল। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বেও বন-জঙ্গল যথেষ্ট ছিল। সুতরাং বাঘের আসা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই কারণে এই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল যে, এক শাখাভুক্ত চারি-পাঁচ পরিবার একত্র বাস করিয়া সমগ্র পাড়াটি এক বড় প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখিত; সম্মুখের দ্বার এক, খিড়কির দ্বার ভিন্ন ভিন্ন। এই বন্দোবস্তে কাজকর্ম চলিত। আমাদের কয়েক ঘর জ্ঞাতির সহিত আমাদের বাড়িটি এইরূপ এক প্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। এক দিন শীতকালে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার পিতামহ সায়ংসন্ধ্যা করিয়া খড়ম পায়ে উঠানে বেড়াইতেছেন, প্রপিতামহদেব সায়ংসন্ধ্যাতে নিমগ্ন আছেন, পিতামহীঠাকুরাণী রন্ধন-শালাতে পাককার্যে রত আছেন, এমন সময়ে পার্শ্বের প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে 'বাঘ, বাঘ' চীৎকার উঠিল। পিতামহ মহাশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিবার জন্য সেদিকে উঁকি মারিলেন, অমনি বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাবা, সত্যি তো বাঘ, আমাকে নিলে যে!" প্রপিতামহ বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক, পিছন ফিরিস না।" অমনি যিনি যেখানে যে কাজে ছিলেন, সকলেই আমার পিতামহের রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। পিতামহীঠাকুরাণী উনান হইতে এক জলন্ত কাঠ লইয়া বাঘের দিকে ধাবিত হইলেন। শুনিতে পাই, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে বাঘ ভীত হইয়া যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দ্বার দিয়া মহাবেগে বহির্গত হইয়া গেল। তখন

জানিতে পারা গেল, কোনো প্রতিবেশীর একটি নবাগতা বধূ একটি খিড়কির দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, বাঘ তাহা দিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল।

আমার পিতামহীর সমগ্র চরিত্র এই সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনুরূপ ছিল। গ্রামেই বাপের বাড়ি, তাহাতে বাপেরা পদস্থ ও গর্বিত লোক, এজন্য তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্ক চিত্তে বাস করিত। আমার পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিদ্যাসাগর তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র। তিনি স্বীয় জননীর ব্যক্তিত্ব ও প্রখর তেজস্বিতা প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন।

পিতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য। স্বর্গীয় রামকুমার ভট্টাচার্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে পিতামহী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন। পিতামহী গৌরাঙ্গী, তিনি শ্যামবর্ণ; পিতামহী অসহিষ্ণু, তিনি সহিষ্ণু; পিতামহী অন্যায়ের গন্ধ পাইলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করিতেন, পিতামহ ঠাকুর অনেক অন্যায় শান্ত ভাবে বহন করিতেন; এমন লোক ছিল না যে পিতামহীঠাকুরাণীকে অপমানের কথা শুনাইয়া দশ কথা না শুনিয়া যায়, পিতামহ মহাশয় অনেক অন্যায় কথা ও ব্যবহার নির্বাক থাকিয়া সহ্য করিতেন, অপমানের সম্ভাবনা হইতে দূরে থাকিতেন; পিতামহীঠাকুরাণী নিজ গৃহের সুখসমৃদ্ধি সর্বাগ্রে বুঝিতেন, সেইদিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিতেন, বাহিরের লোকের সুখ দুঃখের দিকে ততটা মন দিতেন না; পিতামহের হৃদয়ের দ্বার বাহিরের লোকের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। তিনি অতিশয় দয়ালু মানুষ ছিলেন।

বড় পিসীর মুখে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিয়াছি। একদিন বড়পিসী দোলাতে বসিয়া আছেন, এমন সময় পিতামহ ঠাকুর স্নান করিয়া আসিলেন। আসিয়াই সত্বর শয়ন ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন। পিসী দেখিলেন, তিনি গামছাখানি পরিয়া আসিয়াছেন, পরিধেয় বস্ত্র নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার কাপড় কোথায় ফেলে এলে?" পিতামহ তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন, "চেঁচিয়ো না মা! তোমার মা যেন টের পায় না, কাপড়খানা একজন গরীবকে দিয়ে এসেছি।" ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পিতামহ মহাশয়কে অনেক সময় পিতামহীঠাকুরাণীর ভয়ে লুকাইয়া দান করিতে হইত। আমার পিতাঠাকুর স্বীয় মাতার এই তেজস্বিতা ও নিজ পিতার এই সহৃদয়তা উভয়ই পাইয়াছিলেন।

বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশে ভীষণ সাইক্লোন হয়। এই ঝড়ে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া আমাদের গ্রামের দক্ষিণবর্তী সমুদয় প্রদেশকে প্লাবিত করে। সেই সময়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তদনন্তর ওলাউঠা রোগ বঙ্গদেশে প্রথম দেখা দিয়া আরও সহস্র সহস্র

লোককে নিধন প্রাপ্ত করে। সেই ওলাউঠা রোগে দশদিনের মধ্যে আমার পিতামহ, প্রপিতামহী ও পিতামহী মারা পড়েন।

আমার পিতামহ ঠাকুর যখন গত হইলেন, তখন দুই পুত্র, দুই কন্যা পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন। তন্মধ্যে বড়পিসী তখন বয়ঃপ্রাপ্তা অর্থাৎ ১৬। ১৭ বৎসরের মেয়ে, এবং তৎপূর্বেই সন্তানের মুখ দেখিয়াছেন। কাজেই তিনি তখন গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিলেন। পিতামহাশয় এই সময় হইতে ঘরজামাই হইয়া, বড়পিসীর শাসনাধীনে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতেই বাস ও সমুদয় বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার পিতার বয়ঃক্রম তখন ৬।৭ বৎসর। এইরূপে বৃদ্ধ প্রপিতামহ, পিসামহাশয় ও বড়পিসী, ছোটপিসী, কাকা, ও বড়পিসীর দুই সন্তান লইয়া সংসার চলিতে লাগিল।*

আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন; তাহার আয়েই সংসার চলিত। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তিরূপে অনেক উপার্জন করিতেন। তিনি অনেক সময় কলিকাতাতে বাস করিতেন। সেখানে তিনি পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ রাধানাথ মল্লিক মহাশয়দের পরিবারের কুলপুরোহিত ছিলেন। দেশের কাজকর্ম দেখার ভার পিসামহাশয় ও বড়পিসীর উপর ছিল।

'কুলসম্বন্ধ' কুলীন বিবাহের প্রথা। ক্রমে আমার পিতার দশম কি একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ও সেই সঙ্গে বিবাহের কাল উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীনদিগের মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল, এখন দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। কুলসম্বন্ধের অর্থ এই যে, কুলীন বৈদিকের ঘরে কন্যা জন্মিলেই দুই-এক মাসের মধ্যে সমশ্রেণীর কোনো শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখা হইত। তৎপরে কন্যা আট-নয় বৎসরের হইলেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত। যদি বিবাহের পূর্বে বাগ্‌দত্ত বরের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে কন্যা 'অন্যপূর্বা' নাম পাইত। তৎপরে আর তাহার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না, মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হইত। আমার দুই পিসী, এইরূপে 'অন্যপূর্বা' হইয়া মৌলিক বরের সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। এই প্রথানুসারে আমার পিতার ছয় কি সাত মাস বয়সের সময়, কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ববর্তী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাস-বয়স্কা প্রথমা কন্যার সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া রাখা

*পিতামহ-পিতামহীর মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, আমার জ্যেষ্ঠা পিতৃষ্বসা আনন্দময়ী বা বিন্দী, কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা গণেশজননী, আমার পিতা, ও আমার পিতৃব্য রামতারণ, এই কয়জন সংসারে থাকেন। বড়পিসীর স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হয়।... পিসামহাশয় দত্তবাড়ীতে পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে আমার পিতৃব্য রামতারণ ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়।—গ্রন্থকারের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

হইয়াছিল। তদনুসারে দশম কি একাদশ বৎসর বয়সে আমার পিতার বিবাহ হইল।

মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। আমার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন সুবিজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা কাঁসারিপাড়াতে তাঁহার টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গ-সহিত্য-জগতে চিরদিনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমার মাতামহ কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত 'প্রভাকর' নামক পত্রিকা সম্পাদনে তাঁহার সাহায্য করিতেন। তিনি উত্তর কালে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত বাংলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী কর্ম লইয়াছিলেন, এবং আমার বড়মামা সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই কলেজেই কর্ম পাইলে, মাতামহ মহাশয় মিতব্যয়িতার গুণে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া পৈতৃক ভিটা হইতে উঠিয়া স্বগ্রামেই একটি দোতালা পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে ইহা এক নূতন ব্যাপার বলিয়া ঐ দোতালা বাড়ি প্রতিবেশীবর্গের অনেকের চক্ষের শূল-স্বরূপ হইয়া বহুদিন ধরিয়া আমার মাতুল পরিবারের ঘোর অশান্তির কারণ হইয়াছিল। তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব।

মাতামহ মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ হয়। আমার ৯।১০ বৎসরের সময় তিনি দারুণ উরুস্তম্ভ রোগে গতাসু হন। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রসন্নমূর্তি, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। আমাকে 'শিবরাম' বলিয়া ডাকিতেন। গৃহস্থালী বিষয়ে পরিপক্কতা তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। আমার মাতুলালয়ে সম্বৎসরের চাল-ডাল প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য এরূপ সঞ্চিত থাকিত যে, হঠাৎ কোন দিন দশ-পনরোজন অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে দুই ঘণ্টার মধ্যে পরিতোষ পূর্বক আহার করানো মাতামহীঠাকুরাণীর পক্ষে কিছুই ক্লেশকর হইত না। মাতামহের মিতব্যয়িতা ও পাকা গৃহস্থালীর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম পুত্র উপেন্দ্রনাথের শৈশব কালে হুঁকা কলিকা হাতে লইয়া বেড়াইবার বাতিক ছিল। একটা হুঁকা ও কলিকা না পাইলে কাঁদিয়া ঘর ফাটাইত, রাত্রে তাহার শয্যার পার্শ্বে হুঁকা কলিকা রাখিতে হইত, রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগিলে হুঁকা হুঁকা করিয়া কাঁদিত। সুতরাং তাহার জন্য হুঁকা ও কলিকা সর্বদাই রাখিতে হইত। হুঁকা তো বড় একটা ভাঙিতে পারিত না, কলিকা-গুলি দিনে ২।৩ বার ভাঙিত। মাতামহ মহাশয় প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে গৃহে আসিতেন, আসিয়া রবিবার গৃহস্থালীর জিনিস গুছাইতেন। একবার আসিয়া রবিবার কয়েক ঘণ্টা বসিয়া মাটি দিয়া এক ঝোড়া কলিকা গড়িয়া খড়ের আগুনে পোড়াইয়া রাখিয়া গেলেন; অভিপ্রায় এই, উপেন যত পারে কলিকা ভাঙুক। তখন

এক পয়সাতে বোধ হয় আটটা কলিকা পাওয়া যাইত, সে বায়টুকুও বাঁচাইবার দিকে তাঁহার এত দৃষ্টি পড়িল।

দোলদার ছকড়-গাড়ি। পূর্বেই বলিয়াছি চাঙ্গড়িপোতা গ্রাম কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত। সেকালে এক প্রকার দোলদার ছকড়-গাড়ি ছিল, তাহা চাঙ্গড়িপোতার সন্নিহিত রাজপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিত। কুঠীওয়ালা বাবুরা ও অপেক্ষাকৃত পদস্থ ব্যক্তিরা প্রতি সোমবার সেই দোলদার ছকড়-গাড়ি চড়িয়া কলিকাতায় আসিতেন ও শনিবার কলিকাতার ধর্মতলা হইতে ঐ গাড়ি চড়িয়া বাড়ি যাইতেন। আমার মাতামহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে কেহ কখনো গাড়িতে দেখিতে পাইত না। তিনি সর্বদাই শনিবার পদব্রজে কলিকাতা হইতে বাড়িতে যাইতেন, এবং সোমবার পদব্রজেই কলিকাতায় ফিরিতেন; বড়মামাও সেইরূপ করিতেন। আমি ৮ বৎসরের সময় কলিকাতায় আসিলে, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে পদব্রজে যাতায়াত করিতাম।

এই সকল কারণে লোকে কৃপণ বলিয়া আমার মাতামহের অখ্যাতি করিত; কিন্তু আমি কলিকাতায় তাঁহার বাসাতে আসিয়া দেখিয়াছি, তিনি জামাতা ছাড়া স্বসম্পর্কীয় প্রায় ৮।৯ জন যুবক তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। যাহা হউক, তিনি যে অতিশয় হিসাবী ও মিতব্যয়ী লোক ছিলেন তাহতে সন্দেহ নাই। আমার মাতাঠাকুরাণী গোলোকমণি দেবী স্বীয় পিতার গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা ও মিতব্যয়িতা পাইয়াছিলেন।

মাতামহী। আমার মাতামহীঠাকুরাণী আকৃতি ও প্রকৃতিতে মাতামহ হইতে বিভিন্ন ছিলেন। মাতামহ সম্বৎসরের চাল-ডাল গোলাতে সঞ্চয় করিতেন, মাতামহী দরিদ্রা স্ত্রীলোকদিগকে গোপনে ডাকিয়া সেই চাল-ডাল অঞ্চল ভরিয়া দান করিতেন; টাকা-কড়ি সর্বদা দুই হাতে দান করিতেন। এজন্য তাঁহার পতি বা পুত্র তাঁহার হস্তে সংসারের টাকা রাখিতেন না, আপনাদের নিকট রাখিতেন। কিন্তু মাতামহীর নিজ ব্যয় বলিয়া তাঁহার হস্তে যাহা দেওয়া হইত, তাহা হইতেই দান-ধ্যান চলিত।

এই স্থানে মাতামহীঠাকুরাণীর সদাশয়তার কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। আমার পিতা আমাকে কলিকাতায় রাখিয়া গেলে সময় সময় আমার ভয়ানক অর্থাভাব হইত, তখন অনন্যোপায় হইয়া আমি মাতুলালয়ে যাইতাম। মামীদিগকে আমার অভাব জানাইতে সাহস করিতাম না। মাতামহীঠাকুরাণী আমাকে এত ভালোবাসিতেন যে আমি মাতুলালয়ে গেলে, রাত্রে আমাকে স্বীয় শয্যাতে লইয়া গলা জড়াইয়া শুইতে ভালোবাসিতেন। এই নিয়মে তিনি আমাকে অনেক বৎসর পর্যন্ত কাছে রাখিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্নেহে আমাকে নিজ বাহু পাশে বাঁধিতেন তাহা স্মরণ

করিলে এখনো চক্ষে জল আসে। যাহা হউক, যে জন্য এ বিষয়টা উল্লেখ করিতেছি তাহা এই—মাতামহী আমাকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিলে আমি রাত্রে তাঁহার কানে কানে আমার দারিদ্র্যের কথা বলিতাম। তিনি গোপনে আমার কাপড়ের খুঁটে তাঁহার নিজ ব্যয়ের টাকা হইতে হয়তো দুইটি বা চারিটি টাকা বাঁধিয়া দিতেন, বলিতেন, "এ কথা কারুকে বল না, টাকার কষ্ট হলেই আমার কাছে এস।" এখন স্মরণ করিয়া লজ্জা হয়, কি স্বার্থপরতার কাজই করিতাম!

আমার মাতামহীঠাকুরাণী বড় ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। উপহাসচ্ছলেও যদি কাহাকেও কিছু দিব বলিয়া মুখ দিয়া কথা বাহির করিতেন, তাহা হইলে তাহা না দিয়া প্রসন্নমনে থাকিতে পারিতেন না, তাহা দিতেই হইত। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার রন্ধনশালার জন্য একটি বড় ঘটি কেনা হইল। ঘটিটি এত বড় যে জলসুদ্ধ নাড়াচাড়া করিতে মেয়েদের কষ্ট হয়। মাতামহী একবার জলসমেত ঘটিটি তুলিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা রে! এ ঘটির এক ঘটি জল যদি কেউ এক বারে খেতে পারে, তবে তাকে এক টাকা দিই।" অমনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে এক পরিবারের একটি ছেলে ছুটিয়া গিয়া ঘটিটি লইয়া জলপান করিতে বসিয়া গেল। মাতামহী ভয় পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, তুই অত জল খাসনি, আমি টাকা দিব বলিছি, দিবই," এই বলিয়া একটি টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। আর একবার একদিন গ্রীষ্মকালে ভয়ানক রৌদ্রে উঠান তাতিয়া অগ্নি-সমান হইয়াছে। এমন সময় মাতামহীঠাকুরাণীর একবার গোলাতে যাওয়ার আবশ্যক হইল। উঠানে পা দিয়াই বলিয়াই উঠিলেন, "বাবা রে! যেন আগুন, এ উঠানে যদি কেউ দুদণ্ড বসতে পারে, তবে তাকে দুটাকা দিই।" অমনি একজন যুবক প্রস্তুত! সে লম্ফ দিয়া সেই তপ্ত উঠানের মধ্যে গিয়া বসিল। মাতামহী একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, "ওরে তুই উঠে আয়, আমি দুটাকা দিচ্ছি," বলিয়া তাহাকে দুই টাকা দিলেন।

বাস্তবিক তাঁহার মতো কোমলহৃদয়া, দয়াশীলা, স্বজনবৎসলা, উদারপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণা নারী অল্পই দেখিযাছি। আমার বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ধর্মভীরুতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধর্মভীরুতা তিনি জননী হইতে পাইয়াছিলেন।

মাতামহীর বৃদ্ধাবস্থায় আমার দুই মামী যখন ঘরকন্নার ভার লইলেন ও তাঁহাকে সংসারে খুঁটিনাটি হইতে নিষ্কৃতি দিলেন, তখন ধর্মচিন্তা, দরিদ্রের সেবা ও গৃহস্থ শিশুগণের পালন তাঁহার প্রধান কাজ দাঁড়াইল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, এবং স্নানান্তে ফিরিবার সময় পথের দুই পার্শ্বে পরিচিত দরিদ্র পরিবারদিগকে দেখিয়া আসিতেন। এটি তাঁহার নিত্য

ব্রতের মধ্যে হইয়াছিল। এজন্ত তিনি নিজ ব্যয়ের টাকা হইতে কয়েক আনা পয়সা সঙ্গে লইতেন, এবং গৃহে ফিরিবার সময় বাড়িতে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া আবশ্যক মতো কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, এবং নিজের সাধ্যে না কুলাইলে, পুত্রদিগকে অনুরোধ করিয়া কিছু কিছু সাহায্য করাইয়া দিতেন।

তাঁহার সহৃদয়তার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কথা স্মরণ হইতেছে। একবার আমি পদব্রজে স্বীয় বাসগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে মাতুলালয়ে একবেলা থাকিয়া আসিব এইরূপ সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু অগ্রে তথায় সংবাদ দিই নাই। গ্রাম হইতে অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়াছিলাম, মাতুলালয়ে পৌঁছিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া যাইবে। পথিমধ্যে একজন হীনজাতীয় লোক আমার সঙ্গ লইল। সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসিতেছে। সে যখন শুনিল যে আমি শহরে আসিতেছি তখন ব্যগ্রতা সহকারে তাহাকে সঙ্গে লইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি জানিতাম, বিনা সংবাদে অসময়ে মাতুলালয়ে পৌঁছিব, হয়তো মামীদিগকে আবার পাক করাইতে হইবে, সেই ভয়ে প্রথমে ইতস্তত করিলাম, কিন্তু তাহার ব্যগ্রতাতিশয় দেখিয়া চক্ষুলজ্জাবশত 'না' বলিতে পারিলাম না। দুইজনে দ্বিপ্রহরের সময় মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মামীরা তখন আহারে বসিয়াছেন, মাতামহী-ঠাকুরাণী বসিতে যাইতেছেন, তখনও ভাতে হাত দেন নাই। আমার গলার স্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে চুপে চুপে বলিলাম, একটি অন্ত্যজাতীয় লোক পথ হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছে। সে কলিকাতায় কখনো যায় নাই, আমার সঙ্গে যাইবে। তিনি বলিলেন, "বেশ তো, তুই শিগ্‌গির নেয়ে এসে মামীদের পাতে বসে যা। আমার ভাত ঐ লোকটি খাক, আমি আমার ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, পরে খাব।" এ প্রকার বন্দোবস্তটা আমার ভালো লাগিল না। একবার বলিলাম, "তোমার ভাত ওকে কেন দেবে, যে ভাত চড়াবে, তাই ওকে দিয়ো, তোমার ভাত তুমি খাও।" তিনি বলিলেন, "আহা! বেচারা পথ চলে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ও বসে থাকবে আর আমরা খাব, তা কি হয়? যা যা তুই নেয়ে আয়। তাঁহার ত্বরাতে আমাকে আর ভাবিতে-চিন্তিতে সময় দিল না, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া মামীদের পাতে বসিয়া গেলাম। মাতামহী সেই লোকটির হাতে তেল দিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমিও নেয়ে এসো, আসবার সময় আমাদের বাগান থেকে কলাপাতা কেটে এনো।"

তাহার পরে মাতামহীঠাকুরাণী যখন উঠানের পাশে ঢেঁকিশালার দাবা ঝাঁট দিয়া নিজের ভাতগুলি তুলিয়া তাহাকে দিতে গেলেন, তখন মামীদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা রাগারাগি করিতে লাগিলেন। দিদিমা আমাকে যাহা

বলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে বলিয়া নিজের ভাতগুলি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া দিলেন। আমি আহারান্তে আচমন করিয়া আসিয়া দেখি সে ব্যক্তি আহারে বসিয়াছে, দিদিমা অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, এবং "বাবা, এটা খাও, ওটা খাও," বলিতেছেন ; যেন তাহার প্রত্যেক গ্রাসে তাঁহার সন্তোষ হইতেছে। সে ব্যক্তি আহারান্তে আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া আমার মাতামহীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "মা অনেক বামনের মেয়ে দেখছি, তোমার মতো বামনের মেয়ে দেখিনি।"

ঠিক কথা! আমার মাতামহীর ন্যায় ব্রাহ্মণকন্যা বিরল। বলিতে কি, তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি, আমার হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং এ কথা আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাতে যে কিছু ভাল আছে, তাহার অনেক অংশ তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।

জন্ম ও শৈশব : মজিলপুরে বাস

মাঘ-প্রতিপদে জন্ম। এই মাতামহীর ক্রোড়ে, মাতুলালয়ে, বাংলা ১২৫৩ সাল ১৯শে মাঘ ইংরাজী ১৮৪০ সাল ৩১ জানুয়ারী, রবিবার, আমার জন্ম হইল। আমার জন্মকালের বিবরণ যাহা শুনিয়াছি, লিখিতেছি। সায়ংকালে যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম তখন সবে পূর্ণিমা গিয়া প্রতিপদের সঞ্চার হইতেছে। সেদিন আমার মাতামহ বাড়িতে আছেন। কন্যার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণমাত্র তিনি তাঁহার এক দৈবজ্ঞ জ্ঞাতিবন্ধুর ভবনে ধাবিত হইলেন। গৃহস্থ রমণীগণের শঙ্খধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ওদিকে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, ন্যায়রত্নের দৌহিত্র জন্মিয়াছে। মাতুলগৃহে সেই প্রথম শিশুবালকের আবির্ভাব। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতামহী ও তাঁহার জননী, দুই মামী, দুই মাসী (আর এক মাসী তখনো শিশু) ও গৃহস্থ অপর দুই-একজন বিধবা, ইঁহাদের আদর ও অভ্যর্থনার ধন হইলাম। পরদিন রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে বাজনাদার আসিয়া বাড়ি আক্রমণ করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে মাতামহ মহাশয় কলিকাতায় গেলেন। শনিবার তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সাতদিন দলে দলে বাজনাদার আসিয়া বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিল।

শনিবার মাতামহ ঠাকুর ও বড়মামা কলিকাতা হইতে আসিলেন। বাবা তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তিনি বোধ হয় লজ্জাতে তাঁহাদের সঙ্গে আসেন নাই। কিছু

দিন পরে আসিয়াছিলেন। বড়মামা রবিবার প্রাতে সূতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া মোহর দিয়া ভাগিনার মুখ দেখিলেন। জননীর মুখে শুনিয়াছি, আমার মামা আমার মাথা ও কপাল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এই ভাগিনা বড়লোক হবে।"

ক্রমে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আমি মাতামহী, মামী ও মাসীদের কোলে বাড়িতে লাগিলাম। বিশেষত আমার মেজমাসী এক দণ্ড আমাকে কোল হইতে নামাইতেন না।

কিন্তু আমি পৃথিবীতে পদার্পণ করিবামাত্র মাতুলগৃহে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার মাতামহ মহাশয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিয়া পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ পূর্বক, তাহার নাতিদূরে একটি দ্বিতল পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঐ দ্বিতল বাড়িটি পাড়ার লোকের চক্ষুঃশূল হইল। একখণ্ড পতিত জমি ক্রয় করিয়া সেই জমির উপরে ঐ বাড়িটি নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিখণ্ড বহুদিন পতিত অবস্থাতে থাকাতে তাহার উপর দিয়া লোকের যাতায়াতের পথ হইয়া গিয়াছিল। বহু বহু বৎসর ধরিয়া লোকে সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু মাতামহ যখন তাহা ক্রয় করিয়া, প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তদুপরি গৃহনির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহা লইয়া বিবাদ ও বিষম দলাদলি ও তাহার ফলস্বরূপ মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। তখন প্রতিবেশীগণ আমার মাতুল-পরিবারের প্রতি এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিল যে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সূত্রে আমার ছয় মাস বয়সে জননী আমাকে লইয়া আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরের বাটিতে গেলেন।

আমার প্রপিতামহ তখন সকল কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন ; চক্ষে দেখেন না, কানে শোনেন না। তিনি আমাকে পাইয়া "আমার বংশধর আসিয়াছে" বলিয়া মহা আনন্দিত হইলেন, এবং আমাকে 'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শৈশবে অশান্তি। আমার এতটা অভ্যর্থনা আমার বড়পিসীর সহ্য হইল না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কাকার মৃত্যু হওয়ার পর, ও ছোটপিসী শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পর, তিনি নিজ পুত্রকন্যাগণকে লইয়া গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছিলেন। সে ভিটা যে তাঁহাকে কোন দিন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় স্বপ্নেও জানিতেন না। গৃহকর্তা স্বীয় পিতামহের হাতে নূতন বংশধরের এই আদর দেখিয়া তাঁহার আর এক চিন্তার উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, তিনি এতদিন ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে রহিয়াছেন।

ইহার পর হইতে আমার মাতার প্রতি তাঁহার দারুণ বিরুদ্ধ ভাব জন্মিল এবং ননদে ও ভাজে মন-কষাকষি আরম্ভ হইল। তাহার ফলস্বরূপ আমার মা আমাকে দেখিতেন না। মনের রাগে প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অনাহারে রান্নাঘরে সংসারের কাজে নিমগ্ন থাকিতেন, আমি চেঁচাইয়া মরিয়া যাইতাম, একবার ফিরিয়া চাহিতেন না। বড় কাঁদিলে আমার পিসতুতো বোনেরা কোলে করিয়া রান্নাঘরে লইয়া গিয়া উনানের নিকট হইতে স্তন্যপান করাইয়া আনিত। কিন্তু রাগের দুধ খাইয়া আমার ঘোর উদরাময় জন্মিল ; যেমন দুধ পান করিতাম, তেমনি দুধ বাহির হইয়া যাইত। অল্পদিনের মধ্যে রাগে ও অনাহারে মায়ের বুকের দুধ শুকাইয়া গেল। তখন আমার জীবন সঙ্কট উপস্থিত। রক্তভেদ ও রক্তবমন আরম্ভ হইল। তখন মা'র চক্ষু স্থির হইল। তিনি সমস্ত দিন সংসারের কাজে থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে আমার মুখে জল দিতেন। এই অবস্থাতে একদিন আমার পিসীর অনুপস্থিতি কালে আমার মা আমার প্রপিতামহের ক্রোড়ে আমাকে শোয়াইয়া তাঁহার কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, তোমার বাবা না খেতে পেয়ে মরে।" এই এই কথা শুনিয়া তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন, এবং এই সংবাদ তাঁহাকে কেহ দেয় নাই বলিয়া আমার পিসামহাশয় ও পিসীমাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন ; এবং পিসামহাশয় আসিলে হুকুম দিলেন, "আমার বাবার জন্য যত দুধ লাগে রোজ করে দাও।" আমার জন্য দুধের রোজ হইল। তদবধি প্রপিতামহ কিছু সতর্ক হইয়া কান পাতিয়া থাকিতেন। ছোট ছেলের কান্না একটু কানে গেলেই "বাবা কেন কাঁদে" বলিয়া চীৎকার করিতেন, আর বড়পিসী রাগিয়া যাইতেন।

আমার জন্য দুধের রোজ হইল বটে কিন্তু তখন উদর ভাঙ্গিয়াছে, ছেলে আর বাঁচানো যায় না। আমার শরীর অস্থিচর্মসার হইল। তখনকার অবস্থা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার পাছা ছিল না যে পাছা পাতিয়া বসি ; যখন বসিতে শিখিলাম' তখন পিঠের দাঁড়ার উপর বসিতাম। সেই যে আমার হাত পা ছিনা পড়িয়া গেল, সেই ছিনা-পড়া এখনো রহিয়াছে।

দারুণ উদরভঙ্গের উপরে রসতড়কা রোগ দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে সমুদয় গা গরম হইয়া হাত পা খেঁচিতাম ও অজ্ঞান হইয়া যাইতাম। মা আমাকে বুকে ধরিয়া 'ছেলে গেল' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন। মায়ের মুখে শুনিয়াছি, এই রোগ প্রায় ৭।৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিল, ডুব দিয়া নাইতে শিখিলে সারিয়া যায়। আমার আকার ও মূর্তি তখন এ প্রকার হইয়াছিল যে, আমাকে রাখা ও আমার সেবা করা একমাত্র জননী ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

যাহা হউক, আমার পিসীমা আমার প্রপিতামহের তিরস্কার খাইয়া খাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে আমাদের ভিটাতে আর তাঁহার থাকা হইতেছে না। পিসামহাশয় আমাদের বাড়ির সম্মুখেই কিছু জমি লইয়া একটি বসতবাটী নির্মাণ করিলেন। পিসীমা সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেলেন। আমার বয়স তখন দুই কি আড়াই বৎসর হইবে।

বড়পিসী উঠিয়া গেলে গৃহে শান্তি হইল বটে কিন্তু আমার মা'র আর এক প্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একমাত্র দাসী সহায় করিয়া সেই বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর ও শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইতে হইল। একলা ঘরে একলা স্ত্রীলোক পাইয়া চোরে বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। কয়েকবার সিঁদ হইল। এক রাত্রে এক ঘরে পাঁচ জায়গায় সিঁদ ফুটাইয়াছিল।

আমার মা। একদিকে চোরের উপদ্রব, অপর দিকে দুষ্ট লোকের উপদ্রব। বাবা তখন কলিকাতায় আমার মাতামহের বাসায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতেছেন। সুতরাং আমার মাকে বৎসরের অধিকাংশ কাল সশঙ্ক চিত্তে একাকিনী থাকিতে হইত, এবং আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় উগ্রমূর্তি ধারণ করিতে হইত। সেই অবধি মায়ের এমন একটা আত্মমর্যাদাজ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার মর্যাদার অণুমাত্র লঙ্ঘন হইলে, তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; লঙ্ঘনকারীকে জানিতে দিতেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটির ভিতরে স্নেহের বারিধারার ন্যায় আগ্নেয়গিরির অগ্নিও আছে।

আমার মাতার আত্মমর্যাদাজ্ঞানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একটি আমার শৈশবে ঘটিয়াছিল, অপরটি বহু বৎসর পরে। প্রথম ঘটনাটি এই: পাঁচ বৎসর বয়স হইলেই মা আমাকে গ্রামের একটি পাঠশালে দিলেন। বসুপাড়ায় বসুদের বাড়িতে এক বধেমেনে গুরুর পাঠশালা ছিল, তাহাতে আমাকে ভর্তি করা হইল। আমি তালপাতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াই দিন দিন সমপাঠী বালকদিগের অপেক্ষা উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহার কারণ এই, আমার মা সে সময়কার তুলনাতে অনেক লেখাপড়া জানিতেন। আমার বাবা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার মত-সত একটু উদার ছিল, তিনি আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মা প্রায় প্রতিদিন দুপুরবেলা রামায়ণ পড়িতেন। দুপুরবেলা তিনি নিজে পড়িতেন ও আমাকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতেন। সেইজন্য আমি পাঠশালে অপরাপর বালকের অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহাতে গুরুমহাশয়ের কিছু আশ্চর্য বোধ হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোরে কে পড়া বলে দেয় রে?" আমি বলিলাম, "আমার মা।"

গুরুমহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা লেখাপড়া জানে?" উত্তর, "হঁা, আমার মা বেশ পড়তে পারে।" তাহার পর গুরুমহাশয় সন্ধান লইলেন যে আমার মা একাকিনী বাড়িতে থাকেন, বাবা বিদেশে। একদিন গুরুমহাশয় আমার লিখিবার তালপাতে কি লিখিয়া আমাকে দিলেন, বলিলেন, "তোর মাকে দিস্, আর কেউ যেন দেখে না।" আমি ভাবিলাম, সকল বালকের মধ্যে আমি ভাগ্যবান, গুরুমহাশয় আমার মাকে পত্র লিখিয়াছেন। আমি বাড়িতে আসিয়া এক গাল হাসিয়া মাকে বলিলাম, "ওরে মা, গুরুমহাশয় তোকে কি লিখেছে দেখ্।" মা তালপাতাটি আমার হাত হইতে লইয়া একটু পড়িয়াই গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন, পাতাটি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আমি তাহা আনিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে মারিলেন, এবং তৎপর দিন হইতে আমার পাঠশালে যাওয়া বন্ধ করিলেন। সেই আমার পাঠশালে যাওয়া শেষ। তৎপরে তিনি আমাকে গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

আর একটি ঘটনা অনুরূপ। সে ঘটনাটি সে সময়ে আমার মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হওয়াতে স্মরণ আছে। একবার আমার মাতুলালয়ে কয়েকজন নবাগত অতিথি আহারে বসিয়াছেন। আমার মায়ের জ্ঞাতি সম্বন্ধে খুড়তুতো ভাই অভয়াচরণ চক্রবর্তী সেই সঙ্গে বসিয়াছেন। এই অভয়মামা কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কি বিশপস্ কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রামে একজন পদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু আমার মা ও পাড়ার অপরাপর প্রাচীনা আত্মীয়া মহিলারা অভয়মামাকে বালক-কাল হইতে 'ঘেনো' 'ঘেনো' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার 'অভয়' নাম দিদিদের বা খুড়ী-জেঠীদের মুখে কখনই শোনা যাইত না। সকলেই 'ঘেনো' 'ঘেনো' বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত দিবস আহারের সময় আমার মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মাছ পরিবেশন করিবার সময় অভয়মামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘেনো, তোকে একটা মাছের মুড়ো দেব?" কারণ অভয়মামা আহারের বিষয়ে খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন, মা তাহা জানিতেন। এত লোকের সমক্ষে 'ঘেনো' বলিয়া ডাকাতে অভয়মামা রোষ-কষায়িতলোচনে একবার আমার মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অবজ্ঞাসূচক দুই-একটি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমার মা তখন কিছু বলিলেন না। তৎপরে আচমনান্তে অভয়মামা যেই ঘরের মধ্যে পান খাইতে আসিয়াছেন, অমনি মা কুপিতা সিংহীর ন্যায়, পদাহতা ফণিনীর ন্যায়, গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "লেখাপড়া শিখে তোর এই বিদ্যে হয়েছে? আমি তোকে 'ঘেনো' বলেছি, তাই ভালো দেখায়, না 'অভয়বাবু' বললে ভালো দেখায়? তোর বন্ধুরা কি জানে না আমি তোর দিদি? তুই বাইরে অভয়বাবু হতে পারিস, আমাদের কাছে তো সেই ঘেনোই আছিস।

জিজ্ঞাসা করে দেখিস, তোর বন্ধুরা ঐ ঘেনো ডাকেই খুশি হয়েছে কি না। আর যদি আমার ঘেনো বলাটা চুকই হয়ে থাকে, তুই তো অতগুলি ভদ্রলোকের সমক্ষে তোর দিদিকে অপমান করলি। এই তোর লেখাপড়ার ফল ? তোর লেখাপড়াকে ধিক, তোর প্রফেসারিতে ধিক, তোর নাম সম্ভ্রমকে ধিক! অমুক কাকার কি কপাল, তোর জন্য এতগুলো টাকা বৃথা খরচ করেছেন!" যখন আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এইরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ চলিতে লাগিল, তখন অভয়মামা আর সহিতে না পারিয়া মায়ের পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "দিদি! মাপ কর, অপরাধ হয়েছে।" অভয়মামাকে আমি বিদ্বান লোক ও গুণী লোক বলিয়া মনে মনে উচ্চ স্থান দিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি যখন আমার মায়ের পায়ে পড়িয়া গেলেন, তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। তিনি চলিয়া গেলে মাকে বকিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে যেমন করে বকো, তেমনি করে অত বড় লোকটাকে বকলে?" মা বলিলেন, "রেখে দে তোর বড় লোক, বড় লোকের মুখে ছাই!" সেদিনকার সে দৃশ্য আমি জন্মে ভুলিব না।

আমার তেজস্বিনী মা একাকিনী পড়িয়াও এইরূপে তাঁহার আত্মমর্যাদাজ্ঞানের গুণে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। বাবা গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটির সময় বাড়িতে আসিতেন। আমি তাঁহাকে যমের মতো ডরাইতাম, কারণ তিনি সামান্য সামান্য কারণে আমাকে ভয়ানক মারিতেন।

আমার মা আমাতে কিছু অন্যায় দেখিলে রাগ করিতেন এবং সাজা দিতেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার কি প্রকার স্নেহ ছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। একবারকার একটা ঘটনা মনে আছে। তখন আমার বয়স চার-পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। সেই সময়ে একবার আমার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল। সেই পীড়ার অবস্থাতে মা ইষ্টদেবতার চরণে প্রণত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার কৃপায় ছেলে যদি সারিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি হাতে মাথাতে ধুনা পোড়াইবেন, এবং নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া দেবতার স্তব লিখিয়া দিবেন। কয়েক দিনের পর আমি সারিয়া উঠিলাম। যেদিন ব্রত উদ্‌যাপনের দিন আসিল, সেদিন পাড়ার একটি মেয়ে আমাকে কোলে করিয়া মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন দেখিবার জন্য ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি, মা স্নান করিয়া আসিয়া দুই হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়া যোগাসনে বসিয়াছেন। পূজারি ব্রাহ্মণ তাঁহার দুই হাতে ও মাথার উপরে কাদার তাল দিয়া তদুপরি জ্বলন্ত আগুনের সরা বসাইয়াছেন এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই আগুনে ধুনার গুঁড়া নিক্ষেপ করিতেছেন, আগুন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। মনে হইল আমার মাকে পোড়াইতে যাইতেছে। যাঁহার কোলে ছিলাম, ভয়ে তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইলাম। তাহার পর যখন একখানি ছুরির বা

নরুনের অগ্রভাগ দিয়া মা'র বুক চিরিলেন এবং একটা ঝিনুকে রক্ত ধরিয়া এক ভূর্জপত্রে দুর্গার স্তব লিখিতে লাগিলেন, তখন আর আমাকে সে ঘরে রাখিতে পারিল না। আমি মেয়েটির কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আমাকে বাহিরে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা আসিয়া আমাকে কোলে লইলেন ও নানা মিষ্ট সম্বোধনে কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার বয়স তখন চারি পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মায়ের উনিশ বৎসর বয়সের সময় আমি হইয়াছি, সুতরাং মায়ের বয়স তখন ২৩ কি ২৪ বৎসরের অধিক নয়। ২৪ বৎসরের বালিকার ঐ মানতের কথা যখন স্মরণ করি, তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে ভাবি, এই ধর্ম-নিষ্ঠা আমার চরিত্রে কৈ ?

শৈশবে ঠাকুরের নিবেদিত অন্নে অরুচি। এই সময়কার একটা অদ্ভুত কথা আছে। অনুমান চারি-পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমি কোন মতেই ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিতে চাহিতাম না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটিতে এটা একটা ভয়ানক কথা। কে যে আমার মাথাতে এ সঙ্কল্প ঢুকাইয়া দিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বেশ মনে আছে যে প্রায় প্রতিদিন আমার ভাত খাওয়া লইয়া একটা মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইত। আমাদের বাড়িতে শালগ্রাম শিব পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পৈতৃক ঠাকুর ছিলেন। প্রপিতামহ মহাশয়ের কথা বলিবার সময় তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইবে। প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জন তাঁহাদের অগ্রে নিবেদন না করিয়া কাহারও আহার করিবার অধিকার ছিল না। আমারও ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিব না। এজন্য বাবার ও মা'র হাতে গুরুতর প্রহার সহ্য করিতাম তবুও নিজের জেদ ছাড়িতাম না। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে, আমার অন্নগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া, অপর অন্ন ঠাকুরদের নিবেদন করা হইত। কিন্তু আমার পিতামাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিত না। অধিকাংশ সময় ঠাকুরদের নিবেদনের পূর্বে আসিয়া আমি বাহিরের দাবাতে আহার করিতে বসিতাম। কোন কোন দিন বাবা কৌতুক দেখিবার জন্য রান্নাঘরের ভিতর হইতে অন্ন নিবেদন করিয়া ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় দাবার এক প্রান্তে যে আমি আহারে বসিয়াছি, আমার পাতে ঠাকুরদের কুশীর জল ছড়াইয়া দিতেন। অমনি, 'ভাত আমি খাব না,' বলিয়া আমি হাত তুলিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতাম ; মা আসিয়া অনেক বুঝাইতেন, কিছুতেই খাওয়াইতে পারিতেন না। শেষে বড়পিসীদের বাড়ি হইতে আমাকে খাওয়াইয়া আনিতে হইত, কারণ তাঁহাদের বাড়িতে ঠাকুর টাকুর ছিল না।

মায়ের স্বপ্ন। এই ব্যাপার লইয়া আমার মাকে পাড়ার মেয়েদের নিকট বড় লজ্জা

পাইতে হইত। তাঁহারা বলিতেন, "তোমার পেটে এ কি কালাপাহাড় এসেছে?" তখন মা তাঁহাদিগকে নিজের একটি স্বপ্নের কথা বলিয়া বলিতেন, "আমি জানি, ও ছেলে জাতহরণীতে হরে নিয়েছে।" সে স্বপ্নটি এই। আমাদের এতৎ প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সংস্কার আছে যে সূতিকাগৃহে ছয়দিনের রাত্রে শিশুকে মাটিতে শোয়াইতে নাই, প্রসূতিকে কোলে করিয়া থাকিতে হয়। মাটিতে শোয়াইলে জাতহরণীতে ধরিয়া লইয়া যায়। তদনুসারে আমি যখন ছয়দিনের ছেলে, সেদিন রাত্রে মা ধাইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে অর্ধেক রাত সে আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর অর্ধেক রাত মা নিজে কোলে করিয়া থাকিবেন। তদনুসারে ধাই অর্ধেক রাত্রি রহিল, পরে মা'র পালা আসিল। মা কিয়ৎকাল বসিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন। মনে করিলেন, শুইয়া ছেলে বুকের উপর শোয়াইয়া ঘুমাইবেন, মাটিতে না শোয়াইলেই হইল। এই ভাবিয়া আমাকে বুকের উপর শোয়াইয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, একটি রূপলাবণ্যসম্পন্না নারী সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছেলেটি নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কে? আমার খোকাকে কোথায় নিয়ে যাও?" স্ত্রীলোক হাসিয়া বলিল, "বাঃ, এ যে আমার খোকা।" মা বলিলেন, "না, আমার খোকা।" মেয়েটি বলিল, "না, আমার খোকা।" এই বিবাদে মা'র ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখেন, আমি বুক হইতে সরিয়া পড়িয়াছি। এই স্বপ্নের কথা চিরদিন মা'র মনে জাগিয়া রহিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আমাকে জাতহরণীতে হরিয়াছে বলিয়া কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি। মা'র মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম।

আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় আমার এক ভগিনী জন্মিল। সে দেখিতে অতি সুশ্রী হইয়াছিল বলিয়া বাবা কবিত্ব করিয়া তাহার নাম 'উন্মাদিনী' রাখিলেন। সে যখন পাঁচ-ছয়মাসের মেয়ে, তখন মা একদিন তাহাকে প্রপিতামহদেবের সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার হাতখানি লইয়া উন্মাদিনীর উপরে রাখিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই মেয়ে হয়েছে দেখ, পদধূলি দেও, আশীর্বাদ কর।" প্রপিতামহদেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মা রে দয়াময়ি! ভুলতে না পেরে আবার এসেছিস্?" প্রপিতামহের দয়াময়ী ও করুণাময়ী নাম্নী দুইটি কন্যা শৈশবেই গত হইয়াছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, সেই দয়াময়ী পুনরায় আসিয়াছে। তদবধি উন্মাদিনীকে তিনি দয়াময়ী বলিয়া ডাকিতেন।

উন্মাদিনী বসিতে সমর্থ হইলেই আমার খেলিবার সঙ্গিনী হইল। দুই ভাই-বোনে বসিয়া খেলিতাম। মা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার মেশা পছন্দ করিতেন না।

তখন পাড়ার ছেলেরা যে কি খারাপ কথা বলিত ও খারাপ কাজ করিত, তাহা স্মরণ করিলে লজ্জা হয়। গালাগালি বৈ তাহাদের মুখে ভালো কথা ছিল না। অধিকাংশ ছেলে রাগিলেই তাহাদের মাকে 'পাঁটী' বলিত। আমাদের প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি জেঠার ছেলে মেয়েরা মাকে এত পাঁটী পাঁটী বলিত যে, তাদের একটি বোনের মা-মা বলার পরিবর্তে পাঁটী পাঁটী বলিয়াই কথা ফুটিল। সে মাকে না দেখিতে পাইলে 'পাঁটী ও পাঁটী' করিয়া কাঁদিত। সেই কুসঙ্গের মধ্যে আমার মা যে আমাদিগকে কিরূপে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। একবার পাড়ার এক ছেলের মুখে তার মা'র প্রতি বাপান্ত গালি শুনিয়া আসিয়া আমি নিজের মাকে সেই গালি দিলাম। আর কোথায় যায়! মা আমাকে ধরিয়া দুইখানা খোলার কুচি একত্র করিয়া আমার গালের মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, রক্তে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে কয়েক দিন আহার বন্ধ হইল, মা আমার গলায় গলান ভাত ও দুধ ঢালিয়া দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি জননীর প্রতি গালাগালি আমার মুখে কেহ কখনও শোনে নাই।

ভাই-বোন। উন্মাদিনীকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম, সর্বদাই কাঁধে করিয়া বেড়াইতাম, কোথাও কিছু ভালো ফল বা ফুল পাইলে তাহার জন্য আনিতাম, সে সঙ্গিনী না হইলে খাইতে বসিতাম না, এবং তাহাকে ফেলিয়া একা শয্যাতে যাইতে পারিতাম না। মা সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের দুই ভাইবোনকে খাওয়াইয়া দিতেন, আমরা দুজনে গিয়া শয়ন করিতাম। আমার কল্পনাশক্তি শৈশব হইতেই প্রবল, কত যে গল্প বানাইয়া উন্মাদিনীকে শুনাইতাম, এখন মনে হইলে হাসি পায়। গল্প শুনিতে শুনিতে আমার গায়ে হাত দিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িত, আমিও ঘুমাইয়া পড়িতাম।

চিন্তাদাসী। ১৮৩৩ সালের সাইক্লোনে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া সুন্দরবনের অভ্যন্তরবর্তী প্রদেশ সকলকে প্লাবিত করে। সেই প্লাবনে যখন গরীব লোকের কুঁড়েঘর ভাসিয়া যায়, তখন হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ নিজ নিজ ঘরের চালের উপরে আশ্রয় লইয়া প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বিভাগে ভাসিয়া আসে। এইরূপে অনেক পুরুষ ও নারী ভাসিয়া আসিয়া আমাদের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। তৎপরেই তাহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করে। এই কলেরার মহামারীতে আমার প্রপিতামহী, পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যু হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল লোক ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চিন্তা নামে এক নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের বাড়িতে শরণাপন্ন হয়। আমার পিতামহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বাড়িতে স্থান দেন, তৎপরেই তাঁহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। চিন্তা আমাদের বাড়িতে থাকিয়া যায়, এবং আমার

বড়পিসীর পরিচারিকা হয়। আমার বড়পিসীর ছেলেমেয়েরা মাতার গর্ভ হইতে চিন্তাদাসীর ক্রোড়েই পড়িয়াছেন ও তাহার ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইয়াছেন। আমিও মাতুলালয় হইতে আসিয়া চিন্তার ক্রোড়ে আশ্রয় পাই। আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইলে দেখিতাম যে চিন্তাই আমাদের হর্ত্রী-কর্ত্রী। আমরা তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতাম না, চিন্তা দিদি বলিয়া ডাকিতাম। চিন্তা সকল কার্যেই পটু ছিল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত, জাল পোলো প্রভৃতি লইয়া গ্রামের প্রান্তবর্তী খাল হইতে মাছ ধরিয়া আনিত, গো দোহন করিত, বাজার হাট করিত, ধান ভানিত, সর্বোপরি আমাদের প্রতি কেহ কোনো অত্যাচার করিলে বাঘিনীর ন্যায় তাহার ঘাড়ে গিয়া পড়িত। চিন্তার প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্কিত থাকিত। চিন্তা এমন সুস্থ ও সবল ছিল যে প্রাতে উঠিয়া ১৮।১৯ মাইল হাঁটিয়া আমার মাতুলালয়ে তত্ত্ব লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

সেই শৈশবকালে চিন্তাদাসী বোধ হয় আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল যে, আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ নারিকেলের গাছ রাত্রিকালে দেশ ভ্রমণ করে। এক ডাকিনী তাহাতে চাপিয়া বেড়াইতে যায়। ইহাতে আমাদের শিশুদলে মহা ভয় হইয়াছিল, পাছে আমাদের নারিকেল গাছ হারাইয়া যায়; কি জানি, ডাকিনী যদি কোথাও ফেলিয়া আসে। চিন্তাদাসী ইহা বলিয়া দিয়াছিল, গাছের গায়ে লোহা মারিয়া রাখিলে ডাকিনীতে গাছ লইতে পারে না। আমার স্মরণ হয়, আমরা কয়েকজন শিশুতে মিলিযা সন্ধ্যার পূর্বে গাছের গায়ে গজাল মারিয়া রাখিয়াছিলাম।

বাংলা স্কুলের ছাত্র। গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের রাজত্বকালে দেশে কতকগুলি আদর্শ বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়। তাহার একটি আমাদের গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিল। কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শ্যামাচরণ গুপ্ত নামক একজন ভদ্রলোক তাহার প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। মা পাঠশালের গুরুমহাশয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া সেই স্কুলে ভর্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া আমি 'স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রকাশিত বর্ণমালা ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নবপ্রকাশিত শিশুশিক্ষা পড়িতে লাগিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষায় অনেক পাঠ মিত্রাক্ষর ও কবিতার মতো ছিল, সেগুলি আমার বড় ভালো লাগিত, দুই-একবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইত। ইহাতে বর্ণপরিচয়ের ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু আমি বর্ণ মিলাইয়া মুখে মুখে কবিতা করিতে পারিতাম।

গ্রামে ইংরাজী স্কুল। হার্ডিঞ্জ বাংলা স্কুল স্থাপনের পরেই আমাদের গ্রামে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। হরিদাস দত্ত নামে জমিদারবাবুদের বাড়ির একজন যুবক তখন দেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। ইনি অল্পদিন হইল

পরলোকগত হইয়াছেন। অনুমান করি, প্রধানত ইঁহার ও ইঁহার বয়স্তদিগের যত্নে ও জমিদারবাবুদের সাহায্যে ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আমার মনে আছে যে, সেই স্কুলে একজন ইংরাজ হেডমাস্টার লওয়া হইয়াছিল। সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। সাহেবের সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে আসিত, সে সাহেবের টেবিলের তলায় শুইয়া থাকিত। আমরা তাহাকে দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। সাহেব জমিদারবাবুদের এক বাগান-বাড়িতে থাকিতেন। আমরা তাঁহার পালিত মুরগী ও অন্যান্য পাখি দেখিবার জন্য গিয়া সেই বাগানে উঁকি ঝুঁকি মারিতাম। সাহেবকে রাস্তায় দেখিলে সে পথ হইতে অন্তর্ধান করিতাম। ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে নূতন সভ্যতার আলোক আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে, হরিদাস দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবকের উৎসাহে 'মজিলপুর পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছুদিন চলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ব্রজনাথ দত্ত নামে আমাদের গ্রামে একজন মধ্যাবস্থ বিষয়ী লোক ছিলেন। জ্ঞানচর্চাতে তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্ঞানী মানুষদিগকে লইয়া সর্বদা জ্ঞানালোচনা করিতে ভালোবাসিতেন। শুনিয়াছি, তিনি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত মজিলপুর পত্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং গ্রামের উন্নতি বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনিই গ্রামে ব্রাহ্মধর্মকে প্রবিষ্ট করেন এবং আমার ভক্তিভাজন স্বগ্রামবাসী গুরুস্থানীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী করেন। এই শিবকৃষ্ণ দত্ত ইহার কিছু দিন পরে 'লুক্রিসিয়ার উপাখ্যান' বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন, এবং বাংলা কাব্য বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হন। পরে ইনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই বহুদিন পরে গতাসু হন। ইঁহার উন্মাদরোগ সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় কথা আছে। ইঁহার পিতা ব্রজনাথ দত্ত জ্ঞানানুরাগী ও গুণীগণের উৎসাহদাতা মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় সিদ্ধি খাইতেন। লোকে যেমন ঘরের দেওয়ালে গোবরের ঘুঁটে দিয়া রাখে, তেমনি তিনি তাহার বৈঠক ঘরের দেওয়ালে ছোট ছোট ঘুঁটের মতো সিদ্ধি দিয়া রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়া নিজে খাইতেন এবং বন্ধুদিগকে খাইতে দিতেন। আশ্চর্য এই, দেখা গেল, ইঁহার কয়েকটি সন্তান পাগল হইয়া গেল। ইঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধি পান ও ভোজন তাহার কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, আমার শৈশবে ও আমার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে মজিলপুর শিক্ষাদি বিষয়ে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ প্রদেশে একটি অগ্রগণ্য গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই গ্রামে ব্রাহ্মধর্মের ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলন চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা যাইবে।

'আদ্য' কথার মানে। এই সময়ের আর কয়েকটি বিষয় স্মরণ আছে। মাতাঠাকুরাণীর

আহার করানোর গুণে আমার ভুঁড়িটি বিলক্ষণ বড় হইয়াছিল। কৃশাকৃতি হাত পা, কিন্তু ভুঁড়িটি বেশ গোলগাল। সেজন্য শ্যামাচরণ পণ্ডিতমহাশয় আমাকে 'আফিং-খেকো বামণ' বলিতেন; এবং আমাকে কাছে পাইলেই, দুই আঙুল দিয়া আমার পেট টিপিতেন। আমি ভুঁড়ির জন্য অনেক শিক্ষকের কাছে এই পেট টেপার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এক-একদিন স্কুলে পৌঁছিলেই পণ্ডিতমহাশয় আমার কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিতেন, এবং পেট টিপিয়া বলিতেন, "আফিংখোর বামণ, তোমার মা তোমাকে কত ভরি আফিং খাওয়ান?" ফলত পণ্ডিতমহাশয় আমাকে বড় ভালোবাসিতেন, তাহার কারণ এই, আমি ক্লাসে পড়াতে সর্বদা প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানে থাকিতাম। তাহার কারণ ছিলেন আমার মা। আমি মায়ের কাছে পড়া শিখিয়া যাইতাম। তবে আমার এইটুকু প্রশংসার বিষয় যে পড়াতে আমার মনোযোগ ছিল। মা প্রাতে উঠিয়া গৃহকর্মে ব্যস্ত হইতেন। আমি বইখানা হাতে লইয়া, "মা, এটা কি?" "মা, এ কথার অর্থ কি?" এই বলিতে বলিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শিশুশিক্ষাতে আছে, আ ও ঢ-য়ে য-ফলা—উদাহরণ "আঢ্য লোক সদা সুখী"। মা ফিরিয়া বলিলেন, "ওটা আঢ্য"। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। প্রশ্ন, "আঢ্য কাকে বলে মা?" উত্তর, "আঢ্য বলতে বড়মানুষ, যেমন গোপালবাবু" (গ্রামের একজন জমিদার)। স্কুলে পণ্ডিতমহাশয় যেই 'আঢ্য' শব্দ বানান করিতে বলিলেন, অমনি সর্বাগ্রে আমি বানান করিলাম, "আ ও ঢ-য়ে য-ফলা—আঢ্য, আঢ্য বলতে বড়মানুষ, যেমন গোপালবাবু।" পণ্ডিতমহাশয় শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "হাঃ হাঃ—ও তুই কোথায় পেলি রে?" উত্তর, "কেন, আমার মা বলে দিয়েছেন।" এইরূপে মায়ের গুণে কোনো বালক আমাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার এক ফল এই হইল যে, অন্যান্য বালকেরা বাড়িতে গিয়া নিজ-নিজ মায়ের কাছে আবদার আরম্ভ করিল, "শিবের মা কেমন পড়া বলে দেয়। তুই কেন দিস্ না?" মায়েরা বলিতে লাগিলেন, "আরে ম'লো, আমি কি লেখাপড়া জানি? শিবের মা তো ভালো জ্বালা ঘটালে।" এইরূপে আমার মা একটু লেখাপড়া জানিয়া ঘরে-ঘরে গোল বাধাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রথম শিক্ষকতা। আমাদের বাড়ির পাশে জ্ঞাতিদের বাড়িতে এক গৌরাঙ্গী বিধবা যুবতী থাকিতেন, তিনি সম্পর্কে আমার পিতার খুড়ী। আমার মাকে অন্নদামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া খাইবার জন্য কিছু মিষ্টদ্রব্য হাতে দিয়া, অনেক খোসামোদ করিয়া বর্ণপরিচয় করিতে বসিতেন, এবং হাতে তালি দিয়া আমাকে নাচাইতেন, আর বলিতেন, "শিব নাচি

নাচি যায়, শিব ডম্বুরু বাজায়, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডম্বুরু বাজায়।" আমি তালে তালে নাচিতাম। ইহার পরে আমার সহৃদয় খুড়ী জেঠী দিদিরা আমাকে দেখিলেই "শিব নাচি নাচি যায়" বলিয়া আমার অভ্যর্থনা করিতেন।

খেলার সাথী খোঁড়া মেয়ে। আমি বোধ হয় ভিতরে ভিতরে চিরদিন প্রশংসাপ্রিয় মানুষ। এ দুর্বলতাটা শৈশব হইতেই আছে। আমাদের পাশের বাড়িতে আমার একজন জ্ঞাতি জেঠার একটি খোঁড়া মেয়ে ছিল, সে বোধ হয় আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় ছিল। সে আমাকে ভুলাইয়া রোজ প্রাতে আমার খাবার হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া খাইত। আমি যেই খাবারের ধামীটি হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতাম, অমনি সে আমাকে মিষ্ট স্বরে ডাকিত, "আগাশ দাদা! এখানে এস।" সে তাহাদের দাবা হইতে নামিতে পারিত না, কাজেই আমাকে যাইতে হইত। কেন যে সে আমাকে 'আগাশ দাদা' বলিত জানি না। যতই আমি তাহাদের দাবার দিকে অগ্রসর হইতাম, ততই তাহার মিষ্ট কথার মাত্রা বাড়িত, "কি লক্ষ্মী ছেলে, কি সুন্দর ছেলে" ইত্যাদি। আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেই দাবায় গিয়া উঠিতাম, অমনি সে বলিত, "এস না ভাই, দুজনের খাবার মিশিয়ে খাই।" এই বলিয়া তাহার ধামীর খাবারগুলি আমার ধামীতে ফেলিয়া থাবা-থাবা করিয়া খাইতে আরম্ভ করিত। তাহাতে আমার আনন্দই হইত। হাসির কথা এই, খাবারগুলি শেষ হইলেই আর সে আমার প্রতি প্রেম দেখাইত না। সামান্য একটু কিছু মনের অনভিমত কাজ করিলেই আমাকে খামচাইয়া, গালি দিয়া, দাবা হইতে নামাইয়া দিত। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আসিতাম। মা বলিতেন, "খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে; পাঁচশো বার বলি, খুঁড়ীর কাছে যাসনি, তবুও মরতে যাস।" মা বারণ করিলে কি হয়, আমি খুঁড়ীর কাছে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না, বোধ হয় প্রশংসাটুকুর লোভে। ইংরাজ কবি কাউপার নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ডিউপ অভ টুমরো ইভন্ ফ্রম এ চাউল্ড।' আমিও নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, 'ডিউপড্ বাই প্রেইজ ইভন্ ফ্রম্ এ চাইল্ড।'

সুন্দরী খেলার সঙ্গিনী। সেকালের আর একটা কথা মনে আছে। একটি সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়িতে তাহার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই আমার খেলাধুলা লেখাপড়া ঘুচিয়া যাইত। আমি তাহার পায়ে পায়ে বেড়াইতাম। আমরা পাড়ার বালক-বালিকা মিলিয়া "চাঁদ চাঁদ, কেন ভাই কাঁদ" প্রভৃতি অনেক খেলা খেলিতাম। তখন সে আমাদের সঙ্গে খেলিত। খেলার ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে এক দলে না পড়িতাম, আমার অসুখের সীমা থাকিত না। আমি তাহার হাত ধরিয়া খেলার সঙ্গীদিগকে বলিতাম,

"আমি এর সঙ্গে থাকব, তোমরা আমার বদলে এ-দল হতে ও-দলে আর কারুকে দাও।" বালকেরা আমার অনুরোধ রাখিত না; বকিয়া, ঠেলিয়া, গলা টিপিয়া আমাকে আর এক দলে দিয়া আসিত। ঐ বালিকার বাড়ি আমাদের স্কুলের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম। ইহার পর আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম ও এখানকার পাঠাদিতে ব্যস্ত হইলাম, তখন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে দূরে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। আর বহু বৎসর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বড় হইয়া ব্রহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর গ্রামে গিয়া আবার তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম কান্তি বিলীন হইয়াছে, সন্তানভারে ও সংসারভারে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহা "তুমি কি আমার সেই খেলার সঙ্গিনী?" নামে একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছি। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেই কবিতাটি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া তাঁহার 'অবলাবান্ধবে' ছাপিয়াছিলেন। আমি সেটিকে সংগ্রহ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু অবলাবান্ধবের পুরাতন ফাইল না পাওয়াতে পারি নাই।

এই পঠদ্দশার স্মৃতি হৃদয়ে বড় মিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মের কয় মাস মর্নিং স্কুল হইত। আমি পাড়ার বালকদের সঙ্গে মিলিয়া অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ফুল তুলিতে যাইতাম। কোঁচড় ভরিয়া ফুল লইয়া স্কুলে যাইতাম। জমিদারবাবুদের বাড়ির সম্মুখে একটা চাঁপা গাছ ছিল, সেই গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতাম। আমি গাছে চড়িতে তত পরিপক্ক ছিলাম না। কখনই ডানপিটে ছেলে ছিলাম না। কিন্তু পাড়ার ডানপিটে ছেলেরা আমাকে গাছে চড়িতে শিখাইতে ত্রুটি করিত না। চড়িতে ভয় পাইলে ভীরু বলিয়া উপহাস করিত, সেটা প্রাণে সহিত না।

গানের দল। সে কালের আরও কয়েকটি কথা মনে আছে। একবার পাড়াতে একদিন রামায়ণ গান হইল। তাহা দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা এক রামায়ণ গানের দল করিল। আমি গাহিতে পারিতাম না, সুতরাং মূল গায়েন হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমার উৎসাহে দলটি জমিয়া গেল। এক ছেলের গলায় একটা ঢোল, আর একজনের হাতে করতাল, ও মূল গায়েনের হাতে চামর দিয়া, আমরা নূপুর পায়ে দিয়া দোহার হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়িতে বাড়িতে গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সে গানের মাথা মুণ্ডু ভাব অর্থ কিছুই থাকিত না। পাড়ার একজন কৌতুকপ্রিয় লোক হাসাইবার মতো কতকগুলো ছড়া বাঁধিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া দিলেন, তাহাই আমরা বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদিগকে শুনাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া

কে কার গায়ে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতেই আমরা পরমানন্দিত হইয়া আপনাদের শ্রম সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম।

পিঁপড়ে কি কথা বলে? আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালবাসিতাম। পুষি নাই এমন জন্তুই নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, ও সকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়েও পুষিতাম। ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্বা ঘাস খাওয়াইতাম, পিঁপড়েদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভালো লাগিত যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে, তখনো পিঁপড়ে হইয়া চারি হাত পায় পিঁপড়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি মারিয়া খ্যাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া সেই কাঁটা দ্বারা সেই মাছি দাবার মাটিতে পুঁতিয়া দিতাম, দিয়া কখন পিঁপড়ে আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। হয়তো আধঘণ্টার পর সেখানে একটি পিঁপড়ে দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটির পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পারে না, তখন চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংরা কাঠিটির উপরে একবার উঠে একবার নামে, বড়ই ব্যস্ত। অবশেষে সে চলিয়া গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি মারিয়া চলিলাম। সে গিয়া গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর আধ ঘণ্টা গেল। শেষে দেখি সৈন্যদল বাহির হইল। পিঁপড়ের সারি, মধ্যে মধ্যে দুইটা করিয়া বলবান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি পিঁপড়ে। পরে ভাবিয়াছি, তাহারা সেনাপতি হইবে। প্রকাণ্ড সৈন্যদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত, তখন মহা টানাটানি আরম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটি তুলিয়া লইলাম। তখন মাছি লইয়া সকলে গর্তের দিকে দৌড়িল। ইহারা ফিরিতেছে, তখন অপরেরা আসিতেছে, পথে মুখোমুখি করিয়া কি সঙ্কেত করিল যে, যাহারা আসিতেছিল তাহারাও ফিরিল। আমি মনে করিতাম, ইহারা নিশ্চয় কথা কয়। তখন মাটির নিকটে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহাদের শব্দ শোনা যায় কি না। কান পাতিয়া আছি, তখন কেহ শব্দ করিলে বারণ করিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পিঁপড়েরা কি বলছে শুনি।" ইহা দেখিয়া বাড়ির লোকেরা হাসাহাসি করিতেন। এই ব্যাপার প্রায় সর্বদাই ঘটিত।

পাখি ধরা। তৎপরে, পাখি ধরিবার ও পুষিবার জন্য অতিশয় উৎসাহ ছিল। পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তাহার মায়ের মতো যত্নে তাহাকে পালন করিতাম। সে জাতীয় পাখিরা কি খায়, তাহাদের মায়েরা কিরূপে

খাওয়ায়, এ সকল সংবাদ পাড়ার ডানপিটে ছেলেদের কাছে পাইতাম. সেইরূপ করিয় দিনের মধ্যে দশবার করিয়া খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাঁধিয়া তাহার মধ্যে বাচ্চা রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যায়। তাহার পর খেজুরগাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া খ্যাংরার মতো করিতাম; তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্ধমৃতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া পাখিকে খাওয়াইতাম। পাখির বাচ্চা পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত। বাবা তখন ছুটিতে বাড়িতে থাকিতেন। তিনি আমার পাখি পোষা দেখিতে পারিতেন না। পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, ইহা সহিতে পারিতেন না। পাখির বাচ্চাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আমাকে ঐ বাচ্চার মায়ের কাজ করিতে হইত। পিতার হস্তে এত প্রহার খাইয়াও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

মা আমার পাখি পোষার বড় বিরোধী ছিলেন না। বোধ হয় ছেলে বাড়িতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে, এই তাঁহার মনের ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারও পাখি পোষা শখ ছিল। আমি চলিয়া আসিবার পরও তিনি অনেক পাখি পুষিয়াছেন।

আমি যে কেবল পাখির বাচ্চা পুষিতাম তাহা নহে, ধাড়ী পাখিও পুষিতাম। বড় পাখি ধরিবার তিন প্রকার কৌশল ছিল। প্রথম, আমাদের উঠানে একটি ধামা খাড়া করিয়া তাহার সম্মুখে চাল কড়াই ছড়াইয়া, ধামার পৃষ্ঠে একগাছি বাঁকারির অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপর প্রান্ত দাবাতে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোনো ঘুঘু বা পায়রা বা শালিক যেই আসিয়া একমনে চাল কড়াই খাইত, অমনি বাঁকারির দ্বারা ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম। দ্বিতীয়, গাছের ডালে যখন পাখিতে পাখিতে ঝগড়া ও মারামারি করিত, তখন তাহার নিচে গিয়া কাপড়ের জাল পাতিতাম। তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়ামড়ি করিয়া পাকা ফলটির মতো গাছের তলায় পড়িয়া যায়। কখনো কখনো ঐরূপে আমার কাপড়ে পড়িয়া যাইত। তৃতীয়, টুনটুনি দোয়েল প্রভৃতি ক্ষুদ্র পাখিরা যখন অন্যমনস্ক ভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত, তখন ভোঁ করিয়া তাহার পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল মারিতাম। হঠাৎ তাহাদের পায়ের নিকটস্থ ডালে

সজোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশেহারা হইয়া পড়িয়া যাইত, আমি অমনি তাহাদিগকে ধরিতাম।

ঢিল ছোঁড়া বিষয়ে আমার অদ্ভুত বিদ্যা ছিল। পাখিকে বাঁচাইয়া ডালে ঢিল মারিতে পারিতাম। বলা বাহুল্য যে, অনেক সময় ডালে ঢিল না লাগিয়া পাখির মাথায় লাগিত এবং পাখিটির প্রাণ যাইত। এইরূপে আমার হস্তে অনেক পাখির প্রাণ গিয়াছে। বলিতে কি, পুকুরে ব্যাঙটি ভাসিতেছে বা গাছে পাখিটি বসিয়া আছে দেখিলেই আমার ঢিল মারিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। শুনিলে হয়তো অনেকে হাসিবেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও সময় সময় বৃক্ষশাখায় পাখিটি আছে দেখিয়া আমার ঢিল মারিতে ইচ্ছা করে, অমনি হাসিয়া সে ইচ্ছা নিবারণ করি।

আমার ঢিল ছোঁড়া বিষয়ে দুইটি ঘটনা স্মরণ আছে। একবার আমার পিতার সহিত কোথায় যাইতেছিলাম। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ হইবে। পিতা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। আমি পশ্চাৎ হইতে দেখিতে পাইলাম, আমার পিতার সম্মুখস্থিত একটি বৃক্ষের শাখাতে একটি শালিক পাখি অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছে। আর সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যে পিতাকে যমের মতো ভয় করিতাম তিনি সঙ্গে, সে কথাও মনে থাকিল না। ভোঁ করিয়া আমার ঢিলটি ছুটিল। পাখিটির কোথায় যে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু পাখিটি পাকা ফলটির মতো বাবার সম্মুখে পড়িয়া গেল। বাবা বুঝিতে পারেন নাই যে আমি পশ্চাৎ হইতে ঢিল ছুঁড়িয়াছি, সুতরাং তিনি মনে করিলেন, আর কোনো কারণে পড়িয়াছে। তিনি পাখিটিকে কুড়াইয়া লইলেন। নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীর ঘাটে লইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগে করিয়া তাহার মুখে জল দিতে লাগিলেন। সুখের বিষয় পাখিটি মরিল না। তিনি পথের একজন লোককে পাখিটি দিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে চলিলেন। আমি পশ্চাৎ চলিলাম।

আর একবার আমি পথে যাইতেছি, আমার সম্মুখে আর একজন লোক যাইতেছে। আমি দেখিতে পাইলাম, দূরে আমাদের সম্মুখস্থ রাস্তার পার্শ্বে একটি ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। অমনি ঢিল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তি আসিল। বলিতে লজ্জা হইতেছে, ভোঁ করিয়া এক ঢিল ছুঁড়িলাম। সে নিরপরাধ প্রাণী চরিতেছিল, আমার ঢিল গিয়া বোধ হয় তাহার মাথায় লাগিল। বুঝিতে পারিলাম না, কেবল মাত্র দেখিলাম, ছাগলটি একবার ভ্যা করিয়া ডাকিয়া মাটিতে মুখ থুবড়াইয়া থুবড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ দেখিয়াই আমি পশ্চাৎ হইতে চম্পট। আর এক পথ ধরিয়া পাড়া ঘুরিয়া কিছু পরে গিয়া দেখি, কয়েকজন লোক জুটিয়াছে, ছাগলটিকে শোয়াইয়া জল ঢালিয়া বাঁচাইতেছে ; বোধ হইল ছাগলটি মরিবে না।

তখন আমি যেমন পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম, তেমনি পাখির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেও ভালোবাসিতাম। যদি দৈবাৎ উঠানে কোনো পাখি আসিত, তাহা হইলে আমি, মা খুড়ী জেঠী যে কেহ সে সময় কথা কহিতেন, সকলের মুখ চাপিয়া ধরিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পাখি এসেছে।"

একবার পাখি দেখিতে গিয়া হাতির পায়ের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তখন আমাদের গ্রামে পোলবন্দী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হাতি যাইত, কারণ, রেল বা রাস্তা ঘাট ছিল না। একবার আমি পাঠশালে বা স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি, দপ্তরটি বগলে আছে ; এমন সময় হঠাৎ একটি নূতন রকমের পাখি দেখিলাম, যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। সে লেজ তুলিয়া চমৎকার শিস দিতেছে। আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলাম, "এ কি পাখি ?" নিমগ্ন চিত্তে তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ওদিকে পোলবন্দী সাহেবের হাতি আসিতেছে। মাহুত চেঁচাইতেছে, পাড়ার লোকেরা "ওরে অমুকের ছেলে, ম'লি ম'লি, পালা পালা" বলিয়া চেঁচাইতেছে। আমার সেদিকে খেয়াল নাই, কানে একটা আওয়াজ আসিতেছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ চেতনা হইতেছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখি হাতি শুঁড় দিয়া আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মাহুত বোধ হয় আমাকে সরাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেছে। হাতির শুঁড় দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া সরিয়া গেলাম।

আমি যে কিছু দেখিলেই এত মনোযোগী হইতাম, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শৈশব হইতেই আমার কারণানুসন্ধিৎসা বড় প্রবল ছিল। মায়ের মুখে শুনিয়াছি যে, আমি দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে 'কেন' 'কেন' বলিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতাম। যথা, তাঁহার কোলে চড়িয়া আর এক পাড়ায় নিমন্ত্রণে যাইতেছি, হঠাৎ পথে একটি নূতন গরু দেখিলাম। অমনি প্রশ্ন—ও কাদের গরু ? উত্তর—পুঁটেদের গরু। প্রশ্ন—এখানে কেন বেখে গেছে ? উত্তর—ঘাস খাবে বলে। প্রশ্ন—কেন ঘাস খাবে ? উত্তর—ক্ষিদে পেয়েছে বলে। প্রশ্ন—কেন ক্ষিদে পেয়েছে ? উত্তর—সমস্ত রাত কিছু খায়নি বলে। প্রশ্ন—কেন খায়নি ? উত্তর—ওরা রাত্রে গরুকে জাবনা দেয় না বলে। প্রশ্ন—কেন রাত্রে জাবনা দেয় না ? উত্তর—ওরা গরীব বলে। প্রশ্ন—গরীব কাকে বলে ? ইত্যাদি। সময়ে সময়ে এই 'কেন'র মাত্রা এত অধিক হইত যে উত্তরের পরিবর্তে চপেটাঘাত পাইতাম। এই কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি হইতেই বোধ হয়, পিঁপড়ে ও পাখির গতিবিধি এত লক্ষ্য করিতাম।

রূপী বিড়াল। কেবল যে পাখি ভালোবাসিতাম তাহা নহে, অন্যান্য জন্তুও পুষিতাম। বিড়ালছানা আনিয়া উন্মাদিনীকে দিতাম, সে পুষিত। অনেক সময়ে আমাদের

উভয়ের অতিরিক্ত প্রেমবশত তাহাদের প্রাণ যাইত। বিড়ালের মধ্যে রূপীর কথা স্মরণ আছে। রূপী একটি মেনি বিড়াল ছিল। এমন সুন্দর বিড়াল কম দেখা যায়। শাদার উপরে পেটের দুই পাশে ও মাথায় কাল দাগ। লোমগুলি পুরু-পুরু, চক্ষু দুটি হরিদ্রাবর্ণ, ও লেজটি মোটা। এখন মনে করি, রূপী বোধ হয় দোআঁশলা বিড়াল ছিল। কে যে তাহাকে দিয়াছিল মনে নাই। উন্মাদিনী ও আমি তাহাকে পুষিয়াছিলাম। তিনি এমনি আদুরে হইয়াছিলেন যে, উনান কাঁথায় শোয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভ্রমের হানি বোধ হইত, বিছানার উপর না হইলে তিনি শুইতেন না। উন্মাদিনী ও আমি যখন সন্ধ্যার সময় আসিয়া শয়ন করিতাম, তখন রূপী বাবা ও মা'র পাতের মাছের কাঁটার লোভও ত্যাগ করিয়া আমাদের দুজনের মধ্যে আসিয়া শুইত। অনেক সময় তিনজনে গলা জড়াজড়ি করিয়া ঘুমাইতাম। মা শয়ন করিতে আসিয়া তাহাকে মশারির বাহিরে ফেলিয়া দিতেন। ভোরে যদি কোনো দিন ঘুম ভাঙিত, দেখিতাম রূপী গরীব দুঃখীর মতো মশারির বাহিরে পড়িয়া আছে। তখন বড় দুঃখ হইত, তাহাকে আবার মশারির মধ্যে আনিতাম। তাহা লইয়া মাতা-পুত্রে বিবাদ হইত।

আর এক খেলার সঙ্গী। আমাদের তখনকার আর একজন খেলার সঙ্গীর কথা স্মরণ আছে। সে শেয়ালখাকী। শেয়ালখাকী একটা মাদী কুকুর। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমার বাবা একদিন দেখিলেন একটি কুকুরের বাচ্চাকে শেয়ালে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া তাঁহার দয়ার আবির্ভাব হইল। তিনি হৈ হৈ করাতে ও ঢিল ঢেলা মারাতে শেয়ালটা বাচ্চাটকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। বাবা বাচ্চাটা কুড়াইয়া আনিলেন। সে তখন অতি শিশু। তাহার পৃষ্ঠের শেয়ালের কামড়ের ঘা শুকাইতে অনেক দিন গেল। সে বড় হইল, বাবা তাহার নাম শেয়ালখাকী রাখিলেন। শেয়ালখাকী আমাদের বাড়িতেই রহিয়া গেল এবং পাড়ার বালক-বালিকার খেলিবার একটা মস্ত সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমার ভাবিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, আমরা শেয়ালখাকীকে আমাদেরই একজন ভাবিতাম। সে সকল খেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমরা পাড়ার বালক-বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখনো কখনো বনভোজনে যাইতাম। পাড়ার নিকট কোনো জঙ্গলময় স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখানে উনান করিয়া প্রত্যেকের বাড়ি হইতে কাঠ কুটা চাল ডাল বহিয়া লইয়া যাইতাম। বালিকারা রাঁধিত, বালকেরা হইত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, এবং তাহাদের মা খুড়ী জেঠীরা হইতেন অতিথি। পরম সুখে বনভোজন হইত। শেয়ালখাকী আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বনে থাকিত। আহারান্তে আমরা যখন বনে লুকোচুরি খেলিতাম, তখন শেয়ালখাকী বনের মধ্যে লুকাইত, আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমরা তাহাকে খেলার সঙ্গী বলিয়া জানিতাম।

শেয়ালখাকীর দুইটি কীর্তি স্মরণ আছে। একবার আমরা কয়েকজন বালকে পরামর্শ করিলাম যে প্রতিবেশীদের একটা পুরাতন ভাঙা দালানে ঢুকিয়া পায়রা ধরিব। ঐ দালানের মধ্যে অনেক পায়রা থাকিত। আমরা মধ্যে মধ্যে ঘরে ঢুকিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া তাড়া দিয়া পায়রা ধরিতাম। কিন্তু দ্বার জানালা ভাঙিয়া তাহাতে এত গর্ত হইয়া গিয়াছিল যে সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য প্রায় পাঁচ-ছয়জন বালককে ঘরে প্রবেশ করিতে হইত। দরজা জানালার গর্তে-গর্তে পিঠ দিয়া এক-একজন বালক দাঁড়াইত, আর একজন পায়রাদিগকে তাড়াইয়া ধরিত। সেদিন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে চারিজন বৈ জুটিল না। আমরা একটি বালক খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি শেয়ালখাকী আসিতেছে। শেয়ালখাকীকে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম, ভাবিলাম আর বালকের প্রয়োজন নাই, শেয়ালখাকী দ্বারাই কাজ চলিবে। বলিলাম, "শেয়ালখাকি! আয় আয় পায়রা ধরিতে যাই।" শেয়ালখাকী অমনি প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে চলিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এক-একজন বালক এক-এক ছিদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নিচে চৌকাঠের উপরে একটা ছিদ্র ছিল। শেয়ালখাকীকে বলা গেল, "শেয়ালখাকি! এই গর্তের মধ্যে লেজ দিয়ে বসে থাক, দেখিস যেন এ জায়গা ছেড়ে উঠিসনে।" তখন আশ্চর্য বোধ হয় নাই, এখন যতবার ভাবি আশ্চর্য বোধ হয়, শেয়ালখাকী কিরূপে আমাদের কথা বুঝিল। সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিয়া নিজের পিঠের দ্বারা ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। পরে পায়রাদিগকে যখন তাড়া দিতে আরম্ভ করা গেল এবং পায়রাগুলি তাহার মুখের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন না জানি শেয়ালখাকীর পক্ষে স্থান ত্যাগ করিয়া পায়রার সঙ্গে ছুটিবার কি প্রলোভনই হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে তা করিল না, আমরা যেরূপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রহিল।

আর একটি ঘটনা এই: আমাদের বুধী বলিয়া একটা গাভী ছিল। তাহার একটি রাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় রাখালের সঙ্গে বুধীকে লইয়া মাঠে যাইত। সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া বৈকালে ঘরে আসিত। একবার বাবা কি কারণে রাগ করিয়া রাখালটাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন বুধী ঘরে বাঁধা পড়িল। তাহাকে চরায় কে? এইরূপে দুই-একদিন গেল। পরে আমি বলিলাম, "বাবা, শেয়ালখাকীকে দিলে সে গরু চরিয়ে আনতে পারে।" শুনিয়া বাবা হাসিলেন, "হাঃ, কুকুরে আবার গরু চরাবে!" মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন, তিনি তখন আমার কথায় যোগ দিলেন। তখন শেয়ালখাকীর সঙ্গে গরু পাঠানো স্থির হইল। কেমন করিয়া গরু চরাইতে হইবে তাহা শেয়ালখাকীকে বুঝাইয়া দেওয়া গেল। সে গরু লইয়া

যাইতে আরম্ভ করিল। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, গরু আর আসে না। বাবা ও মা চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে, একা শেয়ালখাকী মহা চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে, সঙ্গে গরু নাই। আসিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করে, একটু দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়, আবার নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখের দিকে চায়, ডাকে, আবার দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়। শেষে বাবা বুঝিলেন যে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। তখন আমাদের দুইজন বালককে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা সঙ্গে গিয়া দেখি, একজনেরা আমাদের গরু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা শেয়ালখাকীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে, কুকুরটা আবার এসেছে, নিজে মার খেয়ে গিয়ে বাড়ির লোক ডেকে এনেছে।"

এই শেয়ালখাকীর ন্যায় আরও অনেকবার অনেক কুকুর পুষিয়াছি।

আমার প্রপিতামহ। সর্বশেষে, আমার প্রপিতামহকে এই কালের মধ্যে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। আমার স্মৃতিশক্তি যত দূর যায়, আমার জ্ঞানোদয় পর্যন্ত আমি তাঁহাকে অন্ধ বধির ও বাড়ির বাহিরে যাইতে অসমর্থ দেখিয়াছি। সে সময়ে বোধ হয় তাঁহার বয়স ৯৫ বৎসর ছিল। তিনি খর্বাকৃতি ও কৃশাঙ্গ মানুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে একটি বালকের মতো দেখাইত। আমার মা তাঁহার ধর্মভাব ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে কোলের শিশুটির ন্যায় তাঁহাকে হাতে ধরিয়া পালন করা আমার মা'র এক প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, তৎপরে ছোট শিশুটির ন্যায় তাঁহার কাপড় ছাড়াইয়া কাচা কাপড় পরাইয়া পূজার আসন ও কোশাকুশী দিয়া তাঁহাকে পূজায় বসাইয়া দিতেন। বসাইয়া দিয়া নিজের গৃহকর্মে যাইতেন। পূজা অন্তে আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বসিবার আসনে বসাইয়া দিতাম।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ছোট কোঠা-ঘর ছিল, তাহার এক অংশে প্রপিতামহ মহাশয় থাকিতেন, আর এক অংশে ঠাকুরঘর ছিল। সে জন্য সমগ্র ঘরটি ঠাকুরঘর বলিয়া উক্ত হইত। ঠাকুরঘরে এক পাথরের বড় শিব, এক কাষ্ঠনির্মিত পঞ্চানন, এক স্ফটিকনির্মিত বাণলিঙ্গ শিব, এক শালগ্রাম শিলা, এই চারি ঠাকুর থাকিতেন। বোধ হয় প্রপিতামহের অন্নপ্রাশনের সময় পাথরের শিবের প্রতিষ্ঠা হয়, আমার পিতার অন্নপ্রাশনের সময় কাষ্ঠনির্মিত পঞ্চাননের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং অপর দুইটি ঠাকুর বোধ হয় কুলক্রমাগত। প্রপিতামহের যত দিন শক্তি ছিল, তিনি নিত্য ঠাকুরঘরে গিয়া ঐ ঠাকুরগুলি পূজা করিতেন। কিন্তু আমি যখন দেখিয়াছি, তখন

তিনি আর ঠাকুর পূজা করিতে ঠাকুরঘরে যান না, আমার পিসামহাশয় প্রভৃতি অন্য লোকে ঠাকুর পূজা করেন।

স্নানের প্রতি প্রপিতামহ মহাশয়ের বড় ভয় ছিল, এজন্য মাসে দুই-চারিবার মাত্র স্নান করানো হইত। কেন যে স্নানে ভয় ছিল বলিতে পারি না। দেখিতাম, মাথায় বা গায়ে জল দিলে 'বাপরে মারে' করিয়া পাড়ার লোক জড়ো করিতেন। সেই জন্য প্রতিদিন প্রাতে কাপড় ছাড়াইয়া সন্ধ্যা আহ্নিকে বসানো হইত।

আমি চলিতে বলিতে শিখিলেই তাঁহাকে ধরিয়া ঘরের বাহির করা, শৌচে লইয়া যাওয়া, তাঁহার মুখ ধুইবার জল আনিয়া দেওয়া, কাপড় আনিয়া দেওয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে সরু গলাতে 'পো' বলিয়া ডাকিলেই তিনি পুলকিত হইয়া উঠিতেন। কোনো কাজে আমার দরকার হইলেই আমাকে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। সর্ববিষয়ে আমাকে অতিরিক্ত আদর দিতেন। মা আমাকে মারিলে আমি কাঁদিতাম, আমার ক্রন্দনের স্বর যদি তাঁহার কানে যাইত তাহা হইলে "বাবা কাঁদে কেন?" বলিয়া রাগিয়া ফাটাফাটি করিতেন। এইজন্য মা মারিলেই আমি আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া পো-র নিকট গিয়া কাঁদিতাম।

পো অধ্যাপক ছিলেন, বাড়িতে বসিয়া বিদায় আদায় যাহা উপার্জন করিতেন তাহাতেই সুখে সংসার চলিত। কখনো কখনো গ্রামের বিষয়ী লোকদিগের গৃহে ক্রিয়াকর্ম হইলে, পো-র জন্য বিদায়ের ডালি আসিত। ডালির অর্থ, একখানি সরাতে একটু চিনি ও দশ-বারোটি সন্দেশ, তৎসহ একটি ঘড়া, কি একটি গাড়ু, কি কতকগুলি মুদ্রা। আমি বাহিরে খেলা করিতে করিতে যদি দেখিতাম যে ডালি আমাদের ভবনের অভিমুখেই যাইতেছে, তখনই সঙ্গ লইতাম। প্রপিতামহ মহাশয় বাহির বাড়ির দিকে এক রকে বসিয়া জপ করিতেন। লোকে ডালিটি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ছুঁয়াইয়া দিত। তিনি বুঝিতেন যে ডালি আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেন "কার বাড়ি হ'তে?" ডালি-বাহক চীৎকার করিয়া নামটা বলিয়া দিত। তখন পো আমাকে ডাকিতেন, "বাবা!" আমি অমনি ছোট ছোট অঙ্গুলিতে তাঁহার গা ছুঁইয়া দিতাম; ভাবিতাম, বেশি চেঁচাইলে মা শুনিতে পাইবেন। প্রপিতামহ বুঝিতেন, বাবা উপস্থিত। টাকাগুলি নিজের কাছে রাখিয়া বলিতেন, "এই সন্দেশের সরা মাকে নিয়া দেও।" বাবা তো সরাখানি লইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া অধিকাংশ খাইলেন, শেষে রান্নাঘরের কাছে গিয়া বলিলেন, "মিত্তের বাড়ি থেকে ডালি এসেছিল ঐ সে সরা," এই বলিয়া রান্নাঘরের দাবাতে সরাখানি রাখিয়াই দৌড়। মা রাগিয়া

পো-র নিকট আসিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন, "আমাকে কি ডাকতে পার না? বড় যে 'বাবা' 'বাবা' কর, ঐ বাবা সব সন্দেশ খেয়ে ফেলেছে।" প্রপিতামহ মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া উঠিতেন, "হাঃ হাঃ, বেশ করেছে, ওর জন্যই তো সব।" যখন সরাখানি আমার হাতে না পড়িয়া মায়ের হাতে পড়িত, তখন পো হাত দিয়া সন্দেশ গুলি গণিয়া রাখিতেন। তাহার পর তাঁহাকে প্রতিদিন কয়টা করিয়া সন্দেশ দেওয়া হইত তাহা গণিতেন। যদি দেখিতেন অধিকাংশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে ফাটাফাটি করিতেন, "আমাকে যদি সব দিলে তো বাবা খেলে কি?"

এ সকল লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। হায়! তখন আমি তাঁহার এতটা প্রেম বুঝি নাই।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই ২।৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর। পো-র পাতের মাছ চুরি করিয়া খাইত, তিনি দেখিতে পাইতেন না। এইজন্য মা প্রথম প্রথম পো-কে আহারে বসাইয়া বাম হস্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন; বলিয়া আসিতেন, "মধ্যে মধ্যে বাড়িগাছটা আপসো, বেড়াল আসে।" পো মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটা লইয়া বিড়ালের উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পো-র পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো তাহার উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পো-র পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন; আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক-এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না; এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি নিয়ম এই ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার, হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইশারাতে ডাকিতে লাগিলেন "উঁ, উঁ!" অর্থাৎ কে আমাকে ছুঁইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন, পেটুক

পুত্রটির হাতে মুখে দইয়ের দাগ, আর লুকাইবার যো নাই। পো-র কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উঁ কি? ঐ 'বাবা'। বড় যে আদর দেও!" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, "হাঃ হাঃ, বেশ করেছে, তবে ও-ই সব থাক," বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মা'র সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তো বেরাল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেরাল হয়েছে।"

আমি বাল্যকালে প্রপিতামহদেবের অধর্মের প্রতি যে বিরাগ দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। পরিবার মধ্যে আমার পিতা বা মাতা কাহারও কার্য ধর্ম বা নীতি-সঙ্গত হয় নাই, এরূপ মনে করিলে তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতেন বা মাথা খুঁড়িতেন। ক্রোধ কোন প্রকারেই সম্বরণ করিতে পারিতেন না। আমার কোনো দুষ্টামি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে মাকে ডাকিয়া আমাকে শাসন করিতে আদেশ করিতেন। পাছে আমি পাড়ার কুসঙ্গে মিশিয়া দুষ্টামি শিখি, বোধ হয় এই ভয় করিতেন: কারণ, দেখিতে পাইতাম যে, কুকুরটা বাছুরটা তাঁহার ঘরের রকের সম্মুখ দিয়া গেলে, ঝাপসা-ঝাপসা দেখিয়া, "ওই বাবা বাইরে গেল" বলিয়া মাকে ডাকাডাকি ও মহামারি উপস্থিত করিতেন। এইজন্য আমাকে পা টিপিয়া টিপিয়া বা পিছন দিয়া অনেক সময়ে পলাইতে হইত।

প্রপিতামহের শাস্ত্রজ্ঞান ও সংস্কৃতানুরাগ। প্রপিতামহদেব একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানুরাগী মানুষ ছিলেন। আমার স্মরণ আছে, গ্রামের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে মধ্যে মধ্যে কঠিন কঠিন প্রশ্ন বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। তখন চীৎকার করিয়া প্রশ্নগুলি তাঁহাকে বোঝানো ও ব্যবস্থা লওয়া এক মহা ব্যাপার পড়িয়া যাইত। বয়সে অতি প্রাচীন হইলেও তিনি সেরূপ স্মৃতিশক্তি হারান নাই। তিনি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার জ্ঞানালোচনাতে আনন্দ দেখিতাম। তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞান বিষয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রথমটি এই। অনুমান ১৮৫১ কি ১৮৫২ সালে আমাদের গ্রামের স্কুলের মধ্যে একটি সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেণী খোলা হয়। আমাদের জ্ঞাতিবর্গের বাড়ির অনেক ছেলে তাহাতে ভর্তি হয়, এবং আমার মাতার জ্যাঠতুতো ভাই চাঙ্গড়িপোতা গ্রাম নিবাসী কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সেই সংস্কৃত শিক্ষা শ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি কর্ম লইয়া আমাদের গ্রামে গিয়া আমাদের বাড়িতেই বাস করিতে থাকেন, এবং সংস্কৃত কাব্যাদির বিচার বিষয়ে আমার প্রপিতামহের একজন সহায় ও সঙ্গী হইয়া পড়েন। প্রাতে গ্রামের কোনো কোনো

ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার নিকট পড়িতে আসিতেন। তাঁহাদের মুখে প্রপিতামহ মহাশয় সংবাদ পাইতেন, তাঁহারা কি পড়েন; তাহাতে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আমি কলিকাতা হইতে বাড়ি গেলেই দেখিতে পাইতাম, তিনি কৈলাসমামাকে ডাকিয়া তিন চরণ সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিয়া, শেষ চরণ কি তাহা জানিতে চাহিতেছেন; কৈলাসমামা আশ্চর্যান্বিত হইয়া আমার মাকে বলিতেছেন, "দিদি, কি আশ্চর্য! এ সকল শ্লোক এখনো ওঁর স্মরণ আছে!"

অপর ঘটনাটি হাস্যজনক।

'রাম শব্দের টা-তে কি হয়?' আমি ১৮৫৬ সালে যখন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইলাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানকার কর্তা। তিনি তৎপূর্বে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ানো বন্ধ করিয়া নিম্ন শ্রেণীতে তাঁহার প্রণীত উপক্রমণিকা ধরাইয়াছেন। আমরা উপক্রমণিকা অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিলাম। তৎপরে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে আসিলে আমার প্রপিতামহদেব শুনিলেন যে আমি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়াছি, তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! রাম শব্দের 'টা'-তে কি হয়, বল তো।" আমি বালকের কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "রাম শব্দের আবার 'টা' কি?—রামটা।" তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঘোড়ার ঘাস কাটবে।" "রাম শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কি হয়"—বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে পারিতাম 'রামেণ'। কিন্তু আমি তো মুগ্ধবোধ পড়ি নাই, কাজেই রাম শব্দের 'টা' যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা লইয়া আমার বাবার সহিত প্রপিতামহদেবের কথা হইল, বাবা সমুদয় কথা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতেছি না শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন।

বাবার মুখে শুনিয়াছি, প্রপিতামহ মহাশয়ের সময়ে কলাপ ব্যাকরণ পড়িবার রীতি ছিল, তদনুসারে তিনি যৌবনে কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমার পিতা মহাশয়ের পঠদ্দশাতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তদনুসারে প্রপিতামহ মহাশয় বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে আমি মুগ্ধবোধ পড়ি, সেই জন্যই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "রাম শব্দের 'টা'-তে কি হয়?"

প্রপিতামহদেব আমার মাতার মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। সুতরাং সময়ে অসময়ে মাতাকে ডাকিয়া, কোন স্থলে কিরূপ কর্তব্য, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই সকল উপদেশ আমার মাতার অন্তরে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি সমগ্র জীবনে ঐ সকল উপদেশ হইতে একপদও বিচলিত হন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রপিতামহ মহাশয় আমার জননীকে বিবাহিতা হিন্দু রমণীর যে

গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, মাতা চিরদিন সেই পথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আমার শৈশবে আমার মাতৃদেবীর ও আমার প্রপিতামহের যে ধর্মভাব দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। আমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য মা'র ইষ্টদেবতার নিকট মানতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহাই কেবল নহে, ধর্ম সাধন তাঁহার প্রতিদিনের প্রধান কার্য ছিল। মাটি দিয়া শিব গড়িয়া নিত্য পূজা করিতেন। সে পূজাতে অনেকক্ষণ থাকিতেন। খাবার অন্ন ঠাকুরদিগকে নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না। বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রত নিয়ম উপবাসাদি চলিত, প্রতিদিন পূজার ফুল আনিয়া আমার মাথায় দিতেন এবং নিজের পদধূলি দিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

সাধুপুরুষ প্রপিতামহ। প্রপিতামহদেবের ধর্মভাবও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাসী ভক্ত শাক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার ইষ্টদেবতাকে সর্বদা 'দয়াময়ী মা' বলিয়া ডাকিতেন। যৌবনে নিজের দুই কন্যা সন্তান জন্মিলে তাঁহাদের নাম 'দয়াময়ী' ও 'করুণাময়ী' রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বাল্যকালেই গত হন। দয়াময়ী করুণাময়ীর চিন্তা তাঁহার মনে কিরূপ লাগিয়া ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের মৃত্যুর প্রায় ষাট বৎসর পরে যখন আমার প্রথমা ভগিনী উন্মাদিনী জন্মিল, তখন তাঁহার মনে হইল দয়াময়ী আবার আসিয়াছে।

প্রপিতামহদেব জপতপ পূজাদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় যাপন করিতেন। প্রথমত প্রায় একঘণ্টা কাল দেব দেবীর পূজন ও জপ প্রভৃতিতে যাইত, তৎপরে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পিতৃপুরুষের তর্পণে অতিবাহিত হইত। তৎপরে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল মাটিতে মাথা ঠুকিয়া ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা হইত। এই প্রণাম করিয়া করিয়া তাঁহার কপালের উপরে একটা আবের মতো মাংসের গুলি জন্মিয়াছিল। মাথা ঠুকিয়া যখন প্রার্থনা করিতেন,তখন আমার মা কোনো কোনো দিন কান পাতিয়া শুনিতেন। একদিন মা শুনিলেন যে, তিনি মুখে মুখে বাংলা ভাষাতে তাঁহার ইষ্টদেবতার চরণে আমার বিদেশবাসী পিতার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন, "মা দয়াময়ি! সে বিদেশে পড়ে আছে, তাকে রক্ষা করো। সে কাহারও বারণ শোনে না, তাকে সুমতি দেও," ইত্যাদি। সর্বশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া নাচিতেন। নাচিবার সময় আমার ডাক হইত, 'বাবা!' আমি তখন দিগম্বরমূর্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন এবং প্রপিতামহের হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন। অমনি দুইজনে হাতে হাত ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। তিনি তিনশত পঁয়ষট্টিদিন নাচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার দুই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে—

"দুর্গা দুর্গা বল ভাই,
দুর্গা বই আর গতি নাই।"

মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে লইয়া প্রাতে নাচিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সায়ংসন্ধ্যার পর কাপড় মুড়ি দিয়া নিজ শয্যাতে বসিয়া আমাকে কোলে লইয়া মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতেন, দেবতাদের স্তব প্রভৃতি শিখাইতেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিখাইতেন। যথা—প্রপিতামহের নাম কি? প্রশ্ন করিয়াই তদুত্তরে বলিতেন. "বল, শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার।" আমি বাল্যস্বরে বলিতাম, "শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার," ইত্যাদি। তৎপরে দেবদেবীর যে সকল স্তব মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন এবং আমাকে আবৃত্তি করাইতেন, তাহার সকলগুলি মনে নাই। একটি মনে আছে, তাহা এই—

সর্বমঙ্গলা-মঙ্গল্যে, শিবে, সর্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে, ত্র্যম্বকে, গৌরি, নারায়ণি, নমোঽস্তু তে।

সে সময়কার আর একটি শ্লোক আমার স্মরণ আছে, তাহা মনে হইলে ক্ষোভ-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদয় হয়। মনে হয়, অল্পদিনের মধ্যে আমাদের গৃহে কি পরিবর্তনই ঘটিয়া গেল! আমার প্রপিতামহ আমাকে অপরাপর প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন করিতেন, "বাবা, তোমরা কোন জাতি?" বলিয়াই বলিতেন, "বল, আমরা ব্রাহ্মণ।" পরে প্রশ্ন—"কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? আবার উত্তর—"দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ"। আবার প্রশ্ন—"তোমরা কত দিন ব্রাহ্মণ?" উত্তর—

"যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা, যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে,
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ, তাবদ্বিপ্রকুলে বয়ম্।"

অর্থাৎ, দেবগণ যতদিন মেরুতে আছেন, গঙ্গা যতদিন পৃথিবীতে আছেন, চন্দ্র সূর্য যতদিন আকাশে আছেন, ততদিন আমরা ব্রাহ্মণকুলে আছি। এখন ভাবি, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, আর আমি কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি!

আমি জ্বরে পড়িলে বা অন্য কোন প্রকার পীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমার মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেন, এবং পীড়ার কথা জানাইতেন। তৎপরে প্রপিতামহদেব আমার দেহে হাত বুলাইয়া ঝাড়িতে আরম্ভ করিতেন, সমগ্র দেহে ফুৎকার দিতেন, ও মুখে-মুখে ইষ্টদেবতার স্তব আবৃত্তি করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, ঝাড়িয়া দেওয়াতেই অনেক সময়ে বোধ হয় আমার জ্বর সারিয়া যাইত। এইজন্য জ্বরে আমার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইলেই, আমি "পো-র কাছে নে যা" বলিয়া কাঁদিতাম।

এই সাধু ও সিদ্ধ পুরুষের স্মৃতি আমাদের পরিবারে জীবন্ত রহিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন যাহা কিছু আছে, আমাদের গৃহে যত্নপূর্বক রক্ষিত হইতেছে। সে সকলকে সকলেই পবিত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ত্যাগের পর আমার একবার যক্ষ্মা রোগের সূচনা হয়, তখন আমার জননী আমার পরিচর্যার জন্য কলিকাতা আসিয়া আমাকে লইয়া কয়েক মাস ছিলেন। তিনি আমার পূজ্য পো-ঠাকুরদার লাঠি যোগপট্ট ও মালা আনিয়া আমার শয্যাতে রাখিয়াছিলেন, বিশ্বাস এই ছিল, তাহার গুণে আমি রোগমুক্ত হইব। তিনমাস কাল ঐ সকল দ্রব্য আমার শয্যা হইতে সরাইতে দেন নাই। তৎপরে এ-লোক হইতে যাইবার সময় পো-র জপের মালা আমার ভগিনীকে ও তাঁহার আহারের বাটি আমাকে দিয়া গিয়াছেন, আমি প্রতিদিন তাহা ব্যবহার করিতেছি।

আমি আর কি বলিব, তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে, অনেক মানুষ দেখিয়াছি, নিজে অনেক ভ্রম প্রমাদ করিয়াছি, কিন্তু যখনই সেই সাধু পুরুষের সেই ধর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করি, তখনই নিজের দুর্বলতা স্মরণ করিয়া লজ্জাতে অভিভূত হইয়া যাই। বহু বর্ষ পরে যখন আমার মা কাঁদিয়া বলিতেন, "হায় রে, এমন সাধু পুরুষের এত আশীর্বাদ কি বৃথা গেল?" তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না। মনে মনে বলিতাম, "হায় রে, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে যেমন অকপটে 'মা' বলিতেন, আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি না!"

ক্রমে আমি নবম বৎসরে আসিয়া উপনীত হইলাম। নবম বৎসরে আমার উপনয়ন হইল। উপনয়নান্তে পো নিজে আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিজের নিকট লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা করাইতে লাগিলেন।

কলিকাতা যাত্রা। ইহার অল্পদিন পরেই বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। সেদিনকার কথা আমি ভুলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে; বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হাম্‌লায়, তেমনি আমার মা সেদিন হাম্‌লাইতে লাগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম, তিনি পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন কোনো দিন ভুলিব না। উন্মাদনী চিন্তাদাসীর সঙ্গে শালতী ঘাট পর্যন্ত আমাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। যখন সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পাগ্‌গা দাদা, (অর্থাৎ পাগলা দাদা.) আমার জন্যে পুতুল এনো," তখন আমি কাঁদিয়া অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল, আমার মনে হইল, আমার বুকের হাড় খুলিয়া লইয়া গেল। আমি পিতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিলাম।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ। ১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে বাবা আমাকে কলিকাতায়

আনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে আমাকে ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া ইংরাজী শিখাইবেন ; কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তিনি সংস্কৃত শিক্ষাতে এত বৎসর দিয়াও এবং কলেজ হইতে সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও ২৫ টাকার অধিক বেতন পাইলেন না। সুতরাং বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজীর গন্ধ না হইলে কাজ কর্ম পাইবার সুবিধা নাই। কিন্তু তাঁহার অবস্থাতে তাহা করিতে দিল না। তিনি তখন বর্ধমান জেলায় আমদপুরে পণ্ডিতি করিয়া আসিয়া কলিকাতা বাংলা পাঠশালাতে ২৫ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম করিতেন। অতএব পুত্রকে উৎকৃষ্টরূপে ইংরাজী শিখাইবার যে বাসনা ছিল তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল।

কেবল তাহাই নহে। হেয়ার স্কুলে না দিবার আরও একটি কারণ উপস্থিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ঐ কলেজে আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপকতা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার মাতুলের সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারি-দিন আমাদের বাসাতে আসিতেন, এবং আমাকে নিকটে পাইলেই দুইটা আঙ্গুল চিমটার মতো করিয়া আমার পেট টিপিতেন ; সুতরাং বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন শুনিলেই আমি সেখান হইতে পলাইতাম। যাহা হউক, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তিনি আমার বাবাকে আমাকে হেয়ার স্কুলে না দিয়া সংস্কৃত কলেজেই দিতে বলিলেন, তদনুসারে আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হইল।

আমার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই সময়ে পীড়িত হইয়া স্বীয় গ্রামের বাড়িতে বাস করিতেছিলেন। আমি কলিকাতায় আসিয়া চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনের নিকটস্থ 'মহাপ্রভুর বাড়ি' নামক এক বাড়িতে মাতুলের বাসাতে রহিলাম। ঐ বাড়ির বাহিরে নিচের তলাতে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুইজনের কাষ্ঠনির্মিত দুই প্রকাণ্ড মূর্তি ছিল। হরেকৃষ্ণ বাবাজী নামক এক বাবাজী ঐ বাড়ির মালিক এবং ঐ উভয় মূর্তির সেবক ছিলেন। সেই বাড়ির এক ঘরে একটি চিত্রকর থাকিতেন, তিনি বাবুদের ছবি আঁকিতেন। তাঁহার ঘরে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিয়া তাঁহার ঘরে অনেকক্ষণ থাকিতাম, নিমগ্ন-চিত্তে ছবিগুলি দেখিতাম। আমার ছবি দেখার নেশা সেই অবধি অদ্য পর্যন্ত যায় নাই। আমাকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে রাখিয়া দিলে বোধ হয় আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকিতে পারি।

আমরা বাড়ির ভিতর উপরতলায় থাকিতাম। সেই উপরতলায় এক পার্শ্বে আমার মাতুল গ্রামের আর কয়েকটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা আমাকে বড়

ভালোবাসিতেন। সে পুরুষের বাসা, সমস্ত দিনের মধ্যে একটি মেয়েমানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না। স্বসম্পর্কীয় ও স্বগ্রামের অনেকগুলি যুবককে আমার মাতুল অন্ন দিতেন, তাঁহারা সকলে ঐ বাসাতে থাকিতেন। এক-একটি ভীষণাকৃতি মর্দ; কেহ দেড় কুনিকা, কেহ দুই কুনিকা চাউলের ভাত খায়। কেহ পড়ে, কেহ বা কিছু কাজ করে, কেহ বা নিষ্কর্মা বসিয়া খায়। আমার বাবা সংস্কৃত দশকুমারচরিত হইতে নাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাহারও নাম 'দর্পসার', কাহারও নাম 'দর্প-নারায়ণ', কাহারও নাম 'চণ্ডবর্মা' রাখিয়াছিলেন; সেই নামে তাঁহাদিগকে ডাকিতেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকের ভোজনের পাথরের পৃষ্ঠে নরুন দিয়া খুদিয়া কে কত কুনিকা চাউলের ভাত খায় তাহাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। থালা ঘটি বাটি সর্বদা চুরি যাইত বলিয়া আমার মাতামহ থালা বাটির পাট উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেকের জন্য এক একখানি মেটে পাথর কিনিয়া দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত লোক আসিলে শালপাতা কিনিয়া দেওয়া হইত। আমি আসিলে আমার একখানি মেটে পাথর আসিল। প্রত্যেককে আপন আপন পাথর মাজিতে হইত।

বাসার লোক। পুরুষ পুরুষের সঙ্গে থাকিলে তাহাদের আলাপ আমোদ, কথাবার্তাতে লাজ সরম থাকে না। বাসার লোক আমাকে দেখিয়াও কিছু সঙ্কোচ করিত না; অবাধে সকল প্রকার আলাপ করিত। আমার বাবা দেখিতে পাইলে কখনো কখনো তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন, কখনো কখনো আমাকে তাড়াইয়া দিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহিত নিরন্তর বাস করিয়া ও এই সকল অভদ্র আলাপ নিরন্তর শুনিয়া আমার মহা অনিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমার অকাল-পক্বতা জন্মিয়াছিল। গ্রামের লোকে তাহার পর হইতে আমায় 'শিবে জেঠা' নাম দিয়াছিল। আমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়াও কিরূপে বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত জেঠামো করিতাম. তাহা স্মরণ করিয়া এখন লজ্জা হয়। তদ্ভিন্ন ঐ পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অনেক খারাপ বিষয় শিখাইয়াছিল, যাহার অনিষ্ট ফল পরজীবনেও অনেক দিন ভোগ করিয়াছি। এই পুরুষদের সঙ্গে বাস ও অভদ্র আলাপাদি দ্বারা আর একটি অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, আমার রীতিনীতি আলাপ সম্ভাষণ প্রভৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজন্য সমুচিতরূপে ফুটিতে পায় নাই। বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসেন বলিয়া আমার আলাপ সম্ভাষণে সৌজন্যের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে অনুভব করি যে, আমার আলাপ আচরণ ভদ্রতার অনুরূপ নহে। এমন কি, যে নারী জাতির প্রতি আমার এত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, তাঁহাদের প্রতিও সমুচিত সৌজন্য প্রকাশ করি না।

এই হরেকৃষ্ণ বাবাজীর বাড়িতে স্মরণীয় বিষয়ের মধ্যে আর একটি কথা আছে।

তখন কলিকাতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কেহ প্রথমে আসিলে একবার গুরুতর পীড়াতে পড়িতে হইত। আমিও আসিয়া ২।১ মাসের মধ্যে কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলাম। দেশে আমার মাকে সে সংবাদ দেওয়া হইল না। এই জ্বরের বিষয়ে আমার এই মাত্র স্মরণ আছে যে, আমাকে একখানা ভাঙা রথের চূড়ার উপরে বসাইয়া ভাপরা দেওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে ভাপরা দিয়া জ্বর ছাড়ানো, ও মাথা-ব্যথা হইলে জোঁক লাগানো, চিকিৎসার প্রণালী ছিল।

কালা ছিলাম না। আর একটা ঘটনা বোধ হয় এই সময়েই ঘটিয়া থাকিবে। আমার বাবা তখন আমাকে 'হা-কালা' বলিয়া ডাকিতেন। কারণ এই। যখন আমি হাঁ করিয়া থাকিতাম, অর্থাৎ একমনে কিছু কাজ করিতাম, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিলে শুনিতে পাইতাম না। বাবা অনেক সময় ডাকিয়া ডাকিয়া শেষে রাগিয়া আসিয়া মারিতেন। বাবার বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কালা হইয়া যাইতেছি। আর এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কিছু কারণও ছিল, ছেলেবেলায় মধ্যে মধ্যে আমার কান পাকিত। যাহা হউক, বাবা আমাকে কালা ভাবিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আউট-ডোরে লইয়া গেলেন। তখন ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী আউট-ডোরে বসিতেন। তিনি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে বলিলেন, "ছোকরা, তুমি আমার দিকে পিছন করে দাঁড়াও তো।" আমি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন এক থোলো চাবি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কিছু শুনিলে কি?" আমি বলিলাম, "চাবি ফেলে দিয়েছেন।" তখন তিনি হাসিয়া বাবাকে বলিলেন, "এ ছেলে তো কালা নয়।" বাবার সে কথা মনঃপূত হইল না। তিনি আমাকে বাড়িতে আনিয়া অন্য কোনো ডাক্তারের পরামর্শে আমার কানে পিচকারী দিয়া, নাপিত ডাকিয়া কান পরিষ্কার করাইয়া, আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তখন মাসে মাসে নাপিত ডাকিয়া আমার কান খোঁটানো হইত। নাপিতেরা তখন কুঠীওয়ালা বাবুদের ন্যায় বেনিয়ান পরিয়া পাগড়ী মাথায় দিয়া পথে পথে ঘুরিত। একজন নাপিত এলেন, যেন কেরাণীবাবু এলেন। এই শ্রেণীর নাপিতের হস্তে ঐ অন্যমনস্কতার জন্য আমার অনেক নিগ্রহ হইয়াছে।

সিপাহী মিউটিনী। হরেকৃষ্ণ বাবাজীর বাড়ির বাসা অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙিয়া গেল। মাতুলমহাশয় উঠিয়া সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে এক বাড়িতে গেলেন, এবং বাবা আমাকে লইয়া বহুবাজার জেলিয়াপাড়া নামক গলিতে বাসা করিলেন। ইহাও পুরুষের বাসা। বাসার লোকেরা কর্মস্থল হইতে আসিয়া, বসিয়া তামাক খাইতেন ও গল্প করিতেন, ধীরে সুস্থে রাঁধিতে যাইতেন; আমি যে একটি ছোট বালক

আছি, তাহার যে শীঘ্র-শীঘ্র আহার করা চাই, ইহা কাহারও মনে থাকিত না। তাঁহাদের রাঁধিতে রাত্রি প্রায় নয়টা সাড়ে-নয়টা হইয়া যাইত। আমি ততক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিতাম না, কেতাব হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আহারের সময় সকলে আমাকে টানাটানি করিত, কোনো রূপে তুলিতে পারিত না। অবশেষে বাবা প্রহার করিতেন, তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইত; কাঁদিতে কাঁদিতে আহার করিতে যাইতাম। সেই বাসাতে হরিনাভির রামগতি চক্রবর্তী নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার মায়ের খুড়া। সেই সূত্রে তাঁহাকে দাদামশাই বলিয়া ডাকিতাম। তিনি আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আমাকে রক্ষা করিতেন এবং তাহা লইয়া বাবার সঙ্গে বকাবকি করিতেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে আমার রক্ষক মনে করিতাম।

জেলিয়াপাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সালে মিউটিনী ঘটে, এবং আমাদের কলেজ পটলডাঙ্গা হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবাজার রোডের তিনটি বাড়িতে থাকে। মিউটিনী থামিলেও ঐ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপরে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে।

কলিকাতায় প্রথম বিধবা বিবাহ। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। আমি পেট টিপুনির ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতাম বটে, কিন্তু তাঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি তখন আমাদের আদর্শ পুরুষ। ১৮৫৬ সালের শেষভাগে যেদিন প্রথম বিধবাবিবাহ দেওয়া হয়, সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! সুকিয়া ষ্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ঐ বিবাহ হয়। বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমাদের বাসাতে সর্বদা বিচার হইত, এবং বাসার অনেকে তাহার পক্ষ ছিল। সুতরাং আমি জ্ঞানোদয় হইতেই এই সংস্কারের পক্ষপাতী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন আমরা বালকেরা পর্যন্ত মহা দুঃখিত হইলাম।

তাঁহার কাজে ই. বি. কাউয়েল সাহেব আসিলেন। তিনি সাধুতার মূর্তি ছিলেন। সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিতাম। তিনি আমাদিগকে বড় ভালোবাসিতেন, আমরা খেলা করিতেছি দেখিলে তিনি সুখী হইতেন।

কাউয়েল সাহেবের স্মৃতি। তাঁহার বিষয়ে এই সময়ের একটি ঘটনা মনে আছে। একদিন আমাদের ক্লাসের ছোকরারা একটা ছোট কাঠের সিঁড়ী লইয়া আর এক ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে একটার ছুটির সময় ভয়ানক দাঙ্গা করিল। আমি তখন খেলিতেছিলাম। আমাকে ক্লাসের ছেলেরা দাঙ্গার জন্য ধরিয়া আনিল। যে কয়জন

বালক সিঁড়ী লইয়া টানাটানি করিয়াছিল আমি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম, সুতরাং কিল দেওয়া অপেক্ষা কিল খাওয়া আমার ভাগ্যে অধিক ঘটিয়াছিল। ছুটির পর স্কুল আবার বসিলে এ-বিষয়ের তদন্ত আরম্ভ হইল। কাউয়েল সাহেব বড় বাড়ি হইতে তদন্ত করিতে আসিলেন। তিনি যখন ক্লাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কে কে দাঙ্গাতে ছিলে উঠিয়া দাঁড়াও," তখন তাঁহার সেই সাধুতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমি যেন আর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না; কে যেন ঠেলা দিতে লাগিল। কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ক্লাসের আর কোনো ছেলে উঠে না, ইতস্তত করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাহেব বলিলেন, "তবে কি আমি বুঝিব, তোমরা কেহ দাঙ্গাতে যাও নাই? যে যে গিয়াছ উঠিয়া দাঁড়াও।" আমি আর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, "তুমি কি একা দাঙ্গাতে গিয়াছ?" আমি বলিলাম, "ক্লাসের সকলেই গিয়াছিল।" ইহার পর সাহেব ক্লাসসুদ্ধ বালকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন, এবং আমাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া বড় বাড়িতে তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ বলিয়া মার্জনা করিলাম, কিন্তু দাঙ্গাতে গিয়া ভালো কর নাই।" আরও অনেক সদুপদেশ দিলেন। তিনি যখন আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তুমি ভালো ছেলে, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি," তখন ভালো ছেলে হইবার বাসনা যে মনে কত প্রবল হইল, তাহা বলিতে পারি না।

ফলতঃ, আমি তখন মিথ্যা বলিতে পারিতাম না; বড় জোর মৌনী থাকিতাম, অসত্য বলিতাম না। ইহারই কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের আর একটি কথা স্মরণ আছে, তাহা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি। তখন আমি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে মাতুলের নিকট থাকি। বাসার বড়-বড় ছেলেরা আমাকে তামাক খাইতে শিখাইয়াছিল। নিজে তামাক খাইয়া আমার হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিত, "টান।" প্রথম প্রথম টানিয়া ঘুর লাগিত, তবু শখের জন্য টানিতাম। একদিন তামাক টানিয়া বড়মামার নিকট বাজারের পয়সা আনিতে গিয়াছি, তিনি তামাকের গন্ধ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তামাক খাস?" আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম, "হাঁ।" তারপর তিনি প্রশ্ন করাতে যেরূপে যেরূপে তামাক খাইতে শিখিয়াছি, ও যত বার খাই, সমুদয় বর্ণনা করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম তেরো বৎসরের অধিক হইবে না। মাতুল শুনিয়া বাসার লোকের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং আমাকে তামাক না খাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। আমি তদবধি আর তামাক খাই নাই। কিন্তু একবার একটি মিথ্যা বলিয়া মাতুলকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম, তাহা যথাস্থানে বলিব।

কবিতায় হাতে খড়ি। জেলিয়াপাড়াতে অবস্থিতি কালের একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ আছে। আমাদের ক্লাসে গঙ্গাধর নামে একটি ধনী সন্তান পড়িত। সে বড়

মোটা ছিল, এজন্য ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে 'গঙ্গাধর হাতি' বলিত। গঙ্গাধর পড়াশোনাতে বড় মনোযোগী ছিল না, সেজন্য ওঠা-নামার সময় উপরে উঠিতে পারিত না। একদিন কিন্তু ঘটনাক্রমে গঙ্গাধর ফার্স্ট হইয়া গেল। তখন তাহার আমাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে কে? তাহা আমার সহ্য হইল না। পরদিন আমি তাহার নামে কবিতা বাঁধিয়া ক্লাসে উপস্থিত। একটার ছুটির সময় সমস্ত ক্লাসের ছেলেদিগকে ও তন্মধ্যে গঙ্গাধরকে দণ্ডায়মান করিয়া, সেই কবিতা পাঠ করা হইল। সমুদয় কবিতাটি আমার মনে নাই। চারি পংক্তি মাত্র স্মরণ আছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

ইজার চাপকান গায় ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতি,
বড় তার অহঙ্কার ধরা দেখে সরাকার,
চলে যেন নবাবের নাতি।

কবিতা যখন পড়া হইল, তখন ছেলেদের করতালিতে ও অট্টহাস্যে সমুদয় স্কুলের ছেলে জড়ো হইল। গঙ্গাধর অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল; এবং মাস্টার মহাশয়ের নিকট নালিশ করিল। কুমারখালির চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাগোবিন্দ মৈত্র তখন আমাদের ইংরাজীর মাস্টার ছিলেন। তিনি কবিতাটি আমার হাত হইতে লইয়া মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেন, এবং আমার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার কবিতা বেশ হয়েছে, কিন্তু মানুষকে গালাগালি দিয়ে কবিতা লেখা ভালো নয়"। ইহার পর আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ বাড়িয়া গেল।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। ফলতঃ, আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই। বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন, অথবা নিজে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। সেই সকল কবিতা আমার কানে লাগিয়া ছিল। তৎপরে কলিকাতাতে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনো প্রকারে হাতে পাইলেই গিলিয়া খাইতাম। তৎপরে আমার বাবা কবিতার রসগ্রাহী মানুষ, তিনি বন্ধুদের সহিত ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা করিতেন। এই সকল কারণে আমার শৈশব হইতে কবিতা লিখিবার বাতিক জাগিয়া থাকিবে। আমার দশ বৎসর বয়সের লিখিত খাতা পরে দেখিয়াছি। তাহাতে কয়েকটি কবিতা লিখিত আছে। সেগুলি এরূপ উৎকৃষ্ট যে অতটুকু বালকের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না। অনুমান করি, সেগুলি অন্য কোনো স্থান হইতে নকল করিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতেও এই প্রমাণ হয় যে, নয়-দশ বৎসর বয়সেও ভালো কবিতা দেখিলেই নকল করিয়া লইতাম।

এই সময়ের স্মরণীয় বিষয় আরও অনেক আছে, আমার দুইটি সহাধ্যায়ী বালকের মাতারা এই সময়ে আমার মাসীর কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম, সর্বদা তাঁহাদের বাড়িতে যাইতাম, তাঁহাদের কন্যাদের সঙ্গে ভাইবোনের মতো খেলিতাম। ইহাতে আমার জননীর ও ভগিনীর অভাব দূর হইত। ভালো জিনিস কিছু গৃহে হইলেই তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। পাছে আমি কুসঙ্গে পড়ি এই ভয়ে তাঁহারা কলেজের ছুটির দিনে আমাকে নিজেদের বাড়িতে রাখিতেন।

এই দশ-এগারো বৎসর বয়সের আর একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ হয়। আমাদের কলেজের সন্নিকটের গলিতে একটি বালিকা ছিল। সে আমার সমবয়স্কা। দেখিতে যে খুব সুন্দরী ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখখানি আমার বেশ লাগিত। সে তাহাদের বাড়ির উঠানে খেলা করিত। আমি আর একটি বালকের সঙ্গে রোজ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। সে তার মা'র ভয়ে পথের বালকের সহিত বড় বেশি কথা বলিত না, কিন্তু জানিত যে আমরা তাহাকে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ভালোবাসি, তাই সে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিলেই বাহিরে আসিত ও এটা ওটা যাহা দিতাম গোপনে লইত। আমি বোনের মত তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্তু তাহাদের বাড়ির লোকে তাহা দিত না। বহুবাজার পাড়া হইতে কলেজ উঠিয়া গেলে আমরা তাহাকে হারাইলাম।

প্রথম মৃত্যুদর্শন। এই জেলিয়াপাড়াতে থাকিবার সময় আমাদের পরিবারে দুইটি দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম, উন্মাদিনীর মৃত্যু, দ্বিতীয়, আমার প্রপিতামহদেব রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের স্বর্গারোহণ।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে গেলাম। যাইবার সময় কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া বাড়িতে যাই। প্রথম দিন চাঙ্গড়িপোতায় মামার বাড়িতে গিয়া এক রাত্রি যাপন করিলাম; পরদিন প্রত্যূষে পদব্রজে যাত্রা করিয়া বাড়িতে গেলাম। বারো বৎসরের বালকের পক্ষে ২৮ মাইল পথ হাঁটিয়া যাওয়া বড় সহজ কথা নহে; আমি তো গলদঘর্ম হইয়া বাড়িতে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু উন্মাদিনীকে আমি এমনি ভালোবাসিতাম যে বাড়িতে গিয়া যখন দেখিলাম উন্মাদিনী ঘরে নাই, তখন যেন সব শূন্য দেখিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সে বাহিরে আমের বাগানে গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে দৌড়। মা চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওরে বোস, ওরে দাঁড়া, তাকে ডাকচি," কে বা তাহা শোনে! আমি একেবারে গিয়া উন্মাদিনীকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

এই উন্মাদিনীই সেই গ্রীষ্মকালে মারা পড়িল। বাবা একদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া জমিদারবাবুদের বাগানে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি উন্মাদিনীকে আদর করিয়া লিচু খাওয়াইলেন। উন্মাদিনী আনন্দিত অন্তরে হাসিতে হাসিতে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার দারুণ কলেরা রোগ দেখা দিল। একবার ভেদ একবার বমি হইয়াই সে যেন চুপসিয়া গেল। তাহার বমিতে আস্ত আস্ত লিচু উঠিল। সে কথা এই জন্য বলিতেছি যে, তাহার মৃত্যুতে এত আঘাত পাইয়াছিলাম যে তদবধি আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ভালো মনে লিচু খাইতে পারি নাই। লিচু খাইতে গেলেই উন্মাদিনীর কথা মনে হয়। প্রাতে ৯টার সময় পীড়া জন্মিয়া অপরাহ্ণ ৩টার মধ্যে উন্মাদিনীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাহাকে যখন নিকটস্থ পুকুরে নামাইল, তখন আমি গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। মনে হইল, সে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং তাহার দুইচোখে জলধারা পড়িতেছে। সেই চক্ষের জলধারা এই দীর্ঘকাল ভুলিতে পারি নাই। উন্মাদিনী চলিয়া গেলে গৃহ শূন্য দেখিলাম। তৎপরে আমার তিন ভগ্নী জন্মিয়াছে এবং তদ্ভিন্ন পরের মাকে মাসী, পরের বোনকে বোন অনেক বার করিয়াছি, কিন্তু শৈশবের সেই বিমল আনন্দের স্মৃতি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

বোধ হয় ইহার পূর্ব বৎসর পূজার সময় আমার প্রপিতামহদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। আমি ও আমার পিতা তখন কলিকাতায় ছিলাম। তিনি আমার পিসামহাশয়কে আমাদিগকে সংবাদ দিয়া বাড়ি লইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বাবা গেলেন। আমি বোধ হয় কলিকাতাতেই থাকিলাম, কারণ তাঁহার মৃত্যুশয্যা আমার স্মরণ হয় না। তৎপরে মৃত্যুর দুই এক দিন পূর্বে নিজেকে বাড়ির বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন। অনেকবার চীৎকার করিয়া বলা হইল যে যথাসময়ে লওয়া হইবে, কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। তৎপরে ইষ্টদেবতার নাম করিতে করিতে ১০৩ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

প্রথম বিবাহ। এই জেলিয়াপাড়ার বাসায় থাকিতে থাকিতে আমার প্রথমবার বিবাহ হয়। সাল তারিখ মনে নাই, তখন ঠিক কত বয়ঃক্রম ছিল, তাহাও স্মরণ নাই, ১২।১৩ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মাতুলালয়ের সন্নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের 'নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী'র জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত আমার প্রথম বিবাহ হয়। প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসরের অধিক হইবে না। আমাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের

কুলপ্রথা অনুসারে প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম যখন এক মাস ও আমার বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর তখন তাঁহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

এই বিবাহকালীন সকল বিষয় আমার স্মরণ নাই। এই মাত্র স্মরণ আছে যে, আমি কানে মাকৃড়ি, গলায় হার, হাতে বাজু ও বালা পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম। বাবা বাজনা ও আলো করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে লইয়া যেই আসরে বসাইল, অমনি গ্রামের সমবয়স্ক বালকেরা আসিয়া "ওরে তুই কি পড়িস? কি পড়িস?" বলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমি অল্পক্ষণ মধ্যে বয়োচিত লজ্জা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং আমাকে তাহারা ঠকানো দূরে থাক, আমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়া দিলাম। ইহা স্মরণ আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটি বড় জেঠা।" তৎপরে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেলে সমবয়স্কা বালিকাদিগের কানমলা আরম্ভ হইল। সেইবার ঠকিয়া গেলাম, কানমলার পরিবর্তে কান মলিয়া দিতে পারিলাম না। নারীদলে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এত মেয়ে একত্র দেখিয়া ভাবা-চ্যাকা লাগিয়া গেল।

বিবাহের পরদিন যখন এক পালকিতে বরকন্যাকে তুলিয়া দিয়া গৃহাভিমুখে বিদায় করিল, তখন আমার মুশকিল বোধ হইতে লাগিল। মেয়েটি ঘোমটা দিয়া সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাত পা ছড়াইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না, মহা বিপদ! অবশেষে পথিমধ্যে একটা পড়ো বাগানে গিয়া পালকি নামাইল, আমি বাহির হইয়া বাঁচিলাম। বাহির হইয়া দেখি, লিচু গাছে লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লিচু পাড়িয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খাইতে খাইতে মনে হইল, মেয়েটি একা বসে আছে, তারও তো খিদে পেয়েছে, তাকে গোটা কতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়, যদি কেহ দেখিতে পায়।

ক্রমে পালকি গ্রামের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাড়ার খেলিবার সঙ্গী বালকগণ আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছে। পাড়ার দুইটি বালক আমার বড় অনুগত ছিল। তাহারা আসিয়া পালকির দ্বার খুলিয়া সরু গলাতে বলিল, "ওরে, তোর রবা কুকুর ভালো আছে।" শুনিয়া দুর্ভাবনা দূরে গেল, ভারি খুশি হইলাম। এই রবার বিবরণ একটু দেওয়া আবশ্যক। রবা একটি কুকুরের বাচ্ছা, মাদী কুকুর। শীতের ছুটির সময় বাড়িতে আসিয়া একটি বালকের নিকট হইতে লইয়া তাহাকে পুষিয়াছিলাম। যদিও মাদী কুকুর, তথাপি তাহার নাম দিয়াছিলাম 'রবার্ট'। ইহারও একটু বিবরণ আছে। কুকুরটি যখন আসিল, সঙ্গী বালকগণ জিজ্ঞাসা করিল, "ওর নাম কি হবে?"

আমি নাম দিলাম 'রবার্ট'। তাহার মর্ম এই : আমার উপর ক্লাসের ছেলেরা তখন 'চেম্বার্স ফাস্ট বুক অব্ রীডিং' পড়িত। তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে রবার্ট একজনের নাম, সেইটা মনে ছিল। পাড়ার বালকদিগের নিকট তো বাহাদুরি দেখানো চাই, তাই নাম দিলাম রবার্ট। আমি শহর হইতে গিয়াছি, আমার বাক্য তখন বেদবাক্য, তাই তাহার নাম হইল 'রবার্ট'। শিশুদের মুখে 'রবার্ট' ঘুচিয়া দাঁড়াইল 'রবা'। আমি রবাকে লইয়া পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে সুখেই ছিলাম, আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল বিবাহ দিতে। আমার ভাবনা হইল, রবাকে দেখে কে? মা'র উপরে বিশ্বাস হইল না, কারণ মা তখন কুকুর ভালোবাসিতেন না। কাজেই পাড়ার বালকদিগের প্রতি তাহার ভার দিয়া আসিয়াছিলাম। তাহারাই তাহাকে কয়েক দিন খাওয়াইয়াছিল ও দেখিয়াছিল। তাই আসিয়া সংবাদ দিল, "রবা ভালো আছে।"

ক্রমে পালকি বাড়িতে উপস্থিত হইল। পাড়ার মেয়েরা বৌ দেখিতে আসিল। মা হুলু দিয়া, ধানদুর্বা ফুল চন্দন ঠাকুরের চরণামৃত প্রভৃতি দিয়া বৌ ঘরে তুলিলেন। আমি পালকি হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি রবাকে দেখিতে ছুটিলাম। বড় পিসী "ওরে খা, ওরে খা" করিয়া পশ্চাতে ছুটিলেন। কে বা মিষ্ট খায়, কে বা বৌ লইয়া মেয়েদের মধ্যে বসে! তখন রবা প্রসন্নময়ী অপেক্ষা বহুগুণে আমার প্রিয়। এখন এই সব স্মরণ হইয়া হাসি পায়।

বিবাহের পরে প্রহার। বিবাহ উৎসব শেষ হইতে না হইতে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। আমার বিবাহের কয়েকদিন পরেই আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কে এক জেঠার এক কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনো প্রসন্নময়ী আমাদের বাড়িতে আছেন, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যান নাই, এবং তাঁহার পিত্রালয় হইতে যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও কেহ কেহ তখনো আছেন। আমার ঐ জ্যাঠতুতো বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলের বরযাত্রিদিগের সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দিয়া আসন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আমার বড়পিসীর মেজছেলে রামযাদব চক্রবর্তীর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুষাঘুষি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মা এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন, এবং দুইজনের কানে ধরিয়া থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙিয়া দিলেন। মেজদাদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়িতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, "মামীমা মায়ে পোয়ে পড়ে আমায় মেরেছে।" বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান

করিলেন না, ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলেন না, একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন, এবং আমার এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া আমার মায়ের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

ইহার পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা আমাকে বলিলেন, "আজ তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শিগগির খেয়ে, ভটচাযি্য পাড়ায় যাত্রা হবে সেখানে গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোন। কর্তার রাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আসবে।" মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি আসিতেছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি শুনিয়া তাঁহাদের বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন, "তোরা কাকে এমন করে গালাগালি দিস যে রাস্তা হতে শোনা যায়?" আর কোথায় যায়! বড়পিসী বাবার কানে মা'র নামে অনেক কথা ঢালিয়া দিলেন। বাবা আর কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কিনা জানি না। আমার মায়ের উপরে কি বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাঁহার মনে চিরদিন এই একটা ভাব ছিল যে, তাঁহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তাহার নামে কেহ কখনো কোনো অভিযোগ করিবে না, তাহার কোনো দোষ কেহ দেখাইবে না, সে সকল দোষের ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে। সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কিনা, জানি না। যাহা হউক, যখন মায়ের ত্বরাতে আমি রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়িতে প্রবিষ্ট হইলেন। হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পাজীটা কোথায়?" আমার মা দুইহাত দিয়া রান্নাঘরের দরজার দুইকাঠ ধরিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "সে ঘরে নাই।" আমি বুঝিলাম, বাবা যদি রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে আসেন, মা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, বাধা দিয়া রাখিবেন। কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না, বলিলেন, "দা-খানা দাও দেখি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দা কেন?" বাবা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি? দাও না।" মা দা-খানা বাহির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া পিছনের দ্বার দিয়া খানা-খন্দ বন-জঙ্গল পার হইয়া ভটচাযি্য পাড়ায় যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া সর্বদা ভিড়ের ভিতর থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে

ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় ধরিল। আমি বলিলাম, "কে রে?" স্বপ্নেও ভাবি নাই যে বাবা সেখানে আসিয়া ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি, বাবা! তিনি আমার পিঠে দু ঘুষা দিয়া বলিলেন, "খবরদার কাঁদতে পারবি না।" সে ঘুষা খাইয়া কান্না গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হইয়া পড়িল। কি করি, কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে অবস্থায় আমাকে বাড়ি লইয়া গেলেন, এবং উঠানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস নে, আমি আসছি।" এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্য যে বাঁশের ছড়ি কাটিয়া গোলার গায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন; মা যে তৎপূর্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে না থাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, পিসতুতো দিদি, বিবাহ বাড়ির লোকেরা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে! পালা পালা, মা'র খাবার জন্তে কেন দাঁড়িয়ে থাকিস!" আমি বলিতে লাগিলাম, "না, আমি যাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়েছেন।" এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছা না পাইয়া, কি দিয়া মারিবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, তখন বড়পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ওরে ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠের বাড়ি মারলে কি ছেলে বাঁচবে!" এই বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ভাইবোনে ছুটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসীকে এরূপ এক ধাক্কা মারিলেন যে, তিনি তিন-চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের মূর্তির ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মানা, সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া নাই চড়া নাই। বাবার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা-ও নড়ব না।" বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে দেখ।" এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথায় ও পিঠে চেলা কাঠ পড়াতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলা কাঠের কয়েক ঘা খাইয়াই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল, আমার চারিদিকে মুখগুলো

ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোয়ানো হইয়াছে, এবং দুই-তিনজন লোক তার্পিন তেল দিয়া আমার গা মালিশ করিতেছে; বাবা আপনি তেল জোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া আছেন। আমার চেতনা হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্য গেল। একজনের পর আর একজন গেল, তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, "কৃষ্ণচরণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে ছেলে বেঁচে আছে, তবে আমি যাব, আর কারও কথাতে যাব না।"

এই কৃষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন। তিনি বড় ভক্ত ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে 'ভক্ত কৃষ্ণচরণ' বলিয়া ডাকিত। সেই রাত্রে কৃষ্ণচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে আসিলেন, এবং আমার সহিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিতে গেলেন। মা তাঁহার কথা শুনিয়া জঙ্গল হইতে উঠিয়া আসিলেন, এবং "বাবা রে, তুই কি আছিস?" বলিয়া আমার শয্যা-পার্শ্বে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে, আমার যখন চেতনা হইল, তখন আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ জেঠামো করিয়া বলিতে লাগিলাম, "আমি মেজদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, মারামারি করেছিলাম, দোষ হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড দেওয়া বাবার পক্ষে কি ভালো হয়েছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়িতে রয়েছে, পাশের বাড়িতে কুটুম্বরা এসেছে, তাদের সমুখে এত মারা কি বাবার পক্ষে ভালো হল?" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম, বাবা অদূরে মাটিতে নাক ঘষিয়া নাকে খৎ দিতেছেন। এখানে এ-কথা বলা আবশ্যক যে, তাহার পরে তিনি সহস্র উত্তেজনা সত্ত্বেও আমার বা আমার ভগ্নীদের গায়ে আর হাত তোলেন নাই। এমন কি, আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেও, তিনি তর্জন গর্জন করিয়াছেন, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু আমার গায়ে হাত দেন নাই। ইহাতেই সকলে বুঝিবেন, তাঁহার অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা কিরূপ ঐকান্তিক ছিল।

মাতুলের সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ'। ইহার কিছুদিন পরে আমার পিতা কলিকাতা বাংলা পাঠশালার কর্ম হইতে বদলী হইয়া আমাদের গ্রামের হার্ডিঞ্জ মডেল বাংলা

স্কুলের হেড পণ্ডিতের কর্ম পাইয়া গ্রামের বাড়িতে চলিয়া যান। তখন আমাকে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে আমার মাতুলমহাশয়ের বাসাতে রাখিয়া যান। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বদাই আসিতেন, এবং আমার মাতুলের সহিত কি পরামর্শ করিতেন। পরে শুনিলাম, 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইবে, তাহার পরামর্শ চলিতেছে। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইল। বাসাতে ধুম পড়িয়া গেল। বাড়িতেই ছাপাখানা খোলা হইল। কাগজ ছাপা ও কাগজ বিলির জন্য অনেক লোক বাসাতে থাকিতে আরম্ভ করিল। হৈ-হাই গোলমাল সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত। তাহার ভিতরে আমি বয়সে সর্বাপেক্ষা ছোট, আমার খাওয়া-দাওয়া বা কে দেখে, পড়াশোনার প্রতিই বা কে দৃষ্টি রাখে! আমি সেই পুরুষের দলে পড়িয়া, রাঁধি, বাসন মাজি, এবং কোনো প্রকারে নিজের পড়াশোনা করি। তদুপরি, বাসার বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকগণের আলাপ আচরণ কিছুই আমার মতো বয়সের ছেলের শুনিবার ও দেখিবার উপযুক্ত নহে। সে সকল স্মরণ করিলে এখন লজ্জা হয়, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে একেবারে অসৎপথগামী হই নাই।

সপ্তাহের মধ্যে বাসার অন্নাশ্রিত লোকগুলি মাতুলের ভয়ে অনেক শান্ত মূর্তি ধারণ করিয়া থাকিত, নিজ-নিজ কাজে মনোযোগ করিতে বাধ্য হইত। মাতুলমহাশয় শনিবার দেশে যাইতেন, শনিবার রাত্রি ও রবিবার সমস্ত দিন বাসা আর-এক মূর্তি ধারণ করিত। কেহ গাঁজা কেহ মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিত। মাতুল খরচের জন্য যে-কিছু পয়সা দিয়া যাইতেন তাহা এইরূপে ব্যয় করিয়া ফেলিত। আমাদিগকে অনেক রবিবার ভাতে-ভাত খাইয়া কাটাইতে হইত। প্রশংসার বিষয়, আমাকে তাহারা অনেক সময় একটা কিছু ছল করিয়া অন্য কোনো বাসায় থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিত। তথাপি যাহা দেখিতাম ও শুনিতাম তাহা বালকের দেখা কোনো প্রকারেই কর্তব্য নহে। ঈশ্বরকে আজ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি যে, সেই সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি একদিনের বিবরণ বলিতেছি। বাসার অন্নাশ্রিত আত্মীয়দিগের মধ্যে এক-জনকে সকলে 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকিত। ঐ 'মামা', সম্পর্কে আমার মায়ের মামা, তবু আমিও 'মামা' বলিয়া ডাকিতাম। বলিতে কি, চাকর বাকর দোকানি পসারি কেহই তাহাকে আসল নামে ডাকিত না, সকলেই 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকিত। 'মামা' ইংরাজী লেখাপড়া শেখে নাই; কম্পোজিটারি, বিল সরকারি প্রভৃতি করিয়া কিছু উপার্জন করিত। তাহার সুরাপান ও অন্যান্য দোষ ছিল। একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর একজন আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, 'মামা' সুকিয়া স্ট্রীটের এক

গণিকালয়ে মাতাল হইয়া বমি করিয়া পড়িয়া আছে। গণিকারা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসার লোক বলিয়া তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছে। বারাঙ্গনার মুখে মাতুলের নাম, ইহা যেন আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমি 'মামা'কে ধরিয়া আনিবার জন্য বাসার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অনেক অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা নেশা করিয়া বুঁদ হইয়া ছিলেন, কেহই আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে আমি যেদো নামক এক চাকরকে সঙ্গে করিয়া সুকিয়া স্ট্রীটের সেই গণিকালয়ের অভিমুখে বাহির হইলাম। গিয়া দেখিলাম, এক গোলপাতার ঘরের স্ত্রীলোকের দাওয়াতে 'মামা' বমি করিয়া ভাসাইয়াছে, ও অর্ধ-অচেতন অবস্থাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা যাইবামাত্র স্ত্রীলোকটি গালাগালি আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, "চাকর সঙ্গে এনেছি, বমি পরিষ্কার করছি, ও ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি; গালাগালি দিও না।" এই বলিয়া, বমি পরিষ্কার করাইয়া, যেদো চাকরকে 'মামা'কে তুলিয়া আনিতে বলিয়া নিজে দ্রুতপদে বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলাম; কারণ, তখন যদিও কলিকাতার পথে ঘাটে বাসাতে মাতাল দেখিতাম, তথাপি মাতালের প্রতি কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও ভয় ছিল, তাহাদের কাছে ঘেঁষিতাম না। বাসাতে আসিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, অনেকক্ষণ পরে যেদো চাকর আসিয়া সজোরে দোর নাড়িতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া দেখি, 'মামা' সঙ্গে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে 'মামা'কে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়া একখানা ছোরা আনিয়া দ্বারের নিকট বসিল; বলিল 'মামা' আসিলেই তাহাকে কাটিবে। মনে ভাবিলাম, পথে দুজনে মারামারি করিয়াছে। আমি মহা বিপদে পড়িয়া গেলাম। আমি জানিতাম, যেদো চাকর গাঁজাখোর, সে যাহা ভয় দেখাইতেছে, করিতে পারে। বাসার লোককে ডাকাডাকি করিলাম, কেহই উঠিলেন না, বলিলেন, "মরুক হতভাগারা।" আমি নিরুপায় হইয়া বাহিরের দরজার ভিতরের দিকে এক তালা লাগাইলাম। যেদো উঠিয়া আমার হাত ধরিল, "তালা লাগাও কেন?" আমি বলিলাম, "তালার চাবি তো ভিতরে আমাদের কাছে রইল, 'মামা'র হাতে তো রইল না। এলে খুলে দেব, তার ভয় কি?" যেদো তাহাই বুঝিল এবং ছোরা লইয়া বাহিরের দরজার কাছে বসিয়া রহিল। আমি বাড়ির ভিতরে উপরের ঘরে শুইতে গেলাম। গিয়া শুনি, 'মামা' বাসার পশ্চাতে অপর এক গণিকালয়ে গিয়া মাতালি সুরে এক গান ধরিয়াছে। সে-রাত্রে সে আর বাসায় আসিল না।

পরদিন মাতুলমহাশয় শহরে আসিলে আমি এই বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম; তিনি কুপিত হইয়া বাসা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন।

ইহার পরে আমার মাতামহী ঠাকুরাণী ও আমার বড়মামী আসিয়া কিছুদিন কলিকাতাতে ছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে বাসা পবিত্র হইয়া গেল। মাতুলমহাশয়ের শনিবার বাড়ি যাওয়া বন্ধ হইল। মামীঠাকুরাণী মাতুলের তৃতীয় পক্ষের পত্নী, আমা অপেক্ষা চারি-পাঁচ বৎসরের বড়। তিনি মাতামহীকে গোপন করিয়া আমাকে মিঠাই আনিতে পয়সা দিতেন, মিঠাই আনিয়া রাত্রে দুইজনে খুব খাইতাম। এ পেটুকের সেই সময়টা যে কি সুখেই গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

অগ্রে বলিয়াছি, বড়মামার কাছে একবার একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ এখানে দিতেছি। আমার দুইজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর জননীকে আমি মাসী বলিতাম ও তাহাদের বোনকে বোন বলিতাম। তাঁহারা বাস্তবিক আমাকে মাসীর ন্যায় ভালবাসিতেন। এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজনের বাড়িতে আমরা কয়েকটি বালক একবার এক ছুটির দিনে সম্মিলিত হইয়াছিলাম। নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে একটি বালক একখানা বোতল-ভাঙ্গা কাঁচ লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ ভাই, এই কাঁচ যদি কেহ চিবাইয়া ভাঙিতে পারে, তবে তাকে এখনি এক টাকা দি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা দাও, আমি চিবাচ্ছি।" এই বলিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচখানা লইয়া চিবাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন দুই পাটী দন্তের মধ্যে কাঁচখানা রাখিয়া ভাঙিতে যাইব, অমনি ডান দিকের নিচের ঠোঁট কাটিয়া দুখানা হইয়া গেল। এই অবস্থায় মাতুলের বাসাতে দৌড়িলাম। বড়মামা দেখিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম যে, একখানা চাকু-ছুরি বাহাদুরি করিয়া দাঁত দিয়া তুলিতে গিয়াছিলাম। ছুরিখানা কিয়দ্দূর উঠিয়া সবেগে ঠোঁটের উপর বসিয়া গেল। মামা তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং ডাক্তার ডাকিয়া আমার ঠোঁট সেলাই করাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট এই একটি মিথ্যা কথা কহিয়াছিলাম। এখনো ইহা স্মরণ হইয়া লজ্জা হইতেছে, কারণ আমার সত্যবাদিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি তাঁহার নিকট কখনো কোনো মিথ্যা কথা বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। বলিতে কি, আমাকে তিনি কিরূপ বিশ্বাস করিতেন তাহা যখন ভাবি, আমার মন আশ্চর্যান্বিত হয়। পাছে তিনি ক্লেশ পান, এই ভয়ে সর্বদা কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতাম। তিনি দৃঢ়চেতা কর্তব্যপরায়ণ মানুষ ছিলেন, তামাক পর্যন্ত খাইতেন না, ধীর গম্ভীরভাবে সকল কাজ করিতেন, দিন রাত্রি পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহার চক্ষের সমক্ষে বর্ধিত না হইলে, আমার মনে যত সাধুভাব জাগিয়াছিল, তাহা জাগিত না। তাঁহার নিকট এই মিথ্যা কথা বলিয়া বহুদিন কষ্ট ভোগ করিয়াছি।

মাতুলের কলিকাতার বাসায় থাকিবার কালের আর একটি হাস্যজনক ঘটনা আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বালককালে আমার অতিশয় তন্মনস্কতা ছিল। কিরূপে একবার গাছের পাখি দেখিতে দেখিতে হাতির পায়ের তলায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, কিরূপে আমি তন্মনস্ক চিত্তে পড়িতে বসিলে বাবা আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া আসিয়া প্রহার করিতেন, এবং আমার হংকালা নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই মাতুলের বাসায় থাকিবার সময় একদিন আমি বাড়ির ভিতরের উপরের ঘরে তন্মনস্ক চিত্তে পাঠে মগ্ন আছি, এমন সময়ে বড়মামা শয়ন করিবার জন্য উপরে আসিতেছেন। আমি তন্মনস্ক চিত্তে পড়িতে বসিলেই কোমরের কাপড় খুলিয়া যাইত। সেইরূপ কাপড় খুলিয়া পড়িযাছে, আমি পাঠে মগ্ন আছি। বড়মামার জুতার ঠক ঠক শব্দ শুনিতেছি, কিন্তু চেতনা হইতেছে না, কাপড় সামলাইয়া পরিতেছি না। অবশেষে বড়মামা যখন সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সজাগ হইয়া কোমরের কাপড় সামলাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। বড়মামা বলিলেন, "তুই কি ঘুমুচ্ছিলি? বসে ঘুমুচ্ছিলি কেন? শুতে তো পারতিস?" আমি বলিলাম, "না, ঘুমুই নি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন থাড়ি-মাড়ি দিয়ে উঠলি কেন?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করলাম ছুঁচো আসছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ছুঁচো কি জুতো-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে আসে?" এই লইয়া বাড়ির লোকের মধ্যে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অবশেষে বড়মামা আমার পাঠে মনোযোগ ও চিত্তের একাগ্রতার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ছাত্রজীবনে পাচকবৃত্তি। ইহার কিছুদিন পরেই মাতলা রেলওয়ে খুলিল। বড়মামা ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া বাড়ি হইতে কলেজে গতায়াত করিতে লাগিলেন। সোমপ্রকাশ যন্ত্র কলিকাতা হইতে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার বাসভবনে উঠিয়া গেল। আমাদের বাসা আবার ভাঙিল। আমি দুদিন ইহাদের সঙ্গে, দুদিন উহাদের সঙ্গে, এইরূপ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। শেষে আমার পিতা আসিয়া আমাকে সুকিয়া স্ট্রীটে বাদুড়বাগানে এক আত্মীয়ের বাসাতে রাখিয়া গেলেন। তিনি আমার মাতার পিসতুতো ভাই। তিনি কম্পোজিটারি কাজ করিতেন, এবং একখানি সামান্য গোলপাতার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন। এরূপ স্থির রহিল যে, তিনি প্রাতে ও আমি বৈকালে পাক করিব। কিন্তু কার্যকালে এই দাঁড়াইল যে, আমাকেই দুইবেলা পাক করিতে হইত। কেবল তাহা নহে; বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় কাজ আমার উপর পড়িয়া গেল। অনেক সময় আমাকে বামহস্তে পাঠ্য পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে ভাতের কাঠি লইয়া রন্ধন ও পাঠ এক সঙ্গে চালাইতে হইত। আমি বহুকাল পরে সেই সময়কার একখানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহাতে বামহস্তের হলুদের দাগ

এখনও রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হয়, বাটনা বাটিয়া তৎপরে সেখানি পড়িবার জন্য লইয়াছিলাম, সেই জন্য হলুদের দাগ লাগিয়াছে।

এই স্থানে কিছুদিন বাসের পর আমার পিতা আসিয়া আমাকে কলিকাতার উপনগরবর্তী ভবানীপুরে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া গেলেন।

চৌধুরীবাড়ির ভট্টিবাবু। ভবানীপুরে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতেই আমার অভিভাবকগণ হইতে বিযুক্ত হইয়া একাকী বাস আরম্ভ হয়। এই সদাশয় সাধুপুরুষ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ইনি বর্ধমান জেলার আমদপুর নামক গ্রামের জমিদার কুড়োরাম চৌধুরীর পৌত্র। ইঁহাদের বংশ সৌজন্য সদাশয়তা সচ্চরিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় চরিত্র গুণে সবজনের সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাতে যে সাধুতা ও সদাশয়তা দেখিয়াছি, তাহা কখনো ভুলিবার নহে। ইনি এবং ইঁহার পরিবারস্থ সকলে আমাকে আপনাদের স্বসম্পর্কীয় লোকের ন্যায় দেখিতেন। বাবা কলিকাতা বাসে, পাঠশালাতে আসিবার পূর্বে ইঁহাদের গ্রামে পণ্ডিতী কর্ম করিতেন। সেই সূত্রে ইঁহাদের সহিত আলাপ ও বন্ধুতা জন্মে। ইঁহারা এরূপ সদাশয় লোক যে, সেই বন্ধুতাটুকু খাতিরে আমাকে বাড়ির ছেলের মতো করিয়া লইলেন। আমি একজন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ইঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, আমার প্রতি ইঁহাদের ব্যবহার দেখিলে তাহা মনে হইত না। আমাকে বাড়ির ছেলে মনে হইত।

তাঁহারা আমাকে 'ভট্টি' 'ভট্টি' করিয়া ডাকিতেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। আমার স্বগ্রামের অল্পশিক্ষিত একজন ব্রাহ্মণ যুবক ইঁহাদের ভবনে বাসকালে একবার আমাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিবার সময় 'ভট্টাচার্যের' পরিবর্তে 'ভট্টাচায্য' লিখিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তদবধি আমারও উপাধি ভট্টাচার্য বলিয়া বাড়ির লোকে আমাকে 'ভট্টাচায্য' 'ভট্টাচায্য' বলিতে লাগিলেন। ভট্টাচায্যটা ক্রমে 'ভট্টি' হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে চাকর-বাকর সকলে 'ভট্টিবাবু' 'ভট্টিবাবু' বলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ির কর্তাদের মুখে এই 'ভট্টি' নামটি আমার মিষ্ট লাগিত। কারণ তাহাতে অকপট স্নেহ ও আত্মীয়তা প্রকাশ পাইত।

তাঁহারা আমাকে কিরূপ আপনার লোক ভাবিতেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত এই স্থানেই দেওয়া ভালো। তাঁহারা একবার তাঁহাদের ভাঁড়ারের চাবি আমাকে দিলেন। বলিলেন, "প্রাতে পড়িতে বসিবার পূর্বে তুমি ভাঁড়ারের দোর খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, নিজের চোখে দেখিয়া, সমুদয় জিনিসপত্র বাহির করিয়া দিয়া পড়িতে

বসিবে, চাবি তোমার কাছেই থাকিবে।" সেই বিস্তীর্ণ পরিবারের ভাঁড়ার এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল। ৬০।৭০ জন খাবার লোক; ১০।১৫ জন চাকর; ৪।৫টা ঘোড়া; ৮।১০টা গরু বাছুর। মানুষদের খাবার চাল-ডাল তেল-নুন, ঘোড়ার দানা-ভুষি প্রভৃতি, গরুদের ভুষি-খইল কলাই প্রভৃতি, সমুদয় সেই ভাঁড়ারে থাকিত। প্রতিদিন কোন জিনিস কি পরিমাণ দিতে হইবে, তাহা একটা কাগজে লিখিয়া তাঁহারা ভাঁড়ারের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রাতে গিয়া, ভাঁড়ারের দ্বার খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, সমুদয় জিনিস ওজন করিয়া দিতাম। দিয়া, চাবি লইয়া গিয়া উপরে পড়িতে বসিতাম। তাহার পর সমস্ত দিন আমার সঙ্গে ভাঁড়ারের সম্পর্ক থাকিত না। ঐ জিনিসপত্রের সঙ্গে চাকর-বাকরের তামাকও দেওয়া হইত।

নবীনঠাকুর বিদায়। একদিন আমার স্কুল বন্ধ। সেদিন আমি বাড়িতে আছি। রাঁধুনী বামুন নবীনঠাকুর আসিয়া আমাকে বলিল, "ভট্টি বাবু, আমাদের আর একটু তামাক দিন।" আমি প্রথমে বলিলাম, "যা তামাক দিবার কথা কাগজে লেখা আছে, তা তো দিয়েছি; আবার কেন চাও?" পরে ভাবিলাম, একটু তামাক বই তো নয়, দিয়া আসি। ভাবিয়া তামাক দিতে গেলাম। ভাঁড়ার খুলিয়া তামাক দিতেছি, এমন সময় নবীনঠাকুর আমাকে বলিল, "ভট্টি বাবু, আমাদের সঙ্গে লাগলে এখানে টিকতে পারবেন না।" রাঁধুনী বামুনের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে না রাখাই ভালো, চাকর-বাকর আমাকে অন্নাশ্রিত জানিয়া তেমন খাতির করে না, পদে-পদে তাহাদের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া পরদিন চাবিটা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলাম। প্রকৃত কারণটা আর কাহাকেও বলিলাম না, কেবল মাত্র মহেশচন্দ্র চৌধুরীর খুল্লতাত-পুত্র শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি যখন চাবি ফিরাইয়া দিতে গেলাম, তখন কর্তাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ? তোমার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, তোমার উপর এ-ভার থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি।" এই কথা যখন উঠিল, তখন শ্রীশ আসিয়া তাঁহাদের নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত করিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্তা উঠিল, তাহা শুনিতে শুনিতে আমি চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় দেখিয়া গেলাম, বড়দা (অর্থাৎ মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়) বারাণ্ডার এক ধারে বসিয়া স্নানের পূর্বে দাঁতন করিতেছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাকর গিয়া বলিল, "ভট্টি বাবু, শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন; ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে, বড়বাবু (মহেশবাবু) আপনাকে ডাকছেন।" আমি ফিরিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, বড়দা রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সিংহগর্জনে নবীনঠাকুরকে বলিতেছেন, "রাখ্ রাখ্, হাতা বেড়ি

রাখ্! এখনি ঘর হতে বের হয়ে যা, নতুবা গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।" আমি গিয়া কাছে দাঁড়াইলে আমাকে বলিলেন, "কি ভাই, নবীনঠাকুর তোমাকে কি বলেছে, বল তো।" আমি বলিলাম, "বেশি কিছু বলে নাই, সামান্য একটা কথা বলেছে, সে জন্য রাগ করছেন কেন?" বড়দা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ! কি বলেছে, তাই বল না। সামান্য কি বেশি, আমি বুঝব।" তখন আমি বলিলাম, "ও বলেছে, ওদের সঙ্গে লাগলে আমি টিকতে পারব না।" বড়দা বলিলেন, "বলতে বাকি রেখেছে কি? দু ঘা জুতা মারলে কি সন্তুষ্ট হতে? ঐ জন্যেই লোকে তোমাদের অপমান করতে সাহস পায়।" এই বলিয়া নবীনঠাকুরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা, এখানকার কর্ম গেল; এখানে তো টিকতে পারলিই না, তারপর গ্রামে টিকতে পারিস কি না, পরে ভাবব।" (তাঁহারা আমদপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন, ও নবীন তাঁহাদের প্রজা ছিল)।

নবীন তাঁহাদের গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া গিয়া পথের ধারে বাজারে এক দোকান আশ্রয় করিল। আমি স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইলেই দেখিতাম, নবীন বিষণ্ণ মুখে দোকানে বসিয়া আছে। আমার মনে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, এও গরীব ব্রাহ্মণ, আমার জন্য এ ব্যক্তির কর্ম যায়, এটা প্রাণে সহ্য হয় না। অবশেষে একদিন বড়দা কোর্ট হইতে আসিয়া বাহিরের উঠানে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে নবীনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে গেলাম। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে ভয় হইত, সুতরাং আমি নীরবে বলি-বলি করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে পশ্চাতে বেড়াইতে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "কি ভাই, আমাকে কিছু বলবে নাকি?" আমি বলিলাম, "আপনি নবীনঠাকুরকে মাপ করুন, নতুবা আমার মন খারাপ হচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "ছিঃ! তোমরা বড় মিক্মিমাইগুড্! সে আপনার কাজের ফল ভুগুক। দু-দশদিন যেতে দাও না।" আমি বলিলাম, "সে নিরাশ্রয় হয়ে বাজারের দোকান আশ্রয় করেছে, মাথা রাখবার স্থান নাই, খাবার সম্বল নাই, এটা আমার সহ্য হচ্ছে না।" তখন তিনি চাকর পাঠাইয়া নবীনঠাকুরকে বাজার হইতে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "দেখ্ রে দেখ্, তুই কি মানুষের অপমান করেছিস! তোর জন্য আমার কাছে মাপ চাচ্ছে। এর জন্যই তোকে আসতে দিলাম। যা, কাজ করগে যা।" নবীন স্বীয় কর্মে প্রতিষ্ঠিত হইল, আমার প্রাণের উদ্বেগ চলিয়া গেল। সেদিনকার সে ঘটনা ও মহেশচন্দ্র চৌধুরীর অকৃত্রিম ভালোবাসা চিরদিন স্মৃতিতে জাগিয়া রহিয়াছে।

ইঁহাদের ভবনে আসিয়া আমি অনেক প্রকারে উপকৃত হইলাম। প্রথম, মহেশবাবুর চরিত্র আমার সম্মুখে আদর্শের ন্যায় রহিল। আমি যখনি তাঁহাকে দেখিতাম, আমার অন্তরে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিত। দ্বিতীয়ত, এখানে আসিয়া রাঁধা ভাত ও পড়িবার উপযুক্ত গ্রন্থ সকল পাইয়া আমার পড়াশোনার বিশেষ সুবিধা হইল। যদিও বাসাতে আমার ন্যায় অনেকগুলি ছাত্র প্রতিপালিত হইতেছিল, এবং অনেক সময় আমাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে বাস ও পাঠাদি করিতে হইত, তথাপি আমার যে স্বাভাবিক নিবিষ্টচিত্ততা আছে, তাহার গুণে আমার পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইত না। তৃতীয়ত, এখানে আসিয়া সমপাঠী কতকগুলি বালক পাইলাম, তাঁহাদের দেখা-দেখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে আমার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা অতীব প্রবল হইল।

চতুর্থত, ব্রাহ্মসমাজ গৃহ আমাদের বাসার নিকট হওয়াতে আমি মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি শুনিতে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে লাগিলাম। আমি বোধ হয় ১৮৬২ সালে ভবানীপুরে যাই, কারণ এখানে ডেস্টিনি অব্ হিউমান লাইফ বিষয়ে কেশববাবুর যে ইংরাজী বক্তৃতা হয় তাহা শুনিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় এখানকার ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যে উপদেশ দিতেন, তাহার কতকগুলিও শুনিয়াছি। তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে মনে মনে একটু আকর্ষণ হয়।

এই আকর্ষণের আরও দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, ভবানীপুরে আমার এক সহাধ্যায়ী বন্ধু থাকিতেন, তাঁহাকে আমি অতিশয় ভালোবাসিতাম; তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি আমাকে অতিশয় ভালোবাসিতেন এবং সমাজে যাইতে বলিতেন।

গ্রামে-ব্রাহ্মআন্দোলন। দ্বিতীয়ত, আমাদের বাসগ্রামে যে ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন উঠিয়াছিল ও শিবকৃষ্ণ দত্ত নামে একজন যুবক সর্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্মের বার্তা আমাদের গ্রামে লইয়া যান, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার পিতা ব্রজনাথ দত্ত একজন উদারচেতা বিষয়ী লোক ছিলেন, পণ্ডিতগণের সহিত সর্বদা শাস্ত্র আলোচনা করিতে ভালোবাসিতেন। তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। সে সময়ে আমাদের গ্রামের বড় উন্নতির অবস্থা ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য আরাধ্য ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রদ্ধেয় বন্ধু কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু, রমানাথ বোস প্রভৃতি শিবকৃষ্ণ দত্তের দৃষ্টান্ত ও প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে অনুষ্ঠানাদি করিতে

অগ্রসর হইয়াছিলেন সেজন্য গ্রামে মহা আন্দোলন ও এই যুবকদিগের প্রতি মহা নির্যাতন উপস্থিত হয় সেই নির্যাতনের মধ্যে ইঁহারা বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। সেজন্য আমরা গ্রামবাসী যুবকগণ মনে মনে ইঁহাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম।

১৮৫৯ সালে আমাদের গ্রামপ্রবাসী টাকীনিবাসী ডাক্তার প্রিয়নাথ রায় চৌধুরীর যত্নে ও ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়া মাত্র আমার মা আমার ভগিনীদিগকে তাহাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ-বাবু গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে, স্কুলটি রক্ষার ভার ব্রাহ্ম যুবকগণের উপরে পড়িল।

গ্রামে ব্রাহ্মনির্যাতন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে যখন উমেশচন্দ্র দত্ত, হরনাথ বসু ও কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকগণ মৌরসী পাট্টাতে খাজনা করিয়া একটু জমি লইলেন, এবং তাহাতে স্কুলের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জমিদারবাবুরা তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিধিমতে সে কার্যে বাধা দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম যুবকগণ স্কুলঘর নির্মাণের জন্য শালতি করিয়া সুন্দর বনের ভিতর হইতে খুঁটি ও বেড়ার হেঁতাল প্রভৃতি আনাইলেন। গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে খালের মধ্যে শালতি আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্ম যুবকগণ সংবাদ পাইয়া খুঁটি প্রভৃতি আনিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, চারিদিকের শ্রমজীবী লোকের প্রতি জমিদারবাবুদের হুকুম দিয়াছে, খুঁটি প্রভৃতি কেহ বহিয়া দিবে না। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রলোভন দেখাইয়াও মুটে মজুর পাইলেন না। অবশেষে কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রভৃতি কাঁধে করিয়া খুঁটি প্রভৃতি বহিয়া স্কুলের জমিতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে লাগিল এবং চারিদিকে আলোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাঁহারা খুঁটি প্রভৃতি আনিয়া দেখেন যে, ঘর নির্মাণের জন্য যে-ঘরামিদিগকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা জমিদারবাবুদের আদেশে ঘরামির কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। তখন ব্রাহ্ম যুবকগণ কোমর বাঁধিয়া নিজেরাই ঘরামির কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই কাজে প্রবৃত্ত রহিলেন। তাঁহারা জমি মাপিয়া, খুঁটি প্রভৃতি পুঁতিয়া রাত্রে ঘরে গেলেন। প্রাতে আসিয়া দেখেন যে তাঁহাদের পোতা খুঁটি প্রভৃতি নাই, তৎপরিবর্তে জমির এক পার্শ্বে একখানি ছোট খড়ের ঘর বাঁধা রহিয়াছে! দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া নিকটবর্তী পাড়ায় কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, শুকর মোল্লা নামক জমিদারবাবুদের এক চাকর রাতারাতি ঐ ঘর বাঁধিয়া ভোরে ব্রাহ্ম যুবকদের খুঁটিগুলি তুলিয়া কাঁধে

করিয়া লইয়া গিয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহাশয় এবং অপর গ্রাম হইতে শ্বশুরালয়ে-যাওয়া এক যুবক ভোরে উঠিয়া ঐ খুঁটি প্রভৃতি লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন।

ইহার পর ব্রাহ্ম যুবকগণ আদালতে শুকর মোল্লার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সেই মামলা মজিলপুর গ্রামের পাঁচ-ছয় ক্রোশ উত্তরবর্তী বারিপুর গ্রামের আদালতে হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, জমিদারবাবুরা ঐ মামলার জন্য শুকর মোল্লার নামে স্কুলের জমির এক জাল দলীল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মামলা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সেস্থানের সর্বপ্রধান উকীলদিগকে নিযুক্ত করিয়া মামলা চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ব্রাহ্ম যুবকগণ কলিকাতার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে বলিয়া কতিপয় নবীন ব্রাহ্ম উকীল সংগ্রহ করিলেন। তদ্ভিন্ন মামলা দেখিবার কৌতূহলবশত কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্ম যুবক বারিপুরে গেলেন। আদালত গৃহে ব্রাহ্ম দর্শকের ভিড়ের কথা শুনিয়া জমিদারবাবুরা নাকি বলিয়াছিলেন, "ও মা! আমরা ভেবেছিলাম গ্রামের ঐ কয়েকটা ছোঁড়াই বুঝি ব্রাহ্ম; দেশে এত ব্রাহ্ম আছে তা তো জানতাম না"। যাহা হউক, মামলার শেষে শুকর মোল্লার কয়েক মাসের জন্য কয়েদ হইল। সে কয়েদ হইয়া কলিকাতার নিকটবর্তী আলিপুর শহরের জেলে আসিল। তখন আমি ভবানীপুরে থাকিতাম, আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্ম যুবক হরনাথ বসু মহাশয় কালীঘাটে থাকিতেন। শুকর মোল্লা মনিবের আদেশে অন্যায় কাজ করিয়া কয়েদ হইয়াছে, ইহার জন্য হরনাথ-বাবু বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েদখানায় শুকর মোল্লাকে দেখিতে ও তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইতে লাগিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, আমি তখনও প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিই নাই, কিন্তু সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। হরনাথবাবু আমাকে শুকর মোল্লার কয়েদের জন্য দুঃখিত দেখিয়া, প্রতি রবিবার আলিপুর জেলখানায় গিয়া শুকর মোল্লাকে মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াইয়া আসিবার ভার আমার প্রতি দিলেন, আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। এইজন্য শুকর মোল্লার কয়েদের কথা আমার মনে আছে।

স্বয়ং জমিদারবাবুরাও সেই জমি হইতে ব্রাহ্মদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইলেন না, ইহাতে ব্রাহ্মদের প্রভাব বাড়িয়া গেল। তখন অন্য প্রকার নির্যাতন আরম্ভ হইল। একজন ব্রাহ্ম যুবক "পাড়াগাঁয়ে এ কি দায়, ধর্ম রক্ষার কি উপায়?" নাম দিয়া এক নাটক রচনা করিলেন। তাহাতে জমিদারবাবুদিগকে লোকচক্ষে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করা হইল। বিবাদটা আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে জমিদারবাবুরা বাড়িতে বাড়িতে লোক পাঠাইয়া বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইতে

নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "যে মেয়ে পাঠাবে, তাকে একঘরে করব।" আমি যখন প্রতি রবিবার গিয়া আলিপুর জেলে শুকর মোল্লাকে খাওয়াইতেছি, তখন জমিদার-বাবুদের শাসনে স্কুলে মেয়ে পাঠানো প্রায় বন্ধ হইয়াছে, কেবল আমার পিতামাতার দৃঢ়চিত্ততার গুণে আমার দুই ভগিনীকে লইয়া পণ্ডিত স্কুল চালাইতেছেন।

ব্রাহ্মণ পিতার তেজস্বিতা। অধিকাংশ গৃহস্থই জমিদারবাবুদের নিষেধ শুনিল, শুধু আমার বাবা ও মা শুনিলেন না। তাঁহারা উভয়ে তেজী মানুষ, অতিশয় সত্য-পরায়ণ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় লোক, তাঁহারা লোকের বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির অনেক দোষ গুণ আমার পিতাতে ছিল। তিনি বলিলেন, "কি! এত বড় আস্পর্ধার কথা? আমার ছেলেমেয়ে পড়াব কি না, তার হুকুম অন্যে দিবে? যদি কাহারও মেয়ে স্কুলে না যায়, আমার মেয়ে যাবে, দেখি, কে কি করে।" এই বলিয়া তিনি আমার ভগিনীদ্বয়কে লইয়া স্কুলে গেলেন ও পণ্ডিতকে বলিলেন, "কেবল,আমার মেয়ে আসবে ও তুমি আসবে, স্কুল একদিনের জন্যও বন্ধ কোরো না। যদি কর, তা হলে গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করে দেব।" বাস্তবিক কিছুদিন আমার ভগিনীদ্বয় ও পণ্ডিত-মহাশয় এই তিনজনকে লইয়া স্কুল চলিল। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে বাবা অগ্নিসমান জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ব্রাহ্মদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন তিনি বাড়ির লোকের সমক্ষে ব্রাহ্মদের প্রশংসা করিতেন। ইহাও আমার ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইবার অন্যতম কারণ।

আশ্বিনের ঝড়। এখন নিজের জীবন বিবরণ আবার বলি। চৌধুরী মহাশয়দিগের ভবনে অবস্থান কালে ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে মহা ঝড় ঘটে। সেই ঘটনা স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেটা পূজার ছুটির সময়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন। অনেকে পূজার সময় কলিকাতা হইতে বাড়ি যাইতেছিল, সুতরাং পথে ঝড়ে পড়িতে হয়। আমার স্বগ্রামের একটি যুবক ও আমি দুইজনে ঝড়ের পূর্ব দিন শালতি করিয়া কালীঘাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করি। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া জোরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হয় ও বৃষ্টি নামে। সেই বায়ু ও বৃষ্টিতে আমরা কোনো প্রকারে শালতিতে বসিয়া রাত্রি কাটাইলাম। শয়নের সুখ আর হইল না। পরদিন প্রত্যুষে যখন মেঘের অন্তরালে উষার আলোক দেখা দিল, তখন দেখিলাম আমাদের শালতি মগরাহাট নামক স্থানের উত্তরে জালাসি নামক দ্বীপগ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তরে, বিশাল জলা ও ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে, ঝড় ও তরঙ্গের আঘাতে আন্দোলিত হইতেছে।

বায়ুর বেগ এত অধিক যে, সম্মুখ দিকে এক পা অগ্রসর হওয়া কঠিন; কোনো প্রকারে শালতির চালকদ্বয় জালাসি গ্রামের বাজারের ধারে গিয়া শালতি লাগাইল। আমরা লাফাইয়া তীরে উঠিলাম এবং একটি দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, আমাদের ন্যায় আরও কয়েকজন শালতির যাত্রী নানা স্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। তখনো কাহারও মনে হয় নাই যে ঝড় অবিলম্বে ভীষণ সাইক্লোনের আকার ধারণ করিবে। সকলে পরামর্শ হইতে লাগিল যে, সকলে মিলিয়া খিচুড়ী রাঁধিয়া খাওয়া যাক। যাত্রীদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ এই কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, দুইজনের জন্য রাঁধাও যা, দশজনের জন্য রাঁধাও তা। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সেই দুর্যোগের দিনে খিচুড়ী খাইতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতা আর এক প্রকার বন্দোবস্ত করিলেন।

সাইক্লোনে অদম্য পথিকের গান। খিচুড়ীর পরামর্শ শেষ হইতে না হইতে দোকানদারের সহিত চাউল ডাউলের মূল্য নির্ধারণ হইতে না হইতে, হু-হু করিয়া সাইক্লোনের বায়ু ডাকিয়া আসিল। আমাদের চক্ষের সমক্ষে কয়েকখানি চালা-ঘর পড়িয়া গেল। অবশেষে যে দোকানে আমরা বসিয়া ছিলাম, সে ঘর কাঁপিতে লাগিল। আমরা বিপদ গণনা করিয়া কোমর বাঁধিতে লাগিলাম। তখনো দেখি যাত্রীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তুড়ি দিয়া মন-আনন্দে 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের' ইত্যাদি কীর্তনটি গাইতেছেন। তাঁহাকে বলা গেল, "মশাই, গান রাখুন, কোমর বাঁধুন, এ-ঘর যে পড়ে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দেও ঘর পড়া, গাইতে বড় ভালো লাগছে। শোনো শোনো, কীর্তনটা শোনো।" আর শোনো! চড়চড় করিয়া ঘর হেলিতে লাগিল, আমরা দৌড়িয়া বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটি চাপা পড়িলেন। যেই ঘরের বাহির হওয়া, অমনি আমাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল; সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বগ্রামবাসী সেই যুবক বন্ধুটির সহিত আমি হাতে হাত বাঁধিয়াছিলাম, আমাদের দুইজনকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। একখানা দোকানঘর পড়িয়া গিয়া তাহার দুখানা চাল মাটিতে পড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমরা দুজনে গিয়া তাহার উপরে পড়িলাম। পড়িয়া ভাঙা ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখি, সেই কীর্তনকারী ভদ্রলোকটি পূর্বকার দোকানঘরের চাল ফুঁড়িয়া উপরে উঠিতেছেন। আমাদিগকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হাসিতে লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদিগের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বড় পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি। আপনারা বোধ হয় ভাবছিলেন মারা পড়েছি। আরও কিছুদিন কর্মভোগ

বাকি আছে কি না, এখন কেন যাব?" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হাসি আমার আজও মনে আছে। কতবার ভাবিয়াছি, এরূপ সুখে দুঃখে প্রসন্ন চিত্ত পাওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কতকগুলি মানুষ এরূপ আছে, যাহাদিগকে কিছুতেই বিষণ্ণ করিতে পারে না। ইহাদের অবস্থা স্পৃহনীয়।

কিয়ৎক্ষণ তিনজনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ করা গেল যে, অদূরে রাণী রাসমণির কাছারি বাড়ি দেখা যাইতেছে—সে গ্রামটা তাঁহারই জমিদারী—সেই কাছারিতে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। তিনজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম। কাছারি বাড়ির নিকটস্থ হইতে না হইতে সমগ্র বাড়ি ভূমিসাৎ হইল। চারিদিকের প্রাচীর পর্যন্ত ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়া গেল।

ঝড়ের বন্ধু। তখন বাত্যার প্রকোপ দুর্দান্ত দৈত্যের বিক্রমের ন্যায় হইয়াছে। গ্রামের প্রায় একখানিও গৃহ দণ্ডায়মান নাই, সমুদয় সমভূম হইয়াছে। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনো দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল। স্থির করা গেল যে, সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। গিয়া দেখি, সেই গ্রামের স্ত্রীলোক বালক-বালিকাতে সে ঘর পরিপূর্ণ। ঘরখানি নূতন ছিল বলিয়া তখনো দণ্ডায়মান আছে। সেই গৃহস্বামী অতি বৃদ্ধ। তাহার যুবক পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া ঘরের ভিতরে পুরিয়া, বীরের ন্যায় কোমর বাঁধিয়াছে, এবং সেই ঝড়ে ছুটাছুটি করিয়া চারিদিকের স্ত্রীলোক বালক-বালিকা সংগ্রহ করিয়া সেই ঘরে পুরিতেছে। আমরা ঘরের নিকটে পৌছিয়া দেখি স্ত্রীলোকে ঘর পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, আমাদের দুই বন্ধুর কিরূপ সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। আমরা দ্বার হইতে ফিরিয়া পার্শ্বের দাবাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তৎক্ষণাৎ সে দাবার চালটি আমাদের মাথার উপরে পড়িয়া গেল। তখন আমরা ভাবিলাম যে, এরূপে ঘর চাপা পড়িয়া মরা অপেক্ষা বাহিরের উঠানে বসিয়া ঝড় খাওয়া ভালো। এই ভাবিয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় গৃহের ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবা, তোমরা কোথায় যাও? এত লোকের যদি জায়গা হয়ে থাকে, তোমাদের দুজনেরও হবে।" তখন আমরা বাধ্য হইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক বালক-বালিকার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে না ঢুকিলেই ভালো ছিল। ক্রমে বেলা অবসান হইল। অপরাহ্ণ চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। গ্রামস্থ যাহারা সেই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা 'বাবা রে, মা রে' করিতে করিতে স্বীয়-স্বীয় ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। আমাদের শালতির চালক দুইজন আমাদের বিছানা

ও কিছু-কিছু জিনিসপত্র মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, শালা ৩ খাল হইতে লইয়া এক পুকুরের ধারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তখন আর উদ্ধার করিবার সময় নাই, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। তাহাদিগকে সেই ভাঙা দাবাতে কোনো প্রকারে রাত্রি যাপন করিতে বলিয়া আমরা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাঙা ঘরে রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তাহারা পোদ নামক হীনজাতীয় লোকের ব্রাহ্মণ।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। সেই গৃহের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বীর প্রকৃতিসম্পন্ন যুবক পুত্র সমস্ত দিনের অনাহার ও গুরুতর শ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। পিতামাতা ব্যাকুল হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "ওরে, তুই মুখ হাত ধুয়ে ওই চৌকির নিচে তোর ভাত আছে, খা।" তখন আমরা সেই ঘরে নয়জন, আমরা বিদেশীয় পাঁচজন, ও বুড়ো বুড়ি যুবক পুত্র ও গর্ভিণী পুত্রবধূ এই চারিজন। পিতা-মাতার অনুরোধ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া যুবকটি বলিল, "বাবুরা সমস্ত দিন অনাহারে আছেন, ওঁরা ঘরে বসে থাকবেন আর আমি খাব, তা কি হয়?" কোনোরূপেই সে খাইবে না। ইহাতে আমরা বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "সে কি কথা! এই বিপদে কি কেউ আতিথ্য করতে পারে? তুমি সমস্ত দিন ছুটোছুটি করেছ, তুমি ঐ ভাত খাও, কিছুই অন্যায় হবে না।" সে তাহা শুনিল না, বসিয়া রহিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমাদের ঘরে আমাদের খাবার মতো কিছু আছে কি না?" যুবক বলিল, "চাউল আছে, তা ভিজে গিয়েছে।" উত্তর, "আচ্ছা, ভিজা চাউল আমাদিগকে দাও।" সেই ভিজা চাল লইয়া আমি সকলকে দিলাম, বলিলাম, "ভালো লাগুক না লাগুক, আপনারা খান, তা না হলে ও-ব্যক্তি খাবে না।" আমরা ভিজা চাউল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল, শালতিতে এক হাঁড়ি মাষকলাই বাড়ির জন্য লইয়া যাইতেছিলাম, সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাহির হইয়াছে। আমি সেই ভিজা কলাই আনিয়া সকলকে চাউলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। আমাদের আহারটা বড় মন্দ হইল না। তৎপরে শয়নের ব্যাপার। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে যতগুলি লেপ-কাঁথা-মাদুর ছিল, সমুদয় সমাগত কম্পান্বিত বালক-বালিকাদিগকে চাপা দিবার জন্য দিয়াছিল, তাহাতে সে সমুদয় ভিজিয়া গিয়াছে, কেবল দুইটি সৈঁতলা মাদুর তখনো শুকনো আছে। গৃহস্বামীর পুত্র প্রস্তাব করিল যে, তাহার একটিতে তাহারা সপরিবারে শয়ন করিবে, আর একটিতে আমরা পাঁচজন শয়ন করিব। আমার সঙ্গের লোকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া আদরের সহিত মাদুরটি লইলেন, তাহা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইল। আমি বলিতে লাগিলাম, "ছি ছি!

ও মাদুর নেবেন না, ওরা মাদুরে শুক।" এই প্রস্তাবে সঙ্গের পথিকেরা হাসিতে লাগিলেন, "আমরা পাঁচজনে এক মাদুরে শুই, ওরা চারজনে আর এক মাদুরে শুক। এ বিপদে আর ভদ্রতা করবার সময় নাই।" এই কথাতে আমি রাগ করিয়া মাদুরের বাহিরে কাদাতে শুইয়া অগাধ নিদ্রা দিলাম।

পরদিন প্রাতে যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। আমার অগ্রেই আর সকলে জাগিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। আমি বাহিরে গিয়া দেখি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যুবক পুত্রটি আমাদের শালতির চালকদ্বয়ের সঙ্গে পুকুরে ডুবিয়া ডুবিয়া শালতিখানি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া, তাহাকে ও প্রকার জলে ডুবিতে বারণ করিলাম, কিন্তু সে সে-কথার প্রতি কর্ণপাত করিল না। ক্রমে তিনজনে শালতিখানি তুলিল। চালকদ্বয় তাহার জল ছেঁচিয়া পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ব্রাহ্মণ যুবক কুলীর ন্যায় মাথায় করিয়া আমাদের জিনিসপত্র বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে, সেই সময়ে পথে পতিত একটা ভগ্ন বোলতার চাকের উপরে পা দেওয়ায় তাহার পায়ে অনেকগুলি বোলতা কামড়াইয়াছে, তাহার পা ফুলিয়া উঠিতেছে, তবু সে সেই কাজ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতার উদয় হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণন করিবার নহে।

আমি ব্রাহ্মণ তনয়কে পরে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম, এবং পরে যখনই শালতি করিয়া বাড়ি যাইতাম, সেই গ্রামে উঠিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া কিছু-কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া যাইতাম। সে গ্রামটা যেন আমার তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে একবার গিয়া আর তাহাদের উদ্দেশ পাইলাম না।

চটিপায়ে উড্রো সাহেবের ঘরে। সাল ও তারিখ মনে নাই, ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে বাসের কালে, একবার আমার পিতাঠাকুর মহাশয় একখানি সরকারি কাগজ আমার নিকট পাঠাইয়া আদেশ করিলেন, তাহা আমাকে স্বয়ং গিয়া স্কুলসমূহের ইন্‌সপেক্টর উড্রো সাহেবের হাতে দিতে হইবে। তদনুসারে একদিন কলেজে যাইবার পথে আমি উড্রো সাহেবের আপিসে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার আপিস গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সাহেব তখন পাশের ঘরে আহারে বসিয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই উপস্থিত হইলেন। আমি অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে কাগজখানি দিলাম। তিনি কাগজখানি লইতে চাহিলেন না; বলিলেন, "তুমি আপিস ঘরের বাহিরে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন?"

আমি। এ-ঘরে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিতে হয় এ-নিয়ম যে আছে, তা তো জানিতাম না, তাহা হইলে এ-ঘরে প্রবেশ করিতাম না।

ব্যাপারখানা এই। তখন আমার এমনি দারিদ্র্য ও দুরবস্থা যে, আমাকে চটিজুতাই সর্বদা পরিতে হইত, বুটজুতা পরা ভাগ্যে ঘটিত না। সুতরাং সেদিন চটিজুতা পায়ে দিয়াই কলেজে যাইবার পথে সাহেবের আপিসে গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়াই সাহেব চটিয়াছিলেন।

সাহেব। তুমি জুতা পরিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিরূপে আপনার অপমান করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরানীবাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনারা যদি খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি।

সাহেব। ও যে বুটজুতা।

আমি। বুটজুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকিত, আর চটিজুতা পায়ে দিয়া আসাতে আপনার মান গেল, এ নূতন কথা, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?

সাহেব। হাঁ, আমাদের আপিসের এ-নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি জানো না?

আমি। না সাহেব, আমার জন্মে এমন নিয়ম শুনি নাই।

সাহেব। তুমি জুতা খুলিবে কি না, বল।

আমি। না সাহেব, খুলব না।

সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ডেস্কের উপর রইল। ও আপনাদেরই কাগজ, নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।

এই বলিয়া ডেস্কের উপর কাগজ রাখিয়া আমি যাইতে উদ্যত। সাহেব বলিলেন, "শোনো শোনো, দাড়াও।" আমি দাঁড়াইলাম।

সাহেব। রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত পীড়িত, তুমি কি শুনেছ?

আমি। হাঁ সাহেব, শুনেছি।

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্ছে, আমি এখনই তাঁকে দেখতে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

আমি। না সাহেব, আমাকে কলেজে যেতে হবে, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

সাহেব। আচ্ছা, যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তাঁর ঘরে প্রবেশ করবার সময় জুতা খুলবে কি না?

আমি সেখানে জুতা খুলিবার কারণ বলিতে যাইতেছি সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন:

"'হাঁ' কি 'না' বল, আমি আর কিছু শুনতে চাই না।"

আমি। হাঁ সাহেব, সেখানে খুলব।

সাহেব। তবে আমার এখানে খুলিবে না কেন?

আমি। আপনি কারণ শুনবেন না, তবে আমি কি করব?

কারণটা শুনিলে বলিতাম যে, বাঙালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানাতে জাজিম পাতা থাকে, সকলেই জুতা খুলিয়া প্রবেশ করে, সুতরাং আমাকেও সেই ভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব যখন আমার কথাতে কান দিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলাম, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। সাহেব আবার ডাকিলেন, "ছোকরা, শোনো শোনো।" আমি আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সাহেব। তুমি একটা কথা শুনেছ, 'নিজের মান যদি চাও অপরের মান আগে রাখ?'

আমি। সাহেব, ও খুব ভালো কথা, আমি অনেক দিন শুনেছি।

এই বলিয়া আবার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ত্বরিত পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কলেজের দিকে ছুটিলাম।

বড়মামা বৈকালে আমাকে ডাকাইয়া সমুদয় কথা শুনিলেন। বলিলেন, "উড্রো সাহেব যে তোমাকে জুতা খোলাইতে পারেন নাই, ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আমার ভাগিনার মতো কাজ করিয়াছ।" তৎপরে তিনি সোমপ্রকাশের জন্য ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি "উড্রো সাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিলাম। পরবর্তী সোমবারে "ফলনা সাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া বড়মামা সেটি বাহির করিলেন, এবং বেচারি উড্রো সাহেবের উদ্দেশে অনেক উত্তম মধ্যম তিরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। পরে শুনিতে পাইলাম, উড্রো সাহেব তাহা পাঠ করিয়া আমার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং আপিসের বাবুদিগকে বলিলেন, "এই ছেলে কলেজ থেকে বাহির হইয়া যদি কর্মপ্রার্থী হয়, আমাকে জানাইও। আমি উড্রো সাহেবের ন্যায় সদাশয় পুরুষের বিষ নয়নে পড়িয়া গেলাম ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। তিনি অতি সদাশয় মানুষ ছিলেন বলিয়া এ ঘটনা তাঁহার মনে রহিল না, কারণ, পরবর্তী চাকরীর সময়ে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুল হইতে হেয়ার স্কুলে আসি, তখন তিনিই উদ্যোগী হইয়া আমাকে আনিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কর্মচারীরা তাঁহার আদেশ-মতো পূর্বের কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই, করিলে কি দাঁড়াইত জানি না।

উড্রো সাহেব যেরূপ সদাশয় পুরুষ ছিলেন, এবং আমার ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের কাজে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সবিশেষ বিবরণ জানিলেও কিছু করিতেন না, এইরূপ মনে হয়। আমার মাতুলমহাশয় সোমপ্রকাশে আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কথাটা আমার মনে রহিয়াছে।

কাব্য চর্চা ও কবিতা যুদ্ধ। মধ্যে মধ্যে আমি সোমপ্রকাশে ও এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতাম। লোকে পড়িয়া প্রশংসা করিত। তাহাতে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত হইতাম। কবিতা লেখা সূত্রে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসারী করিতেন, এবং এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও সুরাপান-নিবারিণী সভার সভাপতি ছিলেন। আমি তাঁহার কাগজে প্রথমে কয়েকটি ছোট-ছোট কবিতা মুদ্রিত করি। তাহাতে তিনি প্রীত হন, এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত করেন।

ইহার পরে এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার কবিত্ব শক্তিকে আর একদিকে লইয়া গেল। আমাদের ভবানীপুরে একজন বিলাত ফেরত ডাক্তার আসিয়া বসিলেন, তাঁহার হাব-ভাব চাল-চলন সবই ইংরাজী ধরনের। তিনি নিজের দ্বারে এক সাইন-বোর্ড, দিলেন তাহাতে 'ডট্' বলিয়া নিজের উপাধি লিখিলেন। এই লইয়া আমাদের যুবক দলে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অমনি আমি বাঙালীর সাহেবিয়ানার উপর বিদ্রূপ বর্ষণের জন্য বিলাত-ফেরত বাঙালী সাজিয়া 'এস্ এন্ ডট্' নাম লইয়া এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতে লাগিলাম, বাঙালীর প্রিয় যাহা তাহার উপরে বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ইংরাজী যাহা কিছু তাহার উপর আদর দেখাইতে লাগিলাম। স্বদেশী ভাবাপন্ন হইয়া আর একজন কবিতাতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই কবিতা যুদ্ধ চলিতে লাগিল, চারিদিকে একটা চর্চা উঠিয়া গেল। আমার কবিতাতে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, আমিও স্বদেশী ভাবাপন্ন, কেবল সাহেবী ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। ঐ সকল কবিতার দুই-এক ছত্র মনে আছে। তাহা দেখিলে সকলে হাসিবেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা করাতে আমি বঙ্গভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম--

বিদ্যার সাগর তব মূর্খের প্রধান,
টিকিদার ভট্টাচার্য, নাহি কোনো জ্ঞান।

ইংরাজ মেয়েদের প্রশংসা করিয়া লিখিলাম—

ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিড়াল-লোচনা,
বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ-ললনা।

এই সূত্রে প্যারীবাবুর নিকট আমার একটা পসার দাঁড়াইল। তাহার একটি ফল মনে আছে। ইহা বোধ হয়, ইহার কিছুদিন পরে ঘটিয়া থাকিবে। একবার আমার বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম ছাত্র নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত একটি কবিতা আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। কবিতাটি পড়িয়া আমার ভালো লাগিল। আমি উমেশের সঙ্গে নবীনবাবুর বাসাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম, এবং সেই কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলাম। আমার অনুরোধে তিনি কবিতাটি আমার হাতে দিলেন। আমি কাটিয়া কুটিয়া তাহাতে নিজে কিছু যোগ করিয়া প্যারীবাবুর হাতে দিয়া আসিলাম। তিনি তাহা এডুকেশন গেজেটে ছাপিলেন এবং নবীনকে ডাকিয়া উৎসাহিত করিলেন। পরে নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কবিতা গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সেই কবিতাটি আছে, এবং যত দূর মনে হয়, আমার প্রক্ষিপ্ত দুই-চারি পংক্তি এখনো রহিয়াছে। আমার এখন স্মরণ করিয়া হাসি পায়, আমি সেই অল্প বয়সে কাব্য জগতে কিরূপ মুরুব্বি হইয়া উঠিয়াছিলাম।

শিকারীসঙ্গ ও সুরাপান। প্যারীবাবুর সংস্রবে আসিয়া আমার এক উপকার হইল। সুরাপানের উপর আমার দারুণ বিদ্বেষ জন্মিল। তাহার একটি প্রমাণ আমার মনে আছে। আমি অগ্রেই বলিয়াছি, ভবানীপুরে যে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে আমি থাকিতাম, তাঁহারা সকলেই সাধু সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহাদের বিমল চরিত্রের প্রভাব আমাকে অনেক পরিমাণে গঠন করিয়াছে। তাঁহাদের একজন স্বসম্পর্কীয় লোক ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের সঙ্গে দুই-চারিদিন যাপন করিতেন। তিনি একটি সওদাগর আপিসে একটি বড় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অনেক টাকা উপার্জন করিতেন এবং দুই হস্তে ব্যয় করিতেন। বন্দুক ছোঁড়া, শিকার করা, সদলে নৌকাযোগে জলপথে বিচরণ করা, প্রভৃতি আমোদে অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। এই সব কারণে তিনি আমার ন্যায় যুবকদের চক্ষে একটা 'হিরো'র মতো ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটু দোষ ছিল, তিনি সুরাপান করিতেন। একবার অপরাপর কয়েক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সঙ্গে গঙ্গার চড়াতে কয়েকদিন বাস করিতে গিয়াছিলাম। প্রতিদিন পাখি শিকারের সময় সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনো মাতাল অবস্থাতে দেখি নাই। যাহা হউক, তিনি আমাদিগকে সর্বদাই সুরাপান করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেন; বলিতেন, পরিমিত সুরাপান করিলে শরীর ভালো থাকে, মনে স্ফূর্তি

থাকে, কাজের শক্তি বাড়ে, ইত্যাদি। আমার যেন স্মরণ হয় যে, তাঁহার প্ররোচনায় একদিন কি দুইদিন একটু-একটু সুরাপান করিয়াছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য জগদীশ্বরের কৃপা! তৎপরেই মনে মহা নির্বেদ উপস্থিত হইল। প্যারীচরণ সরকার মহাশয়কে, মাতুল মহাশয়কে ও পিতাঠাকুরকে স্মরণ করিয়া মহা লজ্জিত হইলাম, এবং সুরাপান নিবারণের জন্য দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হইলাম। তদবধি আমি সুরাপান নিবারণের পক্ষে রহিয়াছি।

কাব্যে ছন্দপরীক্ষা : 'নির্বাসিতের বিলাপ'। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সালে ভবানীপুরের একটি ভদ্রসন্তান কোনো গুরুতর অপরাধে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয়। সেই ঘটনাতে ভবানীপুরের লোকের চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে, আমারও চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে। সেই প্রকার মনের ভাব লইয়া কবিতা লিখিতে বসি। কবিতাটি মাতুলের সংবাদপত্র সোমপ্রকাশে 'নির্বাসিতের বিলাপ' নামে প্রকাশিত হয়।

মাতুলের হস্তে যখন 'নির্বাসিতের বিলাপে'র প্রথম কয়েক পংক্তি সোমপ্রকাশে মুদ্রিত করিবার জন্য দিয়া আসিলাম, তখন ভয়ে ভয়েই দিয়া আসিলাম। মনে হইল তিনি ডাকিয়া তিরস্কার করিবেন। মনে করিয়াছিলাম, দুই-একবার লিখিয়া সমাপ্ত করিব। কিন্তু প্রথমবার কয়েক পংক্তি বাহির হইলে, তিনি কলেজে আমাকে ডাকিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং আরও কবিতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া গেলাম। অমনি আরও লিখিতে বসিলাম। এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সোমপ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকবার প্রকাশিত হইতে না হইতে চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। পথে ঘাটে, ভাড়াটে গাড়িতে লোকে বলিতে লাগিল, "এ 'শ্রীশিঃ' কে হে?" আমার লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মনে-মনে মস্ত একটা কবি হইয়া দাঁড়াইলাম। বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না, কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানত এইজন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিবাহ। আমি যখন কবিতারসে নিমগ্ন আছি, তখন এক পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটিল। কোনো বিশেষ কারণে আমার পিতা আমার পত্নী প্রসন্নময়ীর ও তাঁহার বাড়ির লোকের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, তাঁহাকে আর আনিবেন না। তাঁহাকে একেবারে বর্জন করা যখন স্থির

হইল, তখন এই প্রশ্ন উঠিল যে আমি তো একমাত্র পুত্র সন্তান, বংশ রক্ষার উপায় কি হইবে? অতএব আমার পুনরায় বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। আমার এরূপ বয়স হইয়াছিল যে বহুবিবাহকে মন্দ বলিয়া জানি। প্রসন্নময়ীর প্রতি তখন আমার যে বড় ভালোবাসা ছিল, তাহা নহে। তবে তাঁহার ও তাঁহার বাড়ির লোকের সামান্য অপরাধে তাঁহাকে গুরুতর সাজা দেওয়া হইতেছে, ইহা অনুভব করিয়াছিলাম। আমি কিরূপে এইরূপ কঠিন ব্যবহারে সহায়তা করি, ইহা ভাবিয়া মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বাল্যাবধি পিতাকে এরূপ ভয় করিতাম যে, তাঁহার ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। তথাপি আমি নিজে ও জননীর দ্বারা তাঁহাকে জানিতে দিয়াছিলাম যে, এরূপ বিবাহে আমার মত নাই।

বাবা আমাকে বিবাহ দিতে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে লইতে ভবানীপুরে মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে আসিলেন, এবং আমাকে লইয়া গেলেন। পথে আমাকে আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভয় করিতাম, তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিতে পারিতেছি না, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। অবশেষে আমাদের গ্রামের দুই ক্রোশ উত্তরবর্তী বারাসত গ্রামে যাইবার সময় আমি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আপনি মনে করিতেছেন, আমার স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দিয়া আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদিগকে সাজা দিবেন, কিন্তু ফলে এ-সাজা আমাদিগকেই পেতে হবে। আমার বোধ হয় এরূপ কাজ না করাই ভালো।" যেই এই কথা বলা, অমনি বাবা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের পায়ের জুতা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুই এখান হতে ফিরে যা, আর এক পা তুলেছিস কি এই জুতা মারব।" আমি বলিলাম, "চলুন, বাড়িতে গিয়ে মা'র সামনে কথা হবে। আমার বক্তব্য যা, তা আমি বললাম, তারপর করা না-করা আপনার হাত।" তাহার পর দুজনে বাড়িতে যাওয়া গেল। আমি গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, একি হচ্ছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের উপর রাগ করে একি করা হচ্ছে?" মা বলিলেন, "জানিস তো, আমার কাঁধের উপর একটা বৈ মাথা নেই, আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না, যা জানে করুক।" বাবা আমাদের আপত্তির প্রতি দৃকপাতও করিলেন না। আমাকে ধরিয়া বিবাহ দিতে লইয়া গেলেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ বর্ধমান জেলার দেপুর নামক গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত হইল। বিবাহটা ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ কোন সালে হইয়াছিল, ঠিক মনে নাই।

দ্বিতীয় বিবাহের পরিণাম। এই বিবাহের পরেই আমার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। একটি নিরপরাধা স্ত্রীলোককে অন্যায়রূপে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল, এবং আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই অন্যায় কার্যের প্রধান পুরুষ হইলাম, ইহা ভাবিয়া লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পিতার আদেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে আমি এই ভাবিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দশ বর্ষ বনবাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আমি না হয় পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অনুতাপের মুহূর্তে সে চিন্তা আর আমাকে বল দিতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মানুষ আপনার কাজের জন্য আপনিই দায়ী, হাজার গুরুর আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেহ লয় না। আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল। সে তীব্র আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে উপহাস-রসিক বন্ধুতাপ্রিয় মানুষ ছিলাম, আমার হাস্য পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনো নিচের গর্তে বা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলে ভালো হয়।

এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস কখনো করি নাই। আমার স্মরণ আছে, এই সময়ে আমার পিতা আমার নিকট অনেক সময় সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বনে নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। বলিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্তিক নহেন, ইত্যাদি। ইহা লইয়া পিতা-মাতাতে কখনো কখনো ঝগড়া হইয়াছে দেখিয়াছি। বাবার সঙ্গে এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত আছি দেখিলে, মা বাবার প্রতি রাগ করিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেন। বলিতেন, "রাখ, রাখ, তোমার নাস্তিক দর্শন রাখ, ছেলের মাথা খেও না।" কিন্তু নাস্তিকতা আমার মনে ভালো লাগিত না, মনে বসিত না। আমি বালককাল হইতে পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালোবাসিতাম। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে কখনো গুরুতর রূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানসিক অবসাদের কথা লইয়া আমাকে একখানি থিওডোর পার্কারের 'টেন্ সারমনস্ এ্যাণ্ড প্রেয়ার্স' পাঠাইয়া দিলেন। পার্কারের প্রার্থনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে

শয়নের পূর্বে একখানি খাতাতে একটি প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শয়ন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাই নহে, দিনের মধ্যে প্রত্যেক দণ পনরো মিনিট অন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম। দুঃখের বিষয় আমার সে প্রার্থনার খাতাখানি হারাইয়া গিয়াছে। নতুবা ধর্মজীবনের শৈশবের সেই আধ-আধ ভাষা আজ দেখিতাম।

ধর্মজীবনের সূত্রপাত। ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহ। প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটি পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম, দুর্বলতার মধ্যে বল আসিল, আমি মনে সঙ্কল্প করিলাম, "কর্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক থাকে থাক ধন প্রাণ মান রে।" আমি ধর্মের আদেশ ও হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের উপাসনাতে যাইব স্থির করিলাম, ও যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পাছে আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করেন, পাছে লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, এই ভয়ে উপাসনা আরম্ভ হইলে যাইতাম ও উপাসনা ভাঙিবার অগ্রেই চলিয়া আসিতাম।

এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার একটু একটু করিয়া যোগ হইতে লাগিল। আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে বিলাতে গিয়া ডাক্তার হইয়া আসিয়াছিলেন) তখন ব্রাহ্মদের নিকট সর্বদা যাইতেন, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা আমাকে আসিয়া বলিতেন এবং ব্রাহ্মদের প্রকাশিত পত্রিকাদি আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। কিন্তু আমাকে ব্রাহ্মদের কাছে লইতে চাহিলে লজ্জাতে যাইতে চাহিতাম না। একদিনের কথা স্মরণ হয়। উমেশ আমাকে ও যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (যিনি পরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন) ভজাইয়া কেশববাবুর কলুটোলার বাড়িতে লইয়া গিয়া দেখা করাইয়া দিতে চাহিলেন। আমি কেশববাবুর বাড়ির দ্বার পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু বাড়ির মধ্যে পা বাড়াইতে পারিলাম না ; উমেশের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলাম। আর একবার উমেশ ও আমি চিৎপুর রোড দিয়া আসিতেছি, এমন সময় বৃষ্টি আসিল। তখন কেশববাবু চিৎপুর রোডে 'কলিকাতা কলেজ' নামে একটি কলেজ খুলিয়াছিলেন। আমরা বৃষ্টির ভয়ে ঐ কলেজের বারাণ্ডার নিচে গিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ আমাকে ভিতরে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, আমি লজ্জাতে ভিতরে যাইতে পারিলাম না। এমন সময় একটি পশ্চিমে বেহারা উপর হইতে নামিয়া আসিল। আমরা কেশব-বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিতে লাগিল, "কেশববাবু মানুষ নয়, দেবতা। তাঁর কাছে চল, দুটি কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।" তাহার প্রভুভক্তি দেখিয়া

তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা কেশববাবুর কল্পিত নিন্দা আরম্ভ করিলাম। তাহাতে সে অতিশয় বিরক্ত হইল, এবং অবশেষে আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া কেশববাবুর দীর্ঘ জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি দেখিয়া স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বলিলাম, "উমেশ, এ সামান্য মানুষ নয়, যাঁর চাকর এত দূর আকৃষ্ট হতে পারে।" তখন উমেশ আবার আমাকে কেশববাবুর নিকট যাইবার জন্য চাপিয়া ধরিল, কিন্তু আমি লজ্জাবশত যাইতে পারিলাম না।

ইহার পরে, উমেশ যোগেন্দ্র ও অপরাপর ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে আমি আমাদের পূর্বতন সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত এই বন্ধুদ্বয়ের বাসাতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিলাম। ইঁহারা এক সময় আমাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়িতেন, কিন্তু তখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে বিজয় ও অঘোর আমাকে আর ভবানীপুরে যাইতে দিলেন না, নিজেদের বাসাতে রাখিলেন। আমার স্মরণ আছে যে, সে রাত্রে তাঁহাদের বাসাতে অন্যজাতীয়া স্ত্রীলোকের রাঁধা ভাত মাটির সানকোতে খাইয়া সমস্ত রাত্রি এত গা ঘিনঘিন করিয়াছিল যে, ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই।

পিতার বিরাগ। প্রার্থনা আমাকে বল আনিয়া দিল যে বলিয়াছি, তাহার অর্থ এই যে, মানুষের ভয় আমার মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল, এবং নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। পিতা কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন যে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাতে যাইতেছি। একদিন আমাকে ডাকিয়া সমাজে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি ধীর ভাবে বলিলাম, "বাবা, আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখনো লঙ্ঘন করি নাই। আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাওয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।" পরের বাসাতে পিতা আর কোনো কথা বলিলেন না, কিন্তু এই উত্তর তাঁহার এমনি নূতন ও ভয়ানক লাগিল যে, পরে শুনিয়াছি, সেদিন অনেক কাঁদিয়াছিলেন। আর দুই-তিনদিন তাঁহার কলিকাতাতে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু তৎপর দিনই দেশে চলিয়া গেলেন।

পরে শুনিয়াছি, তিনি বাড়িতে পৌছিলে তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার মা ভীত হইয়া গেলেন! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ এত ম্লান কেন, ছেলে কেমন আছে?" বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "সে মরেছে।" অমনি আমার মা, "কি বল গো! ওগো কি বল গো!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পাশের বাড়ির মেয়েরা ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিতে

লাগিলেন, "কৈ, শিবুর ব্যারামের কথা তো শুনি নাই।" তখন বাবা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে মরার মধ্যে। সে ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ করেছে, আমি বারণ করলেও শুনবে না।"

প্রার্থনার বল। যাহা হউক, প্রার্থনার দ্বারা যেমন বল পাইলাম, তেমনি আশাও পাইলাম। আমার অন্তরাত্মা বলিতে লাগিল, ঈশ্বর আমাকে পাপী বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমার বোধ হয়, পার্কারের সরস ও আশান্বিত ভক্তি এ-বিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, ব্যাকুল প্রার্থনা বিফলে যায় না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রেরণা প্রাণে পাইয়া মন আনন্দে মগ্ন হইতে লাগিল। তদবধি প্রার্থনাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তৎপরে আমি অনেক প্রলোভনে পড়িয়াছি, সময়ে সময়ে পতিত হইয়াছি, অনেক অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু প্রার্থনাতে বিশ্বাস আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। সকল সংগ্রামের মধ্যে দুর্বলতাতে বল, নিরাশাতে আশা, নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সেই মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহার দুর্বল সন্তানকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। যে ছেলেটা চলিতে পারে না, বার বার পড়িয়া যায়, তাহার ধরার অপেক্ষা না রাখিয়া যেমন পিতা বা মাতাকে নিজেই সে ছেলের হাত শক্ত করিয়া ধরিতে হয়, তেমনি যেন মনে হয়, সেই মঙ্গলময় পুরুষ দেখিয়াছেন যে, এ পাপী ও দুর্বল মানুষটা নিজে ধরিয়া চলিতে পারে না, যখনি তাঁহাকে ভুলিতেছে, তখনি পতিত হইতেছে, তাই তিনি বার-বার ধূলা ঝাড়িয়া চক্ষের জল মুছাইয়া তুলিয়া ধরিতেছেন।

ঠাকুরপূজা ত্যাগ। বল ও আশা পাইয়া আমি নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম। এইবার আমার কঠিন সংগ্রাম আসিল। ইহার পূর্বে গ্রীষ্মের ছুটিতে বা পূজার বন্ধে বাড়িতে গেলেই আমাকে ঠাকুর পূজা করিতে হইত। আমাদের কুলক্রমাগত কতকগুলি ঠাকুর ছিল। বাবা সচরাচর তাহাদের পূজা করিতেন। আমি বাড়িতে গেলে তিনি সেই কার্যভার আমার উপর দিয়া অপরাপর গৃহকার্য করিবার জন্য অবসর লইতেন। যেবারে আমার হৃদয় পরিবর্তন হইয়া আমি বাড়িতে গেলাম, সেবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলাম যে আর ঠাকুর পূজা করিব না। গিয়াই মাকে সে সঙ্কল্প জানাইলাম। মা ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, একটা মহা সংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি কোনো মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। "ধর্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পারিব না" বলিয়া করযোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিলাম।

অবশেষে সেই সঙ্কল্প যখন বাবার গোচর করা হইল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমনের ন্যায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। আমি ধীর ভাবে বলিলাম, "কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক-একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।" এই কথা শুনিয়া ও আমার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন, এবং প্রায় অর্ধঘণ্টা কাল কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন।

সেইদিন হইতে আমার মূর্তি পূজা রহিত হইল। আমি সত্যস্বরূপের উপাসক হইলাম। কিন্তু আমাদের পারিবারিক আন্দোলন গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আমাকে সকলেই নির্যাতন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তৎপরে বাবা আমাকে গ্রামস্থ ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমি অন্য সময়ে মিশিতাম না, কিন্তু যেদিন তাঁহারা সকলে উপাসনা করিবেন বলিয়া সংবাদ দিতেন, সেদিন বাবা গাত্রোত্থান করিবার পূর্বেই গিয়া উপাসনাতে যোগ দিতাম, আসিয়া তিরস্কার ও গঞ্জনা সহ্য করিতাম। তখন কেহ ব্রহ্মোপাসনা করিবে শুনিলে চারি পাঁচ মাইল হাঁটিয়া গিয়া যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

অথচ এই সময়ে গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্ম, ভবানীপুরের দুই-চারিজন ব্রাহ্ম ও বিজয় অঘোর ভিন্ন আর কোনো ব্রাহ্মের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল না। কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না, লজ্জাতে কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহিতাম না।

শাঁখারীটোলার জগৎবাবু। ১৮৬৭ সালের শেষ ভাগে আমি ভবানীপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটী হইতে ঐ স্থানে একটি ভদ্রপরিবারের অনুরোধে তাঁহাদের সহিত কলিকাতা শাঁখারীটোলাতে এক বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তাহার ইতিবৃত্ত এই। জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি ভদ্রলোক ভবানীপুরে বাস করিতেন। মহিম নামে তাঁহার একটি ছেলে সংস্কৃত কলেজে পড়িত ও আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে কলেজে যাইত। সেই সূত্রে জগৎবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। জগৎবাবুর সাধুতা সদাশয়তা সৌজন্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে, আমার প্রতিও তাঁহার পুত্রবৎ স্নেহ জন্মে। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া গিয়া তাঁহার গৃহিণীর সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, পঠদ্দশাতে শহরে থাকিতে আমার সহাধ্যায়ীদের কাহারও কাহারও মাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম, এবং মাসীর ন্যায় স্নেহ পাইতাম। বলিতে কি, সে সময়ে আমাকে যেরূপ কুসঙ্গের মধ্যে বাস করিতে হইত, স্মরণ করিলে এই মনে হয় যে, সেই মাসীদের স্নেহের গুণে ও তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবেই আমি এই সকল কুসঙ্গের অনিষ্ট ফল হইতে বাঁচিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি জগৎবাবুর পত্নীকেও মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমাকে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে যে কি ভালোবাসিতে লাগিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। শেষে এমনি দাঁড়াইল যে, আমি দুই-চারিদিন দেখা না করিলে মাসী ডাকিয়া পাঠাইতেন, এবং আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়া তিরস্কার করিতেন, এটা-ওটা খাওয়াইতেন, ঘরকন্নার কথা কত শুনাইতেন, আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিতেন না। আমি আপ্যায়িত হইয়া বাসায় ফিরিতাম।

হায়, তাঁহাদের 'কঠিন ছেলে' ব্রাহ্মসমাজের কাজে ও নানা বিষয়ে মাতিয়া কোথায় গিয়া পড়িল, তাঁহারা কোথায় গিয়া পড়িলেন! মাসীকে আর কত কাল দেখিলাম না। এখন ভাবিয়া দেখি, মাসী যে আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন। আমি মানুষেরনিকট যতটা প্রেম পাইয়াছি, ততটা প্রেম দিতে পারি নাই। এ-জীবনে যে আমি সর্বদা নানা সংগ্রামের মধ্যে বাস করিয়াছি, তাহা বোধ হয়, আমার প্রেমিক বন্ধুদের প্রতি আমার সমুচিত প্রেমের অভাবের একটা কারণ। নির্যাতন বিদ্বেষ বিবাদ প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া মন উত্তাপের মধ্যে বাস করিয়াছে, প্রেমের সুশীতল বায়ু সেবন করিবার সময় পায় নাই।

যাহা হউক, আমি এই মাসীর এত স্নেহের এইমাত্র প্রতিদান করিতাম যে, তাঁহাদের মহিমকে রোজ কাছে আনিয়া পড়া বলিয়া দিতাম। ১৮৬৭ সালের শেষ ভাগে ইঁহারা কলিকাতার শাঁখারীটোলাতে এক বাড়িতে গিয়া থাকিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তখন মাসী আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতাম পারিলাম না। আমরা আসিয়া শাঁখারীটোলাতে বাস করিতে লাগিলাম। আমি ও মহিম বাহির বাড়িতে এক দ্বিতীয় তল গৃহে বাস করিতাম। সে ঘরটি বাহির বাড়িতে হইলেও ঠাকুরদালানের ছাদের উপর দিয়া অন্দরমহল হইতে সে ঘরে যখন ইচ্ছা আসা যাইত। সুতরাং মাসী কাজকর্ম হইতে একটু অবসর পাইলেই আমার ঘরে আসিয়া বসিতেন, এবং আমার ও মহিমের পড়া দেখিতেন, এবং নানা ভালো কথায় কাল কাটাইতেন।

বালিকা বন্ধুর বেদনা। আমরা এই বাড়িতে আসার পর মাসীর ভ্রাতুষ্পুত্রী,

১৫।১৬ বৎসরের বালিকা, তাঁহাদের নিকট আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। সে ২।১ দিনের মধ্যেই আমাকে 'দাদা' করিয়া লইল। পিতা-মাতা ঐ বালিকাটিকে শৈশবে একজন পরিণতবয়স্ক বিপত্নীক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বালিকাটি বোধ হয় পতির নিকট বা পতিগৃহে ভালো ব্যবহার পাইত না, কারণ শ্বশুরবাড়ির কথা তুলিলেই দরদর ধারে তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, এবং তাহা দেখিয়া বাল্য-বিবাহের প্রতি আমার ঘৃণা বাড়িয়া যাইত। আমি সাবধান হইয়া বালিকাটির নিকট তাহার শ্বশুরবাড়ির কথা তুলিতাম না, তাহাকে পড়াশোনায় গল্পগাছায় ভুলাইয়া রাখিতাম। বালিকাটি প্রাতে গৃহকর্মে পিসীর সহায়তা করিত, আমার নিকট আসিতে পারিত না, কিন্তু বৈকালে আমি ও মহিম কলেজ হইতে আসিলেই সে আমাদের গৃহ আশ্রয় করিত। আমি তাহাকে ও মহিমকে পড়াইতাম, লিখিতে শিখাইতাম, ভালো ভালো গল্প শুনাইতাম, আমার সেই পূর্বকালের উন্মাদিনীর অভাব যেন কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইত। অনেকদিন এরূপ হইত যে, আমি পড়িতে বসিতাম, সে ও মহিম ঘুমাইয়া পড়িত। আমি শয়নের পূর্বে তাহাকে তুলিয়া বাড়ির ভিতর দিয়া আসিতাম।

আমি এইখানে থাকিতে থাকিতে আমার বন্ধু যোগেন্দ্র (যিনি পরে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বিধবা বিবাহ করেন এবং আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যোগেন্দ্রের সঙ্গে থাকিবার জন্য যাই। কিরূপে সে বিবাহ ঘটে পরবর্তী পরিচ্ছেদে তাহা বলিতেছি। যাইবার সময় মাসীকে বিশেষত সেই বালিকাটিকে ছাড়িয়া যাইতে বড় ক্লেশ হইয়াছিল, সেজন্য সে বিচ্ছেদটা মনে আছে। সে যেন আমার স্নেহ পাইয়া প্রাণ দিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেই স্নেহ-পাশ ছিঁড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল। আমি যখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জানাইলাম, তখন মেয়েটি কয়দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। অবশেষে যখন আমি জিনিসপত্র লইয়া বিদায় হই, তখন বলিল, "দাদা একটু দাঁড়াও, একবার ভালো করে প্রণাম করি।" এই বলিয়া তাহার অঞ্চলটি গলায় দিয়া গলবস্ত্র হইল এবং আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে ও আমার চরণে প্রণত হয় এবং ডাক ছাড়িয়া কাঁদে, আমিও তাহার সঙ্গে কাঁদি।

সেই যে কাঁদিয়া বাল্যবিবাহকে ঘৃণা করিতে করিতে সে বাড়ি হইতে বিদায় লইলাম, সেই ঘৃণা অদ্যাপি আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে। কেহ দশ-এগারো বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিতেছে দেখিলে মনে বড় ক্লেশ হয়। কি আশ্চর্য! বাল্যবিবাহের

অনিষ্ট ফল পূর্বে কত দেখিয়াছিলাম, শাশুড়ীর হাতে বৌয়ের প্রাণ গেল, কতবার শুনিয়াছিলাম, বালিকা পত্নী বিরাজমোহিনীকে হাত পা বাঁধিয়া চিতার উপরে ফেলিয়া দিল, ইহাও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ মেয়েটির চক্ষের জলে শিশু বালিকা-দিগকে হাত পা বাঁধিয়া দান করার উপরে আমাকে যেরূপ জাতক্রোধ করিল, এরূপ অগ্রে করে নাই। কোন ঘটনাতে মানুষের মনে কোন ভাব আসে, ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

হায় হায়! ঘটনাচক্রে মেয়েটি কোথায় গেল, আমি কোথায় গিয়া পড়িলাম। তৎপরে বহু বৎসর পরে একদিন বিধবা বেশে মলিন বস্ত্রে দীনহীনার ন্যায় শিশু-কোলে তাহাকে ভবানীপুরের গলিতে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাইতে দেখিয়াছিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল, কিন্তু আমার চিনিতে বিলম্ব হইল। দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিলাম ও চক্ষের জল ফেলিলাম। সেই দেখা শেষ দেখা।

দ্বিতীয়বার বিবাহের পরই আমার হৃদয় পরিবর্তন হইলে, আমি নিরপরাধা প্রসন্নময়ীর প্রতি যে অন্যায়াচরণ হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যগ্র হই। সে মনের কথা কেবল আমার মাতামহীঠাকুরাণীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম। প্রসন্নময়ীর পিত্রালয় আমার মাতুলালয়ের সন্নিকট। সুতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে আনিলেন। আমাকে সংবাদ দিবা মাত্র আমি গিয়া প্রসন্নময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিলাম। তৎপরে বহুদিন প্রসন্নময়ী, আমার মাতুলালয়েই থাকেন। আমি শনিবার শনিবার সেখানে যাইতাম।

আমি প্রসন্নময়ীর সহিত মিলিত হইয়াছি জানিয়া আমার পিতা প্রথমে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পরে আমার অনুনয় বিনয়ে ও মাতাঠাকুরাণীর অনুনয় বিনয়ে আর্দ্র হইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হন। ১৮৬৭ সালে তিনি আবার আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন।

প্রথম সন্তান হেমলতা। ১৮৬৮ সালের ১১ই আষাঢ় আমার পৈতৃক ভবনে আমার প্রথম সন্তান হেমলতার জন্ম হয়। হেম জন্মিলে বাবার সহিত আমার আর এক মনোবাদের কারণ উপস্থিত হইল। অগ্রেই বলিয়াছি, আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলজাত কুলীন ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল। তদনুসারে হেমলতার শৈশবেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার কথা। আমি সে পথে বিরোধী হইলাম। তাহার বিবাহ সম্বন্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পিতাকে পত্র লিখিলাম। তাহাতে বাবা কুপিত হইলেন। আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না। আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে

একটি শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। আমি শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

আত্মনিগ্রহের সংকল্প। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা দ্বারা আমার হৃদয় পরিবর্তন ঘটিলে আমার প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়াছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার জন্য দুরন্ত প্রতিজ্ঞা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিলাম। যে যে বিষয়ে আসক্তি ছিল তাহা ত্যাগ করিতে এবং যে-কিছু অরুচিকর তাহা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সময়ে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি, প্রাণীহত্যা নিবারণের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিয়া। মাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে, ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়িতে বাসকালে প্রায় প্রতি রবিবার প্রাতে যখন কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঁঠা আসিত, সে পাঁঠার ডাক শুনিলেই আমার পড়াশোনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া রাঁধিয়া পেটে না পুরিতে পারিলে আর কিছু করিতে পারিতাম না। কবিতা পড়িতে ও কবিতা লিখিতে অতিরিক্ত ভালোবাসিতাম বলিয়া কিছুদিন কবিতা পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম, ফিলজফি ও লজিক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধুদের সহিত হাসি-ঠাট্টা ও গল্পগাছা করিতে ভালোবাসিতাম, কিছুদিন মনের কান মলিয়া দিয়া মৌনব্রত ধরিলাম। এই মনের কান মলাটা তখন অতিরিক্ত মাত্রায় করিতাম।

হৃদয়ে ধর্মভাবের উন্মেষ হওয়া অবধি আমি কলেজের পরীক্ষাতেও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। তদবধি প্রতি বৎসর আমি কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলাম। আত্মনিগ্রহের উদ্দেশ্যে, পাঠ্য বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অপ্রীতিকর বোধে যে যে বিষয় অবহেলা করিতাম, তাহাতে অধিক মনোযোগী হইলাম। আমার মনে আছে, অগ্রে অঙ্কে অমনোযোগী ছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ পরীক্ষাতে কখনো এক শতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। ১৮৬৬ সাল হইতে তাহা বদলাইয়া গেল। অঙ্কে এরূপ মনোযোগী হইলাম যে, ঐ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সেকেণ্ড গ্রেড স্কলারশিপ পাইলাম, কলেজেও প্রথম হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই দৃঢ় ব্রত রহিয়া গেল। কি কঠিন সংগ্রাম করিয়া ১৮৬৮ সালে এল. এ. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম ও ৫২ টাকা স্কলারশিপ পাইয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা ক্রমশ করিতেছি। আমার নব ধর্মভাব আমাকে সেই সংগ্রামে শক্তি দিয়াছিল।

বলিতে কি, আমার ধর্মজীবনের আরম্ভ হইতে এই ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত কালকে শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়া মনে করি। এই সময়টা যে ভাবে যাপন করিয়াছিলাম, সেজন্য মুক্তিদাতা প্রভু পরমেশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করি। বিনয়, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, প্রার্থনাপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্মজীবনের অনেক উপাদান এ-সময়ে আমার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। আমার যত দূর স্মরণ হয়, তখন আমার মনের ভাব এই প্রকার ছিল যে, আমার ধর্মবুদ্ধিতে থাকিয়া ঈশ্বর যে পথ দেখাইবেন তাহাতে চলিতে হইবে, ক্ষতি লাভ যাহা হয় হউক। সকল বিষয়ে ও সকল কার্যে ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিতাম, এবং যাহা একবার কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিতাম, তাহাতে দুর্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান হইতাম, ফলাফল ও জীবন মরণ বিচার করিতাম না। ইহার নিদর্শন স্বরূপ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবা বিবাহ দেওয়া ও আমার এল. এ. পরীক্ষার জন্য গুরুতর শ্রম, প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিতে পারা যায়। সে সকল ক্রমশ বর্ণনা করিতেছি।

বন্ধুর বিধবাবিবাহ ও সামাজিক নির্যাতন। প্রথম ঘটনা, যোগেন্দ্রের বিধবাবিবাহ। এই বিবাহ ১৮৬৮ সালের প্রথম ভাগে হয়। ইহার ইতিবৃত্ত এই। ঈশানচন্দ্র রায় নামক নদীয়া-কৃষ্ণনগর নিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী একটি যুবক তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতা ও একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন) ঐ মেয়েটিকে পড়াইতেন। হেমদাদার নিকট আমি মেয়েটির প্রশংসা সর্বদা শুনিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন যে, মেয়েটির ভাই তাহার আবার বিবাহ দিতে চায়। আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবাবিবাহের পক্ষ। আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমার আলাপী কি কোনো ছেলে পাওয়া যায় না যে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারে?

ইতিমধ্যে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পরলোক গমনের দশ-বারোদিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া আমাকে সেই কথা জানাইলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম, "যাও যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। দশ-বারোদিন হল তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যে বিবাহের কথা! আর বিয়েই যদি কর, একটি আট-নয়-বছরের মেয়ে বিয়ে করবে তো, তাতে আমার মত নেই। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।" যোগেন্দ্র সেদিন বিষণ্ণ অন্তরে ঘরে গেলেন। দুদিন পরে আবার আসিয়া আমাকে ধরিলেন।

আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহ করিবার জন্ত নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন আমি হেমদাদার সাহায্যে ঈশানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যোগেন্দ্র ও ঈশানের ভগিনী মহালক্ষ্মী পরস্পরের সহিত পরিচিত হইলেন এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন।

মহালক্ষ্মীর বয়স তখন বোধ হয় ১৮ বৎসর হইবে। আমাদের অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের ছোট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ব হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগিনীকে জানিতেন, এবং যত দূর স্মরণ হয় কিছু-কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া দুই-তিনজন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যত দূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু-কিছু গহনা দিলেন।

এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্কলারশিপ ও ঈশানের স্কলারশিপ মাত্র ভরসা দাঁড়াইল। তদুপরি চাকর-চাকরানী কেহই থাকে না, দিন চলা ভার। এই অবস্থাতে তাঁহারা আমাকে গিয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন শাঁখারীটোলায় জগৎবাবুর বাটীতে থাকিতাম। যোগেন্দ্রের ও ঈশানের স্কলারশিপের সহিত আমার স্কলারশিপ যোগ করিলে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে, এবং আমি সঙ্গে থাকিলে অপরাপর নানা প্রকারে সাহায্য হইতে পারে, এই আশায় তাঁহারা আমাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিতে ধরিয়া বসিলেন। আমি বিবাহের ঘটক, আমি তাঁহাদের বিপদের সময় কিরূপে সাহায্য দানে বিরত থাকি? সুতরাং আমি বাবাকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলাম।

বাবা এই সংবাদ পাইয়া অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন, কারণ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও গ্রামের লোক এই সংবাদ পাইলে গোলযোগ করিবে। তিনি আমাকে ইঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করিয়া পত্র লিখিলেন। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিলাম, যে বিবাহের আমি ঘটক, সেই বিবাহ নিবন্ধন বিবাহিত দম্পতি যখন ঘোর নির্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াছেন, তখন সাহায্যের উপায় থাকিতে সাহায্য না করা অধর্ম; সুতরাং সেরূপ কাজ আমি করিতে পারিব না। বাবা সে যুক্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না, পরন্তু লিখিলেন যে, তাহা হইলে তিনি আর প্রসন্নময়ীকে

বাড়িতে রাখিতে পারিবেন না এবং আমাকে সস্ত্রীক গৃহ হইতে নির্বাসিত করিবেন।

আমার মাতুল। যখন এইরূপ চিঠিপত্র চলিতেছে তখন একদিন বড়মামা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার ভবনে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাবার এক পত্র আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, বাবা আমাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বড়মামার শরণাপন্ন হইয়াছেন। চিঠি পড়িয়া আমি ধীর ভাবে সমুদয় ঘটনা মাতুলের নিকট বর্ণনা করিলাম। কিরূপ নির্যাতন, কিরূপ দারিদ্র্য কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহা ভাঙিয়া বলিলাম। বলিয়া তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মাতুলমহাশয় কিছুক্ষণ ধীর গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, তুমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পার না। তুমি তাহাদিগকে বিবাহে উৎসাহ দিয়া বিপদের সময় যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অধর্মের কাজ হইবে, কাপুরুষতা হইবে, আমার ভাগিনার মতো কার্য হইবে না।"

আমার হৃদয় হইতে কে যেন দশ মণ বোঝা নামাইয়া লইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আমার বাবাকে এই কথা লিখুন।"

তিনি বাবাকে লিখিলেন যে, সে প্রকার অনুরোধ তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না। আমি তাহাদের সাহায্য করিতে বাধ্য।

বন্ধুতার দায়িত্ব। যোগেনদের বিবাহেব পর তাহাদের জন্য আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। এই পরিশ্রমের মধ্যে একবার আমি কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার জন্য যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া মাতুলালয়ে গেলাম। দুই-তিনদিন মাতুলালয়ে মাতামহীর কাছে আছি, এমন সময় একদিন রাত্রি দশটার সময় ঈশানের এক জরুরি টেলিগ্রাম পাইলাম, "এখানে তোমার উপস্থিতি-একান্ত প্রয়োজন, অবিলম্বে এস।" তখন কি করি! রেলওয়ে স্টেশন মাতুলালয় হইতে দুই-তিন মাইল দূরে। মাঠ দিয়া স্টেশনে যাইতে হয়, কিন্তু তখন সমুদয় মাঠ জলে প্লাবিত, পথ পাওয়া দুষ্কর। মাতামহী ঠাকুরাণী ও মামীমা বারণ করিতে লাগিলেন। আমি মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। কিন্তু বড়মামা বলিলেন, "জরুরি টেলিগ্রাম যখন করিয়াছে, তখন নিশ্চয় কোনো বিপদ ঘটিয়াছে, তুমি যাও। রাত্রি শেষে ৩টা কি ৩।০টার সময় একটা ট্রেন আছে; সেই ট্রেনে যাও।" আমি তাঁহার উপদেশে সেই রাত্রেই যাত্রা করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে এক চাকর ও লণ্ঠন দিলেন। আমি জল ভাঙিয়া কোনো প্রকারে রাত্রি ১২টার সময় স্টেশনে পৌঁছিলাম, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কলিকাতায় আসিয়া

উপস্থিত হইলাম।

আসিয়া শুনি, আমি মাতুলালয়ে গেলে তৎপর দিন যোগেনের মা হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যোগেনকে তাঁহার আত্মীয়গণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ও গতকল্য প্রাতঃকাল হইতে কোনো না কোনো ছলে তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। সকলে মিলিয়া এই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক অপর একটি বালিকাকে বিবাহ করিবার জন্য যোগেনকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। যোগেন মাতাকে লইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কি, তাঁহার কাছে রাত্রি যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া মহালক্ষ্মীর কাছে রাত্রিতেও আসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে মহালক্ষ্মীর কাছে থাকে কে? তাহার মাতা কন্যার পুনর্বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে ঈশানেরও হাসপাতালের নাইট ডিউটি উপস্থিত। তাই আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

আমি আসিয়াই যোগেনের মাকে দেখিতে গেলাম, ও তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। তাঁহাকে বুঝাইয়া ও যোগেনকে বলিয়া, যোগেনকে মহালক্ষ্মীর নিকট রাত্রি যাপন করিতে প্রবৃত্ত করিলাম। তিনি সমস্ত দিন মাতার কাছে যাপন করিয়া রাত্রে বাড়িতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আসিতে অনেক রাত্রি করিতেন। ঐ সময় আমি আহারান্তে মহালক্ষ্মীর ঘরে বসিয়া তাঁহাকে বাংলা ও ইংরাজী পড়াইতাম এবং দুজনে ধর্মবিষয়ে আলাপ ও উপাসনা করিতাম।

এইরূপে আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাঁহার ভগ্নহৃদয়া মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, ঈশানেরও পাঠ ও নাইট ডিউটির হাঙ্গামাতে অবসরাভাব হইল। এদিকে চাকর-চাকরানী নাই, সুতরাং আমাকেই বাজার করা, তিন তলাতে কাঁধে করিয়া জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় গৃহ-কর্ম করিতে হইত। এই সকল স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়। এই সকল শ্রম করিতে আমার কিছুই ক্লেশ হইত না, কারণ মহালক্ষ্মীর বিমল ভালোবাসাতে আমাকে সরস রাখিত। মানুষ মানুষকে এত ভালোবাসে না! যোগেনকে সর্বদাই আত্মীয়স্বজনের কাছে যাইতে হইত, সুতরাং আমিই তাহার সঙ্গী, তাহার শিক্ষক, তাহার রান্নাঘরের চাকর, সকলই। আমি একদিন অন্যত্র গেলে সে অস্থির হইয়া উঠিত।

ফলতঃ, এই কালকে যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছি, তাহার কারণ এই। এই কালের মধ্যে আমার অন্তর ধর্মভাব ও ব্যাকুলতা পূর্ণ মাত্রাতে কাজ করিতেছিল; অপর দিকে বন্ধুদের প্রীতি শ্রদ্ধা পূর্ণ মাত্রাতে ভোগ করিতে-

ছিলাম। বস্তুত, আমার প্রতি ঈশান ও যোগেনের প্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও নির্ভরের যেন সীমা ছিল না।

লিখিতে লিখিতে একটা কথা মনে হইতেছে, তাহা ইহার অনেক পরের ঘটনা। তখন ঈশান বোধ হয় লক্ষ্ণৌ-এর বলরামপুর হাসপাতালে কর্ম করিতেন। সেই সময় একবার ছুটি লইয়া আসিয়া কলিকাতাতে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে, তিনি আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, আর বাড়িতে আসিতে দিলেন না। বলিলেন, "আমার পরিবার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তুমি থাক।" এই বলিয়া তাঁহার পত্নীর ত্রুটির বিষয়ে আমার কানে অনেক কথা ঢালিলেন। বলিলেন, "আমি আমার স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়াছি, কোনো ফল হয় নাই। তুমি একবার বুঝাও।" আমি বলিলাম, "তোমার কথাতে কাজ হয় নাই, আমার কথাতে কি হবে?" তিনি বলিলেন, "তোমাকে বড় ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তোমার কথাতে ওর উপকার হতে পারে।" আমি অগত্যা ভৃত্যের দ্বারা প্রসন্নময়ীকে সংবাদ দিয়া সে রাত্রি সেখানেই যাপন করিলাম। অনেকক্ষণ তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহাদের দাম্পত্য বিবাদ বিষয়ে কথাবার্তা কহিলাম। আমার কথার কি ফল হইল, জানি না, কিন্তু বন্ধুদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিষয় যখন স্মরণ করি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কারণ ইহাদের সদ্ভাব প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয় মনের অনেক উপকার হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পত্নীকে পুনর্বিবাহ দানের প্রস্তাব। এই সময় আমার মাথায় যত রকম আজগুবি মতলব আসিত, ভারত উদ্ধারের যত রকম খেয়াল ঘুরিত, স লের উৎসাহ-দায়িনী ছিলেন মহালক্ষ্মী। এ জীবনে আমার অনেক চেলা জুটিয়াছে, কিন্তু মহালক্ষ্মীর মতো চেলা অল্পই জুটিয়াছে। এই সময়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ পড়িয়া যোগেন কিছুদিনের জন্য নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমার সঙ্গে রোজ তর্ক ও ঝগড়া চলিত। আমি তাঁহাকে আস্তিক করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ঝগড়ার ফল এই হইত যে, তিনি আরও দৃঢ়তার সহিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিতেন, "স্ত্রীটিকে তো চেলা করিয়া লইয়াছ, যত পার ধর্ম তাহাকে ভজাও, আমাকে ছাড় না!" আমি যোগেনকে না পারিয়া মহালক্ষ্মীকেই ভজাইতাম। দুজনে প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম।

আমরা তিনটি প্রাণী এমনি 'রিফর্মার' হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়াছিলাম যে, আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১।১২

বৎসরের বালিকা। বোধ হয়, আমার পিতা-মাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। তাঁহাকে যে আনিয়া মহালক্ষ্মীর কাছে রাখিতে পারিলাম না, এজন্য মহা দুঃখ হইল।

এল. এ. পরীক্ষার্থী। তাহার পর, আমার এল. এ. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া। যোগেনের বিধবাবিবাহের ফলস্বরূপ আমাদিগকে কিরূপ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, অগ্রেই তাহার বর্ণনা করিয়াছি। বিবাহের কিছুদিন পরেই মহালক্ষ্মীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে লাগিল। চাকর পাওয়া যায় না, রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সেই অবস্থাতেই তাহাকে রাঁধিতে হয়। এদিকে, যোগেন আত্মীয়-স্বজনের নির্যাতনে অস্থির হইয়া পড়িলেন ও ঈশান মেডিকেল কলেজের ডিউটি লইয়া সর্বদা অনুপস্থিত থাকিতেন বলিয়া চাকরের অনেক কাজ আমার উপর পড়িয়া যাইতে লাগিল। বাজার করা, কাঁধে করিয়া তিনতলায় জল তোলা প্রভৃতির কাজ আমাকেই করিতে হইত—এ সকল পূর্বেই বলিয়াছি। এই সকল করিয়া আমি পড়িবার সময় বড় পাইতাম না। সম্মুখে বৎসরের শেষে পরীক্ষা আসিতেছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেছি না। এইরূপে ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় আমাকে অতিশয় ভালোবাসিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি এই বিধবাবিবাহে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার লেখাপড়া সব গেল দেখিয়া দুঃখিত হইতেছিলেন। তিনি অক্টোবরের প্রথমে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটা ভালো কাজে আছ, কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার জন্য চিন্তিত হয়েছি। তুমি আগামী পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখবে বলে মনে আশা করছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, তুমি স্কলারশিপ পাওয়া দূরে থাক, পাস হও কি না সন্দেহ।" তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল, আমি যেন কোনো পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াইয়াছি, আমার সম্মুখে গভীর গর্ত, আর এক পা বাড়াইলেই তাহার মধ্যে পড়িব! আমার সম্মুখে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত তাহা এক নিমিষের মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল, স্কলারশিপ যদি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের জন্য এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। যোগেন ও মহালক্ষ্মী সাহায্যের অভাবে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া চক্ষে জল আসিল। "ঈশ্বর রাখ, এই বিপদে রাখ," মনে-মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্যপথ নির্ধারিত হইয়া গেল। সর্বাধিকারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমার প্রতি একটা অনুগ্রহ

করিতে পারেন ? তাহা হইলে একবার জীবন মরণ পণ করিয়া দেখি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অনুগ্রহ ?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করিতেছি, কলিকাতা হইতে পলাইয়া ভবানীপুরে থাকিব, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আসিব না, একাগ্র চিত্তে পাঠে মন দিব এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্য যদি আমার স্কলারশিপ না কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, "তুমি কলেজে আসবে না, অথচ স্কলারশিপ কাটা হবে না, এটা কলেজের নিয়ম বিরুদ্ধ। ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা না করে এরূপ করতে পারি না। কি হয় তোমাকে দুদিন পরে বলব।" তৎপরে তিনি সমুদয় বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া ডিরেক্টরের নিকট হইতে অনুমতি আনিলেন এবং আমাকে ছুটি দিলেন।

আমি যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া আমার পুরাতন আশ্রয়দাতা ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদিগের নিকট আড়াই মাসের জন্য একটি ঘর চাহিলাম, যে ঘরে আমি একাকী থাকিব। তাঁহারা দয়া করিয়া তাহা করিয়া দিলেন। আমি সেই ঘর আশ্রয় করিয়া পাঠে একেবারে মগ্ন হইলাম। প্রাতে একবার স্নানাহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে আহারের সময় আধ ঘণ্টার জন্য যাইতাম। নতুবা দিনরাত্রি ঐ ঘরে যাপন করিতাম। এই আড়াই মাসের মধ্যে শয্যাতে যাই নাই। সন্ধ্যার সময় চাকরেরা আলো জ্বালিয়া দিয়া যাইত, সেই আলো সমস্ত রাত্রি থাকিত। বড় ঘুম পাইলে দুই-চারি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই ঘরেই ঘুমাইতাম। যত দূর স্মরণ হয়, পাঠের ঘণ্টা এইরূপ ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম—অঙ্ক ছয় ঘণ্টা (দুইঘণ্টা গ্রন্থ পড়া ও চারঘণ্টা অঙ্ক কষা), ইতিহাস ছয়ঘণ্টা, ইংরাজী তিনঘণ্টা, সংস্কৃত একঘণ্টা, লজিক দুইঘণ্টা—সর্ব শুদ্ধ প্রায় আঠারো ঘণ্টা। এইরূপ পড়িতে-পড়িতে শরীর ও মন সময়-সময় বড় অবসন্ন হইয়া পড়িত। তখন পড়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিত। সেই সময়ে যোগেন ও মহালক্ষ্মীর মুখ মনে করিয়া মনে দুরন্ত প্রতিজ্ঞা আসিত। ভাবিতাম, যাহাদের প্রধান উৎসাহদাতা হইয়া এই সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়াছি, তাহাদের সাহায্য করিতে না পারিলে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব ? প্রাণ থাক আর যাক, একবার মরণ-বাঁচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্রার্থনার উদয় হইত "হে ঈশ্বর, এই সংগ্রামে আমার সহায় হও।" তখন দিনের মধ্যে বহুবার প্রার্থনা করিতাম। লোকে যেমন শ্রমের মধ্যে বার-বার চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বার-বার প্রার্থনা করিয়া সবল হইতাম।

এইরূপ শ্রম করিতে করিতে যখন আড়াই মাস পরে পরীক্ষার সময় আসিল, তখন দেখিলাম একঘরে আড়াই মাস বদ্ধ থাকিয়া ও নিচের ঘরে শুইয়া-শুইয়া

কোমরে বাত ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় একটি বালকের কাঁধে হাত দিয়া পরীক্ষার হলে গেলাম ও পরীক্ষা দিয়া আসিলাম। ডিসেম্বরের শেষে পরীক্ষা হইত।

বন্ধুপত্নীর মৃত্যু। বোধ হয় ১৮৬৯ সালের জানুয়ারীর শেষভাগে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। তখন আমরা মহালক্ষ্মীর পীড়া লইয়া ঘোর সংগ্রামের মধ্যে আছি। হঠাৎ ওলাউঠা পীড়া হইয়া মহালক্ষ্মী মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। তাঁহার পীড়া হইলে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র লইয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে পূর্ব হইতেই জানিতেন ও ভালবাসিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রতিদিন মহালক্ষ্মীকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সাধ্যে যত দূর হয় তাহা করিতে বাকি রাখিলেন না। অবশেষে কয়েকদিনের পর মহালক্ষ্মীর প্রাণ গেল। তখন তিনি ৮। ৯ মাস কাল সসত্ত্বা। এইরূপ অবস্থাতে মৃত্যু হওয়াতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। মহালক্ষ্মীর মা ইহার কিছু পূর্বে কাশী হইতে আসিয়া ছিলেন। তিনি যখন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া "বাবা রে, এত করেও বাঁচাতে পারলি না রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, যোগেন বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, এবং ঈশান পাগলের মতো ঘর হইতে বাহির, বাহির হইতে ঘর করিতে লাগিলেন, তখন আমি আর মহালক্ষ্মীর জন্য কাঁদিব কি? ইহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই ক্ষেত্রেই সংবাদ আসিল যে, আমি এল. এ. পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির ফাস্ট গ্রেড স্কলারশিপ ৩২, ইংরাজী ও সংস্কৃতে ইউনিভার্সিটিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে ডফ্ স্কলারশিপ ১৫, ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্কলারশিপ ১২,—সর্ব সমেত ৫৯ টাকা, বৃত্তি পাইয়াছি। যাহাদিগের জন্য সংগ্রাম করিতেছিলাম জগদীশ্বর তাহাদিগকে সরাইয়া লইলেন ভাবিয়া আমার চক্ষে জল ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে তিনি অন্য সংগ্রামের জন্য পূর্ব হইতেই উপায় বিধান করিলেন। সে সংগ্রাম ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা ও পিতৃগৃহ হইতে নির্বাসন। তাহার বিবরণ পরে বলিব।

মহালক্ষ্মী চলিয়া গেলে, যখন তাহার মা আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা তুমিও কি আমাদিগকে ছেড়ে যাবে?" তখন আর তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিলাম না। ভবানীপুর ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আবার কয়েক মাস রহিলাম। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই যোগেনের বাসা ভাঙিয়া গেল, আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে পড়িলাম, আমাদের জীবনের গতিও পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। মহালক্ষ্মীর শোকটা আমার বড়ই লাগিয়াছিল।

মহালক্ষ্মী চলিয়া গেলে, পাঠে গুরুতর শ্রমের ফলস্বরূপ আমার এক প্রকার

পীড়া দেখা দিল। অতিরিক্ত দুর্বলতার সঙ্গে সর্বাঙ্গে শাদা-শাদা চাকা-চাকা এক প্রকার ফোলা মাংস দেখা দিল, সেগুলিতে আঘাত করিলে বেদনা অনুভব করিতে পারিতাম না। কোনো কোনো ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, কুষ্ঠব্যাধি হইবার উপক্রম। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আমাকে অতিরিক্ত শ্রমের জন্য তিরস্কার করিয়া, ছয় মাস কাল তন্মনস্ক হইয়া চিকিৎসা করিলেন, এবং আমাকে রোগমুক্ত করিয়া তুলিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহ দেওয়া। অতঃপর উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবা-বিবাহের বিবরণ লিখিতেছি। এই ঘটনাটি বোধ হয় ১৮৬৮ সালের মধ্য ভাগে ঘটিয়াছিল। হাইকোর্টের উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস তখন কলিকাতায় যুবক রিফর্মারদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তৎপূর্বে তিনি মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইণ্ডিয়ান র‍্যাডিকাল লীগ নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার সভাপতি রূপে কার্য করিতেছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, কোনো পারিবারিক কারণে স্বীয় পিতার সহিত বিবাদ করিয়া উপেন্দ্র মান্দ্রাজে পলায়ন করেন। মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া উৎসাহের সহিত যুবক সংস্কারকদিগের নেতা হইয়া দাঁড়ান। যোগেন যখন বিধবাবিবাহ করিলেন, তখন উপেন যোগেনকে ও আমাকে একদিন নিজ সভাতে উপস্থিত করিয়া সর্বসমক্ষে বিশেষ সম্মানিত করিলেন। যুবকগণের করতালি ধ্বনিতে আমাদের লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া উঠিল। আমরা মস্ত একটা রিফর্মার হইয়া দাঁড়াইলাম। উপেন সংস্কৃত কলেজের ছেলে, আমরাও সংস্কৃত কলেজের ছেলে, সুতরাং এই সময় হইতে উপেনের সহিত আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। যোগেন উপেনের কাছে যাইবার জন্য সময় বড় পাইতেন না, কিন্তু আমি ও উমেশচন্দ্র মুখুয্যে দুজনে সর্বদা তাঁহার বাড়িতে যাইতাম ও উপেনের মুখনিঃসৃত ইউরোপীয় ফিলজফি ও সংস্কারের সুসমাচার হাঁ করিয়া গিলিতাম। সময়ে-সময়ে আমি উপেনের বাড়িতে রাত্রি যাপন করিতাম।

তাঁহার সহিত একটু বিশেষ যোগ হইবার কারণ ছিল। আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে পুনর্বার বিবাহ দিবার যে খেয়াল এ সময়ে আমার মাথায় ঘুরিতেছিল, উপেন সে খেয়ালের অংশী হইয়া সর্বদা নানা প্রকার পরামর্শ করিতেন। একদিন রাত্রে আমি উপেনদের বাড়িতে শুইয়াছি, উপেন আমাকে বলিলেন, "অত কেন ভাবিতেছ? তোমার দ্বিতীয়া পত্নীকে ঢাকা কি কাশী কি লাহোর কোনো দূর দেশে লইয়া অবিবাহিত বলিয়া বিবাহ দিয়া এস। তারপর তারা সেই দিকেই থাকুক। হলই বা বেআইনি কাজ?" আমি বলিলাম, "সে যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা হয়।" উপেন বলিলেন, "মিথ্যা দুই প্রকারের আছে, হোয়াইট লাইজ অ্যাণ্ড ব্ল্যাক লাইজ; ওটা হোয়াইট লাই।" 'হোয়াইট লাই, ব্ল্যাক লাই' কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম। আমি

আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপেন, মিথ্যার আবার হোয়াইট ব্ল্যাক কি রকম ?" তখন তিনি আমার নিকটে হোয়াইট লাই-এর ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল কথা আমার মনঃপূত হইল না। আমি বলিলাম, "এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না।" যাহা হউক, তখন উপেনের হোয়াইট লাইজ-এর সমর্থন শুনিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু উপেনকে পরিত্যাগ করি নাই।

বোধ হয়, এই ১৮৬৮ সালের মধ্য ভাগে উপেনের প্রথমা স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হইল। ডাক্তার দেখাইবার সময় হইল না। উপেনের মুখে শুনিলাম, হঠাৎ কলেরা হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন।

শোকটা পুরাতন হইতে না হইতে একদিন দুপুরবেলা উপেন কতিপয় বন্ধুসহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল. এ. ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ করতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি করে আনতে হবে। তার মায়ের মত আছে, কিন্তু মামা অভিভাবক, তাঁর মত নাই।" মেয়ে এইরূপে চুরি করা ভালো কি না, আনিয়া কোথায় রাখা হইবে, কবে কিরূপে বিবাহ হইবে, এ সকল প্রশ্ন মনে উঠিল না। মেয়ে চুরি করিয়া বিধবাবিবাহ দেওয়া যাইবে এই উৎসাহেই কলেজ হইতে বিদায় লইয়া তাঁহাদের সহিত যাত্রা করিলাম।

আমরা তিনটি যুবক, গাড়িতে মেয়েটির জায়গা মাত্র আছে। গাড়ি গিয়া ভবানীপুরে এক গলির মোড়ে দাঁড়াইল। কথা ছিল, মেয়েটির জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া যাইবে। তাহা হইল না, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, মেয়েটি আসিল না। পরে সংবাদ পাওয়া গেল, মেয়েটি দিনের বেলা আসিতে পারিল না, সন্ধ্যার পরে আবার আসিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। কার্যোদ্ধার না করিয়া বাড়িতে ফেরা হইবে না, এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে আমরা গাড়ি হাঁকাইয়া ইডেন গার্ডেনে গেলাম, এবং পাউরুটি ও কলা কিনিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া উত্তমরূপে টিফিন করিলাম। সন্ধ্যা অতীত হইলে আবার গাড়ি করিয়া সেই গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, মেয়ের দেখা নাই। অবশেষে দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, তাহার একজন ঐ মেয়ে এবং অপরজন ঐ মেয়েটির জ্যেষ্ঠা সহোদরা। মেয়েটি আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। যেই উঠা অমনি আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি হাঁকাইলাম।

উপেনের আদেশক্রমে গাড়ি গিয়া তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্রের প্রেস ও আপিসের দ্বারে লাগিল। মেয়েটিকে সেখানে গিয়া নামানো হইল। সেটা আপিস ও পুরুষদের বাসা, স্ত্রীলোকের বাসের যোগ্য নহে। আমি দেখিলাম মেয়েটি কাঁপিতেছে।

তখন আমার হুঁশ হইল। আমি উপেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে বিয়ে হবে আর ততদিন এঁকে কোথায় রাখা হবে?" উপেন বলিলেন, "বিবাহ কাল রাত্রে হবে, আর ওঁকে সে পর্যন্ত এখানেই রাখা যাবে।" তখন আমি রাগিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "তা কখনই হবে না। এমন জানলে আমি এ কাজে থাকতাম না। এই পুরুষের দলে ও মাতালের মধ্যে এঁকে রাখা হবে, তা হইতে পারে না।" এখানে বলা কর্তব্য, উপেন সুরাপান করিতেন না, সুরা দূরে থাক. চুরুট পর্যন্ত কখনও খাইতে দেখি নাই। এ সকল বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য সংযম ছিল। কিন্তু তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে সুরাপায়ী ছিল। যত দূর স্মরণ হয়, সেই ভবনেরই আর একঘরে সুরাপান চলিতেছিল। তাহা দেখিয়া মেয়েটিকে সেখানে রাখা বিষয়ে আমার মনে ঘোর আপত্তি উঠিল। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উপেন আমাকে বলিলেন, "তবে তুমি যেখানে পার, এক রাত্রের জন্য এঁকে রেখে এস।" আমি মুশকিল পড়িলাম, সংস্কারক দলের কোনো পরিবারের সহিত আমার সেরূপ আলাপ ছিল না। মেয়েটিকে কোথায় লইয়া যাই? কলিকাতার ব্রাহ্ম নেতাদিগের মধ্যে কিছু দিন পূর্বে গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে অত্যগ্রসর সংস্কারক দলের লোক বলিয়া জানিতাম। সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেই কন্যাকে গাড়ি করিয়া লইয়া মহলানবিশ মহাশয়ের পরিবারে রাখিতে গেলাম। তিনি আনুপূর্বিক সমুদয় বিবরণ শুনিয়া কন্যাটিকে এক রাত্রির জন্য স্থান দিলেন।

তৎপর দিন খিচুড়ী বিবাহ হইল। এরূপ শোনা গেল, মেয়েটি কায়স্থজাতীয়া, যদিও পরে জানা যায় যে তাহা নহে, তদপেক্ষা নিম্নজাতীয়া। কায়স্থদের কন্যা ইহা শুনিয়া উপেনের মনে হইল, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহ করিলে আইনসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে পুরোহিত ও ঠাকুর আসিয়া একটা বিবাহ ক্রিয়া হইল। আবার এদিকে উপেন শহরের বড়-বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক মহা সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানকার জন্য তো কিছু করা চাই। স্থির হইল, সেখানে একটু ঈশ্বরোপাসনা হইবে ও বরকন্যা উভয়ে একটি লেখাপড়াতে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু উপাসনা করিবে কে? আমি অথবা উমেশ মুখুয্যে। কারণ, এই দুইটি ঐ যুবক দলের মধ্যে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত। আমাদের সঙ্গে আর একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি প্যারীমোহন চৌধুরী, যিনি পরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'প্রেরিত দলে' প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই তিনজন ব্রাহ্মের মধ্যে কেন যে আমার দ্বারা উপাসনা করানো সকলের মত হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। যত দূরে মনে হয়, এ পরামর্শ বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্বে স্থির হয়, এবং আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানিতে পারি নাই।

আমি ওদিকে কন্যা আনিতে গিয়া একদল মাতালের হাতে পড়িয়া টানাটানির মধ্যে আছি। আমি যে গাড়িতে করিয়া কন্যাকে আনিতেছিলাম সেই গাড়ি ও আর একখানি গাড়ি একটি ছোট গলির মধ্যে দুই দিক হইতে আসিয়া, পাশাপাশি পার হইতে গিয়া চাকায় চাকায় আটকাইয়া গেল। কোনোখানি বাহির হয় না। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া চাকা টানাটানি করিতেছি, এমন সময় এক দল মাতাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। মাতালেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি বাবা! রাস্তা আটকেছ কেন?" যখন কারণ নির্দেশ করিলাম, তখন সকলে কাঁধ দিয়া গাড়ি ছাড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "ইজ দেয়ার এনি জেণ্টলউমেন, বাবা?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" তাহার পরে আর কেহ গাড়ির দ্বারের কাছেও যায় না, এতই সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিল। সকলে পড়িয়া কাঁধ দিয়া গাড়ি তো ছাড়াইয়া দিল, কন্যার গাড়ি চাকরের সহিত বিবাহ সভা অভিমুখে ছুটিল। এদিকে মাতালেরা চার-পাঁচজনে পড়িয়া আমাকে ধরিল, "এত করে গাড়ি ছাড়ালাম বাবা, কিছু দিতে হবে।" তখন আমার মনে ছিল না যে, আমার পকেটে একটা টাকা আছে। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, বিবাহ সভাতে যাইতে বলিলাম, কিছুতেই রাজি নয়, আমার চাদর কাড়িয়া লইতে উদ্যত। আধ ঘণ্টা টানাটানির পর মনে হইল যে সঙ্গে একটা টাকা আছে। টাকাটা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া বিবাহ সভাতে যেই গিয়া উপস্থিত, অমনি শুনিলাম আমাকে সভামধ্যে উপাসনা করিতে হইবে, সকলে উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিতেছে।

সে কি উপাসনা করিবার অনুকূল অবস্থা? আমি শুনিয়া অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু শোনে কে? তৎপূর্বে কখনো প্রকাশ্য স্থানে উপাসনা করিয়াছিলাম, এরূপ স্মরণ হয় না। যে লাজুক ছিলাম, বোধ হয় করি নাই। লাজুক ছিলাম, এই কথাটি পড়িয়া বন্ধুদের অনেকে হয়তো মনে মনে হাসিবেন। কারণ তাহারা আমাকে এ সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে চিরদিন বেপরোয়া ও বেহায়া দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তখন আমি উপাসনাদি বিষয়ে বাস্তবিক বড় লাজুক ছিলাম। সেই মানুষকে ধরিয়া লইয়া যখন সভামধ্যে চেয়ারে বসাইয়া দিল, তখন কি হইল তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। প্রথমেই গিয়া শুনিলাম, গান হইতেছে "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর; অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর!" যেমন উপাসনার আয়োজন, তেমনি গান! পরে শুনিলাম, যাহাকে গান করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছিল, সে ব্যক্তি ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে রামমোহন রায়ের গানই জানিত, তাহাই গাহিতেছিল। গান শেষ হইলে আমি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার প্রার্থনার মধ্যে সভাস্থল হইতে করতালির চটপটা ধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই জন্য এ বিবাহ

অনুষ্ঠানকে 'খিচুড়ী বিবাহ' বলিয়াছি। উপাসনার পর এক কাগজে বরকন্যা স্বাক্ষর করিলেন। আমার যত দূর স্মরণ হয়, সাক্ষীদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বন্ধু আনন্দমোহন বসু একজন ছিলেন। তখন কিন্তু তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই।

রিফর্মার বন্ধুর কীর্তি। বিবাহের পর উপেনের সহিত ও তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত আমার সম্বন্ধ আরও গাঢ় হইল। আমি সর্বদাই তাহাদিগের সংবাদ লইতাম, এবং কিছু কাজ পড়িলে করিয়া দিতাম। এই সময় হইতে দেখিতে লাগিলাম, উপেন ঋণ শোধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ধার করেন, বাড়ি ভাড়া করিয়া ভাড়া না দিয়া রাতারাতি পলাইয়া অন্য বাড়িতে যান, ইত্যাদি। দুই-একবার নিজে কর্জ করিয়া টাকা দিয়া এরূপ অবস্থা হইতে তাঁহাকে সপরিবারে উদ্ধার করিতে হইল। তথাপি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ভাঙিতে অনেক দিন গিয়াছিল। একবার রাত্রি দুইটার সময় উপেন সপরিবারে পলাইয়া কলিকাতা হইতে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের বাড়িতে যান। তখন শিশিরবাবুরা অগ্রসর সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ছিলেন। সেই রাত্রে আমি যোগেন ও উমেশ মুখুয্যে সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে আগুলিয়া নারিকেলডাঙ্গার খালে নৌকায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। এখন মনে হইলে হাসি পায়।

ইহার পর ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র কিছুদিনের জন্য নিজ ব্যয়ে উপেন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে কাশীতে নিজ ভবনে লইয়া যান, এবং তাঁহাদের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে থাকেন। এইরূপে এক বৎসরের অধিক কাল গত হয়। সেখানে উপেন গোপনে দেনা করিয়া লোকনাথবাবুকে ঋণগ্রস্ত করিয়া পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। আসিয়া কিছুদিন আমার বাড়িতে থাকেন। ইহা যদিও পরবর্তী কালের ঘটনা, তথাপি এখানেই তাহার বিবরণ দিতেছি। আমি তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া, পিতা কর্তৃক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে একটি গলিতে একজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত একগৃহে বাস করিতেছিলাম। আমার কলেজের স্কলারশিপ মাত্র ভরসা। তাহাতে একটি ঘর ভাড়া করিয়া কোনো রূপে চালাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে উপেন্দ্রনাথ আমাকে সংবাদ না দিয়া, গুরুতর পীড়া লইয়া, স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র সহ কাশী হইতে আসিয়া আমার বাসার দ্বারে উপস্থিত। আমি সংবাদ পাইয়া উপেনকে সপরিবারে গাড়ি হইতে নামাইয়া নিজের ঘরে আনিলাম। একজন বন্ধু আমার পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি এই বিপদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ঘর ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র গেলেন। আমি উপেনের চিকিৎসার জন্য অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন, তিনি বিনা পয়সায় উপেনের চিকিৎসার ভার লইলেন।

মহানুভব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাই, তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য। আমার বাড়িতে আসিয়া উপেনের পীড়া বৃদ্ধি পাইল। এমন কি, তাঁহার জীবনের সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হইতে লাগিলাম। এই অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিলেন, "যদি আমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার, বড় ভালো হয়। আমি বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচব না।" শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল না, সুতরাং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিতে পারি না। কি করি, এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। অবশেষে মনে হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে ধরিয়া আনিতে হইবে। তাই একদিন প্রাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি যে উপেনের গূঢ় চরিত্রের কথা পূর্বেই শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়া, তাঁহার প্রতি হাড়ে চটিয়া ছিলেন, আমি তাহা জানিতাম না। আমি উপেনের সংস্রবে থাকি ও তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিয়াছি শুনিয়াই তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন; বলিলেন "কি, যাকে দেখলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জুতা মারতে ইচ্ছা করে, তার হয়ে তুই আমাকে অনুরোধ করিস?" আমি বুঝিলাম তাঁহার দ্বারা এ কাজ হইবে না। আমি বলিলাম, "আপনি বাপ-বেটার দেখা করিয়ে না দিলে আর কারও দ্বারা হবে না। তবে আমি যাই। কি আর করব। উপেনের শেষ অনুরোধটা রাখতে পারা গেল না।" এই বলিয়া উঠিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাকে বিরস বদনে উঠিতে দেখিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "যাস নে, রোস: মরণকালে বাপকে দেখতে চেয়েছে, শুভ বুদ্ধি হয়েছে, এটাও ভালো: দেখি কিছু করতে পারি কি না।" একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন, "কাল প্রাতে ৭টা-৮টার মধ্যে তার বাপকে তোর বাড়িতে আনব, তুই ঘরে থাকিস।" আমি চলিয়া আসিলাম।

তৎপরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে করিয়া শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে আমার বাসাতে আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার বিবরণ এই। সেই দিন প্রাতে সাতটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া শ্রীনাথবাবুকে বলিলেন, "শ্রীনাথ, তোমার গাড়ি যুততে বল দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।" শ্রীনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন জায়গায়? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আঃ চল না, রাস্তায় বলব।" শ্রীনাথবাবু গাড়ি যুতিতে আদেশ করিলেন। দুইজনে গাড়িতে বসিয়া শ্রীনাথবাবুদের গলি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, জানো? তোমার ছেলে উপেন পীড়িত হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছে। তার ব্যায়রাম বড় শক্ত, বাঁচে কি না সন্দেহ। সে মৃত্যু শয্যায়

পড়ে তোমাকে দেখতে চেয়েছে। তাই তার বন্ধুর অনুরোধে তোমাকে নিতে এসেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথবাবু রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কোচম্যান গাড়ি ফেরাও।" তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও: আমি নামব।" কোচম্যান গাড়ি থামাইলে তিনি যখন নামিতে যান, তখন শ্রীনাথবাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এ কি? তুমি নামো যে! বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আমায় ছাড়, ছাড়। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক, সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে বাবাকে দেখতে চেয়েছে, তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়েও দেখা দিতে চাও না!" এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথবাবু ধীর হইয়া বসিলেন, এবং কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন। ক্রমে তাঁহারা আমার বাড়িতে আসিলেন। শ্রীনাথবাবু পুত্রকে দেখিয়া চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণ শুনিলাম।

যাহা হউক, পিতা-পুত্রে দেখা হইল। উপেন পিতাকে কি বলিলেন, জানি না। আমি সেখানে ছিলাম না। শুনিলাম, মাপ চাহিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণও দেখিলাম। তাহার পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথবাবু চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়া আমাকে উপেনের আর্থিক অবস্থার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কপর্দক মাত্রও সম্বল নাই শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমার হাতে ১০ টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখিস, ওর স্ত্রী-পুত্র যেন না ক্লেশ পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। তুই কিরূপে এত ব্যয় দিবি?" যাহার প্রতি এত জাতক্রোধ ছিলেন, তাহারই দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জলধারা পড়িল, কি দয়া!

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য আছে। এই সময়ে আমি সর্বদা উপেনের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম বলিয়া আমাকে অনেকে উপহাস বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করিতেন। তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে গোপনে কি শুনিয়াছিলেন, তাহা তখন জানিতাম না। আমি উপেনের পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সকল প্রতিবাদ যেন ভুলিয়া যাইতাম। ভাবিতাম, এই মেয়েকে এই পথে আনিবার বিষয়ে আমি সাহায্য করিয়াছি, এমন ক্লেশের মধ্যে দূরে দাঁড়ানো কি আমার পক্ষে উচিত হয়? এই জন্য পুত্রসহ বাড়িতে তাহাকে স্থান দিতাম। নিজে ঋণ করিয়া উপেনের ঋণ শুধিয়া তাহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচাইতাম, সর্বদা তাঁহাদের বাড়িতে সংবাদ লইতাম। কিছুতেই আমাকে বিচলিত করিতে পারিত না। তখন তাঁহাদের জন্য যে ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা শুধিতে আমার বহুদিন গিয়াছে। তাঁহাদের বিষয়ে আমার দায়িত্ব যখন স্মরণ করিতাম, তখন যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর

হইতাম। ইহার কয়েক বৎসর পরে উপেন বিলাতে যান, ও সেখানে কয়েদ হন। এ দেশে ফিরিয়া দেশীয় রঙ্গভূমির অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোনো প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনের প্রয়াস পান। এই সময়ে তাঁহার পুরাতন বন্ধুরা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। আমিও সেই সঙ্গে উপেন হইতে দূরে পড়ি।

আর একটি বিধবা বালিকার কাহিনী। এই স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংক্রান্ত আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যোগেন ও মহালক্ষ্মীর সহিত একত্র বাসকালে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। যোগেনের বিবাহের কিছুদিন পরে আমরা চাঁপাতলার দীঘির পূর্ববর্তী একটি বাড়িতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম। সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্তাহে দুই-তিনদিন আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং আবশ্যকমতো সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই পাড়াতেই পাশের বাড়িতে একটি ছুতর জাতীয় বিধবা স্ত্রীলোক থাকিত। তাহার একটি ছয়-সাত-বৎসর বয়স্কা মেয়ে ছিল, সেটিও বিধবা। তাহার মা যখন শুনিল যে আমরা মহালক্ষ্মীর বিধবাবিবাহ দিয়াছি, তখন তাহার ইচ্ছা হইল যে নিজের বিধবা মেয়েটির আবার বিবাহ দিবে, আমাদিগকে সেই ইচ্ছা জানাইল। মেয়েটি সকাল বিকাল আমাদের বাড়িতে আসিতে ও আমাদের সঙ্গে কাল যাপন করিতে লাগিল। আমাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত এবং আমার গলা জড়াইয়া আমার কোলে বসিয়া থাকিত। একদিন প্রাতে সে আমার গলা জড়াইয়া কোলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিলেন। মেয়েটিকে আগে তিনি দেখেন নাই, আমার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ও মেয়েটি কে হে? বাঃ, বেশ সুন্দর মেয়েটি তো।" আমি বলিলাম, "ওটি পাশের বাড়ির একটি ছুতরের মেয়ে, আমাকে দাদা বলে, আমার কোলে বসতে ভালোবাসে। ওটি বিধবা, ওর মা ওর বিয়ে দিতে চায়, তাই আমাদের কাছে দিয়েছে।" এই কথা শুনিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় চমকাইয়া উঠিলেন; "বল কি! এইটুকু মেয়ে বিধবা!" তাহার পর তাহাকে ডাকিলেন, "আয় মা, আমার কোলে আয়।" সে তো লজ্জাতে যাইতে চায় না, আমি কোলে করিয়া তাঁহার কোলে বসাইয়া দিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বুকে ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। শেষে যাইবার সময় মেয়েটিকে ও তাহার মাকে পালকি করিয়া তৎপর দিন বৈকালে তাঁহার ভবনে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিয়া গেলেন, "মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেও, মাহিনা আমি দেব।"

পরদিন বৈকালে মেয়েটিকে ও তাহার মাকে পালকি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটিতে পাঠানো গেল। তাহারা সন্ধ্যার সময় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবীর যে প্রশংসা করিল তাহা শুনিয়া আমাদের মন পুলকিত হইয়া

উঠিল। শুনিলাম, ভগবতী দেবী ছুতরের মেয়ে বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, মেয়েটিকে কোলে জড়াইয়াছেন, কাছে বসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছেন, এবং আসিবার সময় দুজনকে কাপড় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিবার পূর্বেই সেই বাড়িতে বিষম কলেরা রোগে মহালক্ষ্মীর মৃত্যু হইল, আমাদের বাসা ভাঙিয়া গেল, আমরা ছড়াইয়া পড়িলাম। মেয়েটির মাও পাশের বাড়ি হইতে উঠিয়া গেল। মেয়েটি আমাদের হাতছাড়া হইল।

ইহার বহুদিন পরে মেয়েটির সহিত আমার আবার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা এই সঙ্গেই বলা যাউক। তখন আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, এবং ব্রাহ্ম-সমাজ লাইব্রেরি গৃহে বাস করি। একদিন একজন ভৃত্য কোনো স্ত্রীলোকের একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত। খুলিয়া দেখি, সেখানি ঐ মেয়েটির পত্র! সে আমাকে লিখিয়াছে, "বহু বৎসর পূর্বে চাঁপাতলার দিঘীর কোণের এক বাড়িতে পাড়ার একটি ৭।৮ বৎসরের বালিকা আপনাকে 'দাদা' বলিত ও কোলে পিঠে উঠিত, আপনার হয়তো মনে আছে। আমি সেই হতভাগিনী। আমি বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছি। একবার দয়া করিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।" আমি মনে করিলাম, বিশেষ বিপদে না পড়িলে এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করে নাই, আমার যাওয়াই কর্তব্য। এই ভাবিয়া তাহার বাড়িতে গেলাম। গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা এই। আমরা ও তাহার মা চাঁপাতলা পরিত্যাগ করিলে তাহার মা আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যায় নাই। সে বড় হইয়া উঠিলে তাহার মা তাহাকে পাপ পথে লইয়া গেল। সেই অবস্থা হইতে ক্রমে সে এক ব্যক্তির উপপত্নীরূপে বাস করিতে লাগিল ও তাহার দুইটি পুত্রসন্তান জন্মিল। তাহাদিগকে লইয়া বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় সুখেই তাহার কাল কাটিতেছিল। যে ব্যক্তি তাহাকে রাখিয়াছিল সে তাহাকে একখানি বাড়ি কিনিয়া দিয়াছিল, এবং লেখাপড়া করিয়া তাহাকে কয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজও দিয়াছিল। কিন্তু পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই সে ব্যক্তি তাহারই বাড়িতে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইল। এই অবস্থাতে সে ব্যক্তি কোম্পানির কাগজের লেখাপড়াগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ও পুত্রের কাছে গিয়া আশ্রয় লইল। কেবলমাত্র বাড়িখানি এই মেয়েটির রহিল। ছেলে দুইটি লইয়া সে বিপদ সমুদ্রে ভাসিল। এই অবস্থাতে সে আমাকে স্মরণ করিয়াছিল।

আমি তাহার বাড়িতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরেই দেখিলাম, তাহার এই অবস্থাতে বন্ধুতা দেখাইয়া কুলোক তাহাকে ঘিরিতেছে। তখন আমি তাহাকে সে বাড়ি ভাড়া দিয়া আমার নির্দিষ্ট অন্য কোনো স্থানে উঠিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে তাহা করিল না, সেই বাড়ির

বাহিরের অংশ ভাড়া দিয়া ভিতরের অংশে পুত্র সহ থাকিতে লাগিল। একদিন গিয়া দেখি, একটি ১৯।২০ বৎসরের মেয়ে কোথা হইতে জুটিয়াছে, তাহার একটা ইতিবৃত্ত আমাকে বলিল, তাহা এখন স্মরণ নাই। কিন্তু ঐ মেয়ের ঘরে ফরাস বিছানা তাকিয়া বাঁধা হুকা প্রভৃতি দেখিলাম। তখন মনে হইল, নিজের রূপ যৌবন গত হওয়াতে তাহাকে অর্থোপার্জনের আশায় আনিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, "এই আমার তোমার ভবনে শেষ আসা।"

আমার এই ভগিনীকে অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাহার বিষয় স্মরণ করিয়া এখনও দুঃখ হয়। সে এতদিন পরে 'দাদা' বলিয়া স্মরণ করিল, তাহাকে যে হাতে ধরিয়া বিপথ হইতে সুপথে আনিতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ রহিয়া গেল।

মাতৃস্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বী আমার ঝি। মহালক্ষ্মী বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা অদ্যাপি স্মৃতিতে উজ্জ্বল রহিয়াছে। একদিন মহালক্ষ্মীর ভাই ঈশান আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের হাসপাতালে একটি স্ত্রীলোক আসিয়াছে, তাহার গলায় ঘা হইয়া গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গলদেশ ছেঁদা করিয়া তদ্দ্বারা আহার করানো হইতেছে। তৎপরে আর একদিন বলিলেন যে, সে স্ত্রীলোকটি কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিয়াছে, "দাদা ঠাকুর, আমাকে রক্ষা কর, একটা কাজ জুটিয়ে দাও, সুস্থ হয়ে আমাকে যেন আর পূর্বের ঘৃণিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে না হয়।" শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। আমি ঈশানকে বলিলাম, "তার একটা কাজের যোগাড় করে দাও। সে যখন বাঁচতে চায় তাকে বাঁচাও, এটা একটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম।" শুনিয়া ঈশান হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ! আমার আর কাজ নেই, আমি ওর চাকুরী খুঁজতে বেরুই!" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে চাকরানী করে আন না কেন?" ঈশান সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

কিন্তু আমার মনটা সুস্থির হইতে পারিল না। আমি ঈশানের মাকে ও মহালক্ষ্মীকে বুঝাইয়া তাহাকে আমাদের বাড়িতে চাকরানীর কাজে আনিলাম। সে বোধ হয় মেয়েদের নিকট শুনিল যে আমিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া তাহাকে আনিয়াছি, কারণ, দেখিতে লাগিলাম যে আমার দিকে তাহার বিশেষ মনোযোগ। সে আমার নাম রাখিল 'ভালোমানুষবাবু'। এই 'ভালোমানুষবাবু' নাম আমার অনেক দিন ছিল। আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করার পর প্রসন্নময়ীকে যখন আনিলাম, তখন তিনিও এই ঝির মুখে শুনিয়া আমাকে 'ভালোমানুষবাবু' বলিয়া ডাকিতেন।

এই ঝির কথা এই জন্য মনে আছে যে, আমার প্রতি তাহার ভালোবাসার গভীরতা দেখিয়া একবার আমার মা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। একবার তিনি মহালক্ষ্মীর

মৃত্যুর পর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। তখন তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে রাখিয়া ঐ ঝিকে তাঁহার পরিচর্যার জন্য দি। একদিন মা আমাকে বলিলেন, "ও রে দেখ্, তোকে আমার চেয়েও কেউ ভালোবাসে, এটা আমার সহ্য হয় না।"

আমি (বিস্মিত)। সে কি! তোমার চেয়ে তো কেউ আমাকে ভালবাসে না।

মা। না রে, তোর ঝি আমার চেয়ে তোকে ভালোবাসে।

আমি (হাসিয়া)। এমন কথাও তুমি বল! এ কথা তোমার কেন মনে হল?

তখন শুনিলাম, মা দেখিয়াছেন যে, তিনি ঝিকে একপ্রকার বাজার করিয়া আনিতে বলেন, সে সে-পরামর্শ ভাঙিয়া চুরিয়া আর এক প্রকার করিয়া আনে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে 'ভালোমানুষবাবু' ঐ সব ভালবাসেন। কেবল তা নয়, মা রাঁধিতে বসিলে সে রান্নাঘরের দ্বার চাপিয়া বসে, এবং 'এই রকম ক'রে রাঁধ' 'ঐ রকম ক'রে রাঁধ' বলিয়া অনুরোধ করিতে থাকে। মা হাসিয়া বলেন, "ও রে, আমার পেটের ছেলে, ও কি ভালবাসে না বাসে তা কি আমি জানি না?"— পরে আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিলে এই ঝি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল।

সাধে কি নারীজাতিকে ভালোবাসি! যে পাপে ডুবিয়াছিল, পাপ যার দৈনিক আচরণ হইয়াছিল, তাহারও হৃদয়ে এই প্রেমের শক্তি, তাহারও এই কৃতজ্ঞতা! আমার চাকর-ভাগ্য চিরদিনই ভালো। ইহার প্রমাণ পরে আরও প্রদত্ত হইবে।

বেণীসংহার নাটকে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা অভিনয়। ১৮৬৯ সালের বসন্ত কালে আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাটমন্দিরে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করিলাম। তাহার বিবরণ এই। সেবারে বি.এ. পরীক্ষাতে সংস্কৃত বেণীসংহার পাঠ্য ছিল। আমাদের কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা মনে করিলেন, সংস্কৃত বেণীসংহার অভিনয় করিয়া দেখাইলে বি. এ. ক্লাসের ছেলেদের বিশেষ উপকার হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বেণীসংহারের অভিনয়ের যোগাড় করিতে লাগিলেন। অগ্রে তাঁহারা আমাকে সে সংবাদ দেন নাই, অথবা আমাকে তাঁহাদিগের পরামর্শের অংশী করেন নাই। যখন তাঁহাদের কাজটা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন আসিয়া আমাকে তাহাতে যোগ দিবার জন্য ধরিলেন। আমার পরামর্শটা মন্দ বোধ হইল না। বিশেষত অভিনয় দেখা আমার বাতিক। বর্তমান বঙ্গ রঙ্গভূমি সকলে বারাঙ্গনা অভিনেত্রী প্রবিষ্ট করিবার পূর্বে আমি প্রায় প্রতি শনিবার অভিনয় দেখিতে যাইতাম। স্মরণ আছে যে, সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে হরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম। বারাঙ্গনা অভিনেত্রী যেদিন হইতে আসিল, সেদিন হইতে আমার অন্তর্ধান।

সে যাহা হউক, সহাধ্যায়ী ছাত্রেরা যখন আমাকে ডাকিল, তখন তাহাদের

কমিটিতে থাকিতে রাজি হইলাম এবং নিজে একজন অভিনেতা হইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি হইলাম যুধিষ্ঠির, আমার বন্ধু যোগেন্দ্র হইলেন অর্জুন ও অপর বন্ধু উমেশ হইলেন অশ্বত্থামা। কলেজের নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছেলেকে মেয়েদের পার্ট দেওয়া গেল। আমরা মোহাড়া দিয়া সকলকে উত্তমরূপে শিখাইয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাটমন্দির ঠিক করিয়া, কলিকাতা হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজ সকলের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদিগকে টিকিট প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এমন সময়ে এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমাদের কলেজের মধ্যেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পণ্ডিতমহাশয়েরা বলিতে লাগিলেন যে, ছেলেরা পড়াশোনা ছাড়িয়া কেবল অভিনয় লইয়া মাতিয়াছে। আর বাস্তবিক তাঁহাদের অভিযোগ করিবার কারণও ছিল। আমরা যাহাদিগকে অভিনেতা করিয়াছিলাম, তাহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। যাহাকে দুর্যোধন করিয়াছিলাম, সে ভানুমতীকে ক্লাসের মধ্যেই 'প্রেয়সী' বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং তাহার কণ্ঠালিঙ্গন প্রভৃতি করিতে লাগিল, ইত্যাদি। এই সব কারণে পণ্ডিতমহাশয়দিগের আপত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ইহার মধ্যে আছি জানিয়া তাঁহারা একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি যে, সভাতে আমাদের প্রিন্সিপাল, বড়-বড় অধ্যাপকগণ, আমার মাতুলমহাশয়, অপরাপর পণ্ডিতগণ সকলেই সমাসীন আছেন। আমি তো দেখিয়াই কাঁপিয়া গেলাম। দণ্ডার্হ অপরাধীর ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইলাম। প্রিন্সিপাল সর্বাধিকারী মহাশয় তাহাদের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বলিলেন, "আমাদের কাহারও ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এই অভিনয় কর, ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে। তুমি ইহার ভিতর কিরূপে গেলে ?"

আমি। আজ্ঞে, আমি আগে ইহার ভিতর ছিলাম না, পরে গিয়াছি। এবার বেণীসংহার বি.এ. কোর্সে আছে, অভিনয় করিয়া দেখাইলে আমাদেরও উপকার, অন্য ছেলেদেরও উপকার।

প্রিন্সিপাল। তাহা হইলেও কলেজের ছেলে খারাপ করা কি ভালো ?

আমি। যা কিছু দেখিতেছেন দুদিনের জন্য, তাহার পর সব থামিয়া যাইবে।

একজন অধ্যাপক। না না, তাহা হইবে না। ও সব বন্ধ করিয়া দাও।

আমি। মহাশয়দের অনভিমতে আমার কিছু করিবার ইচ্ছা নয়। আপনারা নিষেধ করিলে এখনি ও সব থামিয়া যাওয়া উচিত। তবে মহাশয়দিগকে একটা কথা ভাবিতে বলি। অভিনয়ের আর তিন-চারদিন আছে, হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজের ছেলেদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এখন না করিলে আমাদের বড় লজ্জার কথা। অন্তত একবার অভিনয়ের জন্য অনুমতি দিন।

প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, তুমি যাও। আমরা বিবেচনা করি, তাহার পর তোমায় আবার ডাকিব।

আমি তো 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলাম। বন্ধুদলে আসিয়া সংবাদ দিলে মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। তাহাদিগকে থামাইতে অনেক সময় গেল। অবশেষে অধ্যাপকগণ আবার ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা একবার মাত্র অভিনয় করিতে পার। তবে তোমাকে তিনটি কাজ করিতে হইবে। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর যে সকল বালককে অভিনয়ে লইয়াছ, তাহাদের অভিভাবকদের অনুমতি আনিতে হইবে। দ্বিতীয়, অভিনয় স্থলে গায়ক ও বাদকদের সঙ্গে কলেজের ছেলেদিগকে মিশিতে দিবে না। তৃতীয়, নিম্নশ্রেণীর ছেলেদিগকে ঘরে পাঠাইয়া তবে তুমি সে-স্থান ত্যাগ করিবে।" আমি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম।

যথাসময়ে রাজবাড়িতে অভিনয় হইল। অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ হইল, কিন্তু আমার সেদিন গুরুতর দায়িত্বভারে আমোদ করিবার সময় হইল না। গায়ক ও বাদকদিগকে প্লাটফর্মের নিচে বসাইয়া বেড়া দিয়া দিয়াছিলাম। নিজে সমস্ত সময় সাজঘরের ভিতর ছিলাম, কেবল নিজের অভিনয়ের সময় বাহিরে আসিয়াছিলাম, এবং রাত্রি একটার সময় অভিনয় শেষ হইলে, প্রায় রাত্রি তিনটা পর্যন্ত বসিয়া ছিলাম, সকল অভিনেতাকে গাড়ি আনাইয়া বাড়িতে পাঠাইয়া তবে নিজে বাড়িতে গিয়াছিলাম। এই জন্য এই অভিনয়ের কথাটা এতদিন স্মরণ রহিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা ; উপবীত ত্যাগ ; পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হওয়া ; ব্রাহ্ম দলে সমাদর।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ। এখন আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বিবরণ বলি। ১৮৬৫ সালে আমার হৃদয় পরিবর্তনের দিন হইতে আমি কিরূপে অল্পে-অল্পে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলাম, তাহা অগ্রেই বর্ণনা করিয়াছি। বাস্তবিক, তদবধি এই ১৮৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা অগ্নির মতো জ্বলিতেছিল। আমার অনেক পুরাতন কুৎসিত অভ্যাস ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। যাহাতে নীতি বা ধর্মের উপদেশ আছে এরূপ কোনো গ্রন্থ পাইলেই তাহা অতি উপাদেয় বোধ হইত, এবং তাহা আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। এই কারণে বড়লোকদিগের জীবনচরিত পড়িতে ভালো লাগিত।

এই জীবনচরিত পড়ার বাতিকটা এখনো আছে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, ধর্ম-বিজ্ঞান (থিওলজি) অপেক্ষা ধর্মজীবনের (প্র্যাকটিকাল রিলিজান) প্রতি আমার চিরদিন অধিক দৃষ্টি। অথচ ভাবিতে ক্লেশ হয়, লিখিতে চক্ষে জল আসিতেছে, এই

প্র্যাকটিকাল রিলিজানেই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক হারিয়া গিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে রহিয়াছে, কিন্তু প্রবৃত্তি সকলকে সকল সময়ে সে আকাঙ্ক্ষার বশীভূত করিতে পারি নাই। নিজের নানা প্রকার দুর্বলতার সহিত মহা সংগ্রামে বাস করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি অনেক জীবনচরিত পড়িয়া ফেলি। স্মরণ আছে যে, প্রতিদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া 'বীটনস্ বাইওগ্রাফিকাল ডিকশানারি' হইতে বড় বড লোকের জীবনচরিত পড়িতাম। মানুষ সংগ্রাম করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিয়াছে, ইহা দেখিলে আমার আনন্দ হয়, ভাবিতে সুখ হয়, আমি তাহার মধ্যে মানব জীবনের দায়িত্ব ও ঈশ্বরের কৃপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই। জীবনচরিত ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থে এই উপকার পাইয়াছিলাম। থিওডোর পার্কারের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ আগেই করিয়াছি। নিউম্যানের 'সোল্'-ও বোধ হয় এই সময় পড়িয়া থাকিব। তৎপরে আমাদের এল. এ. কোর্সে আর্থার হেল্পস-এর 'এসেজ রিটন্ ইন দি ইণ্টারভালস্ অভ বিজনেস্' ছিল। তাহা দ্বারা এত উপকৃত হইয়াছিলাম যে, সেই সূত্রে হেল্পস-এর 'ফ্রেণ্ডস্ ইন কাউন্সিল' আনিয়া পড়ি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমার ধর্মজীবনের সেই প্রথমোদ্যমে আমি উভয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌখিক ও লিখিত উপদেশ, তাহাতে আমাকে কি শক্তি কি সাহায্য দিত, তাহা বলিতে পারি না। এক-একদিন তাঁহার উপদেশ শুনিয়া দশ-বারোদিন সেই নেশাতে থাকিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঐ সময় আমার জ্ঞানের বুভুক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল। যখনই কোনো ভালো গ্রন্থ হাতে পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র যেমন আমিষ খণ্ডের উপরে পড়ে, সেই ভাবে তাহার উপরে পড়িতাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গঠন কার্যে যে কয়েক বৎসর ব্যাপৃত ছিলাম, সে কয়েক বৎসর কার্যের ভিড়ে পড়িয়া আমার এই বুভুক্ষাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারিতাম না। আবার এতদিনের পরে সেই বুভুক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু হায়! আর সে শক্তি নাই। এখন মনে হয়, আবার যদি যৌবনের শক্তি পাই ও মনের মতো লাইব্রেরি পাই, একবার প্রাণ ভরিয়া পড়ি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ। আমার ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ ১৮৬৫ সাল হইতে জন্মিলেও আমি এতদিন পর্যন্ত লজ্জাবশত কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দূরে থাকিতাম, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। যত দূর মনে হয়, ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের উন্নতিশীল দল অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি সমাজের দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমার জ্ঞাতি দাদা

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি আদি সমাজের ব্রাহ্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের নিন্দা করিতেন) তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন। আমার মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও উন্নতিশীল দলের পক্ষে ছিলেন না, তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। সেই কারণে উন্নতিশীলদের কথাবার্তা কাজকর্ম যেন ভালো লাগিত না। বস্তুত উন্নতিশীল দলের সঙ্গে আমি অধিক সংস্রব রাখিতাম না। তবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম।

কেশব সেনের উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভ অবধি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত যোগ কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হয়। তাহা এই প্রকারে ঘটে। ঐ বৎসরের প্রারম্ভে শুনিলাম মাঘোৎসবের সময় উন্নতিশীল দল আপনাদের উপাসনা মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবেন এবং তদুপলক্ষে নগরকীর্তন হইবে। এই সংবাদে আমার মাতুল-মহাশয় তাঁহার কাগজে ও কথাবার্তাতে ইহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "এ নেড়ানেড়ী কাণ্ড কেন ?" তদ্ভিন্ন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও অনেক উপহাস বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। সর্বোপরি, আমি শাক্ত বংশের ছেলে, বৈষ্ণবদের কীর্তনের প্রতি পূর্বাবধি অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল। এমন কি, কোনো যাত্রা গান শুনিতে গিয়া যদি দেখিতাম খোল করতাল আসিল ও কীর্তন আরম্ভ হইল, অনেক সময় সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম। আমি ভাবিলাম, উন্নতিশীল দল রাস্তাতে ঢলাঢলি করিতে যাইতেছে। এই ভাবিয়া বিরক্ত চিত্তে ১১ই মাঘ সকালবেলা সে দলের দিকে না গিয়া আদি সমাজের উপাসনাতে গেলাম। উপাসনান্তে আদি সমাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময় কয়েকজন বাবু আসিতেছেন, তাঁহারা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, "মহাশয়, দেখলেন না তো, কেশব শহর মাতিয়ে তুলেছেন।"

নগরকীর্তনে হাস্যাস্পদ না হইয়া কৃতকার্য হইয়াছে, এই কথাটা বড় নূতন লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সে কি রকম ?" তখন তাঁহারা আমার হস্তে নগর কীর্তনের কাগজ দিলেন। আমি সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে আছে—

তোরা আয় রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার। ইত্যাদি।

এই আহ্বান ধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল, আমার যেন মনে হইল, আমাকে

ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইঁহাদের উৎসব হবে কোথায় ?" শুনিলাম. সিন্দুরিয়াপটীস্থ গোপাল মল্লিকের বাড়িতে, আমি সেইদিকে চলিলাম। উপাসনার পর প্রাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, তখন আর তাহা মনে থাকিল না। গোপাল মল্লিকের বাড়িতে গিয়া দেখি কেশববাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় বাড়ি সাজাইতেছেন। তখনো উন্নতিশীল দলের লোকেরা সেখানে আসিয়া পৌঁছান নাই। তখন আবার কলুটোলা কেশব-বাবুর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি, কেশববাবুরা সদলে সবে ফিরিয়া আসিয়া, ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা গুণিতেছেন। আমার পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সে সঙ্গে আছেন। গোঁসাইজী আমাকে দেখিয়াই "কি ভাই !" বলিয়া আসিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাদের সঙ্গে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে গেলাম। তাঁহারা সেদিন আহার করিলেন না, আমারও আহারের কথা মনে রহিল না। উৎসব-মন্দিরে গিয়া সমস্ত দিন উৎসব চলিল। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে এক কোণে যে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই কোণেই সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া যোগ দিলাম। সমস্ত দিন যে-কিছু কাজ হইল আমি যেন তাহার ভিতর নিমগ্ন রহিলাম।

সায়ংকালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স আসিলেন। সেদিন কেশববাবু রিজেনারেটিং ফেইথ্ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিয়াছি। ধর্মবিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয় তবে তাহা ধর্মবিশ্বাস নয়. এই সত্য আমার সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটা নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল। আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম।

অথচ শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য বোধ করিবেন যে, ইহার পরও আমি তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে লজ্জাবশত দূরে থাকিতাম। তখন আমি প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম (যদিও উপবীতটা তখন ছিল), কিন্তু ব্রাহ্মদের সঙ্গে বড় মিশিতাম না। মধ্যে-মধ্যে রবিবারে প্রাতে কেশববাবুর কলুটোলার বাড়িতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম। কিন্তু কীর্তনের সময় ব্রাহ্মদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানা প্রকার চীৎকার করিতেন. পরস্পরে পা ধরাধরি করিতেন ও কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন,. এজন্য ভালো করিয়া উপাসনাতে যোগ দিবার ব্যাঘাত হইত। সেই কারণে সর্বদা যাইতাম না. মধ্যে-মধ্যে যাইতাম মাত্র।

নরপূজার আন্দোলন। এই ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে মুঙ্গের হইতে ব্রাহ্মসমাজে

নরপূজার আন্দোলন উঠে। আমাদের বন্ধুদ্বয় বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া দেন যে, ব্রাহ্মেরা কেশববাবুকে 'প্রভু ত্রাণকর্তা' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাঁহার চরণে ধরিয়া পরিত্রাণের জন্ম প্রার্থনা করিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা লইয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেশবের দলকে পরিত্যাগ করিয়া যান। গোঁসাইজী নিজের শান্তিপুরের বাটীতে গিয়া চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করিলেন। আমার স্মরণ হয়, আমি এই বৎসরের মধ্যে শান্তিপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি আমার সহাধ্যায়ী, তাঁহার মুখে সমুদয় শ্রবণ করা উদ্দেশ্য ছিল।

আমার স্মরণ আছে, উন্নতিশীল দলে এই বিবাদ বাধাতে আমি মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহাতে কেশববাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাঁহাদিগকে নরপূজা অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই, ব্রাহ্মদিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু কেশববাবুর পত্রিকাতে প্রতিবাদকারীদের কথার উত্তর যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্ম যেরূপ প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল, তাহা সত্য ও ন্যায়ের অনুগত ব্যবহার নয় বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবার কেশববাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন যেন আমার হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া গেল। এই পুনর্মিলন উপলক্ষে রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে, একটা উৎসব হয়। ঐখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাহ্মের সহিত সেদিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্বে কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আমার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসব ক্ষেত্রে আলোচনা স্থলে নরপূজার আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, আমি বলি, "মিরারে ও ধর্মতত্ত্বে কে লেখেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু উক্ত উভয় পত্রিকাতে যে ভাবে গোঁসাইজী ও যদুবাবুর কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও অনুগত ব্যবহার নহে।" ইহাতে কেশববাবু কানে-কানে অপর একজনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনা।" এটা মনে আছে, কেশববাবু সেই দিন হইতে আমাকে বিশেষ ভাবে দেখিলেন ও চিনিলেন। আমি সে যাত্রা কেশববাবুর সুপ্রসন্ন সরল ও স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি সশিষ্যে কীর্তন করিতে করিতে নৌকাযোগে চূর্ণী নদীতে বেড়াইতে গেলেন।

আমরা যাই নাই। প্রাতে উঠিয়া দেখি, কেশববাবু ব্রাহ্মদের পায়ের তলাতে এক পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। আহার করিতে বসিয়া দেখিতাম, তাঁহার বড়মানুষী কিছুই নাই, সামান্য ডাল ভাত মনের আনন্দে আহার করিতেছেন। এ সকল আমার বড় ভাল লাগিত।

প্রকাশ্যে দীক্ষাগ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ। ক্রমে ১৮৬৯ সালের ৭ই ভাদ্র (২২শে আগস্ট) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। তখন কয়েকজন যুবককে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব হইল। আমার কোনো কোনো বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত কি না। আমি বলিলাম, প্রকাশ্যে দীক্ষাটা তো বাড়ার ভাগ, আমি তো ব্রাহ্মই আছি। যাহা হউক, অপরাপর যুবকের সহিত আমিও উক্ত দিবস দীক্ষাগ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে আমরা ২১ জন যুবক দীক্ষিত হইলাম। তন্মধ্যে কেশববাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, আমার সম্মানিত বন্ধু আনন্দমোহন বসু, পরলোকগত বন্ধু রজনীনাথ রায় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা চিরদিন ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইলেই, উপবীতটি আর রাখিব কি না, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। তৎপূর্বে উপবীত কখনো আমার গলায় থাকিত, কখনো থাকিত না ; দীক্ষার সময়ে ছিল না। আমি স্থির করিলাম, আর লইব না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল।

আমি চিরদিন দেখিতেছি, কোনো একটা গুরুতর কর্তব্য স্থির করিলে তাহা করিয়া উঠিতে আমার বিলম্ব হয়। তদুপযোগী বল আমার প্রকৃতিতে একেবারে আসে না। বার-বার উঠি ও পড়ি, প্রবৃত্তিকুলের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে হয় ; কখনো তাহারা জয়লাভ করে, কখনো আমি জয়লাভ করি, অবশেষে কিছুদিনের পর বল পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াই। এক লম্ফে স্বর্গে উঠা, এক উদ্যমে নিষ্কৃতি লাভ করা, এক প্রতিজ্ঞাতে প্রবৃত্তি দমন করিয়া ফেলা, আমার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির জানিয়াছি, আমি যখন উঠিতে চাহিতেছি তখনো যে পড়িয়া যাই, ইহাতে ঈশ্বর আমাকে দেখাইতে চান যে, যে-শত্রুর হস্তে আমি অগ্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহার শৃঙ্খল হঠাৎ ভগ্ন করা কত কঠিন। ইহাতে যে-পাপ ত্যাগ করিতেছি তাহার প্রতি ঘৃণা বাড়ে, এবং ব্যাকুলতাও বাড়ে।

মানসিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব। যাহা হউক, আমি উপবীত রাখিব না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে কিছুদিন গেল। প্রথমে মাতাঠাকুরাণী এই সংবাদ পাইবামাত্র মাতুলালয়ে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া

উপবীতটা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া গেলেন। তৎপরে যাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, সেই উপবীত ফেলার বিরুদ্ধে বলে। আর আমি ভাবিতে গেলেও সম্মুখে বড় বিপদ দেখি। আমি পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র। উন্মদিনা গত হওয়ার পর আর তিনটি ভগিনী হইয়াছে, তাহারা সকলেই ছোট। আমি পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন। লোকে যখন বলে, মা মরিবে, বাবা পাগল হইয়া যাইবেন, তখন কিছুই বিচিত্র মনে হয় না। কি করি, কি করি, এমন কঠিন সমস্যা আমার জীবনে কখনো উপস্থিত হয় নাই। এদিকে উপবীত রাখিয়া উপাসনা করিতে যাই, উপাসনা করিতে পারি না। কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া 'ছি ছি' বলে, কে যেন আমাকে চায়, কে যেন আমাকে ডাকে। এইরূপ মানসিক আন্দোলনে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, হজম শক্তি নষ্ট হইয়া দারুণ উদরাময়ে ধরিল। অবশেষে আমি অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বর চরণে পড়িলাম, আপনার বিচার ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলাম। প্রার্থনাতে বার বার বলিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে লইয়া যাহা হয় কর।" কি আশ্চর্য! কিছুদিনের মধ্যে হৃদয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। এত যে ভয় বিভীষিকা, কোথায় যেন পলাইয়া গেল! আমার মনে অভূতপূর্ব বল ও উৎসাহ আসিল। উঠিতে বসিতে, শুইতে জাগিতে, কি এক অপূর্ব আশ্বাস বাণী শুনিতে লাগিলাম। কে যেন বলিতে লাগিলেন, "তোমার কাজ আছে, তোমাকে চাই, তুমি অগ্রসর হইয়া চল।" আমি তখন আমার পত্রে পিতাকে এই কথা লিখিয়াছিলাম, তিনি পড়িয়া নিশ্চয়ই হাসিয়া থাকিবেন। আমি উপবীত ফেলিয়া দিলাম। কিরূপে বাধ্য হইয়া এ কাজ করিলাম, তাহা পিতাঠাকুরমহাশয়কে লিখিলাম। তিনি সে পত্র আমার মাতুলের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে ডাকাইয়া কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন।

মাতুলমহাশয় আমাকে তাঁহার বাড়িতে ডাকাইয়া, সাধারণ ভাবে আমার সহিত উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে ও ধর্মভাব সম্বন্ধে তর্ক করিলেন। এই স্থানে বলা কর্তব্য, আমার মাতুল অতিশয় ধর্মভীরু ও উদারচেতা মানুষ ছিলেন, কাহারও ধর্মভাবের উপর হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি রাগ উষ্মা প্রভৃতি কিছুই করিলেন না; বন্ধুতে-বন্ধুতে যেরূপ কথাবার্তা হয়, সেইরূপ সৌজন্যের সহিত আমার সঙ্গে কথা কহিলেন। পরে আমি চলিয়া আসিলে আমার পিতাকে লিখিলেন, "মানুষের অনেক প্রকার অন্ধতা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ধর্মান্ধতাও এক প্রকার। ইহার ধর্মান্ধতা হইয়াছে, বল প্রয়োগে যে কিছু হইবে এরূপ মনে হয় না।" আমি পিতার ফাইল হইতে সে পত্র পরে দেখিয়াছি।

পিতৃবিচ্ছেদ। কিন্তু পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ শুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে এক প্রকার নজরবন্দী

করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনো শোনে নাই। সুতরাং এই সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাঙিয়া পড়িল। এমন কি, দুই-চারি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা ভাবিলে এখন হাসি পায়। একদিন প্রাতে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটি চাষার মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিঃশ্বাস পড়ে কি না পড়ে এমনি তন্মনস্ক! আমার হস্ত-পদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি যখন বলিলাম, "মা একটু তেল দাও, নেয়ে আসি," তখন একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকরুণ, কথা কয়?" মা বলিলেন, "কথা কবে না কেন?" শুনিয়া আমার ভয়ানক হাসি পাইল। ভাবিলাম, আমি যেটা কর্তব্য বোধে করিতেছি, সেটা ইহাদের নিকট পাগলামি। শিক্ষাতে কি প্রভেদই ঘটাইয়াছে! আর একদিন বৈকালে একটি স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি মুড়ি খাইতেছি। দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ও মা, এই যে মুড়ি খায়, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই?" তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আমি কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছি।

যাহা হউক, আমার বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সময়ের মধ্যে দিবারাত্র লোকের সমাগম, ও একই কথা, একই তর্ক, একই যুক্তি, একই আপত্তি, একই গালাগালি। কতই বা তর্ক করিব, কতই বা উত্তর দিব? আমি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। যিনি যাহা বলিতেন বা তিরস্কার করিতেন দ্বিরুক্তি করিতাম না। শেষে বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফল বোধে আমাকে বিদায় দিলেন। সেদিনের কথা মনে হইলে আর চক্ষের জল রাখিতে পারি না। তিনি অতি সহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজ ব্যয়ে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে, আমাকে জন্মের মতো বর্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুখ দর্শন করেন নাই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

আমার পিতা আমাকে গৃহ হইতে বিদায় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমার মুখ দর্শন করিবেন না। কিন্তু আমি জননীর জন্য বাড়িতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমার মা তখন কি দশাতে বাস করিতেছিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু আমার পিতার ইচ্ছা নয় যে আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাঁহাকে গোপন করিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাড়িতে যাইতাম। তিনি লোকমুখে আমি মা'র কাছে গিয়াছি শুনিলেই, আমাকে প্রহার

করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া আসিতেন। পাড়ার ছোট ছেলেরা আমাকে বড় ভালোবাসিত। বাবা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধূলি লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইতাম। পলাইয়া আসিয়া আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্ম বন্ধু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে আশ্রয় লইতাম। আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্য ২২, টাকা খরচ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২, টাকা ব্যয় সামান্য প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার এই দৃঢ়তা আমাতে কি অধিক মাত্রায় থাকিলে ভালো হইত।

শেষে বাবা কেন যে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, বলিতে পারি না। শুনিয়াছি, গ্রামের মেয়েরা বিরোধী হওয়াতে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। গ্রামের লোকে চিরদিন আমাকে ভালোবাসে। আমি পিতাকে লুকাইয়া গ্রামে যাইতাম বটে, কিন্তু গ্রামের আত্মীয়গণের সহিত দেখা করিতাম। বাড়িতে-বাড়িতে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতাম। মেয়েরা আমাকে বড় ভালোবাসিতেন, আমি মেয়েদিগকে ভালোবাসিতাম। শেষে মেয়েদের ভাব দেখিয়া গ্রামের লোকে বাবাকে বলিতে লাগিল, "তুমি তাকে বাড়িতে যেতে না দিতে পার, কিন্তু গ্রামে আসিতে দেবে না, এ কেমন কথা? তুমি কি গ্রামের মালিক?"

গ্রামের লোকের অনুকূল ভাব দেখিয়া ক্রমশ বাবাও অনুকূল ভাব ধরিলেন। তখন আমি অবাধে গৃহে গিয়া মাতাকে দেখিয়া আসিতে লাগিলাম। আমাকে বাড়িতে প্রবেশ করিতে দেখিলে বাবা নিজে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেন, আমি গৃহে আছি জানিলে সেদিকে আসিতেন না। আমাকে দেখা বা আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ রাখিতেন, কিন্তু আমাকে বাড়িতে থাকিতে ও খাইতে দিতে আপত্তি করিতেন না। বরং নিজে বাজারে গিয়া যে সকল দ্রব্য আমি ভালোবাসি, তাহা কিনিয়া আনিতেন, মাকে বলিতেন, "কলা ভোঁদড় ঘরে এসেছে, কলা কিনে এনেছি, খেতে দাও।" এইরূপ কিছুকাল চলিতে লাগিল।

কলিকাতায় নূতন সংসার। আমি পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া যেন অকূল সমুদ্রে ভাসিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় বড় স্কলারশিপটা ছিল, সেজন্য অন্নবস্ত্রের চিন্তাতে অভিভূত হইতে হইল না। আমি আসিয়া পটলডাঙ্গা মীরজাফরস লেনে শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকারের সহিত একত্র বাসা করিলাম। তিনি রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অন্নদায়িনীকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। অন্নদায়িনীর ভগিনী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তখন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

ইঁহাদের সংস্রবে থাকিয়া আমি বড়ই উপকৃত হইতে লাগিলাম। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল। বিশেষত ইঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে রামতনুবাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া তাঁহাতে আমি সাধুতার যে আদর্শ দেখিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। আমি শ্বশুরকুল হইতে প্রসন্নময়ীকে আনিয়া ইঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম।

প্রসন্নময়ী কলিকাতাতে আসিয়া গৃহধর্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গেল। আমার স্কলারশিপ মাত্র অবলম্বন, এদিকে আবার বি. এ. পরীক্ষার বৎসর উপস্থিত। সাংসারিক চিন্তা, রোগীর সেবা, শিশুকন্যা হেমলতার রক্ষণাবেক্ষণ, এই সকল কারণে আমার পাঠের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয় ও অপরাপর কতিপয় ডাক্তার বন্ধু সহায় না হইলে এই বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না।

১৮৭০ সালের ৮ই শ্রাবণ আমার দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিণীর জন্ম হইল। সে সাত মাসে জন্মিয়াছিল। তাহাকে তুলার বিছানা করিয়া কৃত্রিম তাপ দিয়া বাঁচাইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম 'তুলী' হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাই অদ্যাপি আছে। তাহার জীবন রক্ষা খাস্তগির মহাশয়ের চিকিৎসা-পারদর্শিতার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। সে যে বাঁচিবে, কেহই তাহা মনে করে নাই। দুই-একমাস পরেই বায়ু পরিবর্তনের জন্য কলাইঘাটার যে কুঠীতে উৎসব হইয়াছিল এবং যেখানে তদবধি আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধু নীলকমল দেব ছিলেন, সেখানে প্রসন্নময়ীকে রাখিয়া আসি; এবং আমি ৩৩নং মুসলমান পাড়া লেনে, যে বাসাতে রজনীনাথ রায়, নন্দলাল রায়, সারদানাথ হালদার, শ্রীনাথ দত্ত, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রভৃতি সহদীক্ষিত ব্রাহ্ম বন্ধুগণ বাস করিতেছিলেন, সেই বাসাতে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া বাস করিয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি।

তখনকার মেম-মাস্টার। এ সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা গণেশসুন্দরীর খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ ও তৎপরে ব্রাহ্মসমাজে আগমন। গণেশসুন্দরী কলিকাতা নিবাসী এক বৈদ্য পরিবারের বিধবা কন্যা। মিশনারী মহিলাগণ তখন হিন্দু গৃহস্থদিগের বাড়িতে বাড়িতে অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ললনাদিগকে পড়াইয়া বেড়াইতেন। অতি অল্প ব্যয়েই তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইত। এইজন্য অনেক ভদ্রলোক নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্বীয়-স্বীয় ভবনের মহিলাদিগকে পড়াইতে দিতেন। আমিও প্রসন্নময়ীকে আনিয়া প্রথমে এইরূপে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে একটি কৌতুককর গল্প মনে আছে। তাহা এই স্থানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে মেম

প্রসন্নময়ীকে পড়াইতেন তিনি সপ্তাহে দুইদিন আসিতেন। একবার আসিয়া, মেম মানবের আদি পিতা মাতা আদম ও হবার (এ্যাডাম এ্যাণ্ড ঈভ) বিবরণ মুখে মুখে প্রসন্নময়ীকে বলিয়া গেলেন। তাহার পর গৃহকর্মে ব্যাপৃত হইয়া প্রসন্নময়ী আদম-হবার কথা সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিনে আসিয়া মেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, মানবের আদি পিতা মাতা কে ছিল?" প্রসন্নময়ী তো অন্ধকার দেখিলেন, আদম ও হবা মনে আসিল না। তখন মেম তিরস্কার করিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পার না?" মেম পুনরায় আসিবার দিন প্রাতে প্রসন্নময়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গো, মানুষ আগে কি করে হল?" আমি বলিলাম, "তা কে জানে? তবে একজন পণ্ডিত বলেছেন যে আগে মানুষ বানর ছিল, বানর হতে মানুষ হয়েছে।" সেদিন মেম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ কেমন করে হল?" প্রসন্নময়ীর আবার আদম-হবা মনে নাই। মেম তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা কর না কেন?" প্রসন্নময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন, 'বানর হতে মানুষ হয়েছে'।" মেম বলিলেন, "তোমার বাবু বড় দুষ্টু, তোমাকে তামাশা করেছে।" প্রসন্নময়ী বলিলেন, "না, তামাশা করেননি, সত্যি সত্যি বলেছেন।"

সেদিন ঘটনাক্রমে আমি অন্য ঘরে ছিলাম, মেম যাইবার সময় আমার নিকট আসিলেন। তখন ডারুইনের নূতন মত সম্বন্ধে সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি প্রসন্নময়ীকে পরে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।' শুনিয়া আমি অনেক হাসিয়াছিলাম।

এইরূপ একজন মিশনারী মেম গণেশসুন্দরীকে পড়াইতেন। একদিন গণেশ-সুন্দরী স্বীয় বিধবা মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কিছু না বলিয়া মিশনারীদিগের আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মেম যখন তাঁহাকে বলিতেন যে তিনি অনন্ত নরকের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত এবং তিনি ত্বরায় যীশুর আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, তিনি মিশনারীদিগের আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। ইহা লইয়া শহরে তুমুল আন্দোলন ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। মোকদ্দমায় গণেশ-সুন্দরীর ভ্রাতৃগণ হারিয়া গেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত ও স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়াছে বলিয়া স্থির হইল। আন্দোলন ও সংবাদপত্রের গালাগালি চলিতে লাগিল। কেবল সংবাদ-পত্রের গালাগালি নহে, একদিন হাতাহাতিও হইল। সেদিন পাদরী ডনসাহেব যাঁহার আশ্রয়ে গণেশসুন্দরী ছিলেন, কলেজ স্কোয়ারের কোণে প্রচার করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। কোথা হইতে গণেশসুন্দরীর ভ্রাতা চন্দ্র সদলে বৃক যূথের ন্যায়

আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পাদরীসাহেব ঘুঁষি টিল ঢেলা খাইয়া ধাবিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের সম্মুখস্থিত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়া নিরাপদ হইলেন। ঐ বাড়ির লোকে আক্রমণকারী যুবকদিগকে তাড়া করিল, তাহারা কোন গলি দিয়া কোথায় পলাইল। তখন পাদরীসাহেব বলিলেন, "কি বলিব, পুরোহিত, নতুবা আমি তিন ব্যক্তি নিপাত করিতে পারিতাম।" শুনিয়া আমরা অনেক হাসিয়াছিলাম।

যাহা হউক, সংবাদপত্রের আন্দোলন থামিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম যুবকগণ গণেশসুন্দরীর ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টীয়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লাগিল। শোনা গেল, তিনি খ্রীষ্টীয়গণের নিকট সুখে নাই, আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং স্বীয় জননীর নিকট আসিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জননী লইতে সাহস করিতেছেন না। এই অবস্থাতে উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ আসিয়া গণেশসুন্দরীকে স্বীয় পরিবারে লইবার জন্য আমাকে ধরিলেন। আমি তখন নূতন সংসার পাতিয়া ঘরকন্না করিতেছি। আমি বালিকাটির অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া 'না' বলিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, আমাদের আহারের যদি দু-মুঠো জুটে তো তাহারও জুটিবে।

গণেশসুন্দরী আবার পলাইয়া খ্রীষ্টীয়দিগের আশ্রয় হইতে আমার ভবনে আসিলেন। আমার বাড়িতে তিনি আমার ভগিনীর ন্যায় হইয়া আমাদের কষ্টের অংশ লইয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। তৎপরে ঈশ্বর কৃপায় অতি উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত (রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত) বিবাহিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার গণেশসুন্দরী নাম তুলিয়া দিয়া তাঁহার অপর নাম মনোমোহিনীই প্রবল করিয়াছি। তিনি সেই নামে এখনো আমার ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিতা।

ব্রাহ্মসমাজে 'আনন্দবাদী দল'। কালকাতাতে সকল দলের ব্রাহ্মেরাই আমাকে বন্ধু-ভাবে ডাকিতেন। তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মধ্যে 'আনন্দবাদী দল' নামে একটি দল হইয়াছিল, অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই দলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। ১৮৬৬ সালে কেশববাবু 'জীশাস ক্রাইষ্ট, এশিয়া এ্যাণ্ড ইয়োরোপ' নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন। তাহাতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স তাঁহার প্রতি প্রীত হন, এবং তাঁহার সঙ্গে কেশববাবুর বন্ধুতা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ক্রমে কেশববাবুর দলের লোকদিগের যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক হইয়া পড়ে। বড়দিনের সময় যীশুর ধ্যানে দিন যাপন করা, বাইবেল পড়া, বাইবেলের ব্যাখ্যা করা, খ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি করা,

ইত্যাদি হইতে থাকে। এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, বাইবেল পাঠ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই চলিতেছিল, এখন সেই ভাবটা কিছু প্রবল হয়। ইহার ফলস্বরূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম ভাবে যে অনুতাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীল দলকে প্রবল রূপে অধিকার করে। পাপবোধ নব্য ব্রাহ্মদের সকলের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে, অনুতাপব্যঞ্জক সঙ্গীতাদি রচিত হইতে থাকে। ইহার উপরে, বোধ হয় ১৮৬৭ সালে, গোঁসাইজী উদ্যোগী হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া উন্নতিশীল দলকে বৈষ্ণব সংকীর্তন শোনান। তদবধি সংকীর্তন প্রথা ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল উত্তেজনার ফলস্বরূপ ১৮৬৮ সালে নরপূজার হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই পাপবোধ ও ব্যাকুলতার ভাব হইতেই ব্রাহ্মেরা কেশববাবুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতেন।

যখন একদিকে অনুতাপ ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তখন অপরদিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, "এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।" এই দলকে ব্রাহ্মেরা তখন 'আনন্দবাদী দল' বলিতেন। শিশির বাবু ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপূজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইহারা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে একজন মুঙ্গের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম উপাসনান্তে কেশববাবুর চরণ ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদা হেমন্তবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়কেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাহিরে যাইতে দেখিলাম। এই মাঘোৎসব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের অসম্পূর্ণ বাড়িতে চাঁদোয়া খাটাইয়া সমাধা করা হইয়াছিল।

ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলা লেনে যশোরের লোকেদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। সে সময়ে প্রধানত সঙ্গীত ও সংকীর্তন হইত। টাকী নিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরলাল রায় সেই কীর্তনে গড়াগড়ি দিতেন। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্তন করিতে পারিতেন। তাঁহার কীর্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত। সেখানে নূতন ধরনের সঙ্গীত হইত। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। একটি সঙ্গীতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইত,

তোমার রাগে রাঙা নয়ন তলে বহে দেখি প্রেমধার।

আর একটি সঙ্গীত যাহা তাঁহাদের মুখে সর্বদা শুনিতাম, তাহা এই :

মা যার আনন্দময়ী তার কি বা নিরানন্দ ?
তবে কেন রোগে শোকে পাপে তাপে বৃথা কান্দ ?
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তার চারি পাশে,
ভাসাইয়াছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে।
একবার বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ।

এই গান করিয়া সকলে নৃত্য করিতেন।

একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন শুনিতাম, অপর দিকে ইঁহাদের কাছে গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম। তখন ইহা বেশ লাগিত। শিশিরবাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পরেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেরাম বাঁড়ুয্যের গলিতে আসিয়া বাসা করিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদিগকে সর্বদা দেখিতাম। শিশিরবাবুর অমায়িকতা দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। একদিনের কথা স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলে, বলিলেন, "কি পরের মতো বাহিরে বসে খাবে! চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হতে গরম-গরম ভাত তরকারি মা'র হাতে না খেলে সুখ হয় না"। এই বলিয়া দুজনে গিয়া রান্নাঘরে আহারে বসিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, তাঁহার জননী গরম-গরম ভাত তরকারি দিতে লাগিলেন ও আমরা আহার করিতে লাগিলাম।

ইহার পর হইতে শিশিরবাবুরা অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িলেন।

খ্যাতির বিড়ম্বনা। কিন্তু একটি কারণে এই সময় কিছুদিন ধরিয়া আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বড়ই অসন্তোষকর হইয়া গিয়াছিল। সে কারণটি এই। যতদিন আমি ব্রাহ্মদের পশ্চাতে ছিলাম ও আপনাকে অনেকাংশে হীন বলিয়া মনে করিতাম, ততদিন আমার অন্তরে বিনয় ও ব্যাকুলতা ছিল। আমি আপনাকে সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মরূপে পরিচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু দীক্ষার দিন হইতে সে অবস্থা চলিয়া গেল। আমি যেন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম ; এবং হঠাৎ যেন একজন বড় ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইলাম। আমি তখন ব্রাহ্ম দলের মধ্যে সর্বত্রই সমাদর পাইতে লাগিলাম। সে সমাদরের উপযুক্ত আমি ছিলাম না। বোধ হয় এতটা সমাদর পাইবার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালের শেষে আমার 'নির্বাসিতের বিলাপ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, প্রকাশিত হইবামাত্র উহা লোকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সর্বত্র প্রশংসিত হয়। তদনুসারে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে পরিচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমার দীক্ষার সময় হইতে আমার মাতুল উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দলকে 'কৈশব দল' নাম দিয়া সোমপ্রকাশে তাহাদের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ করেন, তাহাতেও আমার নামটা সাধারণের মুখে উঠে। যে কারণেই হউক, আমি তখন হইতে লোকচক্ষুর গোচর হইয়া একজন মস্ত ব্রাহ্ম হইয়া দাঁড়াই। ইহাতে কিছুদিন আমার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। আমার পূর্বকার ব্যাকুলতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আমি কিছু অসাবধান হইয়া পড়ি, যে সকল দুর্বলতা ও কদভ্যাস অনেক চেষ্টাতে দমনে রাখিয়াছিলাম, তাহা আবার মাথা জাগাইয়া উঠে।

কিন্তু আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দয়া বলিতে হইবে যে, আমি অচিরকালের মধ্যে আত্মদৃষ্টির সাহায্যে নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারি ও তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হই। দীক্ষার সময় ও এই সময় কয়েকটি কবিতাতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, সেগুলি ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে উক্ত পত্রিকার ফাইলে পাওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র দুই চারি পংক্তি স্মৃতিতে আছে। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া লিখিয়াছিলাম—

ভাসায়ে জীবন তরী বিপত্তির সাগরে,
যাই দেব! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে।
মোর পক্ষ ছিল যারা,
বিপক্ষ হইল তারা,
ঘেরিল সকল দিক অপবাদ-আঁধারে,
বহিল প্রলয়-ঝড় মস্তকের উপরে।

অগ্রে যে আধ্যাত্মিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

নিজ দলে গেলে পরে সমাদর পাই হে,
আপনারে বড় ভাবি তাই হে!
কিন্তু কি যে বড় আমি
জান তুমি অন্তর্যামী,
তব অগোচর প্রভু কোনো কথা নাই হে।

যাহা হউক, দীক্ষা ও সাধারণ সমাদরের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে কিছুদিন গেল। আমি যে ব্রাহ্ম দলে হঠাৎ কিরূপ সমাদৃত হইয়া পড়িলাম, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমার দীক্ষার কয়েক মাস পরেই শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হইল। তখন উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাকর্তা কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় জীবিত ছিলেন। তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন যে, আমাকে উক্ত উপাসনাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়দের সহিত বেদীতে বসিতে হইবে ও উপদেশের ভার লইতে হইবে। আমি ভয়ে সঙ্কুচিত হইলাম, কিন্তু তাঁহারা কোনো মতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে রাজি হইলাম। কিন্তু তাঁহার চলিয়া গেলে, বেদীতে বসিতে হইবে ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে মন অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কি করি, কথা দিয়াছি। তখন অনন্যোপায় হইয়া উপদেশটি লিখিতে বসিলাম। লিখিয়া এক প্রকার দাঁড় করাইলাম। উপাসনা স্থলে সেইটি ভয়ে-ভয়ে পাঠ করিলাম। কিন্তু বেদী হইতে নামিলেই দ্বিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি করিয়া আমার উপদেশের অনেক প্রশংসা করিলেন। সভাস্থলেও অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরদিন কলেজে বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছি, এমন সময় ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নিকট হইতে কলেজের অধ্যক্ষের নামে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত, "শিবনাথ ভট্টাচার্য নামে তোমাদের বি. এ. ক্লাসে এক ছাত্র আছে, তাহাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য চাই।" তদনীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর ঘোষাল তোমাকে ডাকিয়াছেন কেন?" আমি বলিলাম, "কিছুই জানি না, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই।" তখন তিনি আমাকে পাঠাইবার পূর্বে ঈশ্বর ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া দিলেন, বলিলেন, "সাবধান, তিনি তোমাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম ভজাইবেন।" সর্বাধিকারী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, গিয়া তাহাই শুনিলাম। ঘোষাল মহাশয় পূর্বদিনে শ্যামবাজারের উপাসনাতে উপস্থিত ছিলেন এবং আমার উপদেশে প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে খ্রীষ্টীয় ধর্মের মহৎ ভাব দেখাইবার জন্য আদিম প্রফেটদিগের ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত পরবর্তী ঘটনা তুলনা করিয়া দেখাইতে লাগিলেন, এবং আমাকে একখানি বাইবেল উপহার দিলেন। আমার প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া বিদায় করিলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, "ইনি কেন খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন না?"

শ্যামবাজারের উপদেশের ধাক্কা এখানে থামিল না। কয়েকদিন পরেই সিন্দুরিয়াপটী 'পারিবারিক সমাজ' হইতে ক্ষেত্রনাথ শেঠ নামে একজন সভ্য আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, উক্ত পারিবারিক সমাজের সকলের ইচ্ছা যে, আমি তাঁহাদের সমাজের আচার্যের ভার গ্রহণ করি। অগ্রে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় সেই সমাজের আচার্যের কার্য করিতেন, কিন্তু কার্যবাহুল্য নিবন্ধন তিনি

সেই ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পাকড়াশী মহাশয়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। আমি তাঁহার উপদেশে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অত বাস্তবিক ব্রাহ্ম আচার্যদিগের মধ্যে চিন্তাশীলতা মৌলিকতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিষয়ে এরূপ অল্প লোক দেখিয়াছি। তাঁহার পরিত্যক্ত বেদী আমি গ্রহণ করিব, ইহা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলাম। কিন্তু তাঁহাদের হাত এড়াইতে পারিলাম না। শেষে, এক শুক্রবারে গিয়া উপাসনা করিতে স্বীকৃত হইলাম। এবারেও উপদেশ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। এই একবার উপদেশ দিয়া আমার বিপদ দশগুণ বাড়িয়া গেল। তাঁহারা আমাকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিলেন। কাজেই আচার্যের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। এই ভার আমার প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতির ও আচার্যের কার্য শিক্ষার উপায়স্বরূপ হইল। আমি কয়েক বৎসর এই কাজ করিয়াছিলাম। যেখানেই থাকি, শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সিন্দুরিয়াপটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। কি বলিব, সে বিষয় সপ্তাহ কাল ভাবিতাম। উপাসক-মণ্ডলীর অভাব নিজ চিত্তে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতাম, প্রত্যেকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার চেষ্টা করিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আচার্যের দায়িত্ব অনেকটা অনুভব করিতাম। এই দায়িত্বজ্ঞানই আমাকে ফুটাইয়াছে।

ক্রমে সেই ক্ষুদ্র উপাসক-মণ্ডলীর সকলের সঙ্গে ভালোবাসা জন্মিয়া গেল। সেই সম্বন্ধ বহু কাল রহিয়াছে। গোপালচন্দ্র মল্লিক, নেপালচন্দ্র মল্লিক, সিন্দুরিয়াপটী পরিবারের দুই ভাই যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাকে বিধিমতে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে গোপালচন্দ্র মল্লিক আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাতে প্রবেশ করেন ও ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া স্বীয় পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মণিলাল মল্লিক আদি সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ঐ পারিবারিক সমাজ স্থাপন করেন।

১৮৭১ সালের ১৫ই আষাঢ় আমার পুত্র প্রিয়নাথের জন্ম হয়।

ঢাকার অবলাবান্ধব পত্রিকা। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অবলাবান্ধব সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত মিলন। তখন ঢাকা সমাজ-সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে 'মহাপাপ বাল্য-বিবাহ' নামে এক পত্রিকা ঢাকা হইতে বাহির হয়, তাহাতে সেখানকার যুবক দলের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে। এই রঙ্গভূমিতে অবলাবান্ধব দেখা দিল। আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এক কোণ হইতে নারীকুলের হিতৈষী হইয়া দেখা দিল? অবলাবান্ধবের সম্পাদককে তখন চিনিতাম না, কিন্তু তাঁহার তাজা-তাজা কথা প্রাণ হইতে আসিতেছে বোধ হইত ও আমাদের বড় ভালো লাগিত।

ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অভয়াচরণ দাসের পুত্র প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে তাঁহার লেখক শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া গেলেন। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমি কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে বলিয়া কহিয়া তাহাকেও লেখিকা করিয়াছিলাম। অবলাবান্ধবে আমার গদ্যপদ্যাত্মক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয়, উক্ত পত্রিকার একখানি ফাইলও খুঁজিয়া পাই নাই।

অবলাবান্ধবের সহিত যোগ রহিয়াছে, সেই সময়ে একদিন কলেজে পড়িতেছি, এমন সময়ে উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া আমাকে বলিল, "ও রে ভাই, অবলা-বান্ধবের এডিটর কলিকাতায় এসেছে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" অমনি আমি আমাদের 'হিরো'কে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। গিয়া দেখি এক দীর্ঘাকৃতি একহারা পুরুষ, স্কুল-মাস্টারের মতো লম্বা চাপকান পরা, দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিন আর অধিক কথা হইল না। সে যাত্রা বোধ হয় তিনি কয়েকদিন পরেই দেশে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই অবলাবান্ধব লইয়া কলিকাতায় আসিলেন, এবং পূর্ববঙ্গীয় যুবকদিগের নেতাস্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন।

এই সময় ঢাকা হইতে তাঁহার ও বরিশাল হইতে স্বর্গীয় বন্ধু দুর্গামোহন দাসের, কলিকাতাতে আগমন স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। ইহার ফল পরে বলিব।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সহিত যোগ। ভারত আশ্রমে বাসকালে যোগবৃদ্ধি। দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজ মোহিনীর আগমন। নগেন্দ্রবাবুর আগমন। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত মতভেদ।

দীক্ষার পর কেশবচন্দ্র সেনের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহাতে আমাতে এমন একটা কি ছিল, যাহাতে তিনি আমাকে দেখিলেই প্রীত হইতেন, আমিও তাঁহাকে দেখিলে প্রীত হইতাম। আমার সঙ্গে তাঁহার হাসি ঠাট্টা রসিকতা চলিত। একবার একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, "কেশববাবুর মনের একটা চাবি তোমার কাছে আছে।" তাঁহার নিকট আমার মনের ভালো মন্দ কোনো কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইত না। অবাধে সকল কথা তাঁহার কানে ঢালিতাম। এমন কি, তাঁহার যে কথা আমার মনের সঙ্গে না মিলিত, তাহাও তাঁহাকে জানাইতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইত না।

তাঁহার সহিত আমার কিরূপ হাসি ঠাট্টা চলিত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা মন্দ নয়। একবার হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনাতে আচার্যের কার্য করিবার জন্য আমি তাঁহাকে রাজি করি। আমি তখন হরিনাভি স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি প্রত্যূষে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রাতে গিয়া আমার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার প্রাতরাশের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত রাখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, তিনি প্রাতে অপরাপর জিনিসের মধ্যে ভিজা ছোলা ও আদা খাইয়া থাকেন। সুতরাং ভিজা ছোলা ও আদা প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। ভিজা ছোলা দেখিয়াই তিনি ভারি খুশি হইলেন। বলিলেন, "বাঃ, আমি যে প্রাতে ভিজে ছোলা খাই, তাহা জানিলে কিরূপে?" আমি বলিলাম, "এ আবার আশ্চর্যের বিষয় কি? আপনার দৈনিক রীতির যদি এতটুকুও না জানলাম, তবে আপনার সঙ্গে কি মিশলাম? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি এত ভিজে ছোলা ভালোবাসেন কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ভিজে ছোলা খাব না! গাড়িতে যুতে টানাও কেমন?" বলিয়াই হাসিয়া আবার বলিলেন, "শুধু গাড়িতে যুতে টানানো নয়, চাবুক মারতেও তো কসুর কর না।" তখন আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাজের সমালোচনা করিতাম। এই চাবুক মারার অর্থ তাহাই। শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেআদবী মাপ করবেন, আপনি বেদীতে বসে চাট মারতেও তো ছাড়েন না।" এই কথা লইয়া খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

আর একবার আমার একটি বন্ধুর কন্যার নামকরণে তাঁহার উপাসনা করিবার কথা। সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। আমরা বসিয়া আছি, তিনি আর আসেন না। তিনি গবর্ণর জেনারেলের বাড়িতে এক সান্ধ্য সমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, তিনি একবার দেখা দিয়াই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৮।।টা বাজিয়া গেল, তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি বড়-লোকদের সঙ্গে সঙ্গে কেন এত বেড়ান? কই, আপনাকে তো কোন টাইটেল দেয় না?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেন হে বাপু? কে. সি. এস. আই. (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি), আমার টাইটেলের অপ্রতুল কি?"

আর একবার আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি ঘুমাইতেছেন, কিন্তু চোখে চশমা আছে। জাগিলে আমি বলিলাম, "যদি ঘুমাচ্ছেন, তবে চোখে চশমা কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু, স্বপন তো দেখতে হয়।"

কেশবচন্দ্রের বিদেশ যাত্রা। ১৮৭০ সালের প্রারম্ভে তিনি যখন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন, তখন একদিন আমাদের অনেককে একত্র করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বিদেশে যাইতেছেন, কি হয় স্থিরতা নাই। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার যে সকল মত লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সে সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা কথা মনে আছে। তিনি মহাপুরুষের মতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি মহাপুরুষদিগকে মনে করেন যেন চশমা—অর্থাৎ চশমা যেমন চক্ষুকে আবরণ করে না, কিন্তু দৃষ্টির উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর দর্শনের ব্যাঘাত করেন না, কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের সহায়তা করেন। অথবা মহাপুরুষেরা যেন দ্বারবান, দ্বারবান যেমন আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রভুর সমীপে উপনীত করিয়া দেয়, তৎপরে আর তাহার কাজ থাকে না, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর চরণে মানবকে উপনীত করিয়া দেন, নিজেরা আর মধ্যে থাকেন না। আমার মনে হইতেছে, আমি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "মহাপুরুষেরা চশমা, তাহা ঠিক। কিন্তু কাহাকেও যদি বার-বার বলা যায়,'দেখ,দেখ,ঐ তোমার চোখে চশমা,ঐ তোমার চোখে চশমা,' তাহা হইলে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে তাহার দৃষ্টিকে তুলিয়া, সে দৃষ্টিকে চশমার উপরেই ফেলিয়া দেওয়া হয়। তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর দর্শনের সহায় হইলেও, 'ঐ মহাপুরুষ, ঐ মহাপুরুষ' করিয়া যদি তাঁহাদের প্রতিই দৃষ্টিকে অধিক আকৃষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে পশ্চাতে ফেলা হয়।"

যাহা হউক, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিলে, তাঁহার বিচ্ছেদে আমি বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলাম, এবং তৎকালের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম; সেটি তাঁহার পত্নীর উক্তিতে। তাহা বোধ হয় অবলাবান্ধবে কি অন্য কোনো পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কেশববাবুর নিকট অনেক শিখিয়াছি। কিভাবে ঈশ্বরের কাজ করিতে হয়, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া জানিয়াছি।

কেশববাবু কয়েক মাস পরে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। ইণ্ডিয়ান রিফরম্ এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে টেম্পারেন্স, এডুকেশন, চীপ লিটারেচার, টেকনিকাল এডুকেশন প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা

প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তদ্ভিন্ন 'সুলভ সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতেও লিখিতাম।

এই সময়ে কেশববাবু পুরাতন সোসাইটি অব থীইষ্টিক্ ফ্রেণ্ডস্-কে পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহাতে আমাকে বক্তৃতা করিতে বলেন। তদনুসারে আমি ইংরাজীতে এক বক্তৃতা করি, কেশববাবু সভাপতি ছিলেন। সে বক্তৃতার দিনের অন্ত-কথা অধিক মনে নাই। এইমাত্র আছে, আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান মিশনারী সুপ্রসিদ্ধ ড্যাল সাহেব সেদিনকার সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে ব্রাহ্ম ফলোয়ার অব্ ক্রাইষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই ইণ্ডিয়ান রিফরম্ এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে কেশববাবু আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এক মুদ্রিত পত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নিকট হইতে, এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত কাল কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ১৬ বৎসরের উর্ধ্বে সেই কালকে নির্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার চার্লস চতুর্দশ বর্ষকে সর্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে চতুর্দশ বর্ষকে বালিকার সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স বলিয়া নির্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলাম।

এই সময়েই বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে আদি সমাজের ভূতপূর্ব সভাপতি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র তদানীন্তন সম্পাদক ও বিলাতের টাইমস পত্রিকার পত্রপ্রেরক জেমস রুট্‌লেজ সাহেব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ টাইমস পত্রিকাতে প্রেরণ করেন। তাহার ফলস্বরূপ এদেশে ও সেদেশে সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে চর্চা উপস্থিত হয়। সেই বক্তৃতাতে রাজনারায়ণবাবু ব্রাহ্মধর্মকে উন্নত হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন। উন্নতিশীল দল এ মতের বিরোধী ছিলেন। কেশববাবু আমাকে ও পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়কে এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি ইংরাজীতে ও গৌরবাবু বাংলাতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। কেশববাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কেশবচন্দ্রের ভারত আশ্রম। এই সময়কার সর্বপ্রথম কার্য 'ভারত আশ্রম' স্থাপন। কেশববাবু ইংলণ্ডে ইংরাজদের গৃহকর্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন।

সর্বদা বলিতেন, মিডল ক্লাস ইংলিশ হোম-এর ন্যায় ইনষ্টিটিউশান পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া, কিছুদিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলামতো কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারত আশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুচর প্রচারকগণ সর্বাগ্রে গেলেন। তৎপরে আমরাও অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশববাবুর মনের ভাবটা কাজে করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

ভারত আশ্রম স্থাপিত হইলে কেশববাবু কলুটোলার বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। কলিকাতা ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রিট ভবনে (বর্তমান সিটি স্কুলের ভূমিস্থিত ভবনে) প্রথমে কিছুদিন থাকিয়া পরে শহরের বাহিরে কোনো কোনো বাগানে গিয়া থাকা হয়। প্রথম বেলঘরিয়ায় এক বাগানে, তৎপরে কাঁকুড়গাছির এক বাগানে কিছুদিন থাকা হয়। এই সকল স্থানে গিয়া আমরা কেশববাবুর বিমল সহবাসে থাকিবার অবসর পাইলাম। স্বীয়-স্বীয় ব্যয়ের অংশ দিয়া সকলে একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় থাকিতাম। একসঙ্গে থাওয়া, একসঙ্গে বসা, একসঙ্গে বেড়ানো—সুখেই কাল কাটিত। শহরে যাঁহাদের কাজ থাকিত, তাঁহারা দিনের বেলায় শহরে গিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাতে একসঙ্গে উপাসনা ও একসঙ্গে ধর্মালাপ চলিত। আমরা সকল বিষয়েই কেশববাবুর পরামর্শ ও সদুপদেশ পাইতাম।

আমি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে আপনাকে অর্পণ করিব বলিয়াই ভারত আশ্রমে বাস করিতে গিয়াছিলাম। আমার অগ্রে অভিপ্রায় ছিল যে, আমি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিব, সেই জন্য উকীল বন্ধুদের পরামর্শে তিন বৎসর 'ল লেক্‌চার' শুনিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, আমার বি. এল. দিবার ইচ্ছা হইবার আর একটি কারণ ছিল। তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি জুডিশ্যাল সার্ভিস-এ তোমাদের কলেজের ছেলে চাই, কারণ তাহারা 'হিন্দু ল' বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়।" তদনন্তর সর্বাধিকারী মহাশয় আসিয়া আমাদিগকে বি. এল. পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন; এবং আমার ভক্তিভাজন মাতুলমহাশয়ও সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে আমি 'ল লেকচার' শুনিতে আরম্ভ

করি। কিন্তু বি. এ. পাশ করিয়াই অন্যবিধ আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে আসিল। আমি কেশববাবুর পদানুসরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে আমার জীবন দিব এই বাসনা হৃদয়ে উদয় হইল। গোপনে পত্র দ্বারা কেশববাবুকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি আস্তে আস্তে ক্রমে আমাদের সঙ্গে জোট. তারপর দেখা যাবে কি হয়।" এবং আমি ১৮৭২ সালের প্রারম্ভে এম. এ. পাস করিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি পাইয়া কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র, তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষকতা কার্য দিয়া আশ্রমে সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমার নামে বেতন রূপে যাহা দেওয়া হইত, তাহা প্রচারকগণের চির-পরিচারক শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে জমা হইত, তিনি আমার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ দেখিতেন, তাহার সহিত আমার কোনো সংস্রব থাকিত না। বলা বাহুল্য, তখন প্রচারকগণ সকলে, ও তৎসঙ্গে আমি, সপরিবারে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতাম।

আমি কেশববাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সে সময় কেশববাবুর ও তাঁহার পত্নীর যে সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। প্রতিদিন দুপুরবেলা আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া স্কুল করা হইত। আমি ঐ স্কুলে পড়াইতাম। একদিন কেশববাবু তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশ্য করিয়া আমাকে বলিলেন, "ওহে, তুমি ওঁকে ইংরেজী শেখাও তো।" তদনন্তর তিনি আমার ছাত্রী হইলেন। কেশববাবু তাঁহার প্রকৃতির সরলতা জানিতেন। তিনি বিলাত হইতে কতকগুলি চিলড্রেনস ম্যাগাজিন ও রীডিং বুক্স আনিয়াছিলেন। তাহার একখানি তাঁহাকে পড়াইবার জন্য দিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ যে ছোট ছেলেদের বই।" তিনি বলিলেন, "আরে, উনি প্রথম ইংরেজী পড়বেন তো? হলই বা ছোট ছেলেদের বই। তুমি পড়াতে আরম্ভ কর না, দেখবে, উনি মনে ছোট ছেলেই আছেন।" কাজেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাঁহার পাঠ্য পুস্তকে একটি ছোট মেয়ের ছবি ছিল, তাহার মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মেয়েটি দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বড় দুষ্ট। ঐ ছবির সঙ্গে তাহার দুষ্টামির অনেক গল্প আছে। আচার্য-পত্নী তাঁহার জীবনে এত দুষ্টামির কথা বোধ হয় শোনেন নাই। তিনি পড়িয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন, ছবিটা পর্যন্ত তাঁহার চক্ষের শূল হইয়া দাঁড়াইল। একদিন পড়িবার জন্য যেই বই খুলিয়াছেন, অমনি সেই ছবিটা বাহির হইল। তিনি দেখিয়া

রাগিয়া গেলেন ও নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন "মা গো মা! কি দুষ্ট মেয়ে! দেখলেই রাগ হয়।" আমি শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম, "রাগেন কার উপরে? ও যে ছবি! আর ও সব যে কল্পিত গল্প।" তিনি সেদিকে কান দিলেন না। তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার চুলগুলো কি কেটে দেব? তারও চুলগুলো ঠিক এমনি কোঁকড়া, দেখলে ঐ ছবিটা মনে পড়ে।" আমি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম।

আর একদিনের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন আমি কেশববাবুর সহিত কোনো বিশেষ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার ঘরে গেলাম। তখন তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময়। কিন্তু দেখিলাম, তিনি ঘরে নাই। তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমাকে কোনো কারণে রাগতে দেখে, তিনি প্রথমে বললেন, 'তাই তো, তুমিও রেগে উঠলে?' এই বলে এই ঘরেই কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন, পাষাণের মূর্তি, তারপর বাহির হয়ে গেলেন। খুঁজে দেখুন বোধ হয় বাগানের কোনো গাছতলায় চোখ বুজে বসে আছেন।" শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "হাসেন কি? ঐ চোখ বুজে-বুজেই আমায় সেরে আনছেন। আমি কিছু অন্যায় করলেই, রাগ নাই উষ্মা নাই, চোখ বুজে একেবারে পাষাণপ্রতিমা হয়ে যান। আমি লজ্জায় মরে যাই। ভবিষ্যতে যাতে আর ওরূপ না করি, তাঁর জন্য ঈশ্বর চরণে বার-বার প্রার্থনা করতে থাকি।"

আমি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যাঁহার বাহিরে এত তেজ, বক্তৃতাতে যিনি অগ্নি উদ্গিরণ করেন, যাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাবে ধরা কম্পিত হয়, গৃহের মধ্যে তাঁহার এই আত্মসংযম! বাস্তবিক, কেশবচন্দ্রের আত্মসংযম শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। বাদ বিসম্বাদ তর্কযুদ্ধে আমরা অনেকেই অনেক সময় উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইতাম, কিন্তু তিনি ধীর ও স্থির থাকিয়া আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। মনে হয়তো গভীর বিরক্তির আবির্ভাব, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। সুযুক্তি পরম্পরা দ্বারা শ্রোতাকে কোণঠাসা করিয়া ধরিতেন। দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়া কেবল দুই-এক স্থলে মাত্র তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়াছি। নতুবা তিনি সর্বত্র সর্ব কালে ও সর্ব বিষয়ে আমাদের নিকট সংযমের আদর্শ স্বরূপ থাকিয়াছেন। এ কথা যখনই স্মরণ করি, হৃদয় উন্নত হয় এবং নিজেদের দৈনিক ব্যবহারের জন্য লজ্জা হয়। তাঁহার সংযমের এই দৃষ্টান্তটি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উপসংহারে বক্তব্য যে, কেশববাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া বাস্তবিক দেখিলাম যে, তিনি এক বৃক্ষের তলে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন।

আচার্য-পত্নীর সরলতা ও আমার প্রতি অকপট ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া ফেলি। আমি একদিন স্কুলে পড়াইবার সময় দেখিলাম, তিনি পড়া করিয়া আসেন নাই। তাই তাঁহাকে বলিলাম, দুপুরবেলা খাওয়ার পর ঘরে গিয়ে শয়ন করলে আপনি তো আপনার পতির নিকট কঠিন বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন, পড়া তয়ের করে আসতে পারেন।" তদনুসারে তিনি তৎপরদিন দুপুর-বেলা পড়া জানিতে বসেন। কেশববাবু এটা ওটা বলিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "যাও যাও, তুমি শিবনাথবাবুর মতো পড়াতে পার না।" এই কথায় কেশববাবু খুব হাসিতে লাগিলেন। তৎপরদিন তাঁহারা যখন পতি-পত্নীতে একত্র আছেন, এমন সময়ে কোনো কাজের জন্য আমি সেখানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া কেশববাবু হাসিয়া বলিলেন, "শিবনাথ! তুমি আমার সমক্ষে পড়াও তো, আমি দেখি। তুমি এমন পড়া কি পড়াও যে আমার পড়ানো ওঁর মনে লাগে না? আমাকে বলেছেন, 'তুমি শিবনাথবাবুর মতো পড়াতে পার না'।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বুঝলেন না, আমাকে ভারি ভালোবাসেন কি না, তাই আমি যা করি ভালো লাগে। আপনাকে জেনেছেন সর্বোৎকৃষ্ট উপদেষ্টা, আমাকে জেনেছেন সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। যা হোক, এ কথা শুনে আমার শ্রমটা সার্থক বোধ হচ্ছে।"

এই ভারত আশ্রমে বাসকালে আচার্য-পত্নীর পতিভক্তি ও শিশুসুলভ সরলতার আর এক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখানে উল্লেখ করা ভালো। আশ্রম স্থাপিত হইয়া প্রথমে কিছু দিন ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট ভবনে ছিল। তখনও 'বয়স্থা মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয় নাই। সে সময়ে কেশববাবু খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারিকা কুমারী পিগটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন বৈকালে আসিয়া আশ্রমবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে বসিবেন, তাঁহাদের লেখাপড়া দেখিবেন ও তাঁহাদের সঙ্গে নানা হিতকর বিষয়ে আলাপ করিবেন। কুমারী পিগট কেশববাবুকে ভালোবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, এই অনুরোধ করিবামাত্র তিনি আসিতে লাগিলেন। একদিন মহিলাদের সহিত অপরাপর কথার মধ্যে কুমারী পিগট বলিলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ না করে তাহাদের অনন্ত নরক বাস হইবে।" আচার্য-পত্নী সেখানে ছিলেন, তিনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ও মা সে কি গো! যে সরল ভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার সাজা অনন্ত নরক বাস?" কুমারী পিগট বলিলেন, "হাঁ, আমাদের ধর্মে তাই বলে। এমন কি, তোমার পতিও যদি খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত না হন, তাঁহার ভাগ্যেও নরক বাস।" এই কথা শুনিয়া আচার্য-পত্নী গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন, তাঁহার চক্ষে দরদর

ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন। তৎপরে কুমারী পিগটের নিকট আসা ত্যাগ করিলেন। আমরা বুঝাইয়া আনিতে পারিলাম না, কেশববাবুও নিজে বুঝাইয়া রাজি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কুমারী পিগটের মুখ আর দেখব না।" কত বলা গেল, "খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন, কেশববাবুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য কিছু বলেন নাই।" তথাপি শুনিলেন না। কিছুদিন পরে বোধ হয় কুমারী পিগটের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া পত্নীর আগমন। ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক জীবনে এক সুমহৎ পরিবর্তন উপস্থিত হইল। আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিতে হইল। ইহার দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সমুদয় অকালে গত হন। তিনি একাকিনী তাঁহার পিতৃব্যগণের গলগ্রহ হন। তদনন্তর তাঁহার পিতৃব্যমহাশয় আসিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিবার আশায় তাঁহাকে অগ্রে কয়েকবার আনিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া, সে চেষ্টা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার পিতৃব্যের অনুরোধে পুরাতন কর্তব্যজ্ঞানটা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্ম দুই স্ত্রী লইয়া একত্র বাস করিবে, ইহা বড়ই খারাপ কথা। বহুবিবাহের প্রতিবাদ আমাদের এক প্রধান কাজ। দুই স্ত্রী লইয়া একত্র থাকিলে তুমি বহুবিবাহের প্রতিবাদ করিবে কিরূপে?" আমি বলিলাম, "আমি তো দুই স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না করব বলে আনতে যাচ্ছি না। সে বেচারির অপরাধ কি যে, পিতা মাতা গত হওয়ার পরেও তাকে আশ্রয় দিব না? এ বহুবিবাহের অপরাধ তো তার নয়, সে অপরাধ আমার। আমি তাকে এনে লেখাপড়া শিখাব, সে রাজি হলে তার আবার বিয়ে দেব বলে আনতে যাচ্ছি।" এই মতভেদ লইয়া আমি কেশববাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বিরাজমোহিনীকে আনিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, "বাল্য বিবাহের দেশে বহুবিবাহে মেয়েদের অপরাধ কি? একজন যদি দশটি মেয়ে বিবাহ করে ব্রাহ্ম হয়, পরে সে দশজনকে আশ্রয় দিতে বাধ্য। এমন কি, আশ্রয় না দেওয়াতে উক্ত স্ত্রীলোকদের কেহ যদি বিপথে যায়, তার জন্য সে দায়ী।"

পত্নীকে পুনর্বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব। আমি কর্তব্য বোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম। তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিব না, কিন্তু পুনঃ-পরিণীতা না হওয়া পর্যন্ত রক্ষা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, যত দূর মনে হয় এই ভাবেই আনিতে গিয়াছিলাম। আশ্রমে রাখিব ও মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া

দিব। পরে তিনি যদি পুনঃপরিণীতা হইতে না চান, লেখাপড়া শিখিলে কোনো ভালো কাজে বসাইয়া দিব। তিনি সুখী হইবেন, ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন—ইহা ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ হইতে লাগিল। প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাজমোহিনীর বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখা পড়া শিখিয়া কোনো ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখা পড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়? তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মা গো! মেয়েমানুষের আবার ক'বার বিয়ে হয়!" তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

দাম্পত্য সঙ্কট। কিন্তু আর একদিক দিয়া আমার আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী হইতেও সেই সময়ের জন্য আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সঙ্গে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথ তিনজন জন্মিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে স্কুল-ঘর ও কেশববাবুর আপিস-ঘর ভিন্ন অধিক বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নময়ীর ঘরে না শুইলে শুই কোথায়? দূরে গিয়া থাকা আমার পক্ষে ঘোর সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ীর পক্ষেও তাহা অতীব ক্লেশকর হইল। অবশেষে প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া এখানে ওখানে শুইতে আরম্ভ করিলাম। ঘটনাক্রমে এক উপায় আবিষ্কার হইল। হিন্দু কলেজের বারাণ্ডাতে দপ্তরীদের একটা টেবিল পড়িয়া থাকিত। রাত্রে তাহাতে জিনিসপত্র কিছু থাকিত না। রাত্রে আহারের পর একখানা পুস্তক লইয়া সেখানে গিয়া সেই পুস্তক মাথায় দিয়া টেবিলে শুইয়া বেশ নিদ্রা যাইতাম। দীঘির মাঠের হাওয়ায় বেশ নিদ্রা হইত। প্রাতে আসিয়া স্নান করিয়া কেশববাবুর উপাসনাতে যোগ দিতাম, বন্ধুদের সহিত আহার করিতাম, আহারান্তে মহিলা স্কুলে পড়াইতাম, অপরাহ্নে বন্ধুদের সহিত ধর্মালাপে কাটাইতাম, সন্ধ্যার পর আহার করিয়া আবার হিন্দু কলেজের বারাণ্ডায় টেবিলের উপর গিয়া শুইতাম। সেখানে আমার সময়

বড় ভালো যাইত। গভীর রাত্রের নির্জনে অনেক দিন ঈশ্বর চিন্তাতে যাপন করিতাম। রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই আমাকে উঠিতে হইত। উষাকালের সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত আমার পক্ষে বড়ই স্পৃহণীয় ছিল।

আমি জানিতাম, আমি যে গোলদীঘির ধারে টেবিলের উপরে রাত্রি যাপন করি, তাহা কেহ জানেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী উভয়েই সে কথা জানিতে পারিলেন। শুইবার স্থানাভাবে কলেজের বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজমোহিনী মনে করিলেন, তিনিই এই সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া ঘোর বিষাদে পতিত হইলেন, তাঁহারও চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন। এই সময় আবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগর হইতে কর্ম ছাড়িয়া প্রচারক দলে যোগ দিবেন বলিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার কথা যেদিন স্থির হয়, সেদিন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত কেশববাবুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের কথা কখনই ভুলিব না। কান্তিবাবু আসিয়া বলিলেন, "নগেন্দ্র আসিতে চাহিতেছেন, কি করা যাবে?"

কেশববাবু। সে তো ভালই, তিনি আসুন। করা যাবে কি, কেন ভাবছ? আবার করা যাবে কি?

কান্তিবাবু। কিরূপে চলবে?

কেশববাবু। তা ভাববার তোমার অধিকার কি? যিনি আনছেন তিনিই তার উপায় করবেন।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অনেক স্থলে দেখিয়াছি। নগেন্দ্রবাবু কৃষ্ণনগরে তাঁহার জননীকে রাখিয়া একটি পুত্র ও পত্নীসহ আশ্রমে আসিলেন।

কিন্তু তাঁহার আসিবার অচিরকালের মধ্যে কেশববাবুর অনুগত প্রচারক দলের সহিত আমার ও নগেন্দ্রবাবুর অপ্রীতি জন্মিতে লাগিল।

আমার প্রতি অপ্রীতি জন্মিবার দুই কারণ। প্রথম কারণ, এই সময়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। ১৮৭২ সালে আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশববাবুকে বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া মন্দিরে পরদার বাহিরে বসিতে চান। কেবল এ কথা যে বলিলেন তাহা নহে,

একটা কিছু স্থির হইতে না হইতে একদিন অন্নদাচরণ খাস্তগির ও দুর্গামোহন দাস স্বীয়-স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণ সহ পরদার বাহিরে সাধারণ উপাসকদিগের মধ্যে গিয়া বসিলেন। এইরূপ কয়েকবার বসিতেই উপাসক-মণ্ডলীর অপরাপর সভ্যগণ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। অনেকে এত দূর গেলেন যে, কেশববাবুকে বলিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মন্দিরে আসা ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সময়ে একদিন সমাগত মহিলাদিগকে পরদার বাহিরে বসিতে নিষেধ করা হইল, তাহাতে অত্যগ্রসর দল রাগিয়া গেলেন। কেশববাবু বিপদে পড়িলেন। কিরূপে উভয় পক্ষ রক্ষা হয়, সেই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী দল বিলম্ব সহ্য না করিয়া মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন, এবং প্রথমে বহুবাজার স্ট্রীটে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে, ও তৎপরে অপর স্থানে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা একবার মহর্ষিকে আনিয়া আপনাদের সমাজে উপাসনা করাইলেন। আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষের প্রধান নেতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকদিন আমি এক বাড়িতে এক পরিবারে বাস করিয়াছিলাম। হৃদয়ে-হৃদয়ে একটা প্রীতির যোগ ছিল। আমি তাঁহাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা দলের একজন পাণ্ডা হইলাম না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমার মনের যোগ ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে বসিতে দিতে আমার আপত্তি ছিল না। বরং যখন তাঁহারা বসিতে চাহিয়াছেন, তখন বসিতে দেওয়া উচিত, এই মনে করিতাম। তবে দ্বারিকবাবুর ন্যায় মনে করিতাম না যে, বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তখন আমার এই প্রকার ভাব ছিল। যাহা হউক, তাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়াই সেখানে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিবার জন্য আমাকে ধরিলেন। আমি জানিতাম, ইহাতে কেশববাবু অসন্তুষ্ট হউন বা না হউন, তাঁহার অনুগত প্রচারক দলের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয় সকলেই আমার বন্ধু এবং তাঁহাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ, উপাসনা করিবার অনুরোধ কিরূপে লঙ্ঘন করি? কাজেই সম্মত হইলাম এবং তাঁহাদের সমাজে উপাসনা করিতে লাগিলাম। ইহা প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত আমার মতভেদের একটা কারণ হইল।

ক্রমে কেশববাবু তাঁহার ব্রহ্মমন্দিরের এক কোণে পরদার বাহিরে অগ্রসর দলের মহিলাদের জন্য বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার মন্দিরে আসিতে লাগিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মতভেদ। মন্দিরে মহিলাদের বসিবার স্থান লইয়া যে বিবাদ তাহা মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে কেশব-

বাবুর সহিত এই অগ্রসর দলের যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা এরূপ সহজে মিটিবার জিনিস ছিল না। আশ্রমে যে মহিলা বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেশববাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দিবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি, জ্যামিতি পড়ানো লইয়াও তাঁহার সহিত আমার তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। আমি জ্যামিতি, লজিক ও মেটফিজিক্‌স্ পড়াইতে চাহিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, "এ সকল না পড়াইলে প্রকৃত চিন্তাশক্তি ফুটিবে না।" কেশববাবু বলিলেন, "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি করিবে? তদপেক্ষা এলিমেণ্টারি প্রিনসিপলস্ অব সায়েন্স মুখে মুখে শিখাও।" আমি সায়েন্স-এর মধ্যে মেণ্টাল সায়েন্স আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, মেণ্টাল সায়েন্স-এ মাথা পূরিয়া রহিয়াছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইয়া কি থাকিতে পারি? আমি মুখে মুখে মেণ্টাল সায়েন্স বিষয়ে ও লজিক বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে সকল নোট এখনো আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহারও কাহারও নিকট থাকিতে পারে। আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিনজন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির (যিনি পরে মিসেস বি. এল. গুপ্ত হইয়াছিলেন) ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইঁহারা সকলেই তখন বয়স্থা ও জ্ঞানানুরাগিণী, ইঁহাদিগকে পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।

কেশবচন্দ্রের আদেশ ঈশ্বরের আদেশ কিনা। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মতভেদ ব্যতীত আমার প্রতি বিরক্তির আরও একটি কারণ ছিল। আমি কেশববাবুর কোনো কোনো মত লইয়া সর্বদা তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই তর্ক অনেক সময়েই কেশববাবুর সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদেশের মত লইয়া তর্ক হইত। কেশববাবু তাঁহার সমুদয় কার্য যেরূপ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন, এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার মনে ভয় হইত যে, তাঁহার সঙ্গের লোকের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। হয় তাঁহার আদেশ ফর্জ করিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার হাতে আপনাকে দিতে হইবে। আমি কেশব-বাবুকে বলিতাম, "আপনি আদেশ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেই ভাবে কাজ করিয়া যান। আমরা আদেশ বলিয়া লইতেছি কি না, দেখিবেন না।" তিনি আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত। আমি মানব চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতাম। তাঁহাকে বলিতাম, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্বাহ করিয়াছেন। কই,

তিনি তো তাহা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, অন্যে সে ভাবে না লইলে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই ?"

কেশববাবু যখন আশ্রম স্থাপন করিলেন, তখন ইহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য বলিয়া স্থাপন করিলেন। কেবল তাহা নহে, ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং সে ভাবে যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাহাদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ-কেহ প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধিক কি, যত দূর স্মরণ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিলেন না। আমরা সপরিবারে আশ্রমে গেলাম, কিন্তু তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এ আবদ্ধ থাকাতে যাইতে পারিলেন না। তিনি ভয় পাইতে লাগিলেন যে, আশ্রমকে এরূপে 'ঈশ্বরাদেশ' বলিয়া ঘোষণা করিলে সমাজে বিরোধ উৎপন্ন হইবে। আমার বেশ স্মরণ আছে, আমরা বেলঘরিয়া বা কাঁকুড়গাছির উদ্যান ভবনস্থ আশ্রম হইতে আসিয়া কলিকাতার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "কি হে, তোমাদের স্বর্গরাজ্য কত দূর এল ?" যদিও পরে তিনি আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কারণে তিনি সে সময়ে কিছুদিনের জন্য প্রচারকগণের নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রবাবুর প্রতি প্রচারকগণের অপ্রীতি জন্মিবার আর এক প্রকার কারণ ছিল। নগেন্দ্রবাবুর তখন এক প্রকার শিরঃপীড়া ছিল, যাহাতে তিনি সময়-সময় লোকের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না, একাকী-একাকী থাকিতে ভালোবাসিতেন, অথবা নিজের অন্তরঙ্গ কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে থাকিতেন। আশ্রমের উপাসনায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন বটে, কিন্তু অপরাপর অনেক সময়ে প্রচারকগণের সহিত বসিতেন না। তাঁহারা যখন দশজনে কেশববাবুর নিকট বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, তখন হয়তো তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু খ্যাতনামা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিতেছেন। নগেন্দ্রবাবুর আর একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা এই ছিল, যে, যে-কেহ বিরুদ্ধ ভাবে তাহার সমালোচনা করে, তিনি তাহার দিক দিয়া যাইতেন না। আমি দেখিতে লাগিলাম যে, নগেন্দ্রবাবুর সহিত প্রচারক মহাশয়দিগের বিচ্ছেদ দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। আমি অনেক সময় তাঁহাকে বলিতাম, যাঁহাদের সঙ্গে কাজ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ হইতে এরূপ দূরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু বলিলে কি হয়, মানুষের প্রকৃতিতে যাহা আছে, তাহা কি হঠাৎ চলিয়া যায় ?

তিনি যে-একাকী বেড়াইতেন, অনেক সময় গভীর আত্মচিন্তাতে যাপন করিতেন।

একদিনের কথা মনে আছে। একদিন আমরা সকলে কাঁকুড়গাছির বাগানে ভারত আশ্রমে, সায়ংকালীন উপাসনার পর কেশববাবুর সহিত নানা প্রকার কথাবার্তাতে আছি, এমন সময় কেশববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগেন্দ্র কই?" অমনি নগেন্দ্র-বাবুর অনুসন্ধান হইল। জানা গেল যে, তিনি বৈকাল হইতে নিরুদ্দেশ আছেন। রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। আমি তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম, "আপনার খোঁজ হইয়াছিল, আপনি কোথায় ছিলেন?" তিনি বলিলেন, "আজ মনটা বড় খারাপ আছে, তাই তিন-চারি ঘণ্টা মানিকতলার খালের ধরে বেড়াইতেছিলাম ও একটা গান বাঁধিয়া গাইতেছিলাম। এই বলিয়া গানটা গাইয়া আমাকে শুনাইলেন। সেটা এই—

আমি কি বলে প্রার্থনা বল করি আর!
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ, বলব কি আর, কি আর আছে বলিবার।
ওহে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে?
আপনি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার।

আমি শুনিয়া ভাবিলাম, নগেন্দ্রবাবু যে সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে না বসিয়া একলা ছিলেন, সে ভালোই হইয়াছে। কিন্তু প্রচারক বন্ধুগণ সকল সময়ে সেরূপ ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, নগেন্দ্র যখন আমাদের সহিত কাজ করিতে আসিয়াছেন, তখন আমরা যেরূপে বসি দাঁড়াই, তাঁহাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। তাঁহারা দিন-দিন নগেন্দ্রবাবুর উপর চটিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের সহিত আমার বিবাদ হইতে লাগিল। আমি নগেন্দ্রবাবুর পক্ষ হইয়া তাঁহাদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে আলস্যের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

নিয়মতন্ত্র প্রণালী লইয়া মতভেদ। আর একটা বিষয়ে একটু মতভেদ ঘটিল। কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে আসিয়া, অপরাপর কাজের আয়োজনের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে ডাকিয়া একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপাসকদিগকে ডাকিলেই তাঁহারা স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনেক বিষয়ে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। যুবকদলের অনেকে উপাসক মণ্ডলীর কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের জন্য উৎসুক হইলেন। সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু কেশববাবু বোধ হয় তাহা পছন্দ করিলেন না। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই দেখিলাম, উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণকে মধ্যে-মধ্যে

ডাকা রহিত হইল। বৎসরান্তে একবার একটা সম্মিলিত সভার মতো হইত, এই মাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনেক যুবক ব্রাহ্ম-উপাসকগণের ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী গঠনের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমি একজন। নিয়মতন্ত্র প্রণালী মতে কাজ হয়, তাহাও আমরা কয়েকজনে চাহিতেছিলাম। সে আকাঙ্ক্ষাও একবার জাগিয়া আবার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় রহিল।

ভারত আশ্রম ত্যাগ ও হরিনাভি গমন। সুহাসিনীর জন্ম। হরিনাভির স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি, দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্রাহ্মসমাজ। প্রকাশচন্দ্র রায়।

পীড়িত মাতুলের আহ্বান। এই সকল মতভেদের মধ্যে ১৮৭৩ সালের প্রথমে আমার পূজ্যপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পীড়িত হইয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। ত্বরায় পেনসন লইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা হইতে বিদায় লইয়া, বায়ু পরিবর্তনের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সোমপ্রকাশ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রামস্থ সংস্কৃত-ইংরাজী স্কুল, তাঁহার বিষয়, তাঁহার পরিবার-পরিজনের দেখিবার ভার কে নেয়? আমার মাতুলপুত্রদিগের মধ্যে কেহই কাজের লোক ছিল না। বড়মামা আমাকে নিজের চক্ষের উপরে মানুষ করিয়াছিলেন। আমি বাল্যাবধি তাঁহার দৃষ্টান্ত না দেখিলে, ধর্ম ও নীতির ভাব যাহা হৃদয়ে পাইয়াছি, তাহা পাইতাম কি না সন্দেহ। মামা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, এখন তুমি আসিয়া আমার স্কন্ধের সব ভার না লইলে আমি বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাইতে পারি না।

আমি বিপদে পড়িয়া গেলাম। কেশববাবুর অনুরোধে একটা কাজের ভার লইয়াছি, আবার মামার অনুরোধ অপরদিকে। প্রথম দিনে কোনো উত্তর না দিয়া ভাবিতে-ভাবিতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া মনে অনেক চিন্তা করিলাম, নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সহিত অনেক পরামর্শ করিলাম। সকলেই মামার সাহায্যার্থ যাইতে বলিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর কেশববাবুকে গিয়া বলিলাম, "নূতন বৎসর আরম্ভ হইতেছে, এখন মহিলা স্কুলে আমার স্থলে পড়াইবার ভার অপর কাহারও উপর দেওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন। আমাকে আমার মাতুলের সাহায্যের জন্য যাইতে হইবে। তিনি কিছু বলিলেন না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন কি না, তখন বুঝিতে পারিলাম না। পরে বুঝিয়াছি যে, আমার চলিয়া যাওয়া তিনি পছন্দ করেন নাই। আমি প্রচার কার্যে জীবন দিবার জন্য আসিয়া বিষয় কর্মে গেলাম, ইহা তাঁহার ভালো লাগে নাই।

যাহা হউক, আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের সোমপ্রকাশের সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাস্টার, তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড়মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।

দুই-একদিনের মধ্যেই একদিন কেশববাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার দুই পত্নীকে যে ভাবে আশ্রমে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন, যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় ছিল না, কারণ, আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নময়ী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও রাখা হইবে, আমি শনিবারে সেখানে আসিয়া রবিবার তাঁহার সঙ্গে যাপন করিব।

অতঃপর প্রসন্নময়ী আমার সহিত হরিনাভিতে গেলেন। নগেন্দ্রবাবু আশ্রম ছাড়িয়া আর এক স্থানে কতিপয় বন্ধুর সহিত বাসা করিলেন, বিরাজমোহিনী তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। আমি প্রতি শনিবার কলিকাতার আসিয়া রবিবার তাঁহার সঙ্গে যাপন করিতে লাগিলাম।

তখন আমি যে প্রণালীতে কার্য করিব বলিয়া স্থির করিলাম, তাহা এই। বিরাজ-মোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিলেন না দেখিয়া এই স্থির করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন, তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাঁহারা ভিন্ন-ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদনুসারেই কার্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিত কালে বহু বৎসর এই প্রণালীতে কার্য চলিয়াছে।

এই ১৮৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের দিন, হরিনাভিতে আমার তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীর জন্ম হইল।

হরিনাভিতে আমি মহা কার্যের আবর্তের মধ্যে পড়িলাম। প্রথম, মামার স্কুলটির ভার লইয়া দেখি যে, তৎপূর্বে কয়েক বৎসর গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হওয়াতে, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হইয়া স্কুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। ইহার ফল এই হইল যে, আমি নামে হেডমাস্টার রূপে একশত টাকা পাইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহা হইতে সেক্রেটারী রূপে মাসে ৪০।৫০ টাকা অপরাপর শিক্ষকের বেতনের সাহায্যের জন্য দিতে লাগিলাম। ওদিকে, সোমপ্রকাশের কার্যভার প্রধানত আমার উপর পড়িয়া যাওয়াতে সংবাদপত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল। তাহার উপর, মধ্যে মধ্যে বড়মামার তালুক দেখিবার জন্য লবণাম্বু-

পূর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে গিয়া দুই-একদিন বাস করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে আমাকে ম্যালেরিয়াতে ধরিল। ঘন-ঘন জ্বর হইয়া লিভারে বেদনা দাঁড়াইল। লিভারে ব্লিস্টার দিয়া, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিয়া তদুপরি পূর্বোক্ত কার্য সমুদয় চালাইতে লাগিলাম।

গ্রাম সংস্কারের চেষ্টা। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন আমাকে আরও কয়েক প্রকার সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। প্রথম, আমি সোমপ্রকাশের কার্যভার হাতে লইয়াই দেখিতে পাইলাম যে, রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী বেহালা প্রভৃতি গ্রামের সহিত এক মিউনিসিপ্যালিটিতে আবদ্ধ হইয়াছে। তদবধি প্রায় দশ বৎসর কাল হরিনাভি, রাজপুর, চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের প্রজাগণ রীতিমতো মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে, যথাসময়ে ট্যাক্স না দিলে তাহাদের ঘটিবাটি নিলাম হইতেছে, কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের অনেক রাস্তাতে এক মুঠা মাটি পড়ে নাই এমন কি এই দীর্ঘকালে অনেক নরদামা হইতে এক মুঠা মাটি তোলা হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে বেহালা ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানের লোক অধিক হওয়াতে, অধিকাংশ টাকা সেইদিকেই ব্যয় হইতেছে।

ইহা আমার বড় অন্যায় বোধ হইল। আমি এই অবস্থা ঘুচাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া সোমপ্রকাশে লেখনী ধারণ করিলাম, সোমপ্রকাশের বাহিরের পাঠকগণ বিরক্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। কাগজে লিখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, আমি স্কুলগৃহে গ্রামবাসীদিগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিলাম। বহু জনের স্বাক্ষর করাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিলাম। যদিও এই সকল আন্দোলনের ফল হরিনাভি ত্যাগ করিবার পূর্বে আমি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তথাপি সুখের বিষয় এই যে, ইহারই ফলে রাজপুর প্রভৃতি গ্রাম বেহালা হইতে পৃথক হইয়া এক স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি রূপে পরিণত হইয়াছে এবং গ্রামের অবস্থা অনেক ফিরিয়াছে।

আমি এই সময়ে আর এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করি, এবং ঈশ্বর কৃপায় তাহাতেও কৃতকার্য হই। সোমপ্রকাশে লিখিতে আরম্ভ করি যে, রাজপুর প্রভৃতির ন্যায় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত গ্রাম সকলের মধ্যে একটি গবর্ণমেণ্ট চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি থাকা উচিত। আমি হরিনাভিতে থাকিতে থাকিতেই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথম ডাক্তার ও ঔষধের বাক্স আমার নিকট প্রেরিত হয়। আমি ডাক্তার মহাশয়কে ও ঐ ডাক্তারখানাকে হরিনাভির এক ভদ্রলোকের বাহির বাড়িতে স্থাপন করি। পরে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

তৃতীয় এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়। সেটি মামার স্কুলটিকে স্থায়ী ভূমির উপর দণ্ডায়মান করিবার চেষ্টা করা। মামা স্কুলটি স্থাপন করিবার সময় একটি অবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে বোধ হয় ছিল যে স্কুলটি উঁচুদরের স্কুল হইবে। সে জন্য তিনি শিক্ষকদিগের বেতনের হার চড়াইয়া বাঁধিয়াছিলেন। যথা, প্রথম পণ্ডিতের বেতন ৪০্ টাকা। কিন্তু ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, কেহই তৎপূর্বে ঐ উক্ত হারে বেতন পান নাই, হেড পণ্ডিত মহাশয় তৎপূর্বে পাঁচ বৎসর মাসে ২৫্ টাকাই পাইয়া আসিতেছিলেন। এইরূপ অপরেরাও স্কুল প্রতিষ্ঠা কালে নির্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা অনেক কম বেতন পাইতেন। বেতনের হার বড় রাখার ফল এই হইয়াছিল যে, যখনই ছাত্র দত্ত বেতন হইতে কিছু টাকা উদবৃত্ত হইত, তাহা ঐ উচ্চ হারের কুক্ষিতে যাইত। বহুদিন হইতে বেঞ্চ ম্যাপ গ্লোব লাইব্রেরি প্রভৃতির জন্য কিছু ব্যয় করা হইত না। এ সকলের অতীব অভাব ছিল ; অথচ তাহা পূর্ণ হইত না। শিক্ষকদিগের কল্পিত বেতনের হার কমাইয়া আমি স্কুলটির উন্নতি করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম, এবং সর্বাগ্রে আমার বেতন ১০০্ হইতে ৮০্ করিয়া অপরাপর শিক্ষকগণ তৎপূর্বে পাঁচ বৎসর যাহা পাইয়া আসিতেছিলেন তাহাই তাঁহাদের নির্দিষ্ট বেতন বলিয়া স্থির করিবার জন্য ইনস্পেক্টরকে লিখিলাম। শিক্ষকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার মাতার জ্যাঠতুতো ভাই কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তখন স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন, তিনি এই আন্দোলনে প্রধান নেতা হইলেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ-কেহ স্কুল ভাঙিয়া আর এক স্কুল করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিলাম, তাঁহাদিগকে গোপনে বুঝাইলাম, আমার উদ্দেশ্য যে স্কুলটির উন্নতি করা, ইহা ভালো করিয়া দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা থামিলেন না। অবশেষে একদিন ছুটির পরে সমুদয় শিক্ষককে একত্র করিয়া ঘাড় খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলাম। বলিলাম, "যিনি-যিনি স্কুল ছাড়িয়া যাইতে চান ও স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দশ মিনিট সময় দিতেছি। ইহার মধ্যে স্থির করিয়া বলিতে হইবে, তিনি থাকিবেন কি যাইবেন। যদি থাকেন, স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিতে হইবে।" সকলেই নিরুত্তর রহিলেন, দশ মিনিটের পর সকল আন্দোলন থামিয়া গেল। কিন্তু অনেকে মনে-মনে আমার প্রতি বিরক্ত রহিলেন। কি করিব, কর্তব্য বোধে লোকের অপ্রিয় হইতে হইল।

যাত্রাদলের সং স্কুলের শিক্ষক। আর একটি আন্দোলন ইহা অপেক্ষাও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। আমি স্কুলের ভার লইয়া দেখি, স্কুলের কয়েকটি শিক্ষক গ্রামস্থ শখের

যাত্রার দলে সং সাজেন। একজন 'ভগি দিদি' সাজেন, আর একজন আর একটা কি সাজেন। ঐ শখের যাত্রার দলটি কতকগুলি নিষ্কর্মা ধনীসন্তানের কার্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সুরাসক্ত এবং অপরাপর দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত ছিলেন। স্কুলের শিক্ষক দুইটি সেই দলে থাকাতে বালকগণ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, স্কুলের বোর্ডে লিখিয়া রাখিত, "ভগিদিদি! চ'টো না," ইত্যাদি। ইহা আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। আমি এক সার্কুলার জারি করিলাম যে, স্কুলের কোনো শিক্ষক শখের দলের অভিনেতার মধ্যে থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে শিক্ষকতার অনুপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে ঐ দুই শিক্ষক যাত্রার দল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শখের দলের ইয়ারেরা আমার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল।

এই ক্রোধ তাহারা বহুদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া, অবশেষে ১৮৭৪ সালের চৈত্র মাসের শেষে গোষ্ঠযাত্রার সময় সুরার ঝোঁকে সদলে আমার বাড়ি আক্রমণ করিল ও আমার সঙ্গের একটি যুবকের মাথা ফাটাইয়া দিল। যে কারণে তাহারা দাঙ্গা করিতে আসিল, তাহা এই। গোষ্ঠযাত্রার সময় গ্রামের জমিদারবাবুদের বাড়িতে মহাসমারোহে ঐ উৎসব সম্পন্ন হইত, এবং স্কুলের সম্মুখস্থিত রাস্তাতে তাহাদের বাড়ি পর্যন্ত হাট বসিত। আমি স্কুলবাড়ির ভিতর দিকেই সপরিবারে থাকিতাম। ঐ দিন বৈকালে স্কুলের পাঠগৃহে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময়ে সম্মুখের হাট হইতে একটি ছেলে আসিয়া বলিল যে, এক তাশখেলার দোকানদার তাহার এক সহাধ্যায়ীকে তাশের খেলা দেখাইয়া ঠকাইয়া তাহার সমুদয় পয়সা লইয়াছে, ছেলেটি কাঁদিতেছে। ইহা শুনিয়া আমি ঐ তাশখেলার দোকানে গেলাম, এবং ছেলেটিকে প্রতারণা করার জন্য তাশওয়ালাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "এরূপ প্রবঞ্চনার খেলা আইন বিরুদ্ধ, আমি পুলিস ইনস্পেক্টরকে জানাইব।" এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে শুনিলাম, দোকানদার আমার নামে নলিশ করিবার জন্য জমিদারবাবুদের বাড়িতে গেল। তাঁহারা তখন বন্ধুবান্ধব লইয়া মজলিসে বসিয়া আছেন, তাহার মধ্যে এই সংবাদ পাইয়া, বলিতে লাগিলেন, "কি, এত বড় আস্পর্ধা! আমাদের গ্রামে চাকুরী করতে এসে আমাদের কাজের উপর হাত! একবার গিয়ে শোনো তো কি বলেন!" আর কোথায় যায়! অমনি সেই বাড়ির কয়েকটি যুবক লাঠি সোটা লইয়া স্কুলবাড়ির অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা আসিতেছে শুনিয়া আমি আমার নিকটস্থিত একটি ছাত্রকে বাড়ির ভিতরের দিকে একটা তালা লাগাইতে বলিলাম। মনে করিলাম, ভিতরে তালা লাগানো থাকুক, উত্তেজনা থামিয়া গেলে জমিদারবাবুকে সকল কথা ভাঙিয়া বলিব। ছেলেটি তালা দিতে গিয়াছে, ওদিকে আক্রমণকারী দল উপস্থিত। তাহারা লাঠি মারিয়া ছেলেটির মাথা ফাটাইয়া দিল. পরে স্কুলবাড়িতে

প্রবেশ করিল। আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ভয়ে গিয়া তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইলাম। তাহারা আমাকে মারিল না। একজন আসিয়া তাহাদের কানে-কানে কি বলিল, তাহারা একে-একে বাহির হইয়া গেল। আদালতে মোকদ্দমা তুলিলে ইহাদের বিশেষ শাস্তি হইত, কিন্তু তাহা করা হইল না। ভালোই, কারণ ইহার পর জমিদারবাবু আমার প্রতি ও স্কুলের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ। এই সকল কাজের মধ্যে হরিনাভিতে পদার্পণ করিয়াই আমি হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করি। কতকগুলি যুবক এই সময় হইতে আকৃষ্ট হইয়া সমাজে যোগ দেন। আমার অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য কেশবচন্দ্র সেন উভয়েই হরিনাভি সমাজের উৎসবে গিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। এই সময়ে আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায়কে আমি স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার নিযুক্ত করি। তিনি আমার সহিত স্কুলবাটীতেই থাকিতেন। প্রসন্নময়ী তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় দেখিতেন। প্রকাশের ন্যায় ব্যাকুলাত্মা আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমাদের পারিবারিক উপাসনা হইত। তদ্ভিন্ন প্রকাশ ও আমি ধর্ম-জীবনের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ যাপন করিতাম। ফলতঃ, তাঁহার সহবাসে আমি ও প্রসন্নময়ী এই সময়ে বিশেষ উপকৃত হইলাম। তদবধি প্রকাশচন্দ্রের সহিত এরূপ গাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল যে, তাহা পরবর্তী সমাজ বিপ্লবেও নষ্ট হয় নাই। এই সময়ে প্রকাশের পত্নী অঘোরকামিনী কিছুদিন হরিনাভিতে গিয়া আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও উপকৃত হইলাম।

পতিতা নারীর কন্যা লক্ষ্মীমণি। এই হরিনাভি বাসকালের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে লক্ষ্মীমণি আমার আশ্রয়ে আসে। লক্ষ্মীমণি ঢাকা শহরের একটি পতিতা নারীর কন্যা। তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিল। লক্ষ্মীমণি ঐ স্কুলে একজন খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষয়িত্রী ও এক ব্রাহ্ম শিক্ষকের সংস্রবে আসে। ইঁহাদের সংস্রবে আসিয়া, তাহার মাতা যে জীবন যাপন করিতেছিল তাহার প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মে। লক্ষ্মীর বয়ঃক্রম যখন ১৩।১৪ হইল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিজ বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার জননী প্রথমে প্ররোচনা অনুরোধ প্রভৃতি করিয়া অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বল প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেচারিকে একটা পুরুষের সঙ্গে একঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করিয়া রাখিল। আঁচড়, কামড়, হাত-পা ছোঁড়ার দ্বারা যত দূর হয় লক্ষ্মী সমুদয় করিয়া সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিল। সন্ধ্যার সময় একবার দ্বার খোলা পাইয়া লক্ষ্মী সরিয়া পড়িল, এবং একেবারে সেই ব্রাহ্ম শিক্ষকের নিকট

গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লইয়া একটি ব্রাহ্ম পরিবারে রাখিলেন। লক্ষ্মীর মাতা দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কন্যা লাভের জন্য আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে একজন ইংরাজ বিচারকের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া লক্ষ্মীকে মাতার হাত হইতে লইয়া সেই ব্রাহ্ম অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

লক্ষ্মীর মাতা মোকদ্দমাতে হারিয়া আর এক প্রকারে লক্ষ্মীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল, বারণ করিলে শুনিত না। এইরূপে, যে গৃহস্থের গৃহে সে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে এক প্রকার অস্থির করিয়া তুলিল। তখন উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ লক্ষ্মীকে নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিলেন। আনিয়া, রাখিবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া, হরিনাভিতে আমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি প্রসন্নময়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে, গণেশসুন্দরী বা মনোমোহিনী তৎপূর্বেই বিবাহিতা হইয়া আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরে একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের সহিত লক্ষ্মীমণির বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বেচারি অধিক দিন বিবাহিত জীবনের সুখ ভোগ করিতে পারে নাই। বিবাহের পর তাহারা উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়িতে গিয়া বাস করিয়াছিল। সেখানে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেড মাস্টার। ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নানা আন্দোলন। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়। 'সমদর্শী'। রামকৃষ্ণ পরমহংস। ব্রহ্মময়ী। নগেন্দ্রবাবু। হেয়ার স্কুলের কার্যপ্রাপ্তি ও ভবানীপুর ত্যাগ।

সোমপ্রকাশ পত্রিকার উন্নতি। আমি যখন হরিনাভিতে বাস করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব; তাহার প্রকোপ তখন অত্যন্ত অধিক। সেখানে যাইবার কিছুদিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরে, ও বার-বার জ্বর হইয়া আমাকে বড় কাহিল করিয়া ফেলে। তাহার উপরে পূর্বোক্ত সকল কারণে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তাহাতে দেড় বৎসরের মধ্যেই আমার শরীর ভাঙিয়া গেল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার শুভানুধ্যায়ী তৎকালীন স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাকে ভবানীপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্বন

স্কুলের হেডমাস্টার করিয়া আনিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের শেষ ভাগে ঐ স্কুলে আসিলাম।

আমার স্বগ্রামবাসী ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসম ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার স্থানে হরিনাভির হেডমাস্টার হইয়া গেলেন। বিরাজমোহিনী তাঁহাদের সহিত হরিনাভিতে গিয়া তাঁহাদের পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। প্রসন্নময়ী লক্ষ্মীমণি সহ আমার সঙ্গে ভবানীপুরে আসিলেন। আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপে কিছুদিন গেল। অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফরমা ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।

এতদ্ভিন্ন ভবানীপুরে আসিয়াই কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলাম। আমার নিজ ভবনেই এই সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইত। আমাকেই অধিকাংশ দিন আচার্যের কার্য করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কোন-কোন বন্ধুকে আনিয়া উপাসনা করাইতাম।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের যে ভার ছিল, তাহা আমি হরিনাভিতে থাকিবার সময়েও রাখিয়াছিলাম, এবং অনেক সময়ে জলে ঝড়ে দুর্যোগে হরিনাভি হইতে আসিয়া সম্পন্ন করিতাম ; তাহা এই সময়ে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রতি অর্পণ করি। তিনি ইহার পর অনেক দিন ঐ কার্য করিয়াছিলেন।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষার আন্দোলন। আমার হরিনাভি বাস কালে, কলিকাতাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নানা আন্দোলন চলিতেছিল। ভবানীপুরে আসিয়া আমি সেই আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া গেলাম। ইহার কোন-কোন আন্দোলন আমি ভারত আশ্রমে থাকিবার সময়েই প্রথম উঠিয়াছিল। মন্দিরে পরদার বাহিরে মেয়েদের বসা ও মেয়েদের শিক্ষা, এই দুই বিষয়ে কেশববাবুর সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি একদল ব্রাহ্মের কিরূপ মতভেদ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর দল ভারত আশ্রমের পূর্বোক্ত মহিলা বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে আর একটি স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথম তাঁহারা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিলাত হইতে নবাগতা কুমারী একরয়েড ইহার তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। কয়েক বৎসরের

মধ্যে কুমারী একরয়েড বিবাহিতা হওয়াতে, ঐ বিদ্যালয় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামে পরিবর্তিত হইয়া কিছুদিন পরে বেথুন কলেজের সহিত মিলিত হয়।

বালিগঞ্জে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া এই স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভায়া নিজে একজন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন, তিনি দিন-রাত্রি বিশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলের উন্নতি সাধনে দেহ-মন নিয়োগ করিলেন।

আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম যে ঐ স্কুল চলিতেছে। গাঙ্গুলী ভায়া ছাড়িবার লোক ছিলেন না। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতাম। এমন সাচ্চা সত্যানুরাগী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, গাঙ্গুলী ভায়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নেতা ছিলেন। আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাবটা তাঁহার মতো না লই, স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় ইহা অন্তরের সহিত চাহিতাম। আমি ভবানীপুরে আসিলেই গাঙ্গুলী ভায়া আমাকে ছিনা জোঁকের মতো ধরিয়া বসিলেন যে, আমার কন্যা হেমলতাকে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে দিতেই হইবে। সুতরাং হেমলতাকে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে দিলাম।

প্রচারকগণের কার্যের বিচার হইতে পারে কিনা? এই সময়ে আর এক আন্দোলন উঠিল। আমার হরিনাভি বাস কালের মধ্যে কেশববাবুর প্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রমে এক ঘটনা ঘটে। ঐ সময়ে আমার স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্ম ভ্রাতা হরনাথ বসু মহাশয় সপরিবারে ভারত আশ্রমে থাকিতেন। হরনাথবাবু মন-খোলা, মহোৎসাহী মানুষ ছিলেন। আয় অল্প ও ব্যয় বহু হওয়াতে তাঁহার আয়-ব্যয়ের সমতা কখনোই ছিল না। তিনি সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু দেনদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষমহাশয় পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আশ্রম হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে নিজের শ্বশুরবাড়ি প্রেরণ করা স্থির করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় আশ্রমের দেনা দিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী বিনোদিনী পুত্র-কন্যা সহ গাড়ি করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় আশ্রমের অধ্যক্ষমহাশয়ের আদেশ ক্রমে ভৃত্যেরা আসিয়া দ্বারে গাড়ি অবরোধ করিল, দেনা শোধ না করিলে গাড়ি যাইতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং আপনার গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

হরনাথবাবু উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনীর নাম দিয়া এই ঘটনার বিবরণ 'সাপ্তাহিক সমাচার' নামক এক ব্রাহ্ম বিরোধী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ করিলেন। দেশীয় সংবাদপত্র সকল একে চায়, আরে পায়। তাহারা একেবারে আশ্রমের ও কেশববাবুর দলের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন তুলিয়া দিল। সময় বুঝিয়া অগ্রসর দলের এক ব্রাহ্মযুবক আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক ঘোর কুৎসাপূর্ণ পত্র

সাপ্তাহিক সমাচারে প্রকাশ করিলেন। তখন কেশববাবু বাধ্য হইয়া সাপ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, সে মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তি হইল। এই বিবাদের সময় আমি হরনাথবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে সংবাদপত্রে যাওয়ার জন্য অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম, এবং মোকদ্দমার বিষয়ে কেশববাবুর পক্ষে ছিলাম।

কিন্তু এই আন্দোলন হইতে আর এক আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। বিনোদিনীকে দ্বারাবরোধ করিয়া অপমান করাতে যুবক ব্রাহ্মদল বিশেষত গাঙ্গুলী ভায়ার দল, আশ্রমের প্রতি চটিয়া গেলেন, এবং এই কার্যের বিচারের জন্য কেশববাবুকে সভা আহ্বানের অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে, প্রচারকগণ ঈশ্বর নিযুক্ত, ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের বিচারক হইতে পারেন না। ইহাতে সমাজের কার্যপ্রণালী ও শাসন সম্বন্ধে এক নূতন আন্দোলন উঠিয়া পড়িল।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ দল এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম, কেশববাবুর মত ও কার্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি আসিবামাত্র ইঁহারা আমাকে আপনাদের মধ্যে লইলেন, কারণ, সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন বিষয়ে এবং কেশববাবুর কোনো কোনো মতের প্রতিবাদ বিষয়ে, ইঁহাদের সহিত পূর্ব হইতে আমার মতের ঐক্য ছিল।

কেশবচন্দ্রের মতের সমালোচনা। ইহার পর আমার ভবনে এবং অপরাপর স্থানে এই প্রতিবাদী দলের ঘন-ঘন মিটিং হইতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিবার জন্য সময় ঘোষণা করা স্থির হইল। এই সময় ঘোষণা দুই প্রকারে আরম্ভ হইল। প্রথমে, কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী নামক স্কুলের গৃহে কেশববাবুর বিরুদ্ধে দুইটি বক্তৃতা হইল। একটি আমি দিলাম, অপরটি আমার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিলেন।

আমার বক্তৃতার সমুদয় কথা স্মরণ নাই। আমি প্রধানত কেশববাবুর কতকগুলি মতের সমালোচনা করিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে এইমাত্র স্মরণ আছে যে, রবিবাসরীয় মিরারে কেশববাবু তাহার উল্লেখ করিয়া তাহার উদার ভাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তাঁহাদের বড়ই অপ্রীতিকর হইল। নগেন্দ্রবাবু সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেশব-বাবুকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন যেমন সাধারণ তন্ত্রের পক্ষে হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, সাধারণ তন্ত্রের নিশান লইয়া কার্য করিয়া, অবশেষে সম্রাটের মুকুট নিজ মস্তকে লইয়াছিলেন, তেমনি কেশববাবু ব্রাহ্ম

প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিয়া আদি সমাজের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যথেচ্ছাচারী রাজা হইয়া বসিয়াছেন। এই কথাতে কেশববাবুর প্রচারক দল আমাদের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন।

মাসিক 'সমদর্শী'। একদিকে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, অপর দিকে ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাস হইতে 'সমদর্শী' নামক দ্বিভাষী এক মাসিক পত্রিকা বাহির হইল। বন্ধুগণ আমাকে তাহার সম্পাদক করিলেন। সুতরাং সাধারণের চক্ষে আমি এই দলের নেতা হইয়া দাঁড়াইলাম। সমদর্শীতে আমরা কেশববাবুর কোনো কোনো মতের প্রতিবাদ করিতাম ও স্বাধীন ভাবে ধর্ম তত্ত্বের আলোচনা করিতাম। সমদর্শী কিছুদিন চলিয়াছিল, পরে বন্ধ হইয়া গেল ; কিন্তু সমদর্শী দল রহিয়া গেল, এবং সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা চলিতে লাগিল।

আর একটি নিরাশ্রয় মেয়ে। ভবানীপুর বাস কালের কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় ঘটনা, একদিন আমি স্কুল হইতে আসিয়া দেখি, একটি নিরাশ্রয় মেয়ে তাহার বোঁচকা-বুঁচকি সহ আসিয়া আমার ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার আর যাইবার স্থান নাই, সে আশ্রয় চায়। সে নিজের জীবনের একটি ইতিবৃত্ত বলিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। মহা মুশকিল, পুরুষ নয় যে অন্য এক স্থান দেখিতে বলিব। মেয়েছেলে, রাস্তায় দাঁড়াইতে বলিতে পারি না। বিশেষত প্রসন্নময়ী অতি দয়ালু ছিলেন, নিরাশ্রয় দীন দরিদ্রের প্রতি তাঁহার দয়া দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। মেয়েটি আসিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে, আর যায় কোথায় ? অমনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। অগ্রে ছিল লক্ষ্মীমণি, এখন আসিল এই মেয়ে, তাঁহার নিজের এক পুত্র ও চারি কন্যা বাদে আর দুইটি কন্যা বাড়িল। মেয়েটি প্রসন্নময়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গেল।

খ্রীষ্টীয় হাই চর্চের সাহিত্য পাঠ। ভবানীপুর বাস কালের আর দুইটি স্মরণীয় বিষয় আছে। প্রথম, এই সময় একজন খ্রীষ্টীয় পাদরীর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা হয়। তিনি হাই চর্চের বড় গোঁড়া ছিলেন। আমি তাঁহার ভবনে অনেক সময় যাপন করিতাম। তাঁহার প্রবোচনায় আমি ঐ সময় হাই চর্চের অনেক পুস্তক পড়ি। তাহার মধ্যে জন হেনরী নিউম্যানের একখানি গ্রন্থ ('এ্যাপোলোজিয়া প্রো ভিটা সুয়া') বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমি বড়ই উপকৃত হই। দুই-তিন মাস তাহার প্রভাব আমার মনে জাগরূক ছিল। নিউম্যান কিরূপে সত্যানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া ভ্রমে গিয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে বিষাদ মিশ্রিত এক আশ্চর্যের ভাব হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাহত যোগ। এইরূপে একদিকে যেমন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ও খ্রীষ্টীয় সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপরদিকে এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমাদের ভবানীপুর সমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে-মধ্যে শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীর মন্দিরে একজন পূজারি ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটি ধর্ম সাধনের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি, এমন সময় মিরার কাগজে দেখিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালোবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনো মানুষ ধর্ম সাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না, জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারি ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্ম সাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন, সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি, এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি; এমন কি, অনেকদিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

সে যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক, রূপ ভিন্ন-ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায়-কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম, তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, "মশাই, এই আমার একটি খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন," অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, "যীশু খ্রীষ্টের চরণে আমার শত-শত প্রণাম।" আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?"

উত্তর। কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি বলিলেন, ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মতো?

রামকৃষ্ণ। হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধু। আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ। সে কেমন তা জানো? আমি শুনেছি, কোনো কোনো স্থানে সমুদ্রে জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোনো বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোনো বিশেষ কারণে কোনো এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মতো হল। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি, সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে, আমাকে অনেকদিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।

বন্ধুপত্নী ব্রহ্মময়ী। এ সময়ের আর একটি স্মরণীয় বিষয়, আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর ভালোবাসা, ও তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ক্লেশ। দুর্গামোহনবাবু এ সময় ভবানীপুরের সন্নিকটে বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহার ভবনে সর্বদা যাইতাম। ব্রহ্মময়ী আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন, তিনি আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। তাঁহার সেই সরল পবিত্রতা মাখা মুখখানি যেন স্মৃতিতে জাগিতেছে। প্রসন্নময়ীর ন্যায়, তাঁহারও সন্তানের ক্ষুধা যেন নিজ সন্তান দিয়া মিটিত না। তিনিও কতকগুলি নিরাশ্রয় বালিকাকে নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছিলেন।

ব্রহ্মময়ী আমার সর্ববিধ সদনুষ্ঠানের উৎসাহদায়িনী ছিলেন। তাহার একটি নিদর্শন মনে আছে। একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শিতিকণ্ঠ মল্লিক ও আমি পরামর্শ করিলাম যে, ভবানীপুরে একটি লাইব্রেরি ও পাঠাগার করিলে ভালো হয়। এই পরামর্শ করিয়া আমরা একদিন দুর্গামোহনবাবুর নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে গেলাম। দুর্গামোহনবাবু অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক বাদবিতণ্ডা চলিল। আমি বলিলাম, "আপনার নিকট হইতে যদি কিছু টাকা আদায় না করি, তবে আমার নাম শিবনাথ শাস্ত্রী

নয়।" তিনি বলিলেন, "আমার নিকট হতে যদি কিছু আদায় করতে পার তবে আমার নাম দুর্গামোহন দাস নয়।" ইহার পর শিতিবাবুর সহিত তাঁহার তর্ক বাধিল। আমি ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়া একেবারে উপরতলায় ব্রহ্মময়ীর নিকট গেলাম। প্রস্তাবটি বেশ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "জ্ঞানের চর্চা বাড়ে, সে তো ভালোই। আপনারা কি মেয়েদের পড়বার মতো বই রাখবেন? অল্প কিছু জমা দিয়ে ভদ্রলোকের মেয়েরা কি ভালো ভালো বাংলা বই নিয়ে পড়তে পারবে?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তা পারবে।"

ব্রহ্মময়ী। তবে আমি এককালীন ৫০ টাকা, ও মাসে মাসে ৪ টাকা করে দেব।

আমি বলিলাম, "তবে এই কাগজে নামটা স্বাক্ষর করে দিন।"

এইরূপে একটা কাগজে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিয়া তাহাতে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করাইয়া, নিচের তলায় গিয়া দুর্গামোহনবাবুর কাছে কাগজখানা ধরিলাম। দুর্গা-মোহনবাবু ব্রহ্মময়ীর স্বাক্ষরটা দেখিয়া বলিলেন, "ও রাস্‌কেল, এই জন্যে তোমার এত জোর? তুমি আমার কাছে হেরে বিলেতে আপীল করবে ভেবে এসেছিলে?" অমনি একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। দুর্গামোহনবাবু উপরে ব্রহ্মময়ীকে বলিলেন, "ওগো তুমি আমাকে না জিজ্ঞেসা করে এই হতভাগাদের কোনো কথা কানে নিয়ো না। এই যে শ্রীহস্তে স্বাক্ষর করেছ, এখন আমার টাকা না দিয়ে পার নাই।"

ব্রহ্মময়ী বলিলেন, "বেশ তো, ওঁরা তো ভালো কাজ করতে যাচ্ছেন। মেয়েদের ব্যবহারের মতো একটা লাইব্রেরি হয়, সে তো ভালোই।"

ব্রহ্মময়ীর আমার প্রতি ভালোবাসার একটি নিদর্শন মনে আছে। একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষ দিকে ছেলেরা প্রসন্নময়ীর চুল বাঁধিবার আয়নাখানা ভাঙিয়া ফেলিল। প্রসন্নময়ী এ কথা আর আমাকে জানাইলেন না। ভাবিলেন, মাসের শেষ কয়টা দিন কোন প্রকারে চালাইবেন, পর মাসের প্রথমে আয়না কেনা হইবে। ইতিমধ্যে একদিন ব্রহ্মময়ী অপরাহ্নে বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকট দাঁড়াইয়া জলে মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হেমের মা, ও কি! জলের জালার কাছে কি করছ?"

প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, "ওগো, আয়নখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে। ওঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ওঁকে জানাইনি। মাস গেলে কিনব ভেবে জালার জলে মুখ দেখে বাঁধছি।"

ব্রহ্মময়ী (হাসিয়া)। ও মা, এ তো কখনো শুনিনি!

প্রসন্নময়ী। দেখলেন, কেমন একটা নূতন বিষয় দেখালাম।

দুইজনে এই লইয়া হাসাহাসি হইতেছে, এমন সময় আমি স্কুল হইতে আসিয়া উপস্থিত। আমিও এই কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলাম। প্রসন্নময়ীকে বলিলাম, "তোমার মতো স্ত্রী নিয়ে ঘর করা কিছুই কষ্টকর নয়, বেশ বুদ্ধি বার করেছ তো! যা হোক, আমাকে বললে আমি আয়না এনে দিতে পারতাম।"

প্রসন্নময়ী। তোমার টাকার টানাটানি যাচ্ছে কি না, তাই বলিনি।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্রহ্মময়ী চলিয়া গেলেন। আমরা ভাবিলাম তিনি বাড়ি গেলেন। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই এক প্রকাণ্ড আয়না লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, "এটি আমার উপহার, নিতেই হবে।" এমন ভাবে, এমন আগ্রহের সহিত এ কথা বলিলেন যে, আমরা আর 'না' বলিতে পারিলাম না, মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। পরে জানিলাম, আমাদের বাড়ি হইতে আর বাড়িতে যান নাই, একেবারে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে গিয়া, এক জানা দোকান হইতে আয়নাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন।

ব্রহ্মময়ীর জন্য দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি আমার জুড়াইবার স্থান ছিল। সপ্তাহের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া ব্রহ্মময়ীর কাছে যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, বসিবার ঘর চেয়ার কৌচ টেবিল প্রভৃতি দিয়া সুন্দর রূপে সাজানো, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি মেজের উপরে মাটিতে বসিয়া সমাগত কয়েকটি মেয়েকে পাশে বসাইয়া গল্প করিতেছেন। একদিনকার একটি ঘটনা বলি। একদিন একটি মেয়ে গল্পচ্ছলে বলিলেন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বেশ লিচু উঠিয়াছে, তাঁহারা আনাইয়া খাইয়াছেন। ইহার পর কথাবার্তার মধ্যে ব্রহ্মময়ী একবার উঠিয়া গিয়াছিলেন, ত্বরায় আসিলেন। তৎপরে আবার কথায় বার্তায় হাসাহাসিতে সময় যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে বড় বড় লিচু আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মময়ী মেয়েদিগকে বলিলেন, "খাও, লিচু খাও।" ইহা লইয়া হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

তাঁহার বাড়িতে পদার্পণ করিলেই তিনি তাঁহার আশ্রিতা মেয়েদের কাহার জন্য কি করা কর্তব্য, আমার সঙ্গে সেই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইতেন। অধিকাংশ দিন সন্ধ্যার সময় নিজের হাতে আমাকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না।

এই ব্রহ্মময়ী ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলেই, বিশেষত আমি, মর্মাহত হইলাম। তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তাঁহার এই সকল সদাশয়তার স্মৃতি আমার মনে জাগিতে লাগিল এবং আমাকে শোকার্ত করিতে লাগিল। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর আমরা একমাস কাল প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, তাঁহার ভবনে মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ

করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি উপাসনার অনুকূল অনেকগুলি শোকসূচক সঙ্গীত বাঁধিয়াছিলাম। তাহার অনেকগুলি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মময়ীর শ্রাদ্ধবাসরে দুর্গামোহন-বাবু বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। আমাদের ন্যায় কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যাঁহারা ব্রহ্মময়ীকে ভালোবাসিতেন এবং তাঁহার পীড়ার মধ্যে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই লইয়া উপাসনা করেন। কিন্তু উপাসনান্তে চক্ষু খুলিয়া দেখি, অনিমন্ত্রিত হইয়াও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া উপাসনাতে যোগ দিতেছেন। ব্রহ্মময়ীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

আমার ভবানীপুরে বাস কালে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র সেনের সহিত একযোগে কার্য করিবেন বলিয়া, কৃষ্ণনগরের কর্ম ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া কেশববাবুর ভারত আশ্রমে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কেশববাবুর ও তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের সহিত মতভেদ ঘটিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত কিছুদিন স্বতন্ত্র বাসায় থাকিলেন, কিন্তু অতি কষ্টে তাঁহার দিন নির্বাহ হইতে লাগিল। হরিনাভিতে বাস কালে আমি আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে তাঁহাদের সঙ্গে রাখিয়াছিলাম, এবং প্রতি শনিবার সেখানে আসিতাম। আমি যথাসাধ্য নগেন্দ্রবাবুর ব্যয়ের সাহায্য করিতাম, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নিবারণ হইত না। তৎপরে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আসিলাম, তখন বিরাজমোহিনীকে হরিনাভিতে সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের নিকটে রাখিয়া, নগেন্দ্রবাবুকে সপরিবারে আমার ভবানীপুরের বাসায় আনিয়া রাখিলাম এবং তাঁহার একটি সন্তান জন্মিল। কিছুদিন পরে নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় গেলেন।

হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল হইতে আমার উৎসাহদাতা ও সহায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখুয্যে মহাশয় আমাকে হেয়ার স্কুলে আনিলেন। ১২০্ টাকা বেতনে হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ও ট্রানস্লেশন মাস্টারের নূতন পদ সৃষ্টি হইল, সেই পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাধিকাবাবুর পরামর্শে উড্রো সাহেব আমাকে উক্ত পদ দিলেন। শুনিলাম সাটক্লিফ সাহেব অন্য কাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা রহিত করিয়া ডিরেক্টর উড্রো সাহেব আমাকে এই পদ দিলেন। পূর্বে উড্রো সাহেবের সঙ্গে যে আমার ঝগড়া হইয়াছিল এবং উড্রো সাহেব আমার প্রতি চটিয়া আছেন, রাধিকাবাবু তাহা জানিতেন। অনুমান করি, সদাশয় উড্রো সাহেবের তাহা মনে ছিল না, অথবা রাধিকাপ্রসন্নবাবু কৌশল-

ক্রমে সে বিরোধের কথা পশ্চাতে রাখিয়া, আমার প্রশংসা করিয়া উড্রো সাহেবের সম্মতি লইয়াছিলেন। যাহা হউক, উড্রো সাহেব স্যাটক্লিফের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে হেয়ার স্কুলে বসাইলেন।

আমি বোধ হয় ১৮৭৬ সালের প্রারম্ভে হেয়ার স্কুলে আসি। কিছুদিন ভবানীপুর হইতে গতায়াত করিয়াছিলাম। অবশেষে আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পশ্চিম হইতে সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভবানীপুরে তাঁহার সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেসের ভার লইয়া বসিলেন। আমি তখন সপরিবারে কলিকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটে এক বাড়িতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তনের দ্বিবিধ চেষ্টা। যুবকদলের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব হ্রাস। থাকমণি। খ্রীষ্টীয়া যুবতী। হরিনাভির উৎসবের পর গুরুতর পীড়া। মুঙ্গেরে কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু। 'পুষ্পমালা' প্রকাশ।

আমি কলিকাতাতে উঠিয়া আসিলে আমাদের সমদর্শী দল আরও জমাট হইল। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত করিবার চেষ্টাও দুই প্রকারে চলিতে লাগিল। প্রথম, ভারতীয় ব্রহ্মমন্দিরটি ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিবার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রতিনিধি সভা স্থাপনের চেষ্টা করা। কেশববাবু ব্রাহ্ম সাধারণের বা উপাসকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করা বন্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরা সর্বদা এ আন্দোলন করিবার সুবিধা পাইতাম না। বৎসরের মধ্যে একবার উৎসবের সময় ব্রাহ্মদিগের যে সম্মিলিত সভা হইত, তাহাতে আমরা ট্রষ্টী হস্তে মন্দির অর্পণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতাম। একবার কেশববাবু এই বলিয়া আমাদের প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন যে, মন্দিরের দেনা আছে, দেনা থাকিতে উহা ট্রষ্টী হস্তে অর্পণ করা যায় না। দ্বিতীয়বার আমরা ঋণশোধের জন্য সময় নির্দেশ করিয়া কয়েক ব্যক্তির প্রতি ভার দিলাম। তৃতীয়বার আমরা কয়েকজন দেনার ভার লইতে চাহিলাম। কোনো ক্রমেই কেশববাবুকে এ কার্যে রাজি করিতে পারা গেল না। আনন্দমোহন বসু মহাশয় যদিও সমদর্শী দলে যোগ দেন নাই, একটু দূরে দূরেই ছিলেন, তথাপি তিনি এ বিষয়ের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতেন। মন্দিরটি যাহাতে ট্রষ্টী হস্তে যায়, তাহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং কেশববাবু এত আপত্তি করাতে তিনি বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

একদিকে এই চেষ্টা চলিল, অপরদিকে ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা নামে একটি সভা গঠনের চেষ্টা চলিল। আমরা প্রস্তাবকর্তা, কিন্তু কেশববাবু তাঁহাতে যোগ দিতে

চাহিলেন। একটি কমিটি নিযুক্ত হইল, তাহাতে তিনি নাম দিলেন। কতকগুলি নিয়মাবলীও প্রণয়ন করা হইল।

কেশবচন্দ্র বনাম ব্রাহ্ম যুবক দল। এই সকল বিবাদের মধ্যে কেশববাবুর ভাব দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইতে লাগিলাম। তিনি সমদর্শী দলকে লক্ষ্য করিয়া রবিবাসরীয় মিরারে স্কেপটিক্‌স্‌, সেকুলারিস্টস্‌, আনবিলীভার্স, প্রভৃতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি দুঃখিত হইয়া ঐ মিরারে ইহার প্রতিবাদ করিলাম।

অতঃপর সংবাদপত্রের এই সকল উক্তি প্রত্যুক্তি, সমদর্শীর লেখা, ও যুবক ব্রাহ্ম-দলের মধ্যে কেশববাবুর আদর্শ সম্বন্ধে নানা আলোচনা উপহাস বিদ্রূপ, প্রভৃতির দ্বারা কেশববাবুর অনুগত প্রবীণ ব্রাহ্মদল ও যুবক ব্রাহ্মদলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন-দিন বাড়িতে লাগিল।

এ বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে কেশববাবু বৈরাগ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে বৈরাগ্য কিরূপ তাহা একটু বলা ভালো। তিনি নিজের ত্রিতল ভবনের ছাদে একটি খোলার ঘর বাঁধিয়া নিজে রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। আহারের যে নিয়ম ছিল তাহার ব্যতিক্রম হইল না, কেবল জল পানের সময় ধাতুনির্মিত গ্লাসের পরিবর্তে মাটির গ্লাস ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঝুলি লইয়া নিজের ভবনে ভিক্ষা মাঙ্গিতে লাগিলেন, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি প্রচারক মহাশয়দিগের কেহ-কেহ রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই কোন্নগরের সন্নিকটে একটি বাগান লইয়া কেশববাবু তাহার 'সাধন কানন' নাম রাখিলেন, এবং নিজে প্রচারক দলের সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাওয়া, জল তোলা, বাগানের মাটি কাটা প্রভৃতি বৈরাগ্য আচরণ পূর্ণ মাত্রায় চলিতে লাগিল। তাহা লইয়া কলিকাতার যুবক ব্রাহ্মদলে খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

ফলতঃ, ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই যুবকদলের উপর কেশববাবুর প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। ব্রাহ্মযুবকগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের সহিত বিবাদ করিয়া ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা গঠন পূর্বক ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমশ তাঁহার নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। তিনি এখন হয়তো মনে করিতেছেন যে, ধর্মসমাজের কার্যে সাধারণের হাত না থাকিয়া ঈশ্বর প্রেরিত মহাজনের হাত থাকা কর্তব্য, এই কারণে তিনি সমাজের কার্যে অপরের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে দিতে চান না, নিজে সর্বময় কর্তা হইয়া থাকিতে চান। এই সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল

হওয়াতে যুবকগণ তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে লাগিলেন। আমাদের মনের উপরে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে যেন হ্রাস হইতে লাগিল।

ভারত সভা স্থাপন। যখন ব্রাহ্মসমাজে এই সকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনো রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা অবশ্যক। আমাদের তিনজনের কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহনবাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইলে। মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে এই পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কার্যান্তরে অন্যত্র ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহনবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিতাম।

যখন একটা সভা স্থাপন এক প্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন।

এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দ-মোহনবাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। সেদিনকার কথা এই মনে আছে যে, সেদিন সুরেনবাবুর একটি পুত্রসন্তান মারা যায়, তিনি তৎসত্ত্বেও আসিয়া সভা স্থাপনে সাহায্য করিলেন। আনন্দমোহনবাবু সম্পাদক, সুরেনবাবু সহ-সম্পাদক আমরা কয়েকজন কমিটির সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত সভা বসিল। আমরা ৯৩নং কলেজ স্ট্রীটের ঘর ভাড়া করিয়া ভারত সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপিস ঘরের অবস্থা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুরসিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত 'ভারত উদ্ধার' কাব্যে লিখিলেন, "কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেঁড়ে।" বাস্তবিক, উহার দশা ঐ প্রকারই ছিল।

এই ৯৩নং কলেজ স্ট্রীট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধু থাকিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তখন ভারত সভার ঘরে কমিটির সম্মতিক্রমে সমদর্শী দলেরও বৈঠক চলিত। এখানে থাকিবার সময়ই আমি বিষয়কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আত্মোৎসর্গ করি। যে চিরস্মরণীয় রাত্রে কেশববাবুর নিকট প্রেতিবাদ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব নির্ধারণ হয়, সে রাত্রে এই ভারত সভার গৃহেই আমাদের বৈঠক হইয়াছিল। বলিতে কি, ভারত সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। একই লোক দুদিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্য চলিয়াছিল।

পাঁচ বন্ধু। এদিকে আমি, কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, এই পাঁচজন বন্ধু একত্র হইয়া ধর্মসাধনের জন্য একটিক্ষুদ্র দল করিলাম। আমরা পাঁচজনে একত্র বসিতাম, প্রাণ খুলিয়া ধর্ম বিষয়ে কথা বার্তা কহিতাম, নানা স্থানে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতাম। মধ্যে মধ্যে ধর্মোপদেশের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাইতাম। তিনি আমাদের নাম রাখিলেন 'পঞ্চ প্রদীপ'। একদিন বলিলেন, লোক পঞ্চ প্রদীপে যেমন দেবতার আরতি করে, তেমনি তোমরা 'পঞ্চ প্রদীপে' ঈশ্বরের আরতি করিতেছ। নামটি আমাদের বড় ভালো লাগিল। আমরা আপনাদের মধ্যে আমাদের সম্মিলনকে পঞ্চ প্রদীপের সম্মিলন বলিতে লাগিলাম।

আর একটি পতিতা নারী থাকমণি। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আর দুইটি ঘটনা আছে। আমি যে লক্ষ্মীমণিকে স্বীয় ভবনে আশ্রয়দান করিয়াছিলাম সে সংবাদ বোধ করি কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছিল। এই দুইটি ঘটনাই পরোক্ষ ভাবে সে-সংবাদের সহিত জড়িত।

একদিন আমার বন্ধু প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ও আমি দুইজনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বাড়ির সম্মুখে আসিবার সময় একটি স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া আসিলাম, কিন্তু তত লক্ষ্য করিলাম না, তাহার মুখটা দেখিলাম না। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পা আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে শুনিলাম, "হাঁ গা শাস্ত্রীমশাই, তোমরা এখন কোথা থাক?" হঠাৎ ফিরিয়া দেখি, একটি গৌরবর্ণা যুবতী একটি শিশু কন্যার হাত ধরিয়া আসিতেছে। মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। ভবানীপুর বাসকালে আমি এক নির্জন পল্লীতে বাস করিতাম। ঐ পতিতা নারী তাহার সন্নিকটেই থাকিত ও আমাদের মেয়েদের সঙ্গে এক পুকুরে স্নানাদি করিত। সে যে আমাকে চিনিয়া রাখিয়াছে ও আমার নাম জানে, তাহা জানিতাম না। যাহা হউক

আমি ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র সে হাসিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমার বাসা কোথায় বললে আমি গিয়ে দেখা করতে পারি, নতুবা আমার বাসা অমুক নম্বর শিব ঠাকুরের গলি, সেখানে তোমাকে একবার আসতে হবে।"

ইহার পর বিদ্যারত্ন ভায়া ও আমি দুইজনে বলাবলি করিতে লাগিলাম, "আমাকে যখন জানে, তখন আমি কি তন্ত্রের লোক তাও জানে। আমার সঙ্গে ওর কি কাজ?" কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিলাম না, বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। আসিয়া আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়কে এই বিবরণ বলিলাম। তিনি এক সময়ে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ও যখন ব্যাকুল হয়ে তোমাকে ডেকেছে, তখন নিশ্চয় কোনো বিষয়ে তোমার সাহায্য চায়। চল, একবার শিব ঠাকুরের গলিতে ওর বাড়িতে যাই।" এই নির্ধারণ অনুসারে পরবর্তী রবিবার প্রাতে আমরা দুজনে শিবঠাকুরের গলিতে তাহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই বাড়িটি এইরূপ স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। তখন বেলা ৯টা, তথাপি তাহাদের অধিকাংশ ঘরে ঘরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অনেকে উঠিয়াছে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে।

এই মেয়েটির নাম থাকমণি। থাকমণি আমাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। সে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার নিমন্ত্রণে আমি ঐরূপ স্থানে যাইব। তাহার ভাবে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম। সে রাস্তাতে আমার সহিত কথা কহিবার সময়, হাসিয়া ঢলিয়া 'তুমি' 'তুমি' করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন আর এক মূর্তি ধরিল। 'আপনি' ও 'আপনারা' বলিয়া কথা আরম্ভ করিল এবং অতি গম্ভীর ও অনুতপ্ত ভাবে আপনার জীবনের বিবরণ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে বিবরণ সংক্ষেপে এই। সে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী কোনো স্থানের এক ভদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের কন্যা। তাহার মাতা ও ভ্রাতা তখনো জীবিত আছেন এবং সে বিপদে পড়িয়া প্রার্থনা করিলে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। বাল্যকালে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার অপর অনেকগুলি স্ত্রী ছিল, সে কখনো পতিগৃহে যায় নাই, কালেভদ্রে কখনো পতিকে দেখিয়াছে এই মাত্র। এই প্রকার অবস্থায় সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পাড়ার একজন পুরুষ তাহার পশ্চাতে লাগিল, এবং তাহাকে ফুসলাইয়া কুলের বাহির করিয়া আনিল। এই অবস্থাতে সে তৎকালীন চৌদ্দ আইনের ভয়ে কিছুকাল ভবানীপুরের সেই নির্জন স্থানে লুকাইয়া ছিল। সেখানে থাকিবার সময় সে আমাকে দেখিয়াছে ও আমার বিষয় অনেক কথা শুনিয়াছে। সেইখানে থাকিতে থাকিতে সে লক্ষ্মীমণিকে দেখিয়াছে, এবং ব্রাহ্মেরা কিরূপে

তাহাকে উদ্ধার করিয়া আমার গৃহে রাখিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছে। তাই তাহার শিশু কন্যাটিকে আমার হস্তে দিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মা ও ভাই আছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভালো, তবে কেন তুমি এমন পথে পা দিলে?"

থাকমণি। কি করে ফিরব, যাবার যো নেই। তাই ভাবি, যার সঙ্গে ভেসেছি তাকেই আশ্রয় করে থাকি। তাই তাকেই আশ্রয় করে আছি। সে বেচারার স্ত্রী আছে, ছেলেপিলে আছে, অল্প আয়, আমার সব খরচ দিয়ে উঠতে পারে না; আমাকে বড় কষ্টে থাকতে হয়। আমার যা হবার হয়েছে, এখন ভাবি মেয়েটাকে এ পথ হতে কি করে বাঁচাই। শাস্ত্রী মশাই, আপনি লক্ষ্মীমণিকে বাঁচিয়েছেন, তাই আপনার চরণে শরণাপন্ন হচ্ছি।

আমি। তোমার মেয়ে যে এখনও মাই ছাড়েনি। এত ছোট মেয়ে কি মা ছেড়ে থাকতে পারবে?

থাকমণি। সে একটা ভাবনার কথা বটে। তবে মনে হয়, একটু ভালোবাসা যত্ন পেলে ক্রমে মাকে ভুলে যাবে। আপনার স্ত্রীর ভালোবাসার গুণে ও বশ হয়ে যাবে।

আমি। আচ্ছা, আরও দুই-তিন মাস যাক, মেয়েটা মাই ছাড়ুক, তখন অমুক ঠিকানায় আমাকে খবর দিও।

এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। হায়! সে আর খবর দিল না। ইহার পরে আমার পীড়া হইয়া, সে বাসা ভাঙিয়া গেল, আমি মুঙ্গেরে চলিয়া গেলাম। তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজে মাতিলাম, থাকমণি ও তাহার কন্যা স্মৃতি হইতে সরিয়া পড়িল। হয়তো তাহার মন বদলাইয়া গেল, না হয় আর আমার উদ্দেশ পাইল না। যে কারণেই হউক, থাকমণির উদ্দেশ আর পাইলাম না।

খ্রীষ্টীয়া যুবতীর মতিভ্রম। দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। এই ঘটনায় উল্লিখিত নারীর উদ্দেশ অনেক অনুসন্ধানেও কেহ পাইবেন না, তাই ইহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। হেয়ার স্কুলে কাজ করিবার সময় একদিন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, একটি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বিনী যুবতী একটি পুত্রসন্তানসহ আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, তাহার পতি অতি দুর্বৃত্ত, তিনদিন হইল তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে তিনদিন পুত্রসহ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মীমণিকে আশ্রয় দিয়া কিরূপে রক্ষা করিয়াছি, তাহা সে শুনিয়াছে, সেই সাহসে আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে। স্ত্রীলোকটি আমার ভবনে থাকিয়া গেল। আমি পরে ভাবিলাম, সে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বিনী, কোনো

খ্রীষ্টীয় পরিবারে তাহাকে রাখিতে পারিলে ভালো হয়, তাহার পতির সহিত শীঘ্রই মিলন হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমার এক পাদরী বন্ধুকে গিয়া ধরিলাম। তিনি দয়া করিয়া তাহাকে পুত্রসহ এক খ্রীষ্টীয় বাড়িতে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ঘরভাড়া ও মাতাপুত্রের আহারের ব্যয় আমাকে দিতে হইত, আমি নিজ অর্থ হইতে এবং ভিক্ষা করিয়া সে ব্যয় চালাইতাম।

তাহাদিগকে সেখানে স্থাপন করিয়াই তাহার পতিকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং আমার ভবনে ডাকাইয়া স্বীয় পত্নীকে লইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে বলিল, "আপনার হাতে আছে, নিরাপদে আছে। অমনি কিছু দিন থাক, ভুগুক, চেতুক, সোজা হয়ে আসুক, পরে আমি নিয়ে যাব।" আমি মনে করিলাম, একটু ভোগা ভালো। সে সেইরূপ রহিল। আমি মধ্যে-মধ্যে স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতাম।

এই সময়ে তাহার ব্যবহারে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রথম, আমি কিয়ৎক্ষণ বসিয়া উঠিতে চাহিলে সহজে উঠিতে দিত না। দ্বিতীয়, তাহার মুখে বিষাদের চিহ্ন কিছুই দেখিতাম না। একদিন সে এ কথা সে কথার পর আমাকে বলিল, "আপনি আমার কষ্ট নিবারণ করতে পারেন। আমি টাকাকড়ির কষ্টের কথা বলছি না, স্ত্রীলোকের আরও কষ্ট আছে, তারি কথা বলছি।" তখন আমার চোখ যেন একটু ফুটিল। কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াই তাহার মুখ হইতে পরিষ্কাররূপে এ কথাটা বাহির করা গেল যে, সে আমাকে অবৈধ প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার ঘরের বাহিরে আসিতেই, সে ভীত হইয়াই হউক কি যে কারণেই হউক, "আর একটা কথা আছে" বলিয়া আমার পথ রোধ করিল। আমার প্রথম মনে হইল, গর্জন করিয়া উঠি এবং জোরে তাহার হাত ছাড়াইয়া যাই। কিন্তু কোলাহল ও লোক-জানাজানি হইলে একটা কলঙ্কের ব্যাপার হইবে, তাহা ইহার পক্ষে ভালো নয়, এই মনে করিয়া তাহা করিলাম না; বলিলাম, "তোমার কাছে বাংলা বাইবেল আছে?"

সে। আছে।

আমি। সেখানা আনো দেখি।

সে। তাতে এখন কাজ কি?

আমি। আনো না। একটু প্রয়োজন আছে।

সে অনিচ্ছাক্রমে বাইবেলখানা বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। যীশু যেখানে মানসিক পাপাচরণের নিন্দা করিতেছেন, সেই স্থানটা বাহির করিয়া পড়িতে দিলাম। সে কোনো মতেই পড়িবে না, অবশেষে আমি বার বার বলাতে পড়িল।

আমি। দেখ, তোমরা যাঁহাকে প্রভু মনে কর, তাঁর কি অমূল্য উপদেশ! তুমি এ উপদেশ কতবার পাইয়াছ, তবু কেন তোমার এ প্রবৃত্তি? আর তুমি আমাকে এত খারাপ কিরূপে ভাবিলে? তোমার স্বামী তোমাকে আমার হাতে সঁপিয়া গিয়াছে। আমি কি ছোটলোক যে বিশ্বাসঘাতকতা করিব?

আমি সেইদিন তাহাকে যেরূপ তেজের সহিত উপদেশ দিয়াছিলাম, জীবনে আর কাহাকেও বোধ হয় সেরূপ দিই নাই। তৎপরদিন তাহার পতিকে ডাকাইয়া বলিলাম, "তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও, ওকে বাইরে রাখা ভালো নয়।" সে তাহাকে লইয়া গেল।

ইহার পর ঐ নারীকে আর একবার দেখিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পরে শহরের সন্নিকটবর্তী কোনো পথ দিয়া যাইবার সময় পথের পার্শ্ববর্তী এক বাড়ি হইতে তাহার পুত্রটি বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "আমরা এই বাড়িতে থাকি; মা আপনাকে দেখতে পেয়েছেন, একবার দেখা করবার জন্ম ডাকছেন।" আমি বাড়িতে প্রবেশ করিলে তাহার মাতা গলবস্ত্রে আমার পদে প্রণত হইয়া, আমার বাড়ির সমুদয় সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের কুশল সংবাদ লইয়া চলিয়া আসিলাম।

রাজনারায়ণ বসু। ক্রমে আমরা ১৮৭৭ সালে উপনীত হইলাম। এই সালের প্রথমে হরিনাভি সমাজের উৎসবে যাই। সেখানে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মগণের সমাগম হয়। উক্ত অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার সরল অকৃত্রিম ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিত। তিনি তখন কার্য হইতে অবসৃত হইয়া বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। আমি মধ্যে-মধ্যে তাঁহার বিমল সহবাসে কিয়ৎকাল যপন করিবার জন্য সেখানেও যাইতাম। তিনি অতি পরিহাসরসিক আমোদপ্রিয় পুরুষ ছিলেন, আমিও তদ্রূপ; সুতরাং দুজনের একত্র সমাগম হইলে উভয়ের 'জিগীষা' প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। হাসিতে হাসিতে লোকের নাড়িতে ব্যথা হইয়া যাইত। এবারেও হরিনাভিতে তাহা ঘটিল। একদিন রাত্রে সামাজিক উপাসনার পর আহারান্তে আমাদের দুইজনের গল্পের কাটাকাটিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। ব্রাহ্মদের নাড়িতে ব্যথা হইল।

সেই কারণেই হউক, কি হরিনাভির ম্যালেরিয়াবশতই হউক, আমি কলিকাতায় আসিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইলাম। জ্বরের সঙ্গে রক্তকাশ দেখা দিল। একজন ডাক্তার বলিলেন, হাঁপকাশের সূত্রপাত, কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন, ক্ষয়কাশের সূত্রপাত। সেইরূপ চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পিতামাতার ব্যবহার। এই পীড়ার সময় আমার পূজনীয় জনক-জননী কি করিয়াছিলেন, এবং আমার বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য দাদাই কি করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত। তৎপূর্বে আট বৎসর আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার মুখদর্শন করেন নাই। তিনি যে প্রথম-প্রথম আমাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবেন না বলিয়া গুণ্ডা ভাড়া করিতেন, ও শেষে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও আমি বাড়িতে কোনো ঘরে আছি জানিলেই সে ঘরের দিকে যেতেন না, পথে আমাকে দেখিলে সে পথ পরিত্যাগ করিতেন, এ সকল অগ্রেই বলিয়াছি। আমি পীড়াতে পড়িয়া যখন বুঝিতে পারিলাম যে পীড়া কঠিন, আমার জীবন সংশয়, তখন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করিলাম। রোগশয্যায় পড়িয়া তাঁকে পত্র লিখিলাম। পীড়ার সংবাদ দিয়া লিখিলাম, "যদি উচিত বিবেচনা করেন, আসিয়া দেখা দিয়া আমাকে পদধূলি দিয়া যাইবেন। তাহা না হইলে এই বিদায়, পরলোকে দেখা হইবে।" তৎপূর্বে বাবা আমার চিঠিপত্র খুলিতেন না, উপরে আমার হস্তাক্ষর দেখিলে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এ পত্র যে কেন পড়িলেন, বলিতে পারি না। অনুমান করি, লোকমুখে অগ্রেই আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, একদিন প্রাতে আমার ভবনের দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া লাগিল। প্রসন্নময়ী জানালা হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন, "বাবা ও মা আসিয়াছেন।" মা উপরে আসিলেন, কিন্তু বাবা আর সে ভবনে প্রবেশ করিলেন না। মা আমার রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া কাঁদিয়া বসিয়া পড়িলেন। "বাবা আসিলেন না কেন?" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, তিনি কবিরাজ ডাকিতে গিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, বাবা আমার চিঠি পাইয়া, মায়ের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আমার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন, বাড়িতে প্রবেশ করিবেন না, আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া আমার চিকিৎসা করাইবেন।

যথাসময়ে কবিরাজ আসিলেন। বাবা তাঁহাকে আমার ভবনে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিজে পথপার্শ্বে দোকানে বসিয়া রহিলেন। কবিরাজ আমাকে দেখিয়া গেলে তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিলেন।

তাঁহার এই ব্যবহারে আমার চক্ষে কত জল পড়িল। তৎপূর্বে এই আট বৎসর সংসারের আপদ-বিপদে জ্ঞাতসারে আমার এক পয়সাও সাহায্য লন নাই। পরন্তু যদি কখনো জানিতে পারিয়াছেন যে, মায়ের হাত দিয়া গোপনে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিতেছি, তখন তুমুল কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি আমাকে একেবারেই ত্যাজ্য পুত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পতিত পুত্র যখন বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিল, তখন আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সম্বল নাই। যে সম্বল হাতের কাছে

পাইলেন, তাহাই লইয়া ছুটিলেন। কি উদারতা! এই উদারতা তাঁহার প্রকৃতির এক মহা সদ্‌গুণ।

তিনি আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া, এক স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করিয়া মাকে আমার পরিচর্যার জন্য সেই বাড়িতে রাখিয়া গেলেন। মাতাঠাকুরাণী বিরাজমোহিনীকে ও আমাকে লইয়া সেই বাড়িতে রহিলেন। মাতাঠাকুরাণীর জপ-তপ-ব্রত নিয়ম উপবাসাদির মাত্রা অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। প্রায় প্রতিদিন দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, ইষ্টদেবতার চরণে শত-শত প্রণাম করিয়া এই অধম পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতেন। তৎপরে গৃহে ফিরিয়া আমার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মাটি দিয়া শিব গড়িয়া পূজাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি শুইয়া শুইয়া তাঁহার পূজার নিষ্ঠা দেখিতাম।

ওদিকে, বাবা মাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া গ্রামের জ্ঞাতি কুটুম্ব-বর্গের মধ্যে কেহ-কেহ দলাদলি আরম্ভ করিলেন। বাবা তখন বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়া দাঁড়াইলেন। "একঘরে করে করুক, আমার কর্তব্য কাজ আমি করেছি," বলিয়া সে দলাদলির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এই দলাদলিতে কিছুদিন গেল।

এদিকে মা আমার সেবাতে বিব্রত। আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অতি সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি মায়ের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। তাঁহার প্রতি আমাদের পরিবারস্থ সকলের ও জ্ঞাতি কুটুম্বের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহার লাঠি, তাঁহার জপ-মালা, তাঁহার যোগপট্ট প্রভৃতি যে-কিছু চিহ্ন রয়ে ছিল, সে-সমুদয়ের প্রতি মা'র এত ভক্তি যে, বাড়িতে কাহারও গুরুতর পীড়া হইল, সেগুলি তাহার রোগশয্যাতে স্থাপন করা হইত, রোগমুক্তি না হইলে অন্তরিত করা হইত না। সেই নিয়মানুসারে জননী-দেবী ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের লাঠি মালা প্রভৃতি আনিয়া আমার শয্যাতে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিন মাস সেইরূপ রহিল, অন্তরিত করিতে দিলেন না। আমার পীড়ার উপশম হইলে তবে তুলিয়া লওয়া হইল।

ভৃত্যের ভালোবাসা। এই পীড়ার সময় আমার জনক-জননীর যেমন আশ্চর্য সন্তান-বাৎসল্য দেখিলাম, তেমনি আমার বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য খোদাইয়ের অদ্ভুত প্রভু-ভক্তির পরিচয় পাইলাম। খোদাইয়ের স্মৃতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার 'মেজবৌ' নামক উপন্যাসে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভবানীপুরে হেডমাস্টারি করিবার সময় খোদাইকে রাখি। তখন হইতে তাহার গুণাবলি দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হয়। আমার প্রতিও তাহার প্রগাঢ় প্রীতি জন্মে। সে আমার হিতৈষী বন্ধু ও পরিবার-পরিজনের রক্ষক ছিল। আমি তাহার হাতে টাকাকড়ি ও সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম।